বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬
শ্রীজানকীনাথ বসু এম. এ. কর্তৃক প্রকাশিত।

লোক-সেবক প্রেস, ৮৬-এ জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ—১৯৫৮

প্রচ্ছদ—শ্রীরোহিণী মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গ ॥

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ., ডি. লিট্.

ভক্তিভাজনেষু

ভূমিকা

মনে করুন কয়েক দিন ধরিয়া দেহে সামান্য অবস্থান্তর অনুভব করিতেছেন, ধরুন আপনার একটু বেশি ঘুম হয় বা কিছু কম হয়। আপনি সাবধানী মানুষ, চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার উপদেশ বা নির্দেশপ্রার্থী হইলেন। আপনার চিকিৎসক প্রবীণ এবং বিচক্ষণ—বিশেষতঃ তিনি হ্যানিম্যান্ ভক্ত। তিনি আপনাকে জেরা করিয়া অস্থির করিয়া তুলিলেন। তিনি প্রথমে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, আপনার জীবনের পূর্ব ইতিহাস—আপনি আপনার জীবনে দেহে ও মনে করে কখন সুখে বা অসুখে ছিলেন—সুখে থাকিলেই বা কেন ছিলেন, অসুখে থাকিলেই বা কেন ছিলেন, কিরূপেই বা আপনার জীবনের সেই বিশেষ বিশেষ সুখ-অসুখ হইতে আপনি অবস্থান্তর লাভ করিলেন। পরেই প্রশ্ন হইবে, আপনার সহজেই মৃত্যুভয় হয়, না সর্বদাই আপনি নিজেকে অজরামরবৎ মনে করেন, আপনি অল্পকারণে আনন্দে উদ্বেল হইয়া ওঠেন বা অল্পকারণে অশ্রুপাতে অধীর হন, আপনি নিত্য স্নানে অভ্যস্ত অথবা জলস্পর্শে আপনার স্বাভাবিক বিরক্তি, আপনি খোলা হাওয়ায় খোলামেলা ভাবে থাকিতে ভালবাসেন অথবা বদ্ধঘরে মুড়িসুড়ি দিয়া থাকিতে ভালবাসেন টক ঝালে আপনার আগ্রহ কি নুন মিষ্টিতে আপনার প্রসক্তি। আপনি ক্রমে অধৈর্য হইয়া উঠিতেছেন, আপনার জীবনের একটি বিশেষ কালে কিছু অনিদ্রা বা অতিনিদ্রার প্রসঙ্গে এত অসংলগ্ন এবং অবাস্তব প্রশ্নের কি প্রয়োজন আপনার তাহা মাথায়ই আসিতেছে না। কিন্তু দেহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ আপনার পরামর্শদাতা বলিবেন, দেহের সাময়িক সুখ-অসুখ বলিয়া কোনও জিনিস নাই। আপনার দেহ-প্রাণ মন সব জুড়িয়া ক্রিয়াশীল একটি অখণ্ড জীবনী অখণ্ড জীবনী-শক্তি, সেই জীবনী-শক্তি এবং আপনার দেহ-প্রাণ-মন জুড়িয়া যে তাহার নিত্য প্রবাহ তাহার সমগ্রতার মধ্যে কোনও পরিবর্তন না আসিয়া আপনার দৈহিক কোনও সাময়িক অবস্থান্তরকেও সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে না সামান্যতম অংশের ভিতর দিয়াও সমগ্রেরই একটি বিশেষ ক্ষণে বিশেষ প্রকাশ, সুতরাং সেই সমগ্রের খানিকটা সন্ধান না লইয়া কোনও আংশিক বা সাময়িক জিনিস সম্বন্ধেও কোনও স্পষ্ট ধারণা করা যায় না।

সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে এই জৈব শাস্ত্রের তথ্যটির উল্লেখ করিলাম এই জন্য, সাহিত্যের সম্বন্ধেও সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে একটা স্বতন্ত্রতার বোধ

প্রচলিত আছে। কিন্তু আমাদের জীবন দর্শনের মধ্য দিয়া এই প্রত্যয়টিই ক্রমে দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে যে, জীবনে স্বতন্ত্র বলিয়া কোনও জিনিস নাই। ব্যক্তিগত ভাবেও নাই, সমষ্টিগত ভাবে—অর্থাৎ জাতিগত ভাবেও নাই। সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, সমাজ—কাহারই কোনও স্বাতন্ত্র্যের দাবী নাই, জীবনের একটি সামগ্রিক ঐক্যের মধ্যেই তাহারা সমন্বিত ভাবে বিধৃত। দেখা গিয়াছে, স্বাতন্ত্র্যের উগ্রতা লইয়া যে অংশটিই সমগ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে চায় তাহাই অসঙ্গত হইয়া উঠে—অসঙ্গতিই অকল্যাণের ইন্ধন।

এই কারণেই সাহিত্যের সৃষ্টি এবং আলোচনা উভয়ক্ষেত্রেই একটা ঐকান্তিক বিশুদ্ধির প্রশ্ন আমাদের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এই একান্ত বিশুদ্ধির দ্বারা যদি আমরা একান্ত বিচ্ছিন্নতার কথা মনে করি, তবে লক্ষ্য করিতে হইবে জীবনের সমগ্রতা হইতে যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল তাহাত জীবনের পরিপন্থী হইয়া উঠিল; তাহাত আর জীবনের অংশ রহিল না, সঙ্গতিহীনতায় তাহা বিরোধী হইয়া উঠিল।

সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়াও দেখা যায়, কোনও দেশের কোনও যুগের সাহিত্যই জাতীয় জীবনের সমগ্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। কোনও যুগের সাহিত্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, তাহার পূর্ব-ইতিহাসের সহিত কিঞ্চিৎ সাধারণ পরিচয়—এবং সেই বিশেষ যুগের জাতীয় জীবনের সমগ্রতার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন রহিয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই প্রয়োজনবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াই বর্তমান গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য', গ্রন্থখানি পাঠ করিলেও বোঝা যায় সব আলোচনাই সাহিত্যকেন্দ্রিক, তবে তিনি তাঁহার আলোচনার মধ্যে সাহিত্য ব্যতীতও ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সামাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি সম্বন্ধে এত তথ্য এবং তৎসম্বন্ধীয় আলোচনাকে এমন ভাবে স্থান দিয়াছেন কেন? স্থান দিয়াছেন এই ধারণা লইয়া যে, উনবিংশ শতকের বাঙালীর সমগ্র জীবন-সাধনার পরিচয় না জানিলে আমরা এই শতকের সাহিত্য-সাধনার পরিচয়কেও ঠিক ঠিকভাবে বুঝিতে পারিব না।

উনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যকে আমরা বাঙালীর নব-জাগরণের সাহিত্য আখ্যা দিয়া থাকি। উনবিংশ শতকের বাঙালীর এই নব-জাগরণ শুধুমাত্র একটা নবসাহিত্য-রচনার উদ্যম লইয়া নহে; এই নবজাগরণের একটি গভীর এবং

ব্যাপকরূপ আছে, সেই গভীরতা এবং ব্যাপকতার উৎস হইতেই এই যুগের সাহিত্য-প্রচেষ্টা উৎসারিত। রাষ্ট্রজীবন, সমাজ-জীবন, ধর্ম-সংস্কৃতি, শিক্ষা-সভ্যতা সবক্ষেত্রে আসিয়াছিল প্রবল আঘাত, এই আঘাত জাতিকে বিপর্যস্ত বা বিমূঢ় করিতে পারে নাই, আত্মরক্ষার সংজাত বৃত্তিতে জাতিকে আত্মশক্তি ও আত্মচৈতন্যে উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। ধরণীর অভ্যন্তরস্থ বিবিধ উপাদান সহসা মিশ্রিত হইয়া প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিলে ধরণী যেমন নিজের ভূত্বকান্তরকে ঊর্ধ্বে ক্ষিপ্ত করিয়া পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি করে, ঊনবিংশ শতকের বাঙালী সমাজ জীবনে তেমনই কতগুলি অনুকূল-প্রতিকূল শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত সমাজ-জীবনের অভ্যন্তরে একটি প্রবল শক্তি সঞ্জাত করিয়া প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই আলোড়নের বহিঃপ্রকাশ সমাজের মধ্যে কতগুলি পর্বততুল্য সুদৃঢ় এবং সমুন্নত চরিত্রের আবির্ভাবে। ইঁহারা ইঁহাদের ব্যাপক কর্মচেষ্টার দ্বারা জাতিকে দৃঢ়তা দান করিয়াছেন, সমুন্নতি দান করিয়াছেন—মর্যাদা দান করিয়াছেন। ইহাই আমাদের ঊনবিংশ শতকের নব জাগরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই নব-জাগরণের সহিতই যুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে আমাদের এই যুগের সকল সাহিত্য-সাধনাকে। সেই যুক্ত করিয়া দেখিবার সাধু এবং সার্থক চেষ্টাই দেখিতে পাই ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থে। দৃঢ় তথ্য-নিষ্ঠা, সংযত অথচ তীক্ষ্ণ মনন—সর্বোপরি একটি ব্যাপক দৃষ্টি লইয়া ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের একটি সামগ্রিক পরিচয়ই আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। এই যুগের সাহিত্য-সমালোচনা বা সাহিত্য-আস্বাদন ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করে নাই, প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এই যুগার্ধের জাতীয় জীবনের সামগ্রিক পরিচয়ের সহিত সাহিত্য-পরিচয়কে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করিয়া দেখিবার চেষ্টা।

একটি সংক্ষিপ্ত 'পূর্বকথার' পরে লেখক গ্রন্থখানিকে নানা অধ্যায়ে বিভক্ত দীর্ঘ চারিটি পর্বে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম পর্ব হইল ১৮০০ হইতে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ লইয়া। এই কালের বঙ্গরঙ্গমঞ্চে প্রধান অভিনেতা বিদেশাগত খ্রীষ্টান মিশনারীগণ, পার্শ্ব চরিত্র এ-দেশের কয়েকজন পণ্ডিত মুন্সী। ইঁহারা ইঁহাদের কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা ইঁহাদের কর্মভূমির অদূরেই একটি বিরাট সম্ভাবনাগর্ভ নেপথ্য সৃষ্টি করিলেন, সেই নেপথ্য হইতে আবির্ভাব প্রধান চরিত্র রাজা

রামমোহন রায়ের, সুতরাং গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব হইল 'রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি।' রামমোহনকে মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়া লেখক এই যুগের বাঙালীর সর্বভাবে উদয়াকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত কর্মোদ্যমেরই পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু রামমোহনকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর যে নব-জাগরণ ও কর্মোদ্যম বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে তাহা তরঙ্গহীন একটানা মনন-প্রবাহেরই সৃষ্টি করিল না। নব-জাগরণ অনেক ভালোর সঙ্গে অনেক মন্দকেও আনিয়া হাজির করিল; মুক্তির সঙ্গে উত্তেজনার আবিলতা, চিন্তা বিশুদ্ধির সহিত অন্ধানুকরণের আবর্জনা, আত্মসংস্কারের সহিত পরপ্রভাবের বিমূঢ়তা নিত্যনূতন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিতে লাগিল। দ্বন্দ্ব ভাবের এবং ভাব প্রণোদিত জীবন যাত্রার। এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস স্থান পাইয়াছে গ্রন্থের তৃতীয় পর্বে, লেখক তাহার নাম দিয়াছেন 'ভাবদ্বন্দ্ব'। গ্রন্থের চতুর্থ পর্বে লেখক মুখ্যভাবে বিদ্যাসাগর ও বাঙালী-মানসের বিচিত্র বিবর্তনের পরিচয় দিয়াছেন। এই পর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গ-সংস্কৃতির আলোচনাও অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে।

দ্বিতল গৃহকে ত্রিতল করিবার আকাঙ্ক্ষা আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ভিত খুঁড়িতে আরম্ভ করি—নানা ভাবে পর্যালোচনা করি ভিতের উপাদানের, পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করি তাহার দৃঢ়তার। আমাদের এই বিংশ শতকের বাঙালী জীবনের ভিত্তিভূমি উনবিংশ শতকের বাঙালী জীবনে। জাতীয় জীবনের ক্রমপ্রসারণের প্রত্যেক ক্ষণে তাই অতি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে উনবিংশ শতকের জাতীয় জীবনের প্রতি—জাগে বিবিধ কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা। সেই কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার ভিতর দিয়া গত শতাব্দীর সাহিত্যের সহিত জাতীয় জীবনের সামগ্রিক রূপের যেমন পরিচয় লইতে চাই, তেমনই বারবার করিয়া সচেতন হইয়া উঠিতে চাই নিজেদের ঐশ্বর্যপূর্ণ ঐতিহ্য সম্বন্ধে—অনুভব করিতে চাই জাতীয় জীবনে নিজেদের একটি সুদৃঢ় বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া। আমাদের গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের সেই সামগ্রিক ঐতিহ্যের পরিচয় ডক্টর অসিতকুমারের গ্রন্থের ভিতরে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাঁহাকে আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

সূচীপত্র

ঃ চতুর্থ পর্ব ঃ

॥ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী-মানসের বিচিত্র বিবর্তন ॥

ভূমিকাঃ পূর্বকথা

প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রসরূপ ও প্রাণবস্তু আলোচনা করিতে গিয়া একটা নূতন বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই সহস্রবর্ষব্যাপী সাহিত্যধারা যে কাব্যের নির্বিকল্প রসলোকে স্বপ্নপ্রয়াণ করে নাই, পরন্তু সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম ও অর্থনৈতিক উত্থানপতনের সহিত নিবিড়তম আত্মীয়তা-সূত্রে বিধৃত হইয়া আছে, তাহা সুস্পষ্ট হইবে এই সাহিত্যের বাতায়নতলে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজ-সংস্কৃতির পটভূমিকা অনুসন্ধান করিলে।

সাহিত্য 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা' বটে, কিন্তু ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেরও একটা নিয়তি ও পরিণতি আছে; এবং সাহিত্য যেহেতু সমাজজীবী মানস চেতনার অন্তর্লীন বস্তু, সেই হেতু তাহা যতই নির্বিকল্প ও নির্বস্তুক হোক না কেন, তাহার একটা বাস্তব অধিষ্ঠান-ভূমি থাকিবেই। যে কোন সাহিত্যই হোক,—চসারের রাজসভাজীবী সূক্ষ্ম কারুকলা বা শেলীর নিঃসঙ্গ নিরুপায় বিদ্রোহ, কালিদাসের কল্পনার অপরূপ সমুৎকর্ষ বা পরবর্তী কালের সংস্কৃত কবিদের অত্যুজ্জ্বল বুদ্ধি ও কল্পনার মণিদীপ্তি, বৈষ্ণবপদাবলীর রসতত্ত্ব বা মঙ্গলকাব্যের ভূমিচারী কল্পনা—প্রত্যেকটির একটা প্রতিষ্ঠাভূমি আছে। সমাজ-জীবনের নানা আন্দোলন, প্রভাব, ভাবজগতের উত্থানপতন, চিন্তাসমুদ্রের আলোড়ন প্রভৃতি অসংখ্য বাস্তব ও কল্পনাশ্রয়ী কারণ সেই প্রতিষ্ঠাভূমিকেই দৃঢ়তর করে।

য়ুরোপ যেমন মধ্যযুগের কালরাত্রির অবসানে ইতালির মারফতে প্রাচীন হেলেনীয় সংস্কৃতির স্পর্শ লাভ করিয়া নূতন মূল্যমানের সাহায্যে জীবন ও জীবন-সমুখ সাহিত্য-সংস্কৃতিকে পরিমাপ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যে ১৯শ শতাব্দী যে বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহা আত্ম-জাগরণের বাণী—আর এই আত্মজাগরণের অর্থই হইল পরিপার্শ্বচেতনা। তাই ১৯শ শতাব্দীতে বাঙালী সর্বপ্রথম দেশকালের গণ্ডী সম্বন্ধে সচেতন হইল এবং নানা প্রভাবের সংঘাতে এই শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্য বিষয়বস্তু ও প্রকাশরীতির দিক দিয়া অতিক্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকা আলোচনা করিবার পূর্বে অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বাস্তব পরিবেশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক, কোন্ প্রভাব এবং কী পরিবেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য বিকাশ লাভ করিয়াছে।

॥ ১ ॥

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভাব

ইতিপূর্বে আমরা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছি যে, সাহিত্য নির্বিকল্প রসবস্তু নহে; তাহার চারিদিকে নানা প্রভাব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বাতাবরণ থাকে। এক হিসাবে সাহিত্য মনন ও অনুভূতির বস্তু এবং প্রধানতঃ মানস-প্রক্রিয়াজাত বলিয়া এই বাঙ্‌ময় সৃষ্টি বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ছাড়াইয়া উঠিতে পারে।

সাহিত্যের রসলোক সৃষ্টি করিতে হইলে মনের জন্য যেমন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিচেতনার আবশ্যক, সেইরূপ সাহিত্যের রূপলোকও বস্তুর ভাবলোকের (অর্থাৎ আইডিয়ার) উপর প্রতিষ্ঠিত। দেহরূপ আধার ছাড়া যেমন আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করা গেলেও বাস্তবক্ষেত্রে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, সেইরূপ পরিবেশ-ব্যতিরিক্ত সাহিত্য ও সাহিত্যিকেরও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই সাহিত্যের রূপ, রীতি ও আত্মার স্বরূপ নিধারণের পূর্বে বীজবপনের ক্ষেত্র বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য পরিবেশ-সচেতন; কারণ আধুনিক মানুষ আপনার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আজ আর অনবহিত নহে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য বহুলাংশে দেবমাতৃক। কবিগণ বাস্তব-পরিবেশ ভুলিয়া সহজেই বস্তুজগতের অতীতলোকে পৌঁছিয়াছেন,—রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক পরিবর্তন ও বিপ্লবের আঘাতে তাঁহাদের সত্তা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। যখন মুঘল-পাঠানে সর্বনাশা সংঘাত চলিয়াছে, দেশ শ্মশান হইয়া যাইতেছে,—তখনও কবিগণ মনসা-শীতলা-শনির পাঁচালী গান করিয়া আসন্ন উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি একটু অবহিত হইলেই দেখা যাইবে যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ নানাভাবে—কখনও স্পষ্ট কোথাও বা অস্পষ্ট রূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিতে গেলে ধর্মনৈতিক বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়া লওয়া প্রয়োজন ; কারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রবিন্যাস—এক কথায় জীবনের যাবতীয় বহিরঙ্গ সাধনা, সমস্তই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি ধর্মচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। নিম্নে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

বৌদ্ধ প্রভাব—বঙ্গে মুসলমান প্রভাব বাঙালীর মানস-প্রকরণটিকে নানাদিক দিয়া প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছিল। তাহার পূর্বে কয়েকখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিক পুঁথি ভিন্ন বাংলা সাহিত্যের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশ্য পাল ও সেন বংশের শাসনাধীনে আসিয়া বাঙালীর ধর্মীয় ও মানস-প্রকৃতি কোন্ পথে ধাবমান হইতেছিল, তাহা তদানীন্তন লিপিলেখ হইতে কিছু কিছু অনুধাবন করা যায়। পালরাজগণ প্রধানতঃ মহাযান শাখাভুক্ত ছিলেন ; মহাযান মত হিন্দুর নবজাগ্রত সংস্কৃতির প্রবল প্রভাবের সম্মুখে 'বৈতসীবৃত্তি' অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ফলে হিন্দুর নব্য পৌরাণিক সংস্কৃতি মহাযান মতবাদকে দ্রুত আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। মহাযান মতের সর্বাধিক প্রভাব ছিল লৌকিক মনে। ইহার সহিত তান্ত্রিকতা, অন্যান্য নানাবিধ গুহ্যতন্ত্রের রহস্যাচার মিশ্রিত হইয়া চর্যাপদের পটভূমিকা নির্মাণ করে। কিন্তু একটা কথা স্মরণীয় ; এই চর্যার ধর্মনৈতিক মতামত শুধু কি সমাজের অন্ত্যজের মধ্যেই নিহিত ছিল ? ইহার সূক্ষ্ম সাঙ্কেতিকতা ও দার্শনিকতার ব্যক্তিগত সাধননির্দেশ কেবল সমাজের অন্ত্যজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল—ইহা বিশ্বাস যোগ্য নহে। অদ্ভুত অলৌকিকত্ব দেশের শিক্ষিত মহলেও প্রচলিত ছিল। 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থের রচনাকাল বা ভাষা লইয়া মতভেদের অবকাশ থাকিলেও ইহা হইতে একটা কথা স্পষ্ট হইতেছে যে, লক্ষ্মণ সেনের রাজসভাতেও প্রচুর অলৌকিক গালগল্প প্রচলিত ছিল। সুতরাং চর্যার ধর্মচেতনা অর্থাৎ সংমিশ্রিত বৌদ্ধ সহজিয়া মত সমাজের উচ্চ কোটিতেও একেবারে অপাংক্তেয় ছিল না বলিয়াই অনুমিত হয়। ভট্টভবদেব বা হলায়ুধ মিশ্র বৈদিক সংস্কারের পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা করিলেও সমাজের উচ্চ নিম্ন উভয় স্তরেই বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। বল্লাল সেন এক ডোমজাতীয়া রমণীকে লইয়া তন্ত্রসাধনা করিয়াছিলেন—এই জনশ্রুতির মূলেও একপ্রকার লৌকিক ধর্মনৈতিক রহস্যাচারের প্রভাব রহিয়াছে। আমাদের অনুমান পালযুগের কিছু পূর্বে কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তখন মহাযান বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি শিথিল

হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক এই সময় দক্ষিণ ভারত হইতে দুইটি তীক্ষ্ণ শায়ক আসিয়া বৌদ্ধধর্মের মর্মস্থলে বিদ্ধ হয়; একটি শঙ্করাচার্যের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ, আর একটি রামানুজের প্রেমভক্তির সর্ববিদারী আবেদন। এই সর্বগ্রাসী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মহাযান বৌদ্ধমত পৌরাণিক দেবদেবীর পক্ষপুটে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়।

পরবর্তী কালে বৌদ্ধতান্ত্রিকতা বৈষ্ণবধর্মের বন্যাপ্রবাহে দিগন্তে ভাসিয়া গেলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থানে স্থানে যে তান্ত্রিকতার উল্লেখ আছে, মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বে ও অন্যান্য অংশে, গোরক্ষ-বিজয় ও ময়নামতীর গান, শূন্য পুরাণ, ধর্মঠাকুরের ব্রতপূজা উৎসবে, বৈষ্ণব সহজিয়াদের রাগাত্মিকা পদ ও কড়চায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা ও শূন্যবাদের বিলীয়মান উদাহরণ পাওয়া যাইবে। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) পতিত বৌদ্ধগণকে বৈষ্ণবসমাজে গ্রহণ করাতে কি ভাবে এই বৈষ্ণবসম্প্রদায় ধ্বংসের পথে গিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রই অবগত আছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধধর্ম পরবর্তী যুগে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তদুপরি শূন্যবাদ মানুষের মনে পরম শান্তি ও সান্ত্বনা দিতে পারে নাই। তাই বৌদ্ধধর্ম বাঙলা দেশে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিল, সাহিত্য ও সমাজে কোথাও বাঁচিয়া রহিল না। কেবল কতকগুলি উপধর্মের মধ্যে গুহ্যশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কুল হারাইয়া অশ্মীভূত হইয়া পড়িল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নূতন রসপ্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে—বৌদ্ধধর্ম নহে, বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম।

বৈষ্ণবপ্রভাব—প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির মনোধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রভাবে যে অভিনব গতিবেগ লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাত্মক গল্পকাহিনী পূর্বভারতে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। গাথাসপ্তশতী, সদুক্তিকর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ এবং লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় যে-সমস্ত উদ্ভট শ্লোক এবং কাব্যকাহিনী জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহাতে শুধু রাজসভাকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের লীলা-লাম্পট্যই ছিল না; আমাদের অনুমান জনসাধারণের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক যে গল্পকাহিনী ও রস-রসিকতা প্রচলিত ছিল, তাহাই মার্জিত ও সংস্কৃত হইয়া কাব্যসংগ্রহে ও লক্ষ্মণ-সেনের সভাকবিদের চিত্তে স্থান পাইয়াছিল। ভাগবত-বহির্ভূত একপ্রকার আদিরসাত্মক গোষ্ঠগীতি বাঙলা দেশে প্রচলিত ছিল। পরে তাহার সহিত উত্তর

ভারতের কৃষ্ণভক্তি-শাখার গ্রন্থাদির পরিচয়ের ফলে খ্রীঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর দিকে আদিরসাত্মক কাহিনীতে ভক্তিভাব জাগ্রত হয়। বিদ্যাপতির পদাবলী, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় তাহারই সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অব্যবহিতপূর্বে রূপ ও সনাতন গৌড়ের অদূরে রামকেলি গ্রামে সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তবে তখনও মহাপ্রভুর রাগানুগা সাধনা একটা ধর্মাচার বা 'কাল্ট্' রূপে গড়িয়া উঠে নাই।

পরে মহাপ্রভুর দিব্য আবির্ভাবের বিদ্যুৎপ্রভাবে সমগ্র গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের যে বিপুল প্লাবন জাগিল, তাহার দুর্বার প্রভাবে বাঙালীর জনজীবন ও সংস্কৃতি নব নব রূপান্তর লাভ করিল। ইসলামের আক্রমণের পর বাঙালী হিন্দু যেন প্রচণ্ড আঘাতের ফলে আত্মস্থ হইল এবং বহির্জীবনে অধিকার হারাইয়া বৈষ্ণবধর্মের অবগাঢ় রাগাত্মিকা সাধনায় আত্মগোপন করিল।

বৈষ্ণবপদাবলী ও জীবনীসাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্য যে বিস্ময়কর, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, বাঙ্গালী আপনার রুদ্ধ আবেগের আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইল। সর্বোপরি মর্ত্যের প্রতি একটা আস্তিক্যবাদী অনুভূতি ও নিষ্ঠা এবং মর্ত্যমানবের প্রতি মমতা—চৈতন্যদেব ও অন্যান্য বৈষ্ণব ধর্মগুরুর জীবনীর মধ্যে বিকাশ লাভ করিল। অবশ্য এই বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্মচর্যার পশ্চাতে দক্ষিণভারতীয় 'আলোয়ার' সম্প্রদায়ের প্রেমমার্গীয় কবিতা ও মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ যে বহুল পরিমাণে আদর্শের উৎস সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙালীর সমাজব্যবস্থা এই বৈষ্ণব ধর্মে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছিল—মুসলমানও শ্রদ্ধার সঙ্গে এই বৈষ্ণবসমাজে স্বীকৃত হইলেন, নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থ বংশোদ্ভূত হইয়াও ব্রাহ্মণের গুরুরূপে পূজিত হইলেন, নীচ চরিত্র সুমহৎ কল্যাণ লাভ করিল। মহাপ্রভুর পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মও কিছুকাল এই উচ্চ ধর্মাদর্শ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু কালক্রমে ইহাতে দূষিত আদর্শ প্রবেশ করিল। বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামী প্রভুদের নির্লোভ যতিজীবনের আদর্শ বাঙলাদেশের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। আবার অন্যদিকে নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্র বৌদ্ধ সহজিয়ামতাবলম্বী ব্যক্তিগণকে বৈষ্ণব-সমাজে গ্রহণ করাতে দেহকেন্দ্রিক তান্ত্রিক রহস্যাচার বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও প্রবেশ করিল। ফলে ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের দ্রুত অবনতি

হইতে লাগিল; শেষে কবিওয়ালাদের অশিষ্ট ও গ্রাম্যরুচির স্থূল স্পর্শে বৈষ্ণব পদশাখার স্নিগ্ধ শুচিতা ও জীবনের অন্তর্গূঢ় বাণী হারাইয়া গেল।

রামভক্তিবাদ—বাঙলাদেশে কৃষ্ণভক্তিশাখা ১২শ শতাব্দী হইতে জনচিত্তে স্থান পাইলেও রামভক্তিশাখা কোনদিনই উত্তর ভারতের অনুরূপ ধর্ম-সচেতন গোষ্ঠী বা কাল্ট্‌রূপে প্রাধান্য পায় নাই, কোন-উপাসক বা পূজক সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠে নাই। রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ ও তাহাতে বর্ণিত কাহিনী ও চরিত্র সম্বন্ধে বাঙালী প্রাচীনকাল হইতেই অবহিত ছিল; রামায়ণের অনেক কাহিনী বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের সহিত জড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু রামায়ণের অনুবাদ ব্যতীত অন্য কোন আখ্যানকাব্য বা গীতিশাখায় রামায়ণের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে নাই,—যদিও মঙ্গলকাব্যে ও অন্যান্য সমশ্রেণীর সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারত হইতে অনেক প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব—প্রধানতঃ এই কয়টি ধর্মমত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। 'কানু ছাড়া গীত নাই'—এই প্রবচনেই বাঙালীর জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' উত্তর ভারতে যে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বাঙলাদেশে রামায়ণ ও মহাভারত ঠিক সেইরূপ ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করে নাই।

মঙ্গলকাব্যে ধর্মচেতনা—মঙ্গলকাব্যে লৌকিক দেবদেবীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা সত্য বটে; কিন্তু পৌরাণিক দেবদেবী ও গ্রাম্য দেবদেবীর মধ্যে প্রায়শঃই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। ১৬শ শতাব্দী হইতে বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতির পুরাণীকরণের যে চেষ্টা চলিতেছিল, তাহাতে মনে হয়, মঙ্গলকাব্যের আর্যেতর দেবদেবীগণ অতি সহজেই পৌরাণিক মণ্ডলে প্রবেশের ছাড়পত্র পাইয়াছেন। মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলে পৌরাণিক প্রভাবের সঙ্গে গ্রাম্য পরিকল্পনা একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। এই দুই দেবীকে কেন্দ্র করিয়া যে উপধর্ম-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল, তন্মধ্যে মনসাদেবীর উপাসকগণ এখনও বর্তমান। একদা হয়তো দেশের মধ্যে বিশেষ শ্রেণীর চণ্ডী-উপাসকগণও বর্তমান ছিলেন। তবে চণ্ডী মনসা, শীতলা—লৌকিক শাক্তদেবী-আশ্রিত উপধর্মগুলি প্রাকৃতিক দুর্বিপাক হইতে বাঙালীকে রক্ষা করিবার জন্যই যেন আবির্ভূত হইয়াছিল। ধর্মঠাকুর, কালুরায়, দক্ষিণরায়, ওলাবিবি প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীগণের পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠীর প্রভাব থাকা বিচিত্র নহে। চণ্ডীপূজা শুধু যে নারীসমাজে বা সমাজের নিম্ন স্তরে প্রচলিত ছিল, তাহা নহে। চৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব হইতে চণ্ডী,

মনসা ও বাশুলী পূজা সমাজে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। অনেক পরে শাক্ত ধর্মের প্রভাবে গড়িয়া উঠে কালিকামঙ্গল শ্রেণীর কাব্য—যেখানে ধর্মের মোড়কে আদিরস পরিবেশনই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্মমঙ্গল রাঢ়ের 'জাতীয় কাব্য' হইতে পারে; কিন্তু ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের জন্যই এই কাব্য ও ধর্মগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় জাতীয়তাবোধের ফলে নহে।

তন্ত্র ও শৈবধর্মের সংমিশ্রণে সৃষ্ট নাথধর্ম, শিবায়ন শ্রেণীর লোকসাহিত্য,—হিন্দু ও বৌদ্ধতান্ত্রিকতা প্রভৃতির রাসায়নিক সংমিশ্রণে এই সমস্ত লৌকিক মঙ্গলকাব্যের ভিত্তি নির্মিত হইয়াছিল। এমন কি সত্যনারায়ণের মহিমাজ্ঞাপক মঙ্গলকাব্যশ্রেণীর পালাগানগুলিতেও ইসলামের পীর-ফকির-মুরসিদ প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত লোকোত্তর ধর্মচেতনার প্রত্যক্ষ প্রভাব রহিয়াছে। অবশ্য প্রবলতর শাসক শক্তির প্রসাদ ভিক্ষার জন্যই হয়তো স্থানীয় হিন্দু-সমাজে বৈতসীবৃত্তির বশে ইসলামের সহিত সন্ধির চেষ্টা করিয়াছিল; এইভাবে বাঙলাদেশে বারবার ধর্ম সমন্বয় হইয়াছে, এবং মিশ্র ধর্মবোধই বাঙালীর প্রাণধর্মে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত মঙ্গলকাব্যে তাহারই প্রভাব দেখা যায়।

নাথধর্মও শৈব ও তন্ত্রাশ্রিত ধর্মমতের সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। নাথ-সাহিত্যের গ্রন্থাদিতে যে ধর্মদর্শন ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই 'কায়াসাধনা'—এবং চর্যার যুগ হইতে এই সাধনাই লোকজীবনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে।[১] অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বাউলের দেহতত্ত্ববিষয়ক গানেও সেই কায়াকেন্দ্রিক সাধনার ধারাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান সুফী মতাবলম্বী সাধকগণও এই গূঢ়চারী 'কায়া সাধনা'র ধারা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।[২] সহজিয়া বৈষ্ণবগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায়[৩] এই জাতীয় ধর্মসাধনার গোপন গুরুমুখী পন্থার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

সর্বশেষে বাউলগানের উল্লেখ করিতে হয়। বাউলগান ১৮শ শতাব্দী হইতেই একটি ধর্মশাখার সাধনপ্রণালীরূপে পরিচিত হইয়াছে। বাউলগানের একাংশে কায়াসাধনার দেহগত বর্ণনা আছে।[৪] কায়ার মধ্যেই বিশ্ব ও বিশ্বাতীতকে উপলব্ধি করার কৌশল বাউলসাধনার বাস্তব অঙ্গ। আবার ইহার মধ্যে অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা, মনের মানুষকে উপলব্ধি, বিশ্বেশ্বরের একপ্রাণতা ইত্যাদি গূঢ় ও চিন্তাগ্রাহ্য তত্ত্বসমূহ ব্যক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীসম্প্রদায় জাতিপাঁতির সীমা লঙ্ঘন করিয়া বাউলতত্ত্বের উদার শ্রীক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, বিশুদ্ধ ধর্মচেতনা

সাহিত্যের নানা অঙ্গের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে। শাক্ত পদকারগণ প্রধানতঃ ভক্ত ও মুমুক্ষু; রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত প্রভৃতি দুই চারিজন পদকর্তাকে ছাড়িয়া দিলে অধিকাংশ শাক্তপদের কাব্যসৌন্দর্য নিতান্ত গৌণ। কিন্তু যে বাউল গানগুলিতে নিছক তত্ত্বকথা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহারও মধ্যে অপূর্ব কবিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মূলে যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা অবশ্যস্বীকার্য। অবশ্য অধিকাংশ স্থলে কাব্যরস অপেক্ষা তত্ত্বদর্শন বা ধর্মাচার প্রাধান্য পাইয়াছে; তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রাষ্ট্র ও সমাজ অপেক্ষা ধর্মচেতনাই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

॥ ২ ॥

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রাষ্ট্রবিন্যাস

রাষ্ট্রবিন্যাস ও রাজ্যশাসনের সহিত সাহিত্যেরও যে নিবিড়তর আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকিতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া আছে। অগাস্টাস যুগে রোমকসাহিত্য, গুপ্তযুগে সংস্কৃত-সাহিত্য, এলিজাবেথীয় যুগে ইংরাজী সাহিত্য এবং পাঠান সুলতানদের আমলে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি বিচার করলে একথা সুস্পষ্ট হইবে যে, সুশাসনের সহিত সাহিত্যের জীবনবিকাশের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং তাহাই স্বাভাবিক। অবশ্য রাষ্ট্রিক 'মাৎস্যন্যায়ের' মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও কবি নিরালম্ব ভাবলোকে সমাহিত হইতে পারেন। কিন্তু কবিও রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক জীব। তাই মাঝে মাঝে অতিশয় ব্যক্তিস্বতন্ত্র আত্মসংহত কবিও রাষ্ট্রিক চক্রবাত্যার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আপনার কল্পস্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে রাষ্ট্র বা সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাব সর্বদা অনুভূত না হইলেও এই দীর্ঘকাল-প্রসারিত সাহিত্যের অন্তরালেও যে দেশকালের প্রভাব রহিয়াছে, তাহা আনুমানিক হইলেও অযথার্থ নহে। একটু অবহিত হইলেই পুরাতন বাংলা সাহিত্যের পশ্চাদ্‌পটেও একটা বস্তুগ্রাহ্য দেশ-কালের সীমা অবিষ্কার করা একান্ত দুরূহ হইবে না।

চর্যাপদের রচনাকালের এক প্রান্তে পালরাজবংশ, আর এক প্রান্তে সেন রাজবংশ। কিন্তু এই বিচিত্র পদসমষ্টি হইতে তৎকালীন জনসাধারণের বিচিত্র জীবনধারণপদ্ধতি ও চিন্তাজগতের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহাতে[৪] ইহাতে

তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কুত্রাপি পাওয়া যায় নাই। আমাদের অনুমান, চর্যাপদ যাহাদের জন্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের সহিত রাষ্ট্রশাসন বা রাজকতন্ত্রের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। সমাজ-জীবনে তাহারা ছিল অন্ত্যজ, সম্ভবতঃ রাষ্ট্রজীবনেও তাহারা ছিল অপাংক্তেয়। দাবা খেলার রূপকে চর্যায় রাজতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] তখন সিদ্ধাচর্যগণ মঠে মন্দিরেই ব্রাহ্মণ্য-সমাজে নিন্দিত গোপনীয় আচার-আচারণ সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং কখন পালবংশ শূন্যে মিলাইয়া গেল, সেনবংশ অধিষ্ঠিত হইল, দেশে বৈদিক সংস্কৃতি উচ্চকোটির মধ্যে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিল, বল্লালসেন নূতন করিয়া হিন্দুর শ্রেণীবিন্যাসে মনোনিবেশ করিলেন—ইহার কোন ইঙ্গিতই বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণের পদে পাওয়া যায় না। অবশ্য তাঁহারা প্রধানতঃ ছিলেন মুমুক্ষু, এবং জীবন্মুক্তির জন্য তন্ত্রমন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে রহস্যাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং শাসকশক্তি ও রাষ্ট্রবিন্যাসের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল না।

খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী হইতে ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রায় দুইশত বৎসর বাংলা পুঁথিপত্রের সাক্ষাৎ পাইলে আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, সৃজ্যমান বাঙলা সাহিত্যে রাষ্ট্র কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল কিনা। ১৪শ শতকের পর হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ অংশতঃ সমাধান হইলে, অপেক্ষাকৃত শান্তিময় পরিবেশে আবার সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হইল। মিথিলার বিদ্যাপতি, বাঙলার বড়ু চণ্ডীদাস ও মালাধর বসুর সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইঁহারা যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ তখন বাঙালী ভূস্বামী ভূমি হারাইয়া ফেলিয়াছিল; বিত্তবান অভিজাত সম্প্রদায় নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং আগন্তুক শাসক 'তুরুকের' প্রতি হিন্দু জনসাধারণের ভীতিমিশ্রিত ঘৃণা সঞ্চারিত হইয়াছিল। বিদ্যাপতি বোধ হয় এই পটভূমিকায় দাঁড়াইয়াই 'তুরুকের' প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন।[৬] বড়ু চণ্ডীদাসের গোষ্ঠকাহিনীতে রাষ্ট্র ও ও সমাজের ছায়াপাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি মনে হয়, কৃষ্ণের প্রতি রাধার 'গোহারি' এবং কংসের দোহাই পাড়িয়া রাধার আত্মরক্ষার চেষ্টা[৭] এই যুগের বাঙলার তরল রাষ্ট্রিক অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিদ্যাপতি কোন কোন পদে মুসলমান নৃপতির নামোল্লেখ করিয়াছেন[৮]; মালাধর বসু যখন ভাগবতের বাংলা রূপান্তর রচনা করিতেছিলেন, তখন মুসলমান রাষ্ট্র হিন্দুসমাজের উপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ না হইলেও উভয় সমাজের রুচি ও রীতিতে তিক্ততার প্রকোপ অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর দেশ অধিকারের মতো বৃহৎ ঘটনাটি এদেশীয় জনসাধারণের চিত্তের উপরিতলেই আঘাত হানিয়াছিল। 'শূন্য পুরাণ' ও 'অনিল পুরাণ' কাব্যে উল্লিখিত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক কৌতূহলপ্রদ পংক্তি কয়টি পাঠে এইটুকুমাত্র অনুমিত হয় যে, বিজয়ী মুসলমানগণ বিজিত হিন্দুর উপর অত্যাচার শুরু করিলে একদল স্থানীয় ব্যক্তি তাহাতে অতিশয় পুলকিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ তাহারা ছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত।[৯] ইসলামের অভ্যুদয়ের ফলে বাঙালীর আজন্ম লালিত সংস্কার পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইল। কিন্তু তাহাতে বাঙালী কবির চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারা যায় না। কারণ সাহিত্যে তাহার প্রতিচ্ছায়া পড়ে নাই। রাষ্ট্র যেমন ইসলামের বিচিত্র ধর্মমতকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সেইরূপ সমাজ ও সংস্কৃতি দূর হইতে ইসলামকে ভয় করিয়াছে, সক্রিয় ভাবে বাধা দেয় নাই।

ধর্মমঙ্গলকাব্যে সুদূর ১০ম—১১শ শতাব্দীর বাঙলা দেশের পাল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কিছু কিছু আভাস আছে।[১০] কিন্তু কাল্পনিক কাহিনীর জন্য ঐতিহাসিক ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই, এবং ইতিহাসকে রূপকথার অঞ্চলতল আশ্রয় করিতে হইয়াছে। মুঘল-পাঠানের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে বাঙালীর বাস্তব জীবন বিপর্যস্ত হইলেও সাংস্কৃতিক জীবনে তাহার প্রভাব প্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একমাত্র মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে সেই বিপর্যয়ের কিছু আভাস আছে। ধর্মমঙ্গলের কবি-পরিচয় খণ্ডে প্রায়ই দেখা যায় যে, অসহায় কবিকে রাজার পাইক নানাভাবে নিগ্রহ করিতেছে, ক্ষীণ কবির স্কন্ধে গুরুভার মোট তুলিয়া দিয়া বেগার খাটাইতেছে। ইহা বোধ হয় ঐ অরাজকতার সমকালীন বিপর্যয়কাহিনী। মুঘল-পাঠানের সংঘর্ষ ও বাঙলার সামন্তবর্গের বিচূর্ণীকরণের সময়েও বাঙালীর কবিমন রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে বিপর্যস্ত হয় নাই। 'নৃপতি হুসেন শাহ অর্জুন অবতার' ইত্যাকার প্রশস্তি বচনের বাঁধাবুলি বাদ দিলে ইসলাম-অভিঘাত বাঙলী কবির মনে বিশেষ কোন স্বাদেশিক চেতনা সঞ্চার করে নাই। মুঘলের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবে যে-প্রকার ভৌম স্বাতন্ত্র্য মারাঠা

ও শিখের ন্যায় দুধর্ষ স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন সামরিক জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল, বাঙলা দেশে অনুরূপ রাষ্ট্রিক কারণ বর্তমান থাকিলেও সেইরূপ কোন স্বদেশাভিমান জাগ্রত হইবার অবকাশ পায় নাই। ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় আড়াইশত বৎসর ধরিয়া নানা আঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়া মুঘলরাজশক্তি সমগ্র বাঙলায় অপ্রতিহত প্রভাবে আত্মবিস্তার করিয়াছে। এই আড়াইশত বৎসরের মধ্যে বাঙালীর দুর্দশা চরম সীমায় পৌছায়। অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মুঘল শাসকের অর্থশোষণ,[১১] সামন্ত ও উপসামন্তবর্গের প্রাধান্য ইত্যাদি কারণে বাঙালীর প্রাণরস শোষিত হইলেও সাহিত্যে তাহার উত্তাপ সঞ্চারিত হয় নাই। পলাশীর যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে বর্গীর উৎপাতের ফলে বাঙালীর ধনপ্রাণ ও মানইজ্জত একেবারে নষ্ট হইল। গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' এই অত্যাচারের বীভৎস বর্ণনা স্থান পাইয়াছে[১২]। ছড়া, লোকগীতি, নারীদের ব্রতাদির মধ্যে এই মহারাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের কিছু কিছু ইঙ্গিত রহিয়াছে। অপর দিকে শোভা সিংহ ও আমীর খাঁর বিদ্রোহের ফলে[১৩] পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কিয়ৎকালের জন্য যে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল, সাহিত্যে কিন্তু তাহার প্রভাব পড়ে নাই। পলাশীর যুদ্ধের মতো ঘটনাও দুই একটি ছড়া রচনা ব্যতীত বাঙালীর মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করে নাই।

পর্তুগীজ জলদস্যুরা যখন দক্ষিণবঙ্গ উৎসন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, তখনও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাহার বিশেষ কোন প্রভাব পড়ে নাই। 'রাত্রিদিন বেয়ে যায় হার্মাদের ডরে'—মুকুন্দরামের এই উক্তি ভিন্ন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও এই আগন্তুকগণের উল্লেখ নাই। কুলপঞ্জিকায় উক্ত 'ভবার মেয়ে' বা কুলে 'ফিরিঙ্গীদোষ' এবং দেহে 'ফিরিঙ্গী ব্যাধি'র ইঙ্গিত সমাজে ইহাদের স্মারকচিহ্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে। ভারতচন্দ্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে জন্মিয়াছিলেন। বোধকরি সেই কারণেই তাঁহার কাব্যের নানাস্থানে তৎকালীন রাষ্ট্রিক উত্থানপতনের ইঙ্গিত আছে। ফিরিঙ্গীর প্রতি তাঁহার অল্পাক্ত মন্তব্য উপভোগ্য—

যবনের কত ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥

মুঘলসেনা কর্তৃক প্রতাপাদিত্যের পরাজয় বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের স্বাদেশিক চিত্ত আদৌ ব্যথিত হয় নাই। তিনি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও শোচনীয় মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছেন।[১৪] 'অন্নদামঙ্গল' ও 'মানসিংহে' সমসাময়িক ঘটনার সামান্য উল্লেখ আছে মাত্র; কিন্তু মুঘলের পীড়নে বাঙালীর যে অর্থনৈতিক হতাশা ক্রমেই স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছিল, ভারতচন্দ্র কোথাও সেই ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেন নাই। ভারতের স্বাদেশিক চেতনা যে য়ুরোপের দান নহে, তাহার প্রধান প্রমাণ রাজপুত, শিখ ও মারাঠা জাতির স্বদেশের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা। কিন্তু বাঙলা দেশে রাজ্য ভাঙা-গড়া চলিলেও তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জাতীয় আবেগের মধ্যে নূতন বল ও উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারে নাই। এই যে নিরুদ্যম, নিরুৎসুক ঔদাসীন্য—ইহার ফলেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপব রাষ্ট্র-যজ্ঞশালার বহ্নি-উত্তাপ সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। পলাশী-প্রান্তরের প্রহসনের পর বিজয়োদ্ধত ক্লাইভ যখন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিতে-ছিলেন, তখন এই মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গের প্রতি অপেক্ষমান অসংখ্য জনতা শুধু মুগ্ধ ভীত বিস্ময়ে চাহিয়াছিল,—কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি পর্যন্ত করে নাই। ক্লাইভ পার্লামেণ্টারী কমিটিতে সাক্ষ্যদান কালে সগর্বে বলিয়াছিলেন—

"That the inhabitants, who were spectators upon that occasion, must have amounted to some hundred thousands ; and if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they might have done it with sticks and stones"

এই সামান্য ঘটনা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, বাঙালীর রাষ্ট্রচেতনা কেন সাহিত্যে কোন উত্তাপ সঞ্চার করিতে পারে নাই।

॥ ৩ ॥

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সমাজচেতনা

আদিপর্ব—খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের ফলে বাঙালীর সমাজব্যবস্থা ভাঙনের মুখে পড়িয়া শম্বুকবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পূর্বে যে সামান্য সাহিত্যিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহা অবলম্বনে বাঙালীর

তৎকালীন সমাজ-জীবনের একটা ছায়ারূপ প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। মুসলমান আক্রমণের পুর্বে যখন চর্যাপদ রচিত এবং সঙ্কলিত হইতেছিল, তখন বোধহয় সমাজে দুইটি স্পষ্ট শ্রেণীভেদ হইয়া গিয়াছিল। একটি নাগরিক ও সামন্তপ্রধান সমাজ, আর একটি দারিদ্র্য-পীড়িত বৌদ্ধ সহজিয়া সমাজ। একদিকে বল্লালসেনের শৈবসংস্কার, তান্ত্রিকতা, কৌলীন্যরীতির দ্বারা উচ্চতর কোটিকে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভাজন করিবার প্রচেষ্টা; অন্যদিকে অব্রাহ্মণ এবং সম্ভবতঃ কোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের রহস্যাচার-কেন্দ্রিক ধর্মপ্রণালী। একদিকে গোপনচারী বৌদ্ধ সহজিয়া, অপরদিকে 'রাজপাদানুধ্যাত' সামন্ত ও পুরোহিত সম্প্রদায়; এই দুই বিরুদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে শেষোক্ত জীবনধারা সংস্কৃত ভাষার আনুকূল্যে এবং রাজধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশ্য রাজমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেও সমাজের অন্তেবাসীদের মধ্যে যে আরও একটা গূঢ়পন্থী জীবনাদর্শ বাঁচিয়া রহিল, তাহার বাহিরের প্রমাণ ক্রমেই অবলুপ্ত হইয়া গেল। প্রকাশ্য রাজসভায় নটীর নূপুর নিক্কণের মত মাদকাশ্রয়ী আদিরসের চর্চা চলিতে লাগিল এবং নৈতিক জীবনের মান শিথিল হইয়া পড়িল। 'সেকশুভোদয়া'-তে বল্লভার যে আখ্যান আছে,[১৬] তাহা হয়তো সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক; কিন্তু উহাতে তৎকালীন সমাজ-জীবনের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ধোয়ীর 'পবনদূতে' গন্ধর্বকন্যা কুবলয়বতীর সহিত লক্ষ্মণসেনের প্রেমের উচ্ছ্বাস কবিকল্পনার বস্তু হইলেও কোন্ সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ উদ্দাম প্রণয়লীলার চিত্র পরিকল্পিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। একদিকে আগন্তুক রাজন্যবর্গের ছত্রছায়াতলে বৈদিক, স্মার্ত ও আদিরসাত্মক সংস্কৃত সাহিত্য লালিত হইতেছিল; আর একদিকে বৌদ্ধ সহজযান মতাবলম্বী সিদ্ধাচার্যদের দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় সমাজের নিম্নতলে শূন্যতার বাণী ছড়াইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছিল।

মুসলমান আক্রমণের পর প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া 'মাৎস্যন্যায়' চলিয়াছিল। আগন্তুক ইসলামের বিচিত্র আচারবিচার, জীবনবোধ ও ধর্মচেতনা বাঙালী হিন্দুকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বাঙালীর সমাজবন্ধন ইতিপূর্বেই পালরাজত্বকালে মহাযান বৌদ্ধপ্রভাবে কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছিল; হলায়ুধ মিশ্র, ভট্টভবদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ও স্মার্ত সংস্কারের দ্বারা উচ্চবর্ণের শিথিলতাকে পরিশুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন; ইহার দ্বারা উপরিতলের ভাঙন কথঞ্চিৎ রোধ করা সম্ভব হইলেও নিম্নতলে তন্ত্রাশ্রিত বৌদ্ধ মহাযানী মত প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার

করিল এবং এই সমাজ-সঙ্কট কালেই ইসলাম প্রবেশ করিল। বাঙালী ইসলামের সহিত পরিচিত হইল।

মধ্যপর্ব—চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তৎকালীন সমাজের সামান্য ছায়াপাত হইয়াছিল। অনুবাদ সাহিত্য, অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদে বাঙালী-সমাজের কিছু কিছু প্রভাব পড়িয়াছে বটে, তবে তাহাও খুব স্পষ্ট নহে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে সীতাচরিত্রে যে নমনীয়তা দেখা যায়, তাহা বাঙলাদেশের নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মহাভারতে ভীমের চরিত্রাঙ্কনে বাঙালীসুলভ হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে। সর্বোপরি রামায়ণের রাম ও মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্রে যে ভক্তির আতিশয্য দেখা যায়, তাহাও বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ।

সুদূর মিথিলায় বসিয়া বিদ্যাপতি 'তুরুকের' কথা লিখিয়াছিলেন; কিন্তু নবাগত মুসলমানসমাজ বাঙালা কবির মনে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা প্রাক্-চৈতন্যযুগের সাহিত্য হইতে জানিবার উপায় নাই। বহির্ভারতীয় মুসলমানের আচার-আচরণের অভিনবত্ব ও জীবনদর্শনের মৌলিকতা বাঙালীর চিত্তে বিশেষ সাড়া জাগায় নাই। পাঠান ও মুঘল সংঘর্ষের কিছু পূর্বে কবিগণ নিরুদ্বিগ্নচিত্তে রাধাকৃষ্ণের লীলা ও রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ লইয়া যে ভাবে কালযাপন করিতেছিলেন. মুঘল অভিযানের পর আর সে শান্তি ও স্নিগ্ধ পরিবেশ বজায় রহিল না। এই যুগের সাহিত্যের মধ্যে তৎকালীন সমাজ-জীবনের অপরোক্ষ প্রভাব অনুভব করা যাইতেছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের যে স্থূল মর্ত্যলীলার অনাবৃত চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন উৎকট জীবনজিজ্ঞাসা উগ্র হইয়া উঠে নাই। ভক্তিমার্গের উল্লেখ আছে বটে, তবে তাহাও পূর্বধারা অনুযায়ী ভাগবত ও গীতগোবিন্দের অনুকল্প মাত্র। ভাগবত ও রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ দৃষ্টে অনুমান হয় যে, বাঙালী সম্ভবতঃ মুসলমান অভিযানে হতচকিত হইয়া নিজ নিজ ঘরগৃহস্থালী সামলাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং উত্তরভারতীয় পুরাণপ্রধান জীবনাদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল।

মঙ্গলকাব্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দরাম গুজরাট নগর পত্তনকালে সর্বপ্রথম মুসলমান সমাজের বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। মনসামঙ্গল কাব্যে হাসান-হুসেনের পালা এবং দক্ষিণরায় সত্যপীর প্রভৃতি ছড়াগানে

মুসলমানের অল্পাধিক উল্লেখ আছে। কিন্তু মুসলমান ধর্ম ও জীবনাদর্শ বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। বাউল ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানে কিছু কিছু মুসলমানা 'বে-সরা' পন্থী সুফী প্রভাব আছে বটে, কিন্তু হিন্দু কবির সুপরিচিত গ্রন্থাদিতে মুসলমান ধর্ম ও জীবনধারা প্রায় কোথাও প্রবল প্রভাব বিস্তার করে নাই। এদেশে শাসক মুসলমানের চণ্ড রূপটি অধিকতর ফুটিয়াছে; তাহার সংস্কৃতি ও সাধনা পীর-ফকির-মুরসিদের উপর উঠিতে পারে নাই। বাঙালী হিন্দু পীর-ফকিরের 'কেরামতে' মুগ্ধ হইয়াছে, পীরের দরগায় শীর্ণি দিয়া মানত করিয়াছে, বাউলগণ ইসলামী শব্দ পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বৃহত্তর জীবন, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ইসলামের সুগভীর প্রভাব নাই বলিলেই চলে। কেবল 'পূববঙ্গ গীতিকা' ও 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহার কারণ ঐ গীতিকাগুলি রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান; দ্বিতীয়তঃ ঐ গীতিকার অধিকাংশ গায়েন মুসলমান।* ফলে উক্ত পালাগানগুলিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি লক্ষ্য করা যায়। বহু মুসলমান কবি হিন্দুর কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত রাধাকৃষ্ণ পদের স্নিগ্ধতা অন্তর স্পর্শ করে। কিন্তু কেবলমাত্র বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যই ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইসলামী-বাংলা মিশ্রিত ভাষার গ্রন্থাদি রচিত হইতে আরম্ভ করে। এই জাতীয় 'কেচ্ছা' বা 'কেরামতী'[১৭] শ্রেণীর উপকথা বাংলার স্বল্প শিক্ষিত মুসলমান সমাজেই সুপরিচিত ছিল; হিন্দু জনসাধারণ নিষিদ্ধ বস্তুর মত ইসলামী পুস্তক-পুস্তিকা হইতে দূরে থাকিত।

চৈতন্য-জীবনাদর্শ ও চৈতন্যোত্তর যুগের সমাজ বাংলা সাহিত্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইসলামের আঘাতজনিত জড়তা তখন কাটিয়া গিয়াছে; রঘুনন্দন আসিয়া নূতন বিধিনিষেধের দ্বারা বাঙালীর ভগ্নবিধ্বস্ত সমাজব্যবস্থাকে আবার গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য অপাংক্তেয় সমাজের নিকট নব উন্মাদনার দ্বার উন্মোচন করিয়া দিল। বৈষ্ণব সাহিত্য—বিশেষতঃ জীবনী-কাব্যে সর্বপ্রথম মানুষের জীবনকথা শ্রদ্ধার সহিত বিবৃত হইল—অবশ্য সে মানুষ দেবকল্প বা দেবতার অবতার।

* লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (৩য়) দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য যদিও সমাজ-মানসের প্রভাবাধীন, তথাপি বৈষ্ণব সাহিত্যের পশ্চাদ্‌পটে শুধু রাজনৈতিক সামাজিক কারণই রসসঞ্চার করে নাই,—একটা বিশিষ্ট ধর্মচেতনা ও দার্শনিক অধিমানস বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যকে সৃষ্টি করিয়াছে এবং পোষণ করিয়াছে। বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্য সাধনবস্তু; সুতরাং বাহিরের সমাজ ও রাষ্ট্রঘটিত কারণ সত্ত্বেও এই জাতীয় পদশাখার আবির্ভাব হইত না, যদি মহাপ্রভু-প্রবর্তিত রাগানুগা সাধনা গণমানসে একটা প্রবল আবেগরূপে বিরাজ না করিত।

মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় আছে বাঙলার উপদ্রুত সমাজ; কাজেই সমাজ-সচেতন বাস্তবতা মঙ্গলকাব্যকে একটা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য দিয়াছে। বৈষ্ণব-কাব্যের নিরালম্ব ভাবলোকে সমাহিত হইয়া বাস্তবতা ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের ঘনঘটাপূর্ণ কাহিনীর মধ্যে একটা সামাজিক বিপ্লবের আভাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও সমাজের যোগাযোগটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"যেমন ভূস্তরপর্যায়ে ভূমিকম্প, অগ্নি-উচ্ছ্বাস, জলপ্লাবন, তুষার সংহতি, কালে কালে ভূমিগঠনের ইতিহাস নানা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে এবং বৈজ্ঞানিক সেই লিপি উদ্‌ঘাটন করিয়া বিচিত্র সৃজনীশক্তির রহস্যলীলা বিস্ময়ের সহিত পাঠ করেন—তেমনি যে-সকল প্রলয়শক্তি ও সৃজনশক্তি অদৃশ্যভাবে সমাজকে পরিণতি দান করিয়া আসিয়াছে, সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদের ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত হইয়া যায়।"[১৮] রবীন্দ্রনাথের এই সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্য মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধেই অধিকতর প্রযোজ্য, মঙ্গলকাব্যেই একটা যুগমানসের ছায়াপাত হইয়াছে,—কখনও স্পষ্টভাবে, কখনও-বা ঈষৎ অস্পষ্টভাবে।

এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে যে সমাজের প্রভাব রহিয়াছে, বাঙলা দেশ বহুকাল পূর্বে সে সমাজ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। কাজেই মঙ্গলকাব্যে যে সমাজচিত্র রহিয়াছে, তাহা এই কাব্য রচনার বহু পূর্বেই অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মঙ্গল-কাব্যে বর্ণিত সমাজিক রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক বর্ণনা কবির সমসাময়িক জীবনধারার সহিত প্রায় কোথাও মিলিবে না; কারণ ১৬শ-১৮শ শতকের মঙ্গলকাব্যের কবিগণ পুরাতন অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থার সম্ভাব্য চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন; সে বর্ণনার সহিত কবির সমকালীন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের মিল না থাকাই স্বাভাবিক। মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত বিড়ম্বনা, ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাইকের বেগার ধরা, ভারতচন্দ্রের হরিহোড় ও ঈশ্বরীপাটনী চরিত্র, দক্ষিণরায়

প্রসঙ্গে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ইত্যাদি কিছু ঘটনা ও চরিত্রের উপর কবিদের সমসাময়িক জীবনের প্রতিফলন হইয়াছে বটে ; কিন্তু অধিকাংশ কবি কবিসুলভ অতিরঞ্জন এবং স্বল্পজ্ঞানের ফলে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত সমসাময়িক বাঙলা দেশের বিশেষ কোন যোগাযোগ নাই।

মঙ্গলকাব্যে দেবতার কৃপাপ্রার্থী অসহায় বাঙালীর আকুল আর্তিই যেন ধ্বনিত হইয়াছে। মুঘল-পাঠানের সংঘর্ষ বা পাঠানের আক্রমণে বাঙালী হিন্দুর সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামো চূর্ণ হইলে উপক্রুত বাঙালী সর্বফলদাতা দেবতার উপাসনা করিতে চাহিয়াছে। তাই অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যেই দরিদ্রের দুঃখ, মানুষের অর্থনৈতিক ব্যথা ও ব্যর্থতা এবং পদমর্যাদাগত হতাশা নানাস্থানেই আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে।[১৯] অবশ্য চণ্ডীমঙ্গলেই দরিদ্র-জীবনের দুঃখ যেন তীব্র বেদনারসে নিষিক্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি ; উজ্জ্বল জীবনের পটতলে দাঁড়াইয়া তিনি বর্ণাঢ্য আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও হরিহোড়ের বৃত্তান্তে দারিদ্র্যের কিছু কিছু বাস্তব বর্ণনা দিয়াছেন।

পরবর্তীকালে শাক্ত পদাবলীতেও বাঙালীর সেই সমাজচেতনা নানাস্থানে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ক্ষেমঙ্করী আদ্যাশক্তির কাছে বাঙালী সমস্ত দুঃখবেদনা ও মৃত্যুভীতি নিবেদন করিয়া নিঃশঙ্ক হইতে চাহিয়াছে। মুঘল শাসনের অন্তিমে ঐ পদাবলী রচিত হইতে আরম্ভ করে, ফলে তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক দুর্বিপাক এই অধ্যাত্মধর্মী পদে কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও-বা অলক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত—যাঁহারা প্রধানতঃ ছিলেন ভক্তিমার্গের পথিক, তাঁহারাও আইন-আদালত ও জমিদারি সংক্রান্ত আপীল, ডিক্রী, ডিসমিস প্রভৃতির রূপক ব্যবহার করিয়াছেন। অবশ্য চর্যার সিদ্ধাচার্যগণের মত গূঢ় অর্থকে প্রতীকের সাহায্যে দ্যোতিত করাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তবুও তাঁহারা যে প্রতীকগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তৎকালীন বাঙলা দেশের নিঃসার অর্থনৈতিক জীবন হইতেই গৃহীত হইয়াছে।

উপসংহার—কেহ কেহ প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হইতে তৎকালীন নৈতিক জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন সাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্যের মত বিশুদ্ধরূপে সমাজ-সচেতন শিল্প বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু তথাপি বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে সমাজ ও নৈতিক জীবনের কিছু কিছু আভাস যে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাহা নহে। যেমন চর্যার মধ্যে যে

যৌনশিথিলতা লক্ষ্য করা যায়, চৈতন্য-জীবনী সাহিত্যে বিশুদ্ধ জীবন ও আদর্শের নিত্যশুদ্ধ প্রকাশ দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, হরিবংশ বা ঐ জাতীয় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যে যে বাস্তবধর্মী আদিরসের উৎসার পরিলক্ষিত হয়, বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে কামতপ্ত দেহকামনার উদগ্র আবেগ রহিয়াছে,—এই সব কিছুই একটা সামাজিক আদর্শকে আভাসিত করিয়া তুলে। অবশ্য এই জাতীয় রচনার আদর্শ শুধু সমাজ-জীবনকে পরিস্ফুট করে না, বিষয়বস্তুর গতানুগতিক রীতি এবং কবির ব্যক্তিগত রসরুচিও ইহার জন্যে অনেকাংশে দায়ী। যেমন ধরা যাক মোপাসাঁর কথা। মোপাসাঁ ও জোলা, উভয়েরই রচনার মধ্যে প্রাকৃত জীবন অঙ্কনচ্ছলে এমন অনেক কামাচারের চিত্র আছে যাহা আর্ট হিসাবে অপরিহার্য নহে। তাঁহাদের ব্যক্তিগত রসরুচিই ঐ শিল্প সৃষ্টির অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি। ঠিক সেইরূপ, যদি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, দূষিত দরবারী আদর্শেই তিনি আদিরসের উগ্রতর গৌড়ীসুরা পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা হইলে অর্ধসত্য বলা হইবে। ভারতচন্দ্র না হয় দূষিত রাজসভার পরিবেশে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভক্ত রামপ্রসাদ বিষয়বাসনা হইতে দূরে বাস করিতেন, কোন রাজসভার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই; তবে তাঁহার কালিকামঙ্গলে আদিরসের প্লাবন বহিয়াছে কেন? আমাদের অনুমান, বিদ্যাসুন্দর শ্রেণীর কাব্য রচনার একটা গতানুগতিক রীতি-পদ্ধতি ছিল। যে-কেহ এই কাব্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তিনিই ঐ আদিরসকে ফেনায়িত করিয়া তুলিতেন, সমাজ আদর্শই সেখানে একমাত্র নিয়ামক শক্তি ছিল না।*

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙলা দেশে যে অরাজকতার বন্যা বহিয়া গিয়াছে, প্রাচীন বাংলার 'মাৎস্যন্যায়'ও তাহার নিকট ম্লান হইয়া যায়। বাঙলার যে প্রাচীন সংস্কৃতি প্রায় ১২শ শতাব্দী হইতে কখনও উদ্দামবেগে, কখনও মন্থরভাবে বহিয়া আসিতেছিল, ইংরাজ বণিকের ছলকৌশলে তাহার অন্তিম মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর প্রায় সমগ্র ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ ধরিয়া রাজ্যশাসন ও অর্থনৈতিক জীবনের বিশৃঙ্খলা চলিতে লাগিল। পুরাতন জমিদারতন্ত্র ধীরে ধীরে ভূমিচ্যুত হইল, এবং নূতন

* লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' (৩য়) কালিকামঙ্গল অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

ইজারাদারগণ ভূস্বামী হইয়া বসিল। ফলে সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ায় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি যেভাবে অগ্রসর হইত, সহসা তাহাতে ছেদ পড়িবার উপক্রম হইল। নূতন শাসন ও নূতন পরিবেশে তাহার প্রাণরস শুষ্ক হইয়া আসিল এবং কলিকাতা নগরী নব্য বণিক-তন্ত্রের রাজধানীরূপে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কলিকাতা ও ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিত্তস্ফীত বণিক ও জনসাধারণের স্থূলরুচির কটু-পিপাসা মিটাইবার জন্য কবিগান, আখড়াই, তর্জা, খেউড় প্রভৃতি প্রাকৃত জনবল্লভ সঙ্গীতকলার উদ্ভব হইল—যাহা পর্যুষিত জীবনের উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ মনোবিকার মাত্র। তারপর ধীরে ধীরে ১৮শ শতাব্দীর পশ্চিম দিগন্তে যুগাবসানের যবনিকা নামিল। কিপলিং কথিত 'Chance directed chance erected' কলিকাতা বাঙালীর প্রাণজাগরণের পীঠস্থানে পরিণত হইল। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই বাঙালীর নব্য রেনেসাঁসের পটভূমি প্রস্তুত হইল। এই অর্ধ শতাব্দীর সাহিত্য ও তাহার পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিলে আমরা বাঙালীর সেই চিত্তজাগরণের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব।

পাদটীকা

১ Dr S B Dasgupta—*Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature*, P 108, 111.

২। আলিবাজার জ্ঞানসাগর, পৃ ৩৬-৩৭

৩ M M Bose—*Post Caitanya Sahajiya Cult*, P 293-302

৪। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—হাজার বছরের পুরানো বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ আষাঢ়, ১৩৫৫

৫। চর্যাপদ পদসংখ্যা ১০

৬। বিদ্যাপতির কীর্তিলতা। ডঃ শ্রীসুকুমার সেনের 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী' পুস্তিকার ৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—দানখণ্ড

৮। কয়েকজন সুলতানের নাম—

(ক) মহলম জুগপতি চিরেজিব জীবথু গ্যাসদেব সুরতান। (অমূল্যচরণ ও খগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত বিদ্যাপতি, পৃ ৮৭)

(খ) সাহ হুসেন ভৃঙ্গ সম নাগর মালতি সেনিক জঁহা। ঐ, পৃ ১৭৪

৯। শূন্যপুরাণে উদ্ধৃত, 'নিরঞ্জনের রুস্মা'।

১০। ডঃ শ্রীসুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, পৃ ৮১

১১। শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, পৃ ৪-৭

১২। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৩ সাল

১৩। Jadunath Sarkar—*History of Bengal*, Vol 11, Pp.393-94

১৪। অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত মানসিংহে আছে—

(ক) পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জর ভরিয়া
প্রতাপ আদিত্য লইল।

(খ) প্রতাপ আদিত্যরাজ মৈল অনাহারে।
ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে॥
কত দিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত।
সাক্ষাৎ করিলা পাতসাহের সহিত॥
ঘৃতে ভাজা প্রতাপ আদিত্য ভেট দিলা।
কব কত যত্নমত প্রতিষ্ঠা পাইলা॥
পাতসার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়।
প্রতাপ আদিত্যে ভাসাইল যমুনায়॥

১৫। B. D. Bose—*Rise of the Christian Power in India*, P. 36

১৬। দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ, ১ম, পৃঃ ৫০৬-৫০৮

১৭। ডঃ শ্রীসুকুমার সেন—ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ ১৩৮-১৫৪

১৮। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্য, পৃ ১৩৫

১৯। ঐ — ঐ পৃ ১৪৫

প্রথম পর্ব

১৮০০—১৮১৩ খ্রীঃ অব্দ

প্রথম অধ্যায়

বাংলা গদ্যের আদি পর্ব ও বাঙালীর মানস-সংস্কৃতি

একটু বিশ্লেষণ করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পট্‌ভূমিকায় অনাধুনিক বাঙালী জাতির প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও মনোজীবনের ধ্যান ও ধর্ম কখনও স্পষ্টরূপে কখনও-বা অস্পষ্টাকারে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সমসাময়িক বাঙালীর সমাজ, রাষ্ট্র ও অধিমানসের স্বরূপ কতটুকু বিকশিত হইয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্বে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আলোচ্য পর্বে আমরা ১৯শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের 'ব্রাহ্ম মুহূর্ত' (১৮০০—১৮১৩) সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং বাংলা সাহিত্যের এই ধূম্রময় সম্ভাবনা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তৎকালীন বাঙালীর সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইবার চেষ্টা করিব।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শ শতাব্দীর শুভ প্রভাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব হইল—অর্থাৎ যেদিন লর্ড ওয়েলেস্‌লি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিলেন। তাহার পূর্বে বাংলা দেশের পূর্ববর্তী অর্ধশতাব্দীর (১৭৫৮—১৮০০) ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক।

পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতি

১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৩এ জুন শুধু বাঙালার জীবনে নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা ; ঐ দিন পলাশীর 'লক্ষবাগ' আমবাগানের পিচ্ছিল প্রান্তরে যে প্রহসন অভিনীত হইল, তাহার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সমগ্র ভারতবর্ষেই নবজীবনের সূত্রপাত করিল। পলাশীর যুদ্ধ মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের মধ্যে অবস্থান করিয়া বাঙালীর জীবন, সংস্কৃতি ও অধিমানসকে অননুভূতপূর্ব বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করিয়া প্রাণচেতনাকে এমনভাবে আঘাত হানিয়াছিল যে, বাঙালী একমুহূর্তেই ছায়াধূসর মধ্যযুগীয় জীবনবোধ ত্যাগ করিয়া রণরঙ্গমুখর আধুনিক জীবনের রাজপথ অবলম্বন করিল। ঐতিহাসিকের ভাষায়, "On June 23. 1757 the middle ages of India ended and her modern age began."[১]

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান ও যন্ত্রদর্শনের সহিত বাঙালীর পরিচয় ঘটিল, জীবনের সীমাঙ্কিত বলয়রেখা ক্রমেই সম্প্রসারিত হইল—বাঙালী

আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার দ্বারা উদ্বেল হইয়া জীবনের নূতন তত্ত্ব উপলব্ধি করিল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙালীর প্রথম মানসমুক্তি ঘটিয়াছিল, ইহাই বাঙালীর প্রথম রেনেসাঁস বা আত্মার পুনর্জাগরণ। ভৌগোলিক চতুঃসীমায় বন্দী বাঙালী এই দিব্য মুহূর্তে বৃহদ্ ভারতবর্ষের প্রাণস্পন্দন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। মহাপ্রভুব আবির্ভাবে একদিকে যেমন বাঙালী জাতি গ্রামীণ চণ্ডীমণ্ডপের সীমা ছাড়িয়া উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক তেমনি তাহার মন ও মননেব সঙ্কীর্ণতাও মহাপ্রভুর প্রেম ও ভক্তিব বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। বাঙালীর দ্বিতীয় রেনেসাঁস বা নব জন্মান্তর ঘটিল পলাশীব যুদ্ধের পবে। এবাব শুধু ভাবতবর্ষ নহে, সমগ্র বিশ্বজীবনের সহিত তাহাব পরিচয় ঘটিল, ইংরাজের মারফতে ও ইংরাজী ভাষায় দূতীয়ালির সাহায্যে বাঙালী য়ুরোপের নবজীবন-উল্লাস উপলব্ধি করিল। এবারেও সে ভৌগোলিক বিপুল বিস্তাবের পরিচয় পাইল এবং য়ুবোপের জীবনদর্শন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাহাব নিস্তরঙ্গ মনোলোকে প্রবল বিস্ফোবণ সৃষ্টি কবিল। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পশ্চাদ্‌পটেব পবিচয় লইলেই সেই বিস্ময়কব প্রাণজাগৃতির মর্মবাণী উপলব্ধি করা যাইবে। তাহাব পূর্বে পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী অধ শতাব্দীর সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক পরিচয় লওয়া যাক।

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু সুবিধা, নবাবেব ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন, মিরজাফর ও মিরকাশিম প্রদত্ত প্রচুব উপহার[২] ভিন্ন ইংরাজ আর বিশেষ কোন ভাবী সম্ভাবনাপূর্ণ সুযোগ লাভ কবিতে পাবে নাই। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের বাকি ছয় মাস নানা দ্বন্দ্ব-সংশয়ের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইল। মিরজাফর প্রায় তিনবৎসর কাল সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলিয়া পরিচিত হইলেন। ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে মিরজাফরের সুলতানি লীলা ফুরাইল, তাঁহার জামাতা মির কাশিমআলি খাঁ প্রচুর উৎকোচ ব্যয় করিয়া বাঙলাব মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন, ক্লাইভ বিদায় লইলেন,—গভর্ণর পদে উন্নীত হইয়া আসিলেন ভ্যান্সিটার্ট। ১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দে মিরকাশিম দ্বিতীয় শাহ্ আলমেব সহিত যোগ দিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন, এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বক্সারের নিকট পরাজিত হন। ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে মিরজাফরের মৃত্যু হইলে ইংরাজ বণিক বাঙলা সুবার প্রায় সমস্ত অংশই অধিকার করিয়া ফেলিল। ঐ বৎসরই ক্লাইভ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট সুবে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার

দেওয়ানী লাভ করিলেন। কিন্তু ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজস্বের উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই; তখনও মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায় যথারীতি রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে জমিদারি সংক্রান্ত বার্ষিক বন্দোবস্ত অব্যাহত ছিল; প্রথমে এই ব্যবস্থাকে কর্ণওয়ালিশ দশসালা বন্দোবস্তে পরিণত করেন এবং অবশেষে ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে এই ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। উচ্চহারে রাজস্ব নির্ধারিত হওয়ার ফলে প্রাচীনকালের জমিদার বংশ সহসা দেউলিয়া হইয়া যায়,[৩] এবং ইজারাদারগণ সেই জমিদারি ক্রয় করিয়া নূতন জমিদারে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙলার চিরস্থায়ী অকল্যাণ সূচিত হয় এবং ভূমির সহিত কৃষক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক লোপ পায়। উপরন্তু মধ্যযুগে যে সমস্ত ভূস্বামী সম্প্রদায় গ্রামীণ সংস্কৃতিব ধারক, পোষক ও বাহক ছিলেন, এবং দীর্ঘদিন ধরিয়া বাঙালী কবি-মনীষী-শিল্পীর সহিত পবিচিত হওয়াব ফলে তাঁহারা যে রুচি ও চিৎপ্রকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন,—সহসা একদিনেই, ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে সেই গ্রামীণ সংস্কৃতির মূল কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কারণ যে সমস্ত নবীন ভূস্বামি-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল, তাঁহাদের দীর্ঘকালাশ্রিত কোন সংস্কৃতির ঐশ্বর্য ছিল না; অর্থের বিনিময়ে তাঁহারা গ্রাম্য সমাজ-সংস্কৃতির যূথপতি হইয়া বসিলেন। ফলে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির প্রাণরস শুষ্ক হইয়া গেল, টোল-মক্তব-মাদ্রাসা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিশীর্ণপ্রায় হইল। এতদিন ধরিয়া বাঙালী হিন্দু-মুসলমান যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতে মানসিক আহার্য সংগ্রহ করিতেছিল, পলাশীর যুদ্ধের পর সেই মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি রুদ্ধস্রোত হইয়া পড়িল।

দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে সমস্ত পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক বংশ ভূমিচ্যুত হইল, তাহাদের কেহ কেহ সদ্য-গঠিত কলিকাতায় আসিয়া জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। বণিকতন্ত্রের রাজধানী কলিকাতায় ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে বাণিজ্যের বিকিকিনি শুরু হইয়া গেল; ফলে কলিকাতায় ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে যে সমাজ ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল, তাহাতে রুচির শুচিতা ছিল না, প্রাণের আরাম ছিল না, আর ছিল না মননের আত্মবীক্ষা। তখনও নব্যতন্ত্রের কোন ইঙ্গিতই স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই; শুধু

কবিওয়ালাদের গগনবিদারী কলহকলরবে কলিকাতাব রাত্রির আকাশ মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিত।

ইতিপূর্বে ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে সবনাশা ছিয়াত্তরেব মন্বন্তর জাতিকে গ্রাস করিযাছিল। তাহাব ক্ষুধানলে প্রায় এককোটি নরনারী প্রাণ দিল। কিন্তু রাজস্ব সংগ্রাহক রেজা খাঁর নির্দেশে দেওয়ান ইংরাজ রাজস্বেব পরিমাণ শতকরা ১০% বাড়াইয়া দিল। হেস্টিংসের হিসাব অনুসারে দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষের পবের বৎসরেই অধিক পরিমাণে বাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছিল।[8] ফলে দেশেব অর্থনৈতিক অবস্থা হইল শোচনীয়, সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক কৃষাণ ও দুই-তৃতীয়াংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এই দুর্ভিক্ষেব কবলে পডিয়া ধ্বংস হইল। ঠিক এই সময়ে আবার বসন্ত রোগ মহামারীব আকারে আত্মপ্রকাশ কবিল।[৫]

একদিকে দেশের সর্বাঙ্গীণ অবক্ষয় দেখা দিল, আর একদিকে কর্ণওয়ালিশেব শ্বেতাঙ্গপ্রীতিব জন্য চাকুবীজীবী বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সহসা চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইয়া অর্থনৈতিক নৈরাশ্যেব মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল।[৬] ফলে সমাজের প্রতিটি স্তরেই একটা ত্রস্ত সংশয় ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার কবিতে লাগিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে দেশের কৃষিসমাজ ও জমিদাবগণ প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলেন। ১৮শ শতাব্দীর দেশের দিকে নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্তের উপর আঘাত আসিয়া পড়িল।

১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে লর্ড ওয়েলেসলি ভারতে বডলাট হইয়া আসিয়া কঠোরভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ফলে তরল রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা কিয়দংশে স্থিতি লাভ করিল। ইতিপূর্বে বাঙলা ও রোহিলখণ্ডের মুসলমানশক্তির অবসান হইয়াছে; অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরের মুসলমান রাজশক্তিও মারাঠাদের দ্বারা বিপর্যস্ত হইয়াছে; সুতরাং অসপত্ন ইংরাজ নিরুদ্বেগে রাজ্যবিস্তারে মন দিল। এই ন্যূনাধিক অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস (১৭৫৭—১৮০০) বিচার করিলে বাঙালীর মনোজীবনের বিশেষ কোন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইবে না। পলাশীর যুদ্ধের তিনবৎসর পরে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়, বোধ হয় আর কিছু কাল পরে রামপ্রসাদ তিরোহিত হন। বাংলা সাহিত্যের শূন্যযুগে একমাত্র কবিওয়ালাগণ স্থূলরুচি ও তৃতীয় শ্রেণীর শব্দালঙ্কারের সাহায্যে অধশিক্ষিত মহলে প্রভাব বিস্তার করিলেন। রাসু (১৭৩৪—১৮০৭), নৃসিংহ (১৭৩৮—১৮০৯), হরুঠাকুর (১৭৩৮—১৮২৪), নিতাই বৈরাগী (১৭৫১—১৮২১), রামবসু

(১৭৮৬—১৮২৮), নিধুবাবু (১৭৪১—১৮৩৯), শ্রীধর কথক (১৮১৬ সালে জন্ম), প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ও টপ্পা গায়কগণ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে ও শেষভাগে আবির্ভূত হইয়া ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, মধ্যযুগীয় জীবনাবসানের সহিত মধ্যযুগীয় সাহিত্যেও যবনিকা পড়িল। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই নূতন সাহিত্য ও জীবন-দর্শনের সূত্রপাত হয়; তৎপূর্বে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া কবিওয়ালাদের অব্যাহত প্রভাব কাযকরী হইয়াছিল। কবিওয়ালাদের সময় হইতে সমগ্র বাঙলা দেশে পরিব্যাপ্ত গ্রামীণ বাংলা সাহিত্য কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমেই নাগরিক সাহিত্যে পরিণত হইল। তাহার সূচনা হইয়াছে কবিওয়ালাদের রচনায়। ইহার পূর্বে কৃষ্ণনগর শান্তিপুর প্রভৃতি নাগরিক অঞ্চলে খেউড় ধরণের কবিগানের আতিশয় প্রচলন হইয়াছিল। ইহার মূলে কৃষ্ণনগরাধিপের রাজসভার দূষিত রুচির প্রচ্ছন্ন প্রভাব ছিল কিনা কে বলিতে পারে? ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই কলিকাতা নগরী বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু তখনও কোনরূপ শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির স্থায়ী রূপ গড়িয়া উঠে নাই। সুতরাং কলিকাতার রুচি শাসন করিত হঠাৎ-ধনাগমে স্ফীত বণিকগণ। এমনি করিয়া বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম পরিবর্তন সাধিত হইল। গ্রামীণ বাংলা সাহিত্য ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নাগরিক সাহিত্যে পরিণত হইল। ইতিপূর্বে গৌড়, আরাকান, মুর্শিদাবাদ ও কৃষ্ণনগর শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য কোনদিন নাগরিক সাহিত্য হয় নাই বা বিশেষ কোন কেন্দ্র হইতে প্রচারিত হয় নাই—কেবল বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী প্রভুরা কিছুকাল বৈষ্ণবধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিয়াছিলেন। সমগ্র দেশ জুড়িয়া এই সাহিত্যের ভূমি প্রস্তুত হইয়াছিল, কবি-সাহিত্যিকগণ গ্রামাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, গ্রামই ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রচারকেন্দ্র। কিন্তু ১৯শ শতাব্দী হইতে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম হইল, তাহা কলিকাতাতেই কেন্দ্রীভূত হইল, গ্রামীণ সাহিত্য হইল নাগরিক। বলিতে গেলে গ্রামজীবনের সহিত ১৯শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ প্রায় লোপ পাইল। আধুনিক বাংলা সাহিত্য তাই কলিকাতার সাহিত্য, তাহার সহিত পল্লীপ্রাণের সংযোগ নিতান্তই ক্ষীণ।

১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কতকগুলি ঘটনা লক্ষ্য করিতে হইবে। ১৭৫৮

খ্রীঃ অব্দে ক্লাইভ কলিকাতার ইংরাজদের মধ্যে খ্রীষ্টানধর্মের প্রতি আস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য কিয়াবনাণ্ডাব নামক এক প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম যাজককে দক্ষিণভারত হইতে কলিকাতায় আনয়ন করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস নিজব্যয়ে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন; উপরন্তু উইলকিন্‌সকৃত ভগবদ্‌ গীতার অনুবাদ, ***The Bhagavat-Geeta or Dialogues of Kreeshna and Arjoon*** প্রকাশ করিবার জন্যও লণ্ডনস্থিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারবর্গকে বিশেষ অনুরোধ করেন। এই সময়ে ইংরাজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য হলহেড ও চার্ল্‌স উইলকিন্‌স্—এই দুই জনের যুগপৎ চেষ্টায় '***The Grammar of the Bengal Language*** (1778) নামক ব্যাকরণটি "ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং"[৮] প্রকাশিত হয়। ইহাতেই সর্বপ্রথম উদাহরণস্থলে প্রাচীন বাংলা কাব্য হইতে উদ্ধৃতি উল্লিখিত হইয়াছে। হলহেডের চেষ্টায় ও হেস্টিংসের তৎপরতায় বৃহৎ-কলেবর 'জেণ্টু কোড' নামক আইনবিষয়ক সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই আইনগ্রন্থ রচনায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর নিকট ইঁহারা অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। ইহার পরেও কর্ণওয়ালিশ কোড্‌ সঙ্কলিত ও অনূদিত হইয়াছিল[৯]। ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় কবিগান জমিয়া উঠে, ব্যবসাবাণিজ্য প্রাধান্য পাইতে আরম্ভ করে, শাসনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে ভারতীয় স্মৃতি-সংহিতা অনুসরণে আইন বিধিবদ্ধ হয়; এইরূপে ধীরে ধীরে কলিকাতা নগরী নবজীবন-উল্লাসের তরঙ্গ-সঙ্কটে দণ্ডায়মান হইল।

১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্ এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী চার্লস্ উইলকিন্‌স্—দুই জনে মিলিত হইয়া এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির সাহায্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষাচর্চার সুযোগ উপস্থিত হয়, বাঙালীর আত্মসাক্ষাৎকারের একটা গহন পথ খুলিয়া যায়। অবশ্য স্যর জোন্‌সের এই প্রচেষ্টা বাঙালীর মনে পৌঁছাইতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। তথাপি এসিয়াটিক সোসাইটির প্রচেষ্টার ফলেই বাঙলা দেশে প্রাচীন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও ঐতিহ্য-সাধনার প্রতি এদেশীয় ও বিদেশী মনীষীর কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অবশ্য ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ১৯শ শতাব্দীর প্রথম বিশ-তিরিশ বৎসর পর্যন্ত বাঙালীর প্রাণরসের সহিত এই প্রতিষ্ঠানের কোন সংযোগ ছিল না। পরে দেশে ইংরাজী পদ্ধতিতে শিক্ষা শুরু হইলে নব্যশিক্ষিত বাঙালীগণ আপনাদের পুরাতন ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার করিল—

এই প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানের সহিত নবীন বাঙালীর আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ বাংলা সাহিত্য ও সমাজসংস্কৃতি সম্বন্ধে অতিশয় দীনদুর্বল। একদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্ধত শাসন, রেজা খাঁর শোষণ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, বসন্ত মহামারী, দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের বিলুপ্তি, কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং সর্বশেষে সাম্রাজ্যবাদী ওয়েলেসলির উন্নাসিক মনোভাব, অপরদিকে বাঙালীর চণ্ডীমণ্ডপাশ্রিত প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষীণ ধারা,—নূতন প্রাণের অনর্গলিত জোয়ার তখনও উচ্ছ্বসিত হইতে পারে নাই।

পাদটীকা

১। Jadunath Sarkar—*History of Bengal, Vol,* II P. 497. এই প্রসঙ্গে তিনি গ্রন্থের অন্যত্র বলিয়াছেন, "In June 1757, we crossed the frontier and entered into a great new world to which a strange destiny had led Bengal." P. 499.

২। B. D. Bose—*Rise of the Christian Power in India,* P-107.

৩। Hunter—*Annals of Rural Bengal,* Pp. 56-57.

৪। *Ibid,* P. 39.

৫। *Ibid,* P. 27.

৬। B. D. Bose—*Op. cit.* P 282.

৭। নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।—বিদ্যাসুন্দর, বারমাস বর্ণন

৮। হলহেড তাঁহার ব্যাকরণের নামপত্রে এই শ্লোকটি মুদ্রিত করিয়াছিলেন, —"বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদাঙ্গ্রেজী।"

৯। নিম্নে কয়েকখানি আইনের তর্জমার উল্লেখ করা যাইতেছে:—

(ক) জোনাথান ডানকান অনূদিত *Regulations for the Administration of Justice in the Court of Dewanee Adaulat* (1789)

(খ) নীল বেঞ্জামিন এডমনস্টোন—বাংলা ও বিহার-উড়িষ্যার ফৌজদারী আদালতের কার্যবিধি (১৭৯১)

(গ) হেনরি পিট্স ফরস্টার—*Cornwallis Code.* (1793).

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইংরাজ রাজকর্মচারিগণের গদ্যচর্চা

ইংরাজ বণিক বাঙলাদেশের উপর রাষ্ট্রাধিকার লাভ করিয়া স্বাভাবিক ব্যবসায়ী বুদ্ধির বলে অতি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, বাঙালীর চিত্ত-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহার ভাষা ও জীবনধারা সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে এবং তাহার জন্য বাংলা গদ্যের উপর আধিপত্য অর্জন প্রয়োজন। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগের বহু পূর্ব হইতে বাংলা গদ্য অনুশীলনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে[১]। ১৬শ-১৭শ শতাব্দীতে নিতান্তই প্রয়োজনের জন্য বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হইত। চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, আইন আদালত, বৈষ্ণব কড়চা—ইহার ঊর্ধ্বে বাংলা গদ্য উঠিতে পারে নাই।[২] ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ নিশ্চয়ই ইহার সন্ধান পান নাই, এবং তাহার সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ তখন বাংলা সাহিত্যে পয়ার-লাচাড়ীর উচ্ছ্বসিত বন্যা বহিয়া চলিয়াছে, গদ্য তখনও প্রয়োজনের অবজ্ঞায় দূরে নির্বাসন যাপন করিতেছে। ইতিপূর্বে পর্তুগীজ পাদ্রী মানোএল দা আস্‌সুম্প্‌সাঁও এবং দোম আন্তোনিও যে তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন[৩], নানা কারণে তাহাও দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। প্রথমতঃ পর্তুগীজ মিশনারীরা শুধু সঙ্কীর্ণ ধর্মচেতনার কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া প্রচারপুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ উহা পর্তুগীজ পাদ্রীদের জন্যই রচিত[৪], জনসাধারণ ইহার কোন সংবাদই রাখিত না। দেশের মধ্যে প্রচার না হওয়ার একটা বড় কারণ—ইহাতে বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত হয় নাই; রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়া মনোএলের গ্রন্থ দুইখানি লিজবন হইতে প্রকাশিত হয়। কাজেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ সেই সমস্ত ধর্মপুস্তকের কোন সংবাদ রাখিতেন না, ফলে তাঁহাদিগকে ভাষা শিখিবার জন্য ব্যাকরণ-অভিধানাদি সঙ্কলন ও সংগ্রহ করিয়া লইতে হইয়াছিল।

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ক্লাইভ ভারতীয় ভাষা শিক্ষার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন এবং কর্মচারীদিগকে সেই মর্মে অনুজ্ঞা দান করিয়াছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে কটকের প্রেসিডেণ্ট

মিঃ ব্রিস্টোকে চাকুরী হইতে অপসারিত করা হয়; কারণ তিনি স্থানীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করিতে পারেন নাই।[৫] ইহার পূর্বেই দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তারের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞপ্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দে ক্লাইভ ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টরবর্গের নিকট লিখিত পত্রে দেশীয় শিক্ষার প্রতি অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন: "Mr. Watts still accompanies me in the campaign, and I cannot omit the opportunity of remarking of what great service he is to your officers by his thorough knowledge of the language and people of their country".[৬] অর্থাৎ বাণিজ্যিক সুবিধার জন্যই যে দেশীয় ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন, তাহা ক্লাইভ স্বাভাবসিদ্ধ দূরদর্শিতা ও চতুরতা বশতঃই ধরিতে পারিয়াছিলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস চারিত্রিক অধোগতির এত গভীর পঙ্কস্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাচ্যভাষা-প্রীতি প্রায় সকলেই বিস্মৃত হইয়াছেন। হেস্টিংসের উৎসাহেই গ্লাড্‌উইন নামক এক কর্মচারী খ্রীঃ ১৭৮০ অব্দে মালদহ হইতে *A Compendious Vocabulary, English & Persian* প্রকাশ করেন; ইহাতে বাংলা শব্দের প্রচুর উদাহরণ আছে। হলহেড সাহেবের *A Code of Gentoo Laws*'[৭] এবং *A Grammar of the Bengal language*[৮] গ্রন্থ দুইটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্লাইভ প্রধানতঃ বাণিজ্যিক সুবিধার দিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন, এবং সেইজন্য স্থানীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু হেস্টিংস, বিশেষতঃ কর্ণওয়ালিস ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে স্থানীয় ভাষাশিক্ষা ব্যাপারটিকে বিচার করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস দেশীয় কর্মচারীদিগকে কর্মচ্যুত করিয়া স্বদেশ হইতে ইংরাজ কর্মচারী আনিয়া একটা বিশ্বস্ত বিলাতী আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু নবাগত কর্মচারিগণ বাংলা ভাষা না শিখিয়া লইলে পদে পদে অসুবিধা হইবার কথা। তাই তাঁহারই নির্দেশে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যবিধিসমূহ বাংলায় অনূদিত হইতে আরম্ভ করে। হলহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণই এবিষয়ে পথ প্রদর্শক। তাঁহার ব্যাকরণের অন্ততঃ ৩৫ বৎসর পূর্বে মানোএলের *Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez*. (1743) নামক পর্তুগীজ-বাংলা ব্যাকরণ

ও শব্দকোষ রোমান হরফে লিজবনে মুদ্রিত হয়। এই ব্যাকরণ প্রচার লাভ করিতে পারে নাই, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

হলহেডের ব্যাকরণ বৈয়াকরণ দৃষ্টিকোণ হইতেই রচিত এবং ইহা রচিত হইয়াছিল 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং', তাহা ভুলিলে চলিবে না। অবশ্য ইহাতে বাংলা ব্যাকরণের ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা ও নিয়মতন্ত্র যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক হইতে পারে নাই। সর্বোপরি হলহেড কৃত্তিবাস ভারতচন্দ্র হইতেই অধিকাংশ উদাহরণ দিয়াছেন; শেষাংশে জগতধির রায় নামক এক ব্যক্তির আরবী-ফারসীসঙ্কুল একখানি পত্রের যে নমুনা দিয়াছেন, তাহা বাংলা গদ্যের আদর্শ উদাহরণ নহে। সে যাহা হউক হলহেডের ব্যাকরণ ১৭৭৮, জোনাথান ডানকানের দেওয়ানী আদালতের আইন অনুবাদ (১৭৮৫), বেঞ্জামিন এডমনস্টোনের ফৌজদারী আদালতের কার্যবিধির অনুবাদ (১৭৯১) এবং ফরস্টারের কর্ণওয়ালিস কোডের অনুবাদ (১৭৯৩) পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, নিতান্তই প্রয়োজনের তাড়নায় ইঁহারা আইন অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তবে এই অনুবাদের কতটুকু তাঁহাদের কৃত, আর কতটুকু তাঁহাদের দেশীয় কর্মচারীদের কৃত, তাহাও বিবেচনার যোগ্য।[৯]

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তখনও কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া কবিগান, তর্জা, যাত্রা, আখড়াই, হাফ আখড়াই গানের উচ্চকিত কোলাহল বহিয়া চলিয়াছে, জাতীয় জীবনের বদ্ধ জলাশয়ে যে আবর্জনা জমিতেছিল, তাহাতে তখনও নবীনের সাগরোর্মি প্রবেশ করিতে পারে নাই। পল্লী অঞ্চলে তখনও পাঁচালী, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ প্রভৃতির গতানুগতিক প্রভাব বর্তমান ছিল। জীবনের বহিরঙ্গে কিছু কিছু পরিবর্তনের সূচনা দেখা যাইতেছিল বটে, কিন্তু প্রাণলোকে তাহার বিশেষ কোন সাড়া উপলব্ধি করা যায় নাই। ইংরাজ কর্মচারিগণ ব্যবসাবাণিজ্য ও রাষ্ট্রশাসনের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, শাসন কার্যের সুবিধার জন্য আইন ও শাসনবিধিকে বাংলায় অনুবাদ করিতেছেন, হেস্টিংসের আনুকূল্যে ভগবদ্গীতার উইলকিন্‌স্ কৃত ইংরাজী অনুবাদ বিলাত হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছে, হেস্টিংসেরই অর্থসাহায্যে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ফ্রান্সিস গ্লাডউইন, হলহেড, চার্লস্ উইলকিন্‌স্, জোনস্, গিলক্রাইস্ট প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ও

অন্যান্য ভারতীয় ভাষা লইয়া গবেষণা করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ বাঙালী তখন শোভাবাজারে, পাথুরিয়াঘাটায়, জোড়াসাঁকোয়, ফৌজদারী বালাখানায়, বাগবাজারে, হোগলকুঁড়িয়ায় কবির দল খুলিয়া, সাজ বাজাইয়া, গাজনে সং বাহির করিয়া, চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী দেবী ও কালীঘাটে কালিকা দেবীর পূজায় মাতামাতি করিয়া, চৌরঙ্গী অঞ্চলের চৌরঙ্গীনাথের মন্দিরে পূজা দিয়া, কেহ-বা সাবর্ণ চৌধুরীদের লালদীঘিস্থিত সেরেস্তায় হিসাব নিকাশের কাজ করিয়া, ইংরাজ রেশমকুঠীর মুৎসুদ্দিগিরি করিয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার-এসরাজ-বীণ বাজাইয়া, কবি, হাপ 'আখড়াই পাঁচালী' শুনিয়া, "রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে গীতবাদ্য আমোদ করিয়া"[১০]—১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ অতিক্রম করিল। য়ুরোপে ফরাসীবিপ্লবের রক্তরাগ তখনও মুছিয়া যায় নাই, প্রলয় তাণ্ডবের মধ্যেও সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার রক্তকেতন ব্যাস্টিল দুর্গে সগর্বে উড্ডীয়মান। বাঙলা দেশে কিন্তু তখনও প্রাণের জোয়ার বন্যাবেগে নামিয়া আসে নাই, দৈনন্দিন জীবনেব ক্ষীণ স্রোত ম্লানমন্দ গতিতে বহিয়া চলিতেছিল। ইংরাজ বণিক দেশ অধিকার করিল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশ শ্মশান হইয়া গেল, দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হঠাৎ-ধনস্ফীত ইজারাদারগণ জমিদারি হস্তগত করিল—সবই যেন চলচ্চিত্রের ছায়াসঞ্চারী মূক ঘটনার মত নিঃশব্দে বহিয়া গেল। সাহিত্যের মধ্যে যে জনচিত্ত স্পন্দিত হয়, তাহা তখনও তামসিক আত্মবিস্মৃতির তলে অবলুপ্ত। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই শ্রীরামপুরের খ্রীস্টান মিশনারীগণ ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্শীগণ বাংলা গদ্যের গঠনরীতি লইয়া নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু জনসাধারণ এই সমস্ত প্রচেষ্টার সহিত কোনরূপ যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিল কিনা সন্দেহ। তবে এই নিশ্ছিদ্র জড়তার মধ্যে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত (১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দের ২রা এপ্রিল) একটি বিজ্ঞপ্তির প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

We humbly beseech any gentleman will be so god to us to take the trouble of making a Bengali Grammar and Dictionary, in which we hope to find all the common Bengali country words made in to English."[১১]

ইংরাজী শিক্ষা যে জনসাধারণের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করিতেছিল, ইহাই তাহার অস্পষ্ট আভাস। অন্ততঃ জীবিকার তাড়নায় একদল বাঙালী

যে সেরবার্ণ, মার্টিন বোল. আরাতুন পিত্রাস[১২] প্রভৃতি ফিরিঙ্গীর পাঠশালায় প্রদত্ত মুষ্টিমেয় ইংবাজী ভাষাজ্ঞান লইয়া এবং

ফিলজফার—বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান—চাষা।

পমকিন—লাউকুমড়ো, কুকুম্বার—শশা।।৩১

প্রভৃতি শব্দার্থ কণ্ঠস্থ করিয়া তৃপ্তি পাইতেছিল না, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই এই ক্ষুদ্র বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাকরণ এব' ইংবাজী-বাংলা শব্দকোষেব প্রয়োজন অনুভবের সাড়া পাওযা যাইতেছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ পূর্বাশাব তোরণদ্বাব আলোকসম্ভব নবজীবনেব প্রত্যাশায় পূর্ণ হইল, মধ্যযুগীয় অন্ধ যবনিকা ধীবে ধীরে স্খলিত হইয়া পড়িল।

পাদটীকা

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

২। ঐ

৩। ঐ, ৬১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ৬২ বর্ষ ১ম সংখ্যা। দোম আন্তোনিওব গ্রন্থ—ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ। মানো এল-দা আসসুম্পসাঁও—কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।

৪। মানোএল তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় বলিয়াছিলেন যে, প্রধানত E Missio-nario nova, অর্থাৎ নবীন প্রচারকদের জন্য এই ব্যাকরণ রচনা করেন।

৫। *Selections from Unpublished Records of Govt.* Vol—II, P,146

৬। সজনীকান্ত দাস—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম সং ১ম পৃ ২৩

৭। ঐ, পৃ ৩৯

৮। ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত

৯। ডঃ শ্রীসুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যে গদ্য, দ্বিতীয় পুনর্লিখিত সংস্করণ, পৃ ২৪

১০। শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ৫৬

১১। *Selections from the Calcutta Gazette,* Vol II. P 497. (Compiled by Seton Karr)

১২। শিবনাথ শাস্ত্রী—উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৭৬।

১৩। ঐ, পৃ.৭৬।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীরামপুর মিশন ও বাঙালীর সংস্কৃতি

॥ ১ ॥

শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে শ্রীরামপুরের খ্রীস্টান মিশনের দান অবশ্য-স্বীকার্য। বিশুদ্ধ ধর্মৈষণা-সঞ্জাত লোকহিত-প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত কয়েকজন বিদেশী ধর্মপ্রচারক এদেশে আসিয়া দেশীয় জনসাধারণের পারত্রিক কল্যাণের জন্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন এবং দেশীয় ভাষায় বাইবেল মুদ্রিত করিয়া যে অভূতপূর্বতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সাম্প্রতিক সাহিত্যান্দোলনে তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে। বাস্তবিক শ্রীরামপুরের প্রোটেস্টান্ট মিশন যে উদ্দেশ্যেই বাংলা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা অনুশীলন করুন না কেন, তাঁহাদের অকুণ্ঠ ধর্মচেতনা ও উগ্র প্রচারধর্মিতা সত্ত্বেও বাংলা গদ্যের ব্যবহারিক রূপ নিরূপণ, বিবিধ বিষয়ে গ্রন্থমুদ্রণ, প্রাচীন বাংলা কাব্যের পুনঃপ্রকাশ ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সুগম সরণি নির্মাণে তাঁহাদের নিরলস চেষ্টা ও অতন্দ্র আগ্রহ নিছক ধর্মৈষণার সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া সারস্বত মহাতীর্থে উপনীত হইয়াছিল; তাঁহাদের ক্রিয়াকর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করিলেই তৎকালীন বাঙালীর মনোজীবনে তাঁহাদের প্রভাব উপলব্ধি করা যাইবে।

ইতিপূর্বে পর্তুগীজ মিশনারীগণ পূর্ববঙ্গে ভাওয়াল অঞ্চলে যে কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং রোমান হরফে প্রচারপুস্তিকা ও ব্যাকরণ-অভিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ছিল অতিশয় সীমাবদ্ধ।[১] ভাওয়ালের অন্তর্গত নাগরী গ্রামের[২] চতুঃসীমা ছাড়াইয়া তাঁহাদের ঐ প্রচার-পুস্তিকাগুলি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়াইতে পারে নাই। উক্ত পুস্তিকাগুলি[৩] শুধু মিশনারীগণের জন্যই রচিত হইয়াছিল; জনসাধারণ তাহার স্বাদগন্ধ পাইত না। ১৮শ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে সুদূর ঢাকার গ্রামে-গ্রামান্তরে রোমান হরফে মুদ্রিত গ্রন্থ দুর্বোধ্যই ছিল, সুতরাং এগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত অথবা বিক্রীত হইয়াছিল কিনা

সন্দেহ। যাঁহারা এই পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিত্ত-সমুৎকর্ষ ও চিন্তাপ্রণালী নিতান্তই আদিম স্তরে বিরাজ করিত। তাঁহাদের কেহই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। দোম আন্তোনিও হিন্দুর সন্তান হইয়াও তাঁহার 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদে' হাস্যকর সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।[৪] 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদে' দেখা যাইবে যে, হিন্দুধর্মের নিগূঢ় কথা তাঁহারা কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই, চেষ্টাও করেন নাই। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কারণ। তবে কথ্য বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞ ছিলেন না, ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের পরিচয়ও অগভীর ছিল না ;—অবশ্য প্রধানতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ ছিল এবং তাঁহারা নাগরী গ্রামের 'সেণ্ট তলেন্তিনো সিদ্ধিমাতা ধর্মঘর' হইতে এই কৃষকদের মধ্যেই প্রচার কার্য চালাইয়াছিলেন।

শ্রীরামপুর মিশনের পরিচালক ও 'ভ্রাতৃবর্গ' অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা শিখিয়াছিলেন , হিন্দুধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁহাদের আক্রমণ তাই অতিশয় শক্তিশালী হইয়াছিল। শ্রীরামপুর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ১৮শ শতাব্দী হইতেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। মিশনারীগণ এই অঞ্চলকে কেন্দ্ররূপে নির্বাচিত করিয়া[৫] বুদ্ধিমানের কার্য করিয়াছিলেন,— বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই আক্রমণ তৎকালীন বুদ্ধিজীবী বাঙালীকে আত্মভ্রষ্ট করিয়া স্বল্পকালের জন্য বিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছিল।

শ্রীরামপুর মিশনের প্রাণপুরুষ উইলিয়াম কেরী ঘনিষ্ঠভাবে বাঙালীর নবজাগৃতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার পূর্বেই ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দের দিকে একজন জাহাজের ডাক্তার—ধর্মপ্রাণ জন টমাস ভারতে আসিয়া কিছু কিছু বাংলা শিখিয়াছিলেন। ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে নরদামটন সায়ারে কয়েকজন ব্যাপটিস্ট মিশনারী যখন ভারতীয় 'হীদেনদের' মধ্যে পবিত্র খ্রীস্টানধর্ম প্রচারের জন্য ব্যাকুল হইলেন, তখন তাঁহাদের নির্দেশে টমাস এবং সপরিবারে কেরী ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে জে. ওয়ার্ড. জে. মার্শম্যান, ডি. ব্রান্সডন এবং ডবলিউ. গ্র্যাণ্ট্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা কিন্তু ধর্মপ্রাণ মিশনারী সম্প্রদায়কে বিষবৎ মনে করিতেন ;

তাঁহাদের প্রতিকূলতার জন্য ইঁহারা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া দিনেমার আশ্রয় শ্রীরামপুরে পৌঁছিলেন। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দের ১০ই জানুয়ারী কলিকাতার অদূরে দিনেমার পক্ষপুটে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল। ইতিপূর্বে কেরী মাত্র ৪০ পাউণ্ড ব্যয়ে কলিকাতা হইতে একটি পুরাতন মুদ্রাযন্ত্র কিনিয়াছিলেন; অবশ্য ইহার তিনবৎসর পূর্বেই ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় দেশীয় ভাষায় অক্ষর প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল।[৬] কেরীর ক্রীত মুদ্রাযন্ত্রই বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতির উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে মুদ্রিত গ্রন্থাদির পরিচয় লইলেই দেখা যাইবে যে, একদল ধর্মপ্রাণ বিদেশী কী ভাবে এবং কী পরিমাণে দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া কেবলমাত্র ধর্মের প্রেরণায় নবজাগৃতির মূল সূত্রটিকে বাঙালীর তন্দ্রামুগ্ধ চেতনার নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

॥ ২ ॥

বাইবেল ও বাঙালী

শ্রীরামপুর মিশন পবিত্র খ্রীস্টানধর্মের সাহায্যে মানসিক অন্ধকূপবাসী 'হীদেন'-দিগকে আলোকে আনিবার জন্য প্রধানতঃ বাইবেলকেই দীপশলাকারূপে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই ১৮০০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ইঁহারা প্রায় চল্লিশটি ভারতীয় ভাষায়[৭] বাইবেলের বহু সহস্র অনূদিত খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নিরলস চেষ্টার ফলেই ভারতের সাহিত্যগৌরবহীন ও ব্যাকরণের নিয়মবর্জিত উপভাষাগুলিও একটা ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মপাশে বদ্ধ হয়। তাঁহারা ব্রহ্মী, ভুটানী, চীনীয় প্রভৃতি বহির্ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়া মুদ্রাযন্ত্রে অক্ষর নির্মাণ করিয়া সেই সকল ভাষায় বাইবেল অনুবাদের পর সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এমন কি ইঁহাদের কেহ কেহ অতি-উৎসাহ বশতঃ গড়মুক্তেশ্বর ও হরিদ্বারের মেলাতেও স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সাধুসন্তদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত বাইবেল বিতরণ করিতেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাংলা গদ্যের প্রথম ডাক পড়িয়াছিল বাইবেল অনুবাদে; কিন্তু ১৮০০ খ্রীঃ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া কেরীর ধর্মপুস্তকের শেষ

সংস্করণের ভাষা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এই দীর্ঘ তিরিশ বৎসরের মধ্যে কেরীর মত ভাষা-ধুরন্ধরের হাতে পড়িয়াও বাংলা গদ্য উৎকট বৈদেশিক ভঙ্গিমা হইতে মুক্তি পায় নাই। টমাস ও কেরীর বাংলা শিক্ষক রামরাম বসু ঐহিক স্বার্থকামনায়—"কে আর তারিতে পারে লর্ড জিজচ্ ক্রাইষ্ট বিনা গো"[৮] বলিয়া কবিতায় খ্রীস্টস্তব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা কতদূর জনপ্রিয় হইয়াছিল জানা যায় না। কেরীর বাইবেলের বঙ্গানুবাদও জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রধান কারণ, বাইবেল অনুবাদের অনভ্যস্ত ভাষাভঙ্গী; দ্বিতীয় কারণ, নিউ টেস্টামেন্ট বা ওলড্ টেস্টামেন্টের মধ্যে এমন কোন শান্তি ও সান্ত্বনার বাণী ছিল না যাহা হিন্দু জনসাধারণের মনে কৌতূহল জাগ্রত করিতে পারে। বাঙালীর যে-মন রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের রসে পরিপুষ্ট, সে-মনে খ্রীস্ট বাণী যে বিশেষ সাড় জাগাইতে পারিবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। বৌদ্ধ ধর্ম যেমন বৈদিক কর্মকাণ্ডপ্লাবিত দেশে মানসমুক্তির বাণী আনিয়াছিল, ইসলাম আনিয়াছিল বলিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের সাম্যনীতি,—কেরী ও তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত 'ভ্রাতৃগণের' প্রচারিত বাণীর মধ্যে সেইরূপ কোন বৃহদ্ মানবধর্মের উদার আহ্বান ছিল না। কাজেই জনসাধারণ দূর হইতে মিশনারী সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারণা সকৌতুকে লক্ষ্য করিয়াছে মাত্র, তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই; এই সময়ে ধর্মান্তরিত বাঙালীর সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প। যাহারা স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের সেই মনোভাবের অন্তরালে ধর্মনিষ্ঠা অপেক্ষা ঐহিক স্বার্থই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছিল কিনা, চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। রামরাম বসু, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য এবং মোহনচাঁদের ন্যায় অনেকেই বোধ হয় বাস্তব প্রয়োজনের তাড়নায় বাহ্যতঃ খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ বা গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পীতাম্বর সিংহ বা কৃষ্ণপ্রসাদের ন্যায় দুই একজনই খ্রীস্টান-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন।[৯] জনসাধারণের বৃহদংশ কোনদিন খ্রীস্টান ধর্মকে অনুকূল দৃষ্টির দ্বারা অভিষিক্ত করে নাই। ধর্মান্তরীকরণের মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মিশনারীগণ প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন এবং অপরিসীম দুঃখ ভোগ করিয়া লক্ষ লক্ষ খণ্ড অনূদিত বাইবেল বিতরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮০৮ সালে স্বয়ং ওয়ার্ড তাঁহার দিনলিপিতে লিখিয়াছিলেন, "Conversions among the Heathen are very rare."[১০]

বাইবেলের অনুবাদের দ্বারা খ্রীস্টানধর্ম যে আশানুরূপ বিস্তারলাভ করে নাই, তাহা জানিবার জন্য বেশি দূরে যাইতে হইবে না, মিশনারীদের চিঠিপত্রের মধ্যেই তাহার উল্লেখ পাওয়া যাইবে। তাঁহারা হিন্দুজাতি সম্বন্ধে অতিশয় ঘৃণ্য মনোভাব পোষণ করিতেন। স্বয়ং কেরীও এই মনোভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। ওয়ার্ড তাঁহার গ্রন্থের নানা স্থানে হিন্দুব আচার-ব্যবহাবের উপব অনুদার সঙ্কীর্ণ মন্তব্য নিক্ষেপ কবিয়াছিলেন, মার্শম্যানও অনুরূপ মত পোষণ কবিতেন।[১১]

১৯শ শতাকব প্রথম দশকেই বাঙালী-মানসেব গোপন গুহাতলে যে আগ্নেয়-বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতেছিল, তাহাব দুই একটি অস্পষ্ট আভাস তদানীন্তন কালেব সমাজ-ইতিহাসে লুকাইয়া ছিল। শ্রীবামপুব ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে খ্রীস্টান ধর্মান্তরী-করণ আশানুরূপ হয় নাই বটে; কিন্তু নবযুগেব মুক্ত বায়ুতরঙ্গ সমসাময়িক তরুণচিত্তে যে দোলা দিযাছিল, তাহাব দুই একটি বিববণ দেওয়া যাইতেছে।

॥ ৩ ॥

নবজীবনের ইঙ্গিত

১৮০২ সালে মার্শম্যান যশোহর হইতে প্রচাবকার্য সাবিয়া ফিরিতেছিলেন। এই সময়ে চাঁদুড়িয়ার নিকট তিনি শিবরাম দাস নামক এক ব্যক্তির সহিত পরিচিত হন। এই ভদ্রলোক প্রচলিত হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করিতেন না; তাঁহার এই মতে বিশ্বাসী প্রায় বিশ হাজার শিষ্য ছিল। তিনি নিবিষ্টচিত্তে মার্শম্যানের খ্রীস্টবিষয়ক আলোচনাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং কয়েকখণ্ড বাইবেলের বঙ্গানুবাদও গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১২] ইঁহাব ধর্মমত সম্বন্ধে মার্শম্যান বিশেষ কোন তত্ত্ব পরিবেশন কবেন নাই। তবে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, ১৯শ শতাব্দীর প্রথম হইতেই কোন কোন বাঙালীর মনে প্রচলিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি হইয়াছিল; সকলের অলক্ষ্যে অচলায়তনের তলদেশে যে সুড়ঙ্গপথ প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।[১৩] মিশনারীদের প্রচার কার্যের ফলে যেমন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক তেমনি আবার হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি অনেকেব নিষ্ঠা ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া পড়িতেছিল।[১৪] দেহাটা গ্রামের ব্রাহ্মণ যুবক কৃষ্ণদাস ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে

পৈতা ছিঁড়িয়া পদদলিত করিয়া খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন; অনেক যুবক সে পথ গ্রহণ না করিলেও প্রচলিত বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি তাঁহাদের নিষ্ঠা যে শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, তাহার নানা প্রমাণ আছে। শ্রীরামপুরের অনেক যুবক গোপনে কেরীর সহিত আলাপ-আলোচনাদি করিতে আসিতেন। তাঁহারা প্রকাশ্যে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ না করিলেও প্রচলিত হিন্দুধর্মকেও বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন না। বাইবেলের অনুবাদের দ্বারা খ্রীস্টান ধর্ম বিশেষ প্রচার লাভ করে নাই—তাহা সম্ভবও ছিল না। মিশনারীগণ বাঙালীর মন ও প্রাণের ধাতুগত বৈশিষ্ট্য ধরিতে পারেন নাই, বা ধরিতে চাহেন নাই; তাই বাইবেল অনুবাদের মত বিপুল অর্থক্ষয়ী পণ্ডশ্রমে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার ফলে যুবকচিত্তে যে প্রচলিত সংস্কার ও জীবনবোধের বিরুদ্ধে, সক্রিয় প্রতিবাদ না হইলেও, নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্য সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯শ শতকের ৪র্থ-৫ম দশকে যে ইয়ং-বেঙ্গলগণ বাঙলা দেশে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন (রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি), তাঁহাদের অনেকের তখন জন্মই হয় নাই।

শ্রীরামপুর মিশন হইতে যে গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যে, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্মের ভিত্তি দুর্বল করিতে হইলে সর্বাগ্রে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়া হিন্দুশাস্ত্র ও ষড়্‌দর্শনের হাস্যকর অযৌক্তিকতা দেখাইবেন এবং তাহার ফলে শিক্ষিত হিন্দুগণ স্বধর্মের অসারতা বুঝিয়া খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিবে। বাইবেল অনুবাদের মূল উদ্দেশ্য যেমন ব্যর্থ হইয়াছে, সংস্কৃত গ্রন্থাদি অনুবাদ ও প্রকাশনার পশ্চাতে অবস্থিত সূক্ষ্ম অভিসন্ধিও ঠিক অনুরূপভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে। ব্যোপদেবের মুগ্ধবোধ, কেরীর *Sanskrit Grammar*, কোলব্রুক সম্পাদিত অমরকোষ, মূল সংস্কৃতে মুদ্রিত সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য, কেরী ও মার্শম্যান সম্পাদিত ও ইংরাজীতে অনূদিত চারিখণ্ডে প্রকাশিত বাল্মীকির রামায়ণ, কৃত্তিবাস ও কাশীরামের মুদ্রণ—ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যাহাই হোক না কেন, বাঙালীর ইহাতে মহদুপকার হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইহার ফলে সংস্কৃতানুশীলনের সুগম পন্থা আবিষ্কৃত হইল, দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন বাংলা কাব্যের সহিত জনসাধারণের, বিশেষতঃ নব্য শিক্ষিতগণের পরিচয় ঘটিতে বিলম্ব হইল না। এই গ্রন্থ-তালিকায় ফেলিক্স কেরী অনূদিত 'বিদ্যাহারাবলি' অর্থাৎ

শারীরতত্ত্ব এবং মার্শম্যানের ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্শম্যানের ইতিহাস বহুকাল ধরিয়া বাঙালীর ইতিহাস পাঠের তৃষ্ণা মিটাইয়াছে। ফেলিক্স্ কেরীর 'বিদ্যাহারাবলি'র ভাষা সাধারণ বাঙালীর কানে অনভ্যস্ত বোধ হইলেও বিজ্ঞানের এই দিক নিশ্চয় তাহাদিগকে জীবতত্ত্বের রহস্য সম্বন্ধে বিস্মিত করিয়াছিল।

সর্বোপরি উল্লেখ করিতে হয় ইঁহাদের পরিচালিত 'দিগ্দর্শন' নামক মাসিক এবং সমাচারদর্পণ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা। দিগ্দর্শন যুবকদের জন্য প্রকাশিত প্রথম বাংলা মাসিক পত্র (এপ্রিল, ১৮১৮)। ইহাতে যে প্রবন্ধ বাহির হইত, তাহার দু'একটির উল্লেখ করিলেই, তৎকালীন তরুণ চিত্তে এই পত্রিকা যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। নিম্নে উক্ত মাসিক পত্রের কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

১। আমেরিকার দর্শন বিষয়।
২। হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ।
৩। বাষ্পের দ্বারা নৌকা চালানোর বিষয়।
৪। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা।

সুকুমারমতি বালক-বালিকার জন্য স্কুলবুক সোসাইটী এই পত্রিকার অনেকগুলি সংখ্যা ক্রয় করিতেন। কিন্তু শুধু বালক-বালিকাই নহে, বিচিত্র বিশ্ব সম্বন্ধে সর্বপ্রথম তরুণ-মনে এই পত্রিকাই বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসার বহ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে 'কর্মঠ বৃত্তি' ত্যাগ করিয়া জ্ঞাতব্য বস্তুকে সর্বপ্রথম বোধের সীমায় আনিবার চেষ্টা করে এই মাসিক পত্রিকা। সুতরাং তৎকালীন বাঙালী যুবকের নিকট এই অভূতপূর্ব বৃত্তান্ত যে অভিনবত্ব সঞ্চার করিতেছিল, তাহাতে সংশয়ের কারণ নাই। এই প্রসঙ্গে 'সমাচারদর্পণ' পত্রিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে শুধু স্থানীয় সংবাদই থাকিত না; হিন্দুর লোকাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি প্রকাশ্য আক্রমণ ইহাতেই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে শুরু হয়। ইতিপূর্বে রামরাম বসু হিন্দুধর্মদ্বেষী অল্প কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন বটে[১৪], কিন্তু তাহা জনসাধারণের নিকট প্রীতিকর হয় নাই। একখানি ব্যতীত অন্যান্য পুস্তিকার সংস্করণই হয় নাই। কিন্তু সাপ্তাহিক সমাচারদর্পণ মার্শম্যানের নেতৃত্বে হিন্দুর আচার-আচরণের বিরুদ্ধে এমন বিষোদ্গার শুরু করিল যে, রামমোহন, ভবানীচরণ প্রভৃতি কলিকাতার প্রসিদ্ধ হিন্দু নেতৃবৃন্দ ইহার বিরুদ্ধে

দণ্ডায়মান হইলেন, পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। রামমোহন স্বয়ং ('ব্রাহ্মণসেবধি'—সেপ্টেম্বর, ১৮২১; 'সম্বাদকৌমুদী'—৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২১) মিশনারীদিগকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। এক কথায়, হিন্দু সমাজের মধ্যে আত্মরক্ষার সাড়া পড়িয়া গেল। সাম্প্রদায়িক ধর্ম-কলহের ফলে একদিকে যেমন কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া নবযুগের সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হইল, অপরদিকে বাঙালী হিন্দু স্বধর্ম রক্ষা করিতে গিয়া সর্বপ্রথম আত্মবিশ্লেষণে অগ্রসর হইল; সেই আত্মবিকলনের অগ্রদূত হইলেন ১৯শ শতাব্দীর প্রথম জাগ্রত মানুষ রাজা রামমোহন রায়।

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট্ মিশন ১৮০০ সন হইতে ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বাইবেল অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত কাব্যপুরাণ, ব্যাকরণ-অভিধানাদি প্রকাশ করিয়া প্রাচীন বাংলা কাব্য মুদ্রিত করিয়া এবং সাময়িক পত্র সম্পাদনা করিয়া খ্রীস্টানধর্ম প্রচারের দিবাস্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই ধর্মৈষণার ফলে বাঙালীর তরুণ মনে স্বদেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে যে কৌতূহল জাগ্রত হইল, তাহার ফলে এক বৃহদ্‌বিশ্ব বাঙালীর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইল, এবং প্রচলিত সংস্কার ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে সংশয় ঘনাইয়া আসিল।

১৮৩৬ সনে মার্শম্যানের মৃত্যু হইলে ঐ বৎসরেই শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন লণ্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনের সহিত একীভূত হইয়া গেল এবং ১৮৩৭ সনে ইহার স্বাধীন সত্তা লোপ পাইল। প্রায় ৩৭ বৎসর ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ শিল্প সৃষ্টি করিয়া ও বাংলা-সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া বাঙালীর চিত্ততলে আত্মজিজ্ঞাসার সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিয়াছে। তাঁহাদের সেই মূঢ় দম্ভোক্তি, "Cost what it may, in men and money, in prayers and labours, India must be won to Christ,"—[১৬] যে আদৌ সফল হয় নাই, তাহা যাঁহারা বাঙলায় প্রটেস্টাণ্ট্ মিশনের কার্যাবলী অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন; কিন্তু বাঙ্গালীর আত্মজাগরণের মূলে ইঁহাদের পরোক্ষ সাহায্য যে বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পাদটীকা

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৬১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

২। নাগরী গ্রামে আসিবার পূর্বে পাদ্রি সম্প্রদায় কোবাভাঙা নামক গ্রামে অবস্থান করিয়া ধর্ম প্রচার করিতেন। এই কোবাভাঙা গ্রাম কোথায় অবস্থিত, তাহা

জানা যায় না। ডঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত ব্রাহ্মণরোমান ক্যাথলিক সংবাদ গ্রন্থের পৃ ২।/• দ্রষ্টব্য।

৩। পুস্তিকাগুলির নাম :

(ক) দোম আন্তোনিও রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। ইহার রচনাকাল আনুমানিক ১৮শ শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ দশক। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৬১বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(খ) মানোয়েল রচিত—'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। রচনা—১৭৩৪, মুদ্রণ—১৭৪৩।

(গ) *Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez* বা বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা-পর্তুগীজ, পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ। ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত।

৪। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬১ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা।

৫। শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করার অন্য কারণও ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সে যুগে মিশনারী সম্প্রদায়কে কলিকাতায় বসবাস বা ধর্ম প্রচার করিতে দিতেন না। বাধ্য হইয়াই নবাগত মিশনারীগণ দিনেমার কেন্দ্র শ্রীরামপুরে মিশন স্থাপন করেন।

৬। সজনীকান্ত দাস—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম সংস্করণ) ১ম, পৃ· ৬৯

৭। বাংলা, আসামী, উড়িয়া, হিন্দী, সংস্কৃত, মারাঠী, তেলুগু, মনিপুরী, কনৌজী, খাসী, বাঘেলী, বিকানীরী, কোংকনী, কাশ্মীরী, বেলুচী, নেপালী, গাড়োয়ালী প্রভৃতি। এ বিষয়ে স্মিথ প্রণীত *Life of William Carey* গ্রন্থের পৃ. ১৭০–৭৯ দ্রষ্টব্য।

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামরাম বসু, পৃ. ৮

৯। Marshman—*History of Serampor Mission*, P. 176

১০। *Ibid*, P. 400.

১১। *Ibid*, P. 444.

১২। *Ibid*, P. 173.

১৩। *Ibid*, P. 127.

১৪। *Ibid*, P 127.

১৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামরাম বসু, পৃ ১৫

১৬। *Fourth Report of Operations in translating, printing and circulating the Sacred Scripture in the languages of India* P. 93 (Serampore College Library).

চতুর্থ অধ্যায়

বাঙালীর জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

॥ ১ ॥

ইতিকথা

কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্‌শী এবং তাঁহাদের রচিত ও অনূদিত গ্রন্থাবলী বাংলা গদ্য, বাঙালীর মনোলোক এবং সমাজ-চেতনার উপর সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—কোন কোন সমালোচক এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। বাংলা গদ্যের কায়াকান্তি গঠনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পুস্তক-পুস্তিকাগুলির যে অল্লাধিক প্রভাব রহিয়াছে তাহা সর্বথা স্বীকার্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিচিত্র ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা বিশ্লেষণ করিলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা ও বাঙালীর মনোজীবনে ইহার প্রতিক্রিয়ার যথাযথ স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে।

বিলাত হইতে সদ্য-আগত সিভিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা, সাহিত্য ও আচারব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্যই লর্ড ওয়েলেস্‌লি কলিকাতায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। যে সমস্ত তরুণ কর্মচারী বিলাত হইতে এদেশে আসিতেন,—তাঁহাদের বয়স ছিল অনধিক ১৫ হইতে ১৮ বৎসর। সুতরাং তরুণ সিভিলিয়ানদিগকে যে এদেশের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন, তাহা সর্বাগ্রে ওয়েলেস্‌লি অনুধাবন করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম সচেতন সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ, যিনি বিশুদ্ধ শাসন-শোষণের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সদা-জাগ্রত বিচারবুদ্ধির সীমা প্রসারিত করিয়া দেখিলেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা যদি এদেশের ভাষা ও আচার-আচরণের সহিত পরিচিত না হন, তাহা হইলে বিরাট ভূখণ্ডকে শাসনাধীনে আনা সম্ভব হইবে না। তাই তিনি ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দের ৩রা জানুয়ারী এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেন যে, যে সমস্ত ব্রিটিশ কর্মচারী ১৮০১ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে এদেশীয় ভাষা, আইন ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ

করিতে না পারিবে, তাহাদিগকে চাকুরীতে বহাল রাখা সম্ভব হইবে না। নিম্নে সেই কৌতূহলজনক বিজ্ঞপ্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

"From and after the lst January, 1801 no servant will be deemed eligible to any of the Offices hereinafter mentioned, unless he shall have passed an examination (the nature of which will be hereafter determined) in the laws and regulations, and in the languags, a knowledge of which is hereby declared to be an indispensable qualification"[১]

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে শ্রীরঙ্গপত্তন জয়ের বার্ষিক উৎসবের দিনে আনুষ্ঠানিক ভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্যক্রম শুরু হইল। কিন্তু ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে ২৪এ নভেম্বর হইতে কলেজের যথার্থ কাজ আরম্ভ হয় ; ঐ দিন হইতেই আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় অধ্যাপনা শুরু হইয়া যায়। কেরীর তত্ত্বাবধানে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা-চর্চার কর্মপ্রণালী যথাযথ ভাবে আরম্ভ হয় ১৮০১ সনের এপ্রিল মাসে। ১৮০৬ সনে কেরী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার প্রধান অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে তাঁহার উপর মারাঠী ভাষারও ভার অর্পিত হয়। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকিয়া ডাঃ কেরী বহু পণ্ডিত-মুন্শীকে এই কলেজে শিক্ষকতায় আহ্বান করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা নানা ভাষায় গদ্য পুস্তক রচনা করাইয়া সরকারী ব্যয়ে, কখনও-বা সরকারী সাহায্যের দ্বারা ঐ পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতেন। এমন কি শিক্ষকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি কলেজ কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিয়া তাঁহাদিগের পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতেন এবং তাঁহারই অনুরোধে কলেজকর্তৃপক্ষ মুদ্রিত পুস্তকের শতাধিক সংখ্যা ক্রয় করিতেন। বস্তুতঃ কেরীর সাগ্রহ সহযোগিতা না পাইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ শুধু ওয়েলেস্লির রাষ্ট্রিক প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লোপ পাইত, বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতিতে ইহার চিহ্নমাত্র থাকিত না। ওয়েলেস্লি তাঁহার মিনিটে বলিয়াছিলেন :

"A College is hereby founded at Fort William in Bengal for the better instruction of the Junior Civil servants of the Company."

তরুণ সিভিলিয়ানগণ এই কলেজ হইতে কতদূর ভাষাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। *Primitiae Orientales* নামক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্যবিবরণী পুস্তিকায় সিভিলিয়ান ছাত্রগণের বাংলা ভাষাজ্ঞানের নমুনা স্বরূপ কিছু বিতর্ক ও বক্তৃতা মূল বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার ভাষা অতিশয় জটিল এবং অনভ্যস্ত জড়তায় কুণ্ঠিতগতি।

টমাসের বাইবেল অনুবাদের মত ইহার বহু পংক্তির অন্বয় করিতে পারা যায় না, ফলে অর্থবোধে অসুবিধা হয়। এই কলেজের কয়েকজন ছাত্র পরবর্তী কালে বাংলা ভাষার অল্পস্বল্প অনুশীলন করিতেন। হেনরি সার্জেণ্ট নামক একটি ছাত্র ১৮০৮ সনে ঈনিড মহাকাব্যের কিয়দংশ বাংলা গদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। মন্‌কৃটন নামক আর একটি ছাত্র শেক্সপীয়ারের টেম্পেস্ট বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন (ক্যাল্‌কাটা রিভিউ, ১৮৫০)। কিন্তু উক্ত পুস্তকগুলির কোন কপি পাওয়া যায় না বলিয়া তাঁহাদের ভাষার স্বরূপও বুঝা যায় না।

(ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৮৫৪ সন পর্যন্ত নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। তবে ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দের পর হইতেই এই বিদ্যায়তনের প্রভাব হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে; কারণ তখন কলিকাতায় রামমোহনের আবির্ভাব হইয়াছে এবং বাঙালীর চিত্তেও বহ্ন্যুৎসব শুরু হইয়া গিয়াছে।) ১৮১৭ সনে স্কুলবুক সোসাইটী ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, নব নব অভীপ্‌সা বাঙালীর চিত্তে বিপুল জীবনবেগ দান করিল, অসংখ্য পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি প্রধানতঃ স্কুলবুক সোসাইটীর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে 'বঙ্গাল গেজেট,' 'দিগ্‌দর্শন', 'সমাচার দর্পণ' প্রভৃতি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইল—বাঙালী গদ্যভাষার মধ্যে রসের সাক্ষাৎ পাইল। সুতরাং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রয়োজন ফুরাইল। (১৮৫৪ সন পর্যন্ত ইহা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে বটে, কিন্তু বাঙালীর মনোলোকের সহিত ইহার আব বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। উপরন্তু পরবর্তী কালে ইহার মধ্যে কতকগুলি ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করে।) বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্য রচনা 'বাসুদেব চরিত' কলেজকর্তৃপক্ষ মুদ্রিত করিতে চাহেন নাই।[১] প্রথম দিকে কিন্তু কলেজের মধ্যে এই জাতীয় সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা আত্মপ্রকাশ করে নাই। অবশ্য ওয়েলেস্‌লি উগ্র ধরণের খ্রীস্টান ছিলেন এবং কলেজকে খ্রীস্টান ধর্মের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। যিনি এই কলেজের প্রোভোস্ট হইবেন, ওয়েলেসলির মিনিট্ অনুসারে তিনি, **"shall always be a clergyman of the Church of England as established by law."** (ওয়েলেসলিব মিনিটের ১১শ ধারা) ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি কিরূপ প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন। তথাপি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম প্রচার প্রবল হইয়া শিক্ষাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় নাই। রামরাম বসু 'লিপিমালায়'

"সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরব্রহ্মের উদ্দিশ্যে নত" হইয়া হিন্দুর পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনী সালঙ্কারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তারিণীচরণ মিত্র এই কলেজের অন্যতম মুন্‌শীর কর্ম নির্বাহ করিবার সময় অতিশয় প্রাচীনপন্থী এবং সতীদাহ প্রথার প্রবল সমর্থক 'ধর্মসভা'র অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন; সতীদাহ প্রথা অব্যাহত রাখিবার জন্য বিলাতে যে আবেদনপত্র প্রেরিত হয়, তারিণীচরণ তাহার হিন্দী ও বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন।[৩] শুধু তাহাই নহে, এই কলেজের অন্যতম মুন্‌শী চণ্ডীচরণ ভগবদ্‌গীতার বঙ্গানুবাদ করিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট ৮০৲ টাকা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন।[৪] কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পদার্থ কৌমুদী' (১৮২১) নামক ন্যায়দর্শনের গ্রন্থ কলেজ-গ্রন্থের তালিকাভুক্ত হইয়াছিল। মনুসংহিতা, বাল্মীকির রামায়ণ, জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি হিন্দুর ধর্মগ্রন্থসমূহ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রতিষ্ঠার পর এই বিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে কতটুকু হিন্দুর প্রভাব আছে বা নাই, কেরী সাহেব তাহার সূক্ষ্ম হিসাব করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অবশ্য পরবর্তী কালে বাঙালীর সমাজজীবনে ও মনোলোকে যে নব প্রাণজাগৃতির বন্যা নামিয়াছিল, তাহার প্রবল আঘাতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যাপার কোন্ দিগন্তে ভাসিয়া গেল, তাহার ঠিক ঠিকানা রহিল না।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি নবাগত সিভিলিয়ানদিগকে কোন্ কোন্ বিষয়ে অভিজ্ঞ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত পঠিতব্য বিষয়ের তালিকা হইতে অনুমিত হইবে।

(ক) ভাষা—আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, বাংলা, তেলুগু, মারাঠী, তামিল, কানাড়ী, য়ুরোপের আধুনিক ভাষাসমূহ, গ্রীক, ল্যাটিন ও ক্ল্যাসিকাল ইংরাজী সাহিত্য।

(খ) আইন—হিন্দু ও মুসলমান আইন, নীতিশাস্ত্র ও আইনগ্রন্থ, ব্রিটিশ আইন, গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক প্রচারিত আইনসমূহ, রাজনীতি ও অর্থনীতি।

(গ) প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস—হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত।

(ঘ) উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং রসায়ন ও জ্যোতির্বিদ্যা।[৫]

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা, হিন্দু ও মুসলমান আইন এবং হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস উক্ত সিভিলিয়ানদের অন্যতম পঠিতব্য বিষয় নির্দিষ্ট হওয়ার ফলে এদেশের পুরাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি য়ুরোপীয় পণ্ডিত ও মিশনারীদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পণ্ডিত মুন্শীদের ভাষা ও বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে যে উৎকট আতিশয্য ছিল, তাহার ফলে এই গদ্য গ্রন্থগুলি জনসাধারণের নিকট কতদূর গ্রাহ্য হইয়াছিল, তাহাও সংশয়ের বিষয়। ঈশ্বর গুপ্ত মিশনারীদের বাইবেল অনুবাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছিলেন,—"মহাপ্রভু পাদ্রি কেরি প্রভৃতি শ্বেতাবতারেরা ঐ সময় বঙ্গভাষায় খীস্টধর্ম বিষয়ক কয়েকখানা পুস্তক প্রকটন করেন, তাহাতে কেবল সাহেব সাহেব গন্ধই নির্গত হইত।"[৬] কিন্তু ঐ গ্রন্থগুলির বহু সংস্করণ হইয়াছিল। কেবলমাত্র কলেজের ছাত্রগণের দ্বারা যে সমস্ত গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। কলিকাতা অঞ্চলে এই গ্রন্থগুলির বহুল প্রচার না হইলে এতগুলি সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছিল কেন? ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৩ই মার্চ, ১৮৫৪) বাংলা গদ্য সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহনের গদ্যরীতিকে প্রচুর প্রশংসাভূষণে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজগোষ্ঠীর মধ্যে শুধু হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ-পরীক্ষা' ও মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র উল্লেখ করেন। গুপ্তকবির স্বাভাবিক রসবোধ ছিল, তিনি তাহার দ্বারাই রামরাম বসুর 'লিপিমালা', কেরীর 'কথোপকথন', গোলোকনাথের 'হিতোপদেশ' এবং মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি'র উৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিতেন। আমাদের অনুমান, ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যেই উক্ত গ্রন্থগুলি লোকলোচনের অন্তরালে নির্বাসিত হইয়াছিল। হরপ্রসাদের 'পুরুষ-পরীক্ষা'র ভাষা কিন্তু উক্ত কলেজগোষ্ঠীর অনেক লেখকের ভাষা অপেক্ষা শিথিল ও জড়তাগ্রস্ত। হরপ্রসাদ কাঁচড়াপাড়া নিবাসী ছিলেন বলিয়া ঈশ্বর গুপ্ত হয়তো স্বগ্রামবাসীর প্রতি একটু পক্ষপাত দেখাইয়াছেন।[৭] মৃত্যুঞ্জয়ের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে; উপরন্তু তাঁহার 'প্রবোধচন্দ্রিকা' আনুমানিক ১৮১৩ সনে রচিত হইলেও মুদ্রিত হয় ১৮৩৩ সনে। তাই হয়তো ঈশ্বর গুপ্ত মৃত্যুঞ্জয়ের বিরাট গ্রন্থখানির উল্লেখ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু আলোচনা করিলেই তৎকালীন বাঙালীর মানসবিকাশের স্তর-পরম্পরা ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করা যাইবে।

॥ ২ ॥

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বাঙালীর মানস-সংস্কৃতি

সম্প্রতি এক লেখক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "Begun to serve an administrative purpose, the Fort William College, nevertheless developed into something far more useful and important, it became a centre of Oriental learning and culture, and gave a great stimulus to language and literature."[৮]

তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সুদূরপ্রসারী ও চিন্তা-উদ্রেককারী, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক এই প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যতালিকাভুক্ত বহু সংস্কৃত ও ইসলামী কাব্য-কাহিনী, ধর্ম ও স্মৃতি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যাইতেছে :

সংস্কৃত

ব্যাকরণ

১। *A Grammar of the Sanskrit Language* (1806)—W. Carey

২। Do (1805)—Colebrook

৩। *An Essay on the Princilpes of the Sanskrit Language*—H. P. Forster.

৪। *The Grammatical Sutras or Aphorisms etc. of Panini* with selections from various commentators, Nagree character, in two vols. (1809).

৫। সিদ্ধান্তকৌমুদী—(১৮১২, নাগরী অক্ষরে)

৬। মুগ্ধবোধ—(১৮০৭, বাংলা অক্ষরে)

অভিধান :

১। *Sanskrit and English Dictionary* (1815)—H. H. Wilson.

২। অমরকোষ—(১৮০৮), কোলব্রুক সম্পাদিত।

৩। হেমচন্দ্রকোষ—(১৮০৭)।

৪। অমরকোষ, ত্রিকাণ্ডশেষ, মেদিনী ও হারাবলী—(১৮০৭, একখণ্ডে নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত)

গল্পকাহিনী :

১। হিতোপদেশ, দশকুমার চরিত (১৮০৬)—কোলব্রুক সম্পাদিত।

২। নলোদয়—(১৮১৪)।

স্মৃতিসংহিতা :

১। মনুসংহিতা—(১৮১৩), কুল্লুক ভট্টের টীকাসহ।

২। মিতাক্ষরা (১৮১২)।

৩। দায়ভাগ—(১৮১৩)।

৪। বীরমিত্রোদয়—(১৮১৫)।

৫। দত্তকচন্দ্রিকা—(১৮১৭)।

৬। দায়ক্রম সংগ্রহ—(১৮১৮)।

কাব্যকাহিনী :

১। রামায়ণ, মূল সংস্কৃত ও ইংরাজী অনুবাদ ও টীকাসহ—কেরী ও মার্শম্যান সম্পাদিত। প্রথম খণ্ড—১৮০৬, দ্বিতীয় খণ্ড—১৮০৮, তৃতীয় খণ্ড—১৮১০।

২। গীতগোবিন্দ—(১৮০৮, নাগরী অক্ষরে)।

৩। মাঘকাব্য—(১৮১৫, বিদ্যালঙ্কার মিশ্র ও শ্যামলাল পণ্ডিত সম্পাদিত)।

৪। মেঘদূত—(১৮১৩, উইলসন সম্পাদিত ও ইংরাজী পদ্যে অনূদিত)।

৫। কিরাতার্জুনীয়ম্—(১৮১৫)।

৬। ভর্তৃহরির তিনখানি শতক—(১৮০৬)।

এই তালিকার প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইলেও ছাত্রদিগকে কাব্য-রসাস্বাদনেও বঞ্চিত করা হয় নাই ; অধিকাংশ স্থলে মূল সংস্কৃত পাঠ নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া অনুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছিল। অবশ্য সাধারণ বাঙালী এই গ্রন্থগুলি

হইতে বিশেষ লাভবান হয় নাই। কারণ প্রায় সবগুলি গ্রন্থই ইংরাজী অনুবাদ ও ইংরাজী টীকাসহ প্রকাশিত হইত; ফলে ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙালী ইহার অর্থ বুঝিতেই পারিত না। স্মৃতি গ্রন্থের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। কারণ প্রায়শই হিন্দুর উত্তরাধিকার, দত্তক প্রভৃতি লইয়া জটিল দেওয়ানী মামলা উপস্থিত হইত। তাহা এত জটিল ও দুরূহ ছিল যে, সব সময়ে জজ-পণ্ডিতের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিলে কোম্পানীর কর্মচারীদিগকে বুদ্ধির বিপাকে পড়িতে হইত। তাই মনুসংহিতা ও উত্তরাধিকার-তত্ত্বনিরূপক স্মৃতি গ্রন্থগুলিকে সযত্নে অনুবাদ করা হইয়াছিল।

কাব্যের মধ্যে রামায়ণ, গীতগোবিন্দ, মেঘদূত, মাঘ ও ভারবীর কাব্যের নাম উল্লেখযোগ্য। মহাভারতে হস্তক্ষেপ না করার কারণ, উক্ত মহাকাব্যের বৃহদায়তন ও ঘটনার ঘনঘটা। কালিদাসের মেঘদূতের অভূতপূর্ব কবি-কল্পনা হোরেস হেমান উইলসনের কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছিল। যাহা হউক, এই সংস্কৃত গ্রন্থগুলির প্রকাশ ও ইংরাজীতে অনুবাদের ফলে ভারত সংস্কৃতির প্রতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—এবং ক্রমে ক্রমে য়ুরোপের পুরাতত্ত্ব-প্রেমিক পণ্ডিতগণের কৌতূহল জাগ্রত হইল। শ্রীযুক্ত জে. সি. ঘোষ তাঁহার গ্রন্থে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে "a centre of oriental learning and culture"[৯] বলিয়াছেন। কথাটা একটু অতিশয়োক্তি হইলেও একেবারে মিথ্যা নহে। তখন বাংলা দেশে সংস্কৃত চর্চা যে কিরূপ অধঃপতিত হইয়াছিল, তাহা উইলসন সাহেবের সংস্কৃত শিক্ষা লাভের বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই জানা যাইবে। উইলসন সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া সংস্কৃত নাটকের অতি অল্পই উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। দেশে তখন টোল চতুষ্পাঠীর নিতান্ত অপ্রতুলতা না থাকিলেও, শুধু স্মৃতি-মীমাংসা চর্চায় বাঙালীর সারস্বত প্রতিভা স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যাকরণ, অভিধান ও কাব্যাদি মুদ্রিত ও অনূদিত করিয়া সিভিলিয়ান সাহেবদের সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন; অবশ্য বাঙালী জনসমাজ তাহা হইতে বিশেষ উপকৃত হয় নাই। তবে ইহাদের প্রতি য়ুরোপীয়গণের শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছিল, এইটুকুই লাভ।

বাংলা গ্রন্থ

এবার আমরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম যুগের বাংলা গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু বিচার করিয়া তৎকালীন বাঙালীর মনোজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, প্রধানতঃ ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগকে বাংলা সাধুভাষা ও কথ্যভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই কেরীর নির্দেশক্রমে ও পণ্ডিত-মুন্শীদের সাহায্যে কিছু কিছু বাংলা গদ্য গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে থাকে। আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম তের বৎসরের (১৮০০—১৮১৩ খ্রীঃ অঃ) ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়েছি। এই কলেজ ১৮৫৪ সন পর্যন্ত জীবিত থাকিলেও ১৮২০—২২ খ্রীঃ অব্দের পর ইহা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা হ্রাস পায়। কারণ কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী, কলিকাতা স্কুল সোসাইটী, ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটী প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দের পর বাংলা গদ্য গ্রন্থ মুদ্রণের অভূতপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হয়। এই সময় হইতেই বাংলা গদ্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সীমাবদ্ধ প্রয়োজন মিটাইয়া কখনও স্কুলপাঠ্য পুস্তক, কখনও সাময়িক পত্র, কখনও বা ধর্মকলহ ও সাম্প্রদায়িক বিতর্কের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে—এই রূপে বাংলা গদ্যের শৈশবকাল অতিক্রান্ত হয়।

(খ্রীঃ ১৮০১ সন হইতে ৮২২ অব্দ পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক বিশ বৎসরের মধ্যে যে পুস্তকগুলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক রূপে রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে :—

রামরাম বসু—রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১)
লিপিমালা (১৮০২)

উইলিয়ম কেরী—কথোপকথন (১৮০১)
ইতিহাসমালা (১৮১২)

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)
হিতোপদেশ (১৮০৮)
রাজাবলি (১৮০৮)
প্রবোধ চন্দ্রিকা (রচনা কাল—আনুমানিক ১৮১৩, মুদ্রণ, ১৮৩৩)

গোলোকনাথ শর্মা (মুখোপাধ্যায়)—হিতোপদেশ (১৮০২)

তারিণীচরণ মিত্র —ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩)

চণ্ডীচরণ মুন্শী—তোতা ইতিহাস (১৮০৫)

ভগবদ্গীতা (মুদ্রিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না।)

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি—হিতোপদেশ (১৮০৮, পাওয়া যায় নাই।)

হরপ্রসাদ রায়—পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—পদার্থকৌমুদী (১৮২১)

আত্মতত্ত্ব কৌমুদী (১৮২২)

এই কয়বৎসরের মধ্যে আরও কয়েকখানি বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল যাহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'য় (১৮১১) লেখকের নাম না থাকলেও ইহা যে তাহারই রচনা, সে বিষয়ে সুদৃঢ় প্রমাণ আছে।[10] 'সাংখ্যভাষা-সংগ্রহ' (১৮১৮) মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারের নামে প্রকাশিত হইলেও ইহাতে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনাই ছিল সর্বাধিক। তারিণীচরণের 'নীতিকথা' (১৮১৮) রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহায়তায় স্কুলবুক সোসাইটীর নির্দেশে অনূদিত হয়। কাশীনাথের 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮২৩) ও 'সাধুসন্তোষিণী' (১৮২৬)[11] ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থভুক্ত না হইলেও সমকালীন রচনা বলিয়া গ্রাহ্য হইবার যোগ্য।)

(একথা সর্বথা স্বীকার্য যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা গ্রন্থসমূহ দেশবাসীর মানসিক আকাঙ্ক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রচিত বা অনূদিত হয় নাই, প্রধানতঃ তরুণবয়স্ক সিভিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান দান করিবার জন্যই এই পুস্তিকাগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সামান্য ও স্বল্পতম রচনাগুলি প্রয়োজনের সীমা পার হইয়া স্বল্প-শিক্ষিত বাঙালীর কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই। শ্রীরামপুরের মিশন বহু অর্থব্যয় ও অমানুষিক পরিশ্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার অক্ষর নির্মাণ করিয়া, ব্যাকরণের নিয়মাবলী সংগ্রহ করিয়া এবং বাইবেল অনুবাদ ও বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া স্বধর্মনিষ্ঠার মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের অনূদিত বাংলা বাইবেল সাধারণ বাঙালীর নিকট কৌতুকের বস্তুতে পরিণত

হইয়াছিল ; ইহার দ্বারা খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারণার কতটুকু সুবিধা হইয়াছিল, তাহাও বিবেচ্য। বিষয়বস্তুর অনাভিজ্ঞতা এবং ভাষার ফিরিঙ্গীসুলভ উৎকট বৈদেশিক স্বাদগন্ধ বাঙালীর চিত্তে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বরং ঐ মুদ্রাযন্ত্র হইতে যে সমস্ত প্রাচীন বাংলা কাব্য মুদ্রিত হইয়াছিল, সেগুলি বহুদিন বাঙালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিয়াছিল। ঠিক সেইরূপ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থগুলি বিদেশীর ভাষাশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রচিত হইলেও ইহাদের মধ্যে সদ্য জাগ্রত বাঙালীর চিত্তবিনোদন ও কৌতূহল পরিতৃপ্তির বহুতর উপাদান ছিল। ইংরাজ বণিকের মারফতে ১৮শ-১৯শ শতকের য়ুরোপের সহিত তখন বাঙালীর প্রাথমিক পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সে পরিচয় ব্যবহারিকতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া চিত্ততোষ রসবস্তুতে পরিণত হইতে পারে নাই। আইনের তর্জমা ও সরকারী নিলাম ইস্তাহারে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া বাঙালী বিশেষ বিস্মিত হয় নাই, কারণ ১৯শ শতকের বহু পূর্ব হইতেই বাঙলাদেশে সাধুগদ্যরীতি দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। মুদ্রাযন্ত্রের মারফতে বাংলা পুঁথির মুদ্রাঙ্কিত রূপ দেখিয়া সে যুগের বাঙালী কিছু কৌতূহলী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তবে বোধ হয় অক্ষর গঠন দেখিয়া কেহ শ্রদ্ধান্বিত হইতে পারে নাই। কারণ ১৮শ শতাব্দীর একেবারে শেষাংশে এবং ১৯শ শতকের প্রথম দিকে মুদ্রিত বাংলা অক্ষর অপেক্ষা পুঁথির অক্ষরগঠন অনেক সুদৃশ্য দেখাইত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য গ্রন্থাদিতে যে-সমস্ত কৌতূহলপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল, তাহার প্রতি সাধারণ বাঙালী আকৃষ্ট হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। উক্ত গ্রন্থগুলির একাধিক সংস্করণ দেখিয়া মনে হয়, কলেজের বাহিরেও উহাদের কিছু চাহিদা ছিল।

ঐ পুস্তক-পুস্তিকাগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিলে তৎকালীন বাঙালীর অন্তরশায়ী ভাবাদর্শের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যাইবে না ; লেখকদের মনোভাব কি পরিমাণে স্বয়ং-স্বাধীন এবং কি পরিমাণেই বা কেরীর নির্দেশে পরিচালিত হইয়াছিল, তাহাও বিচার করিয়া দেখা উচিত। মার্শম্যান সমাচারদর্পণের নামে-মাত্র সম্পাদক ছিলেন, তাঁহার নির্দেশে দেশীয় পণ্ডিতগণই উক্ত সাপ্তাহিকের কলেবর পূর্ণ করিতেন ; এমন কি হিন্দু পণ্ডিতগণ কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে ঐ পত্রে হিন্দুধর্ম ও আচার-আচরণের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ঐ দৃষ্টান্ত অনুসারে বলা যাইতে পারে যে, ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজের পণ্ডিত-মুন্‌শীগণ বিষয়-নির্বাচনে কেরীর নির্দেশেই চালিত হইতেন। গদ্যগ্রন্থ ব্যতীত ভাষা শিক্ষা অসম্ভব, তাই কেরী মুন্‌শীদিগকে বাংলা গদ্যে পুস্তক রচনা করিতে উৎসাহ দিতেন; সুতরাং বিষয়-নির্বাচনে তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। তথাপি ঐ গ্রন্থগুলি সাধারণ বাঙালীর চিত্তে কিরূপ গুরুত্বর প্রভাব ও কৌতূহল বিস্তার করিয়াছিল) উহাদের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইলেই তাহা বোধগম্য হইবে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা গ্রন্থগুলিকে প্রধানত তিনটি শাখায় বিভক্ত করা যায়: গল্প ও উপকথা, ইতিহাস এবং ন্যায় দর্শন।

গল্প উপকথার অনুবাদও যেমন সহজসাধ্য, আবেদনও তেমনি সার্বজনীন। তাই কেরী বোধ হয় উপকথা অনুবাদের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। ক্রমে ১৯শ শতকের প্রথম পাদের বৎসরের মধ্যে হিতোপদেশের অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল অন্তত তিনখানি।[১২] (নীতিকথাসম্বলিত গল্প উপাখ্যানের প্রতি তরুণ বিদেশী কর্মচারীদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় আরও অনেকগুলি আখ্যান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), তারিণীচরণের 'ওরিয়েন্টাল ফেবালিস্ট' (১৮০৩), চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫) এবং হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' (১৮১৫) সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরাজী নীতিগল্পের অনুবাদ বা সারসংক্ষেপ। চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাস' ও হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা'[১৩] প্রধানত আদিরসাত্মক; তন্মধ্যে 'তোতা ইতিহাসের'[১৪] মধ্যে ব্যভিচার-গামিনী নারীর সতীত্ব রক্ষার ফারসী 'কেচ্ছা' জাতীয় রিরংসাবৃত্তি উত্তেজক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতচন্দ্রীয় আদিরস কৃষ্ণনগর হইতে প্রবাহিত হইয়া কলিকাতা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বর্তী অঞ্চলে প্লাবন আনিয়াছিল, এই পুস্তিকায় তাহারই সমর্থন মিলিবে।) কেরীর মত নীতিবাগীশ পাদ্রী যে কি করিয়া এই গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদন করিলেন এবং অনুবাদকগণকে পুরস্কৃত করিবার জন্য কলেজ কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করিলেন, তাহাই পরম বিস্ময়ের বিষয়। কেরী স্বয়ং বলিয়াছেন, "It is rendered into very plain and good Bengalee and very fit for his labour."[১৫] বোধ হয় তিনি উক্ত গ্রন্থের বাংলা ভাষাশিক্ষার যোগ্যতাই বিচার করিয়াছিলেন; নীতিতত্ত্বের গঙ্গোদকে আদিরসের আবিলতা দূর হইয়া যাইবে, ইহাই ছিল তাঁহার

অভিপ্রায়। ইংরাজী হইতে অনূদিত 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট' এবং সংস্কৃত হইতে অনূদিত হিতোপদেশের মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে মানবেতর জীবজন্তু; কিন্তু 'বত্রিশ সিংহাসন,' 'পুরুষ পরীক্ষা' ও 'তোতা ইতিহাসের' মধ্যে মানব-জীবনরসই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বাঙালী পাঠক এই সর্বপ্রথম মানবীয় প্রাণরসের স্পর্শ লাভ করিল। 'বত্রিশ সিংহাসন', 'পুরুষ পরীক্ষা' ও 'হিতোপদেশের' গল্পরস সংস্কৃত শিক্ষিত বাঙালীর অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু 'তোতা ইতিহাসের' প্রভাব অন্যতর। ১৯শ শতাব্দীর প্রধান বাণী—সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে মানব-রস উপলব্ধি। 'তোতা ইতিহাসে'র কটু ব্যভিচারের গল্পের মধ্যে সেই মানবরসই ঈষৎ স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইসলামী বাতাবরণের জন্যই এই গল্পগুলির মধ্যে একটা তৃষাতপ্ত মর্ত্য-প্রেমের স্পর্শ পাওয়া যায়—যাহা একান্তভাবে দেহকেন্দ্রিক।

রামরাম বসুর 'লিপিমালা' (১৮০২) ও কেরীর 'ইতিহাস মালা' (১৮১২) কয়েকটি আখ্যানের সমষ্টি—যাহার কিয়দংশ পৌরাণিক, কিছু বা কাল্পনিক। যদিও প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল লিপি-লেখন শিক্ষা দান, তবু এগুলির মধ্যেও নানা আখ্যান-উপাখ্যানের প্রাচুর্য রহিয়াছে। কেরীর 'ইতিহাসমালা'ও[১৬] ইতিহাস নহে, অনুরূপ গল্পের সমষ্টি। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, লিপিলেখন ও ইতিহাসেও প্রচুর গল্পরস প্রবেশ করিয়াছে। গল্পরসের প্রতি এই যে আকর্ষণ, ইহাই আধুনিকতার প্রথম পদধ্বনি। ধর্মচেতনা বাদ দিয়া প্রধানত মানুষের মর্ত্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী সৃষ্টি হইতেছে—এই যুগের সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এ প্রচেষ্টা সজ্ঞান শিল্পচেতনা হইতে জন্ম লাভ করে নাই, পূর্বতন ধারার ক্রমপর্যায় অনুসরণ করিয়াছে—অর্থাৎ সংস্কৃত উপদেশমূলক গল্পগ্রন্থ দেশের বিদ্বৎ-সমাজে সুপরিচিত ছিল; এই কারণেই পুস্তিকাগুলির একাধিক সংস্করণ হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে কেরীর 'কথোপকথন'[১৭] বিশেষভাবে স্মরণীয়। সিভিলিয়ানদিগকে পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষা শিক্ষা দিবার জন্য এই পুস্তিকা রচিত হইলেও ইহার মধ্যে তৎকালীন বাঙলাদেশ ও সমাজের এক সামগ্রিক চেতনার স্ফুরণ হইয়াছে। যদিও কেরীর ধারণা ছিল "the imitation to be so exact that they will not only assist the student, but furnish a considerable idea of the domestic economy of the country."[১৮]—কিন্তু শুধু সমাজের অর্থনৈতিক জীবন নহে, সমগ্র জীবনের নানা কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যও

বিবৃত হইয়াছে। সর্বোপরি সমাজের নিম্নস্তরেও তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে। দরিদ্র সমাজের ব্যথা, কৃষাণ রায়তের দৈনন্দিন দারিদ্র্যের দুঃখক্লেশ, জমিদার প্রজার নিত্যবিরোধটুকু তিনি যেভাবে বাস্তব ও নাট্য-রসোজ্জ্বলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই বহু ভাষাবিদ বিদেশী ধর্মযাজককে অন্তর হইতে অকুণ্ঠ সাধুবাদ দিতে হয়। শুধু সমাজের নিম্নস্তরেই নহে উচ্চতর বর্ণ, সমাজের প্রত্যেকটি বৃত্তিজীবী ব্যক্তির সঙ্গেই যেন তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ১৮০৪ সনের ২০এ সেপ্টেম্বর তারিখে কলেজের পাবলিক ডিসপিউটেশনের শেষে কেরী সংস্কৃতে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার একস্থানে বলিতেছেন:

'বঙ্গীয় ভাষা স্বদেশীয়ভাষাবৎ প্রায়ো মযা কথিতা আসতে অন্যৈরন্যৈর্লোকৈরেতেষাং বিষয়ে যদ-যজ্জ্ঞান প্রাপ্তং বহু কালাবধি এতদ্রাজীয় নানাদেশস্থলোকৈঃ সহ ধারাবাহিক পরিচয়েন মম তদনূ্যন সর্ববিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্তং প্রাপ্তকালোঽভবৎ অহমন্যাদপি কথয়ামি যদস্মিন দেশে জাতো ভবেয তদা যথা তেষা ব্যবহার ক্রিয়া ধারা অনুভবঞ্চ জ্ঞাতো ভবেৎ তদ্বৎ ইদানীং তৎ সর্বং প্রায়ো জ্ঞাত আস্তে"। ১৯

('বঙ্গীয় ভাষা আমার মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত হইয়াছে। দীর্ঘকাল এ দেশবাসীর সহিত এখানে এবং এই সাম্রাজ্যের অন্যত্র ঘনিষ্ঠতার ফলে আমার এমন সকল বিষয় জানিবার সুযোগ হইয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে কদাচিৎ কাহারও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আমি এখন নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে, এদেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত হইয়াছি যে সময়ে সময়ে নিজেকেই এদেশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়।'— সজনীকান্ত দাস কৃত অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

তাই তিনি এদেশের জনসাধারণের জীবনের গভীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বৃত্তিজীবীর বৃত্তিসংক্রান্ত খুঁটিনাটি বর্ণনা এবং স্ত্রীসমাজের এমন প্রাণধর্মী উজ্জ্বল চিত্র একমাত্র দীনবন্ধু মিত্র বাতীত ১৯শ শতকের আর কোন লেখকের মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'কথোপকথনে'র মাঝে মাঝে এমন সমস্ত প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে ("মাইয়া কান্দল" 'ঘটক বদায়" প্রভৃতি) যাহা কোন বিদেশীর রচনা বলিয়া মনে হয় না। আমাদের অনুমান, তাঁহার এই জাতীয় রচনার সহিত মৃত্যুঞ্জয়ের অনুরূপ রচনার গভীর সাদৃশ্য আছে। গ্রাম্য জীবনের এমন অনাবৃত বলিষ্ঠ মূর্তি অঙ্কনের নাটকীয় কলা-কৌশল একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়।

এই যে বাস্তব জীবনকে, সমস্ত স্থূলতা সত্ত্বেও, অতিশয় সজীবস্তুরূপে অঙ্কন করার কৌশল,—মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রবোধ-

চন্দ্রিকা'য় কৃষাণীর যে মর্মান্তিক দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মত প্রাণস্পর্শী বর্ণনা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠী দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের কোথাও মিলিবে না। সেই কৃষাণীর মর্মন্তুদ উক্তির একটু উল্লেখ করা যাইতেছে :

"মোরা চাষ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাব ছেলেপিলেগুলি পুষিব।·· ······শাকভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন তো জন্মতিথি।"

মার্শম্যান প্রবোধ চন্দ্রিকার ভূমিকায় যথার্থ বলিয়াছিলেন : "The writer anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of the language current only among the lower orders ; the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour."

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা হইতে এইরূপ একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, "তবে কি আজি খাওয়া হবে না, ক্ষুধায় মরিব ?" তৎপত্নী কহিল, "মরুক ম্যানে, আজি কি পিঠা না খাইলেই নয় ? দেখিদেকি হাঁড়ি-কুঁড়ী খুদকুঁড়া যদি কিছু থাকে।" ইহা কহিয়া ঘর হইতে খুদকুঁড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল, "শালটা ভাল বটে, লোড়াটা যা ইচ্ছা তা। এতে কি চিকণ বাটা হয় ? মরুক, যেমন হউক, বাটি ত।" ইহা কহিয়া খুদকুঁড়া বাটিয়া কহিল, "বাটা ত একপ্রকার হইল। আলুনি পিঠা খাইবা, না লুন তেল আনিতে হইবে ?" গতিক্রিয়ার এই কথা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, "ওরে বাছা ঠক, তৈল লবণ কোথা হইতে গোছে গাছে কিছু আন।" ইহা শুনিয়া ঠক নামে তৎপুত্র কোন পড়সীর এক ছালিয়াকে 'আয় আমার সঙ্গে, তোকে মোয়া দিব' এইরূপে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া এক মুদির দোকানে ঐ বালককে বন্ধক রাখিয়া তৈল লবণ লইয়া ঘরে আইল। তৎপিতা জিজ্ঞাসিল, "কিরূপে তৈল লবণ আনিলি ?" ঠক কহিল, "এক ছোঁড়াকে ভুলাইয়া বন্ধক দিয়া মুদি শালাকে ঠকিয়া আনিলাম।" ইহা শুনিয়া তৎপিতা কহিল, "হাঁ মোর বাছা, এই তো বটে। না হবে কেন ? আমার পুত্র ভাল অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে।" এইরূপে পুত্রের ধন্যবাদ করিয়া ভার্যাকে কহিল, "ওলো মাগি, যা যা, শীঘ্র পিঠা করিগা— ক্ষুধাতে বাঁচি না"। প্রবোধচন্দ্রিকা (বিরামচিহ্ন লেখক কর্তৃক প্রদত্ত)

মানবজীবনের ব্যথা-বেদনা ও সদাপ্রসন্ন হাস্য-পরিহাসের প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের কেমন একটা আন্তরিক প্রীতি ছিল। ফলে সাধারণ মানবজীবন বা চরিত্র-চিত্রণের প্রয়োজন হইলেই তাঁহার লেখনী কখনও বেদনায় আর্দ্র হইয়া উঠিত, কখনও-বা হাস্যকৌতুকে স্মিতবিকশিত হইত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর রচনার সহিত মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার এইখানেই পার্থক্য।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর রচিত আখ্যানগুলির বিষয়বস্তু আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সংস্কৃত উপকথা, বিদেশী ঈশপস্ ফেবল্স্ এবং আদি-রসাত্মক মুসলমানী গল্পই বোধ হয় কেরী সাহেবের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। তবে তিনি প্রধানতঃ ভাষাশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, বিষয়বস্তুর তুল্যমূল্য উপযোগিতা ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সংস্কৃত উপকথার সহিত জনসাধারণের পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল; 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্টে'র বিষয়বস্তু প্রায় হিতোপদেশের অনুরূপ—মানবেতর প্রাণীর সাহায্যে মানবনীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। কিন্তু 'তোতা ইতিহাসের' মধ্যে নীতি-উপদেশের প্রাচুর্য থাকিলেও, তাহার অধিকাংশ গল্পে তীব্র আদিরসের কটু স্পর্শ রহিয়াছে; মূল বিষয়বস্তু—এক তোতাপাখী কর্তৃক ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচার হইতে সুকৌশলে রক্ষা। যে 'কৃষ্ণনাগরিক' সংস্কৃতি ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে প্রবাহিত হইয়া ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পঙ্কস্রোতের আবর্ত রচনা করিয়াছিল, এই পুস্তকটি সেই স্রোতোধারার একটি তরঙ্গ মাত্র। একদা ইহা যে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল, ইহার কয়েকটি সংস্করণেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।[২০] এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের সংবাদে এইটুকু নির্ধারণ করা যায় যে, সাধারণ বাঙালীর মন মানব-জীবন-কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে —এবং এই মানবজীবনের অপূর্ব বিস্ময়—'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন'—ইহাই ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাণী।

কেরীর যেমন ভাষাতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল, এবং ঐ দুই বিষয়ে অনুপ্রবেশ করিবার মত অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি ছিল,[২১] তেমনি ইতিহাসের প্রতিও তাঁহার আন্তরিক প্রীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাঁহারই নির্দেশে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের পটভূমিকায় বসিয়া নানা গল্পকাহিনীর সাহায্যে একটি যুগের ঐতিহাসিক ব্যক্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। বাঙালীকে তিনি শুধু গদ্য লিখিতে অনুপ্রাণিত করেন নাই, ইতিহাস চর্চায়ও তাহার কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছিলেন; ইহা অল্প বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাঙালীর রচিত প্রথম মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থ; শুধু তাহাই নহে, ইহাই বাংলা ভাষায় রচিত বাঙলাদেশের প্রথম ইতিহাস—অবশ্য মুঘল যুগের। ইহাতে মুখ্যত প্রতাপাদিত্যের জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইলেও, লেখক তৎকালীন যশোহর ও ধূমঘাটের বর্ণনায় সমসাময়িক-

বাঙলা দেশকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই ইতিহাস রচনায় তাঁহার যে যোগ্য অধিকার রহিয়াছে, সে বিষয়ে প্রমাণ দাখিল করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"আমি তাহারদিগের (অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যের) স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতাপিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত…।" পুরুষ-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ফারসী ভাষায় বক্ষিত সামান্য উপাদান এবং লোকশ্রুতির অতিরঞ্জন মিশ্রিত করিয়া তিনি মুঘল যুগের এই বাঙালী বীরের চিত্র অঙ্কিত করেন। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য যে স্থানে স্থানে সংশয়াতীত নহে, তাহা সত্য। য়ুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ইতিহাস রচনার আদর্শ অনেক পরে অবলম্বিত হয়। সুতরাং যে-সমস্ত ঐতিহাসিক অতিরঞ্জন বা ভ্রান্তি ইহাতে পরিলক্ষিত হয়, তাহা ক্ষমার যোগ্য। তবে একটা কথা অবশ্যই স্বীকার্য। প্রতাপাদিত্যের অবসান বর্ণনার সময় লেখকের কিছুমাত্র আবেগ দেখা যায় নাই—যদিও তিনি 'তাহার-দিগের স্বশ্রেণী' বলিয়া গ্রন্থারম্ভে গর্ব প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আপন বংশের বীরোত্তমের লাঞ্ছিত মৃত্যু বর্ণনার সময় তাঁহার মনে যে কোনপ্রকার ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না।—"এই মতে তাহাকে পিঞ্জিরায় কয়েদ করিয়া সহর ও বাজার গড় ও পুরী সমস্ত লুটিয়া যাবদীয় স্ত্রীলোকেরদের কয়েদ করিয়া পিঞ্জিরায় দাখিল করিল……পথে যাইয়া বানারস মোকামে প্রতাপাদিত্যের কাল হইল।"[২২] তাঁহার মধ্যে কোনপ্রকার স্বাদেশিক অনুভূতি জাগিবার অবকাশ পায় নাই। তিনি কিন্তু মিশনারীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।—"যে লোকেরা (অর্থাৎ মিশনারীগণ) আসিয়াছে তাহারদিগকে দেখিলে বুঝা যায় ইহারা মহাজন তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা শান্তশীল দয়াশীল ক্ষমাবন্ত কমল অন্তঃকরণ। পরদুঃখে কাতর জিতেন্দ্রিয় অহিংসক এমন লোক কোনকালে আমার এদেশে দেখি নাই … ।"[২৩]

রাজীবলোচন কেরীর নির্দেশে 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫) রচনা করেন এবং কেরীর সুপারিশক্রমে কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট ১০০৲ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। কেরী কলেজ-কাউন্সিলের নিকট রাজীবলোচনের নামে সুপারিশ করিয়া লিখেন, "**In consequence of the encouragement given to literary merit by this institution Rajeeb Lochun, a Pundit in the Bengalee Department has lately composed an history of Raja Krishnu Chander (late of Krishnu nager) in the Bengalee language.**"[২৪]

এখানে 'encouragement'টি কেরীর প্রদত্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেরী চাহিয়াছিলেন যে, সিভিলিয়ানগণ শুধু ভাষা নহে, এদেশের ইতিহাস ও সমাজের সহিতও যেন পরিচিত হন। তাই তিনি রামরাম বসু, রাজীবলোচন ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে স্বদেশীয় ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত করেন। রামরাম বসু যেমন প্রতাপাদিত্যের স্বশ্রেণীভুক্ত ছিলেন, রাজীবলোচনও তেমনি সম্ভবত কৃষ্ণচন্দ্রের বংশের সহিত আত্মীয়তার সূত্রে জড়িত ছিলেন। কারণ বুকানন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাসে রাজীবলোচনের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "Rajeeb Lochun Moonshee descended from the family of the Raja." একথা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কারণ কেরী এ সম্বন্ধে কিছুই বলিয়া যান নাই।

জনশ্রুতি ও অতিরঞ্জনে পরিপূর্ণ এই ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীগুলিতে ইংরাজের তোষণক্রিয়া পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে। সিরাজ-বিনাশের ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান অক্ষদণ্ড ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র, যিনি মিরজাফর ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের সহিত ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতিয়াছিলেন। রাজীবলোচনের ইংরাজ তোষণক্রিয়াকে ডাঃ ইয়েট্‌সও নিন্দা করিয়াছেন।[২৫] তাঁহার রচনায় যে স্বদেশপ্রাণতার বাষ্পবিন্দুও পাওয়া যাইবে না, তাহা তো স্বাভাবিক। সিরাজের পতনের পর ক্লাইভ মিরজাফরের সহিত বিজয়গর্বে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলে লেখক মহানন্দে সেই কাহিনী ব্যাখ্যান করিয়াছেন,—"মিরজাফরালি খাঁ মুর্শিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইংরাজি পতাকা উঠিয়া দিলে সকলে বুঝিল ইংরাজ মহাশয়দিগের জয় হইল তখন সমস্ত লোকে জয় জয় ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল।"[২৬] তৎকালীন দেশের মানসিক অবস্থা স্মরণে রাখিলে সমস্ত লোকের 'জয় জয়' ধ্বনির অর্থ বুঝা যাইবে। বোধ হয় এই গ্রন্থটি জনপ্রিয় হইয়াছিল। কারণ ইহা সমসাময়িক কালের কাহিনী লইয়া রচিত, এবং ইহাতে প্রচুর কাল্পনিক গল্পের সমাবেশ করা হইয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি' (১৮০৮) আধুনিক ধরণের প্রথম ইতিহাস। কাহারও কাহারও মতে ইহা মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক গ্রন্থ নহে।[২৭] মৃত্যুঞ্জয় হয়তো বহু স্থান হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাষা দৃষ্টে মনে হয়, ইহা মৃত্যুঞ্জয়েরই রচনা।—"বর্তমান কলিযুগের আরম্ভ অবধি গত ৪৯০৫ চারি হাজার

নয়শত পাঁচ বৎসর পর্যন্ত যে যে রাজা ও বাদশাহ ও নবাব হইয়াছেন তাঁহারদের বিবরণ ১৮০০ আঠার শত খ্রিশবীর সনে গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত হইল,”—এই ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে লেখক বিচরণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, পৌরাণিক অংশে মৃত্যুঞ্জয় ইতিহাস নিধারণ অপেক্ষা গল্প কাহিনীর দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন ; কিন্তু মুসলমান যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাকেই অনুসরণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকের যে নিঃস্পৃহ ভাবদৃষ্টি ও অনুদ্বেজিত মন ইতিহাসের ঘটনা নির্ধারণ ও মূল্য নির্ণয়ের জন্য একান্ত প্রয়োজন, মৃত্যুঞ্জয় ইংরাজী ইতিহাস গ্রন্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলেও, সেই ঐতিহাসিক তত্ত্বদর্শনের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাই ইংরাজ-জয়ে যেখানে রাজীবলোচন উল্লসিত হইয়াছেন,[২৮] সেখানে মৃত্যুঞ্জয় অতিশয় সংক্ষেপে এবং নিরাসক্তভাবে সিরাজের পরাজয় বর্ণনা করিয়াছেন।[২৯] মানুষ হিসাবে মৃত্যুঞ্জয় তৎকালীন সামাজিক খর্বতার ঊর্ধ্বে বিচরণ করিতেন। সতীদাহ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতটুকু[৩০] বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে প্রাচীন ও রক্ষণশীল সংস্কৃতির মধ্যে বর্ধিত হইয়াও তিনি এই বিষয়ে আধুনিক মনের বিস্ময়কর পরিচয় দিয়াছেন।

এই ইতিহাস-নামাঙ্কিত কাহিনীগুলির দ্বারা দেশের একটা উপকার হইয়াছিল ; দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে শুধু লেখকই নহেন, পাঠকগণও কৌতূহলী হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের ‘রাজাবলি’ ইতিহাসের পূর্ণ মর্যাদা দাবী করিতে পারে। তিনি সমসাময়িক ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহকে যে ভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন, সনতারিখের যাথার্থ্যের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং ভারত ইতিহাসের মূল কাঠামো ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনে ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে একটা স্থূল আভাস ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের ‘বেদান্ত চন্দ্রিকা’ (১৮১৭)[৩১] এবং কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের ‘পদার্থ কৌমুদী’ (১৮২১) ও ‘আত্মতত্ত্ব কৌমুদী’র (১৮২২) নাম উল্লেখ করিতে হয়।[৩২] কাশীনাথের ‘পাষণ্ড পীড়ন’ (১৮২৩) এবং মৃত্যুঞ্জয়ের ‘বেদান্ত চন্দ্রিকা’ প্রধানত রামমোহনের একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে রচিত বিতর্কিকা। রামমোহনের আবির্ভাবে বাঙালীর চিত্তে প্রচলিত দেশাচার ও ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হয়। দীর্ঘদিন ধরিয়া খ্রীস্টান মিশনারীগণ হিন্দুধর্মের উপর আঘাত

হানিতেছিলেন ; স্বয়ং রামরাম বসুও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সমাজের কর্ণধারগণ যে অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। রামমোহনের ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মতত্ত্ব এবং ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও সুলভ প্রচারের ফলে, যাহারা এতদিন ধর্মগ্রন্থকে গূঢ়াচার ভাবিয়া দূরে অবস্থান করিত, তাহারা বেদান্ত, উপনিষদ ও তন্ত্রের সবলার্থ বুঝিতে পারিল। ফলে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর সহিত শাস্ত্রাধিকারবর্জিত শূদ্রদের সংঘর্ষ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা দিল—জড় সমাজের বুকে মত্ত তাণ্ডব শুরু হইল। রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর কর্মাবসান হইল, আসিল নূতন যুগ এবং অভিনব যুগজিজ্ঞাসা। রামমোহন হইতেছেন সেই যুগসঙ্কটের অধিনায়ক।

পাদটীকা

১। *Bengal Past and Present*, January, June, 1911.

২। বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ ১৭৫

৩। সমাচার দর্পণ, ৩১ জুলাই, ১৮৩০

৪। "That a premium of sicca Rupees Eighty to be awarded to Chandee Churn Pundit for his translation of the Bhagbut Geeta into the Bengalee Language." Home, Misce. No. 559, pp 384-85. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত' হইতে উদ্ধৃত।

৫। Roebuck-*Annals of Fort William College.*

৬। সংবাদ প্রভাকর, ১৩ই মার্চ, ১৯৫৪।

৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, পৃ ৪২।

৮। J. C. Ghosh—*Bengali Literature*, P. 100

৯। *Ibid*. P. 100

১০। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলীর পৃ. ২।৶০ দ্রষ্টব্য।

১১। 'সাধুসন্তোষিণী' পাওয়া যায় নাই।

১২। গোলোকনাথ শর্মা (১৮০২), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৮০৮) ও রামকিশোর তর্কচূড়ামণি (১৮০৫)—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তিনজন পণ্ডিত হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন।

১৩। ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত।

১৪। তোতা ইতিহাস 'তোতা কহানী' নামক হিন্দী গ্রন্থ হইতে অনূদিত।

১৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, পৃ ২৫।

১৬। 'ইতিহাস মালা' কেরীর নিজস্ব রচনা কিনা সন্দেহস্থল। কারণ ইহার পরিচয় স্থলে আছে, "a collection of stories in the Bangali Language, collected from various sources." কাজেই কেরীই যে ইহার একমাত্র রচয়িতা, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় না।

১৭। 'কথোপকথন'ও কেরীর রচনা কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ রহিয়াছে। এই সম্পর্কে দুইটি সংশয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে—

(ক) কেরী 'কথোপকথনে'র ভূমিকায় বলিয়াছেন, "That the work might be as complete as possible, I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural style of the persons supposed to be speakers."

(খ) কেরীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার এক বন্ধু এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণালে লিখিয়াছিলেন, 'These (colloquies) were composed in the original Bengali probably by a clever native"—সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'কথোপকথনের' ভূমিকা, পৃ ২।/৯

১৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—উইলিয়ম কেরী, পৃ ৩৫

১৯। সজনীকান্ত দাস—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পৃ ৯৬

২০। ইহার প্রথম সংস্করণ ১৮০৫ সালে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে ইহার যে সংস্করণটি আছে, তাহা সম্ভবতঃ ১৮২৫ সালে লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ। বৃটিশ মিউজিয়ামে আর একখানি সংস্করণ আছে: তাহাতে ১৮০৬ সাল উল্লিখিত আছে। East India College-এর পুস্তকতালিকায় যেখানি আছে তাহা ১৮১১ সালে প্রকাশিত। (Dr. S K. De—*History of the Bengali Literature in the nineteenth century*, p. 188.)

২১। কেরী ডাঃ ফ্লেমিং এই ছদ্ম নামে এসিয়াটিক রিসার্চ্চ পত্রিকায় ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।—সজনীকান্ত দাস—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ ১১২

২২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্করণ পৃ ৬৭

২৩। লিপিমালা, ১৮০২ সালের সংস্করণ, পৃ ৫৩—৫৫

২৪। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'

২৫। Dr. Yates—*Introduction to Bengali Language*, Vol.II. p. 124

২৬। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত, 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং,' পৃ ৫৬

২৭। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৬শ ভাগ, পৃ ২৩৩

২৮। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, পৃ. ৫৬

২৯। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী, পৃ ১৮৪—৮৫

৩০। *Friend of India*, October, 1819.

৩১। ১৮১৭ সালে ইহা *'Apology for the Present System of Hindoo Worship'*—নামে প্রকাশিত হয়। ইহাতে মৃত্যুঞ্জয়ের নাম ছিল না। তবে ইহা যে মৃত্যুঞ্জয়েরই রচনা তাহার প্রমাণ আছে। মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলীর ৸৶৹ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩২। কাশীনাথ বাংলা গদ্যে ন্যায়দর্শন অনুবাদে ব্রতী হইয়া একটা দুরূহ কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। চিন্তাগ্রাহ্য জটিল বিতর্ককে অপরিণতগঠন বাংলা গদ্যে স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তোলা সহজ সাধ্য নহে।

দ্বিতীয় পর্ব

রামমোহন ও বাঙালীর মানস-মুক্তি

পঞ্চম অধ্যায়

পটভূমিকা

একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া একটা জাতি ও সংস্কৃতির নবজীবনের বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়; যুগমানবই যুগবাণীকে একটা ক্রিয়াশীল তাৎপর্যে পূর্ণ করেন। রাজা রামমোহন রায় সেই যুগন্ধর কালপুরুষ, যিনি অনাগত কালের জয়বার্তা আপনার মন ও মননে বিধৃত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার বিপ্লবী মনোজীবনের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালীর নব জন্মান্তর হইয়াছে; পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতে মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের আরম্ভ—ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে সত্য,—কিন্তু বাঙলা দেশে যথার্থ নবযুগ আরম্ভ হইয়াছে রামমোহনের কলিকাতায় আবির্ভাবের পর।[১] বাঙলাব নবযুগ শুধু একটা প্রাদেশিক আবর্তন নহে,—রামমোহনের চেতনার বিদ্যুৎস্পর্শ মধ্যযুগীয় ভারতের বুকে রূঢ় আঘাত হানিতে পারিয়াছিল।

আধুনিক জীবনবোধের প্রধান লক্ষ্য—যুক্তিবাদের জয়ঘোষণা, মানবহিতবাদ, ভৌগোলিক সীমা-সম্প্রসারণ, রাষ্ট্র-ধর্ম-সমাজ সম্বন্ধে বাস্তব-চেতনা- লব্ধ হিতৈষণা —প্রধানতঃ মানসমুক্তির এই সকল বাণী রামমোহনের চিত্ত ও ভাবনাকে নব-জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। রামমোহনের কলিকাতায় আগমন ও স্থায়িভাবে বসবাস করিবার পর হইতেই এই নগরীকে কেন্দ্র করিয়া নানা আন্দোলনের প্রলয় কল্লোল উত্থিত হইল, এবং মধ্যযুগীয় বাঙালীর যুগজীর্ণ পথ-পরিক্রমা সহসা নবজীবনলাভের উল্লাসে পরিণত হইল। খ্রীস্টীয় ১৮১৩ অব্দ হইতে ১৮৩৩ অব্দ পর্যন্ত মোট কুড়ি বৎসর রামমোহন বাঙলা দেশে নব্য প্রাণ-প্রতীতির দিব্য দীপ-শিখা বহন করিয়া চলিয়াছিলেন,—১৯শ শতকের প্রথমার্ধে এই আধুনিক 'প্রমিথ্যুস' সর্ববিধ বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে ১৯শ শতকের ধ্রুবতারা বলা হইয়া থাকে। তাঁহার আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ণয় করিলে বুঝা যাইবে যে, বাঙলার মধ্যযুগীয় ভাবনা, জীবন ও সমাজের অন্ধতমসা বিদীর্ণ করিয়া কেমন করিয়া সহস্রাংশু-বর্ষী সূর্যের আবির্ভাব হইয়াছিল।

বিচিত্র অনুভূতি, ভাব-ভাবনা ও চিন্তার রাসায়নিক সংমিশ্রণে রামমোহনের মানসিক ভাবাদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে। রামমোহনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই কুড়ি

বৎসরের (১৮১৩—১৮৩৩) সাংস্কৃতিক মূল্যমান নির্ণয় করা সহজ হইবে। তাঁহারই চিত্তধর্মের মধ্যে ১৯শ শতকের বাঙালীর আত্ম-জাগরণের মূল রহস্য নিহিত আছে এবং তাঁহার চিত্তে যে ভাবধারা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ও নবজীবন-বেগ সঞ্চার করিয়াছিল,—তাহা শুধু একটি ব্যক্তিমনের নিভৃত গুহাহিত ভাববৈশিষ্ট্য নহে, সমগ্র যুগচেতনা একটি উৎকণ্ঠ ব্যক্তির বিশাল চিত্ততটে আহত হইতেছিল। রামমোহন যুগের সন্তান; ১৯শ শতকের প্রথমার্ধ তাঁহারই শাণিত যুক্তির আয়ুধে আহত হইয়া নব্য-রেনেসাঁসের পথ নির্মাণ করিয়াছে। রামমোহন সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন:

"As a herald of the New Age opening with the ever memorable and eventful nineteenth century, he held up before men a new faith, which was universal in its sympathies and whose cardinal principal was that the service of man is the service of God".[২]

রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী সোফিয়া ডবসন কোলেট ভিন্ন দেশবাসিনী হইয়াও রামমোহনের প্রভাব অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তিটিও স্মরণীয়:

"He was the arch which spanned the gulf that yawned between ancient caste and modern humanity, between ancient superstition and science, between despotism and democracy, between immobile custom and a conservative progress, between polytheism and theism." (Rammohan Centenary Volume, P-89.)

রামমোহনের আধুনিক মন, বিশ্ববোধ ও মানবহিতবাদ—ইহার স্বরূপ অনুধাবন করিতে হইলে, তাঁহার সমকালীন রাষ্ট্র, সমাজ ও সমসাময়িক সাহিত্যের পরিচয় লইতে হইবে।

॥ ১ ॥

সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র

আমরা ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে রামমোহন-পর্ব নামে চিহ্নিত করিতে পারি। ১৮১৪-১৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে রামমোহন কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন, এবং প্রায় তাহার বিশবৎসর পরে ইংলণ্ডের ব্রিস্টল নগরে তাঁহার দেহান্ত হয়। আরও একটা কারণে এই বিশ বৎসরের বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বিশ বৎসরের জন্য বাড়াইয়া দেন, এবং সনদে এমন কয়েকটি নূতন ধারা সংযোজিত হয়, যাহার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে সকলের অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির সময় আরও কিছু কিছু নূতন ধারা সংযোজিত হয়, বাঙলা দেশের উপর যাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরবর্তী কালে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কাজেই এই কালের (১৮১৩—১৮৩৩) সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিলে বাঙালীর মনোজীবনে রামমোহনে প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যাইবে।

রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ১৭৯৮-১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে বণিক ইংরাজ ধীরে ধীরে ছলে, বলে ও কৌশলে রাজশক্তি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে আপ্‌পা সাহেবের সহিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'বশ্যতামূলক' মিত্রতা' স্থাপিত হইলে মারাঠা শক্তিও খর্ব হইল এবং ইংরাজের প্রধান রিপু হতবল হইয়া পড়িল। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দের যুদ্ধে মারাঠা শক্তি একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলে বণিক ইংরাজের মারাঠা-ভীতিও হ্রাস পাইল। ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রশক্তিকে খর্ব করিয়া এই দেশের চারিদিকে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইল। মারাঠা শক্তির পতন, চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ফরাসী শক্তির অবসান এবং হায়দ্রাবাদ, কর্ণাট, তাঞ্জোর, সুরাট, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের দেশীয় রাজন্যবর্গকে কোথাও উৎখাত করিয়া, কোথাও-বা বশীভূত করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিল। পিণ্ডারী ও পাঠান শক্তি হতবল হইবার পর রাজপুতানা ও মধ্যভারতে ব্রিটিশের প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষাকৃত সহজ হইল। ইতিপূর্বে নেপাল যুদ্ধে (১৮১৪—১৬) ভাগ্যবিপর্যয়ের পর ইংরাজ নেপালের রাজশক্তিকে করায়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। কাজেই ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বণিক ইংরাজকে ভারতবর্ষে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারে ব্যাপৃত থাকিতে হয় এবং তাহার ফলে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক নরপতিগণের স্বাতন্ত্র্য বহুলাংশে খর্ব হয়, এবং ভারতের চতুঃসীমায় বিদেশীর প্রভুত্ব স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।[৩] ভারতে মুসলমান শাসনের অবসানে সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন এবং নৈতিক-চরিত্র কতদূর অধঃপাতে গিয়াছিল এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা হইতেই তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। রাজ্যশাসন

ও রাষ্ট্রবিপর্যয়ের সহিত যেন জনজীবনের কোন যোগাযোগই ছিল না ; ভৌগোলিক অধিকার লইয়া বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যতই কলহদ্বন্দ্ব চলুক না কেন, জনজীবনের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত না আসিলে কেহই এই সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন বা সমাজবিপ্লব সম্বন্ধে অবহিত হইত না। এই যে পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, ও বাস্তব বিস্মরণ,—মধ্যযুগের অবসানে সমগ্র ভারতেই এই জাতীয় একটা অতি স্থূল তামসিকতা জনচিত্তে জগদ্দল শিলার মত চাপিয়া বসিয়াছিল। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ভারতের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, যুধ্যমান ও পরস্পর-কলহে মত্ত দেশীয় শক্তিকে বহুলাংশে খর্ব করিয়া কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইল ; কিন্তু ভারতের সীমান্তে ও বাহিরে তখনও নানা স্বাধীন শক্তি বর্তমান ছিল। ১৮২৪ হইতে ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতের সীমান্তবর্তী ও বাহিরের শক্তির সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। ব্রহ্মযুদ্ধ ও শিখযুদ্ধে ইংরাজের জয়লাভের ফলে ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধে তাহারা বহুলাংশে নিরুদ্বিগ্ন হইল।[৪] ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ইংরাজ-প্রতিদ্বন্দ্বী-শক্তির অবসান হইল এবং বণিক ইংরাজ শাসক হইয়া প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করিতে লাগিল। তদানীন্তন ভারতবর্ষের নৈতিক-অবস্থা কত শোচনীয় হইয়াছিল, তাহার দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ১৮৩২ সনে ইংরাজ কাছাড় অধিকার করে সেখানকার জনসাধারণের আমন্ত্রণে ; ১৮৩৪ সনে ইংরাজের কুর্গ অধিকার করার পশ্চাতেও জনসাধারণের সমর্থন ছিল। গোয়ালিয়র যুদ্ধে (১৮৪৩) মন্ত্রী দিনকর রাও ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। অবশ্য স্থানীয় শাসকদের অত্যাচারে জনসাধারণও সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছাইয়া ইংরাজকে আমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।[৫] ইহার কিছু পরেও নব্য-শিক্ষিত বাঙালী ইংরাজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলিয়া মনে করিত। রামমোহনের সমসাময়িক কালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর সগর্বে বলিয়াছিলেন ঃ

"If we were to be asked, what government we would prefer, English or any other, we would, one and all reply, English by all means, ay, even in preference to a Hindu Government."[৬]

অবশ্য ইংরাজের প্রতি এই অকুণ্ঠ ভক্তির উচ্ছ্বাস ক্রমেই তিরোহিত হইতে লাগিল। অর্থনৈতিক কারণে ইংরাজের যে স্বার্থপর রূপ নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করিল, অতি অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষিত বাঙালী তাহার যথার্থ

স্বরূপ বুঝিতে পারিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম অনারেরি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন ; ইংরাজের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাও ছিল প্রচুর। কিন্তু তিনিই আবার ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বজ্র বর্ষণ করিয়াছিলেন,

"They have taken all which the Natives possessed; their lives, liberty, property and all were held at the mercy of Government."

সুরের এই যে পরিবর্তন, ইহা শুরু হইল রামমোহনের তিরোধানের পর। কিন্তু ১৯শ শতকের প্রথম তিন দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দেশব্যাপী জড়তার মধ্যে যখন ইংরাজ বণিক স্বার্থ ও লোভের দ্বারা চালিত হইয়া ভরতের রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনরস ধীরে ধীরে শোষণ করিয়া লইতেছিল, তখন সেই অন্ধ তামসিক যুগে এই সর্বনাশা ব্যাপার কাহারাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কেবল রামমোহনই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে অবহিত হইয়াছিলেন। ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পর বাঙালীর রাষ্ট্র-চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ ফিরিয়া আসিল।

১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদেব মেয়াদে বৃদ্ধির সময় পার্লামেণ্ট কর্তৃক ইহাতে একটি নূতন ধারা সংযোজিত হইল ; যাহার ফলে ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার লোপ পাইল। ইহার আশু প্রয়োজনও ছিল। শিল্পবিপ্লবের পর ইংলণ্ডে বহু কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল, নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে নির্মিত হইতেছিল। এতদিন ধরিয়া ইংলণ্ডে-প্রস্তুত দ্রব্যাদি য়ুরোপের পণ্য-প্রাঙ্গণ প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছিল। কিন্তু নেপোলিয়ন ইংরাজের বলবীর্য হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে য়ুরোপের বন্দরে ব্রিটিশ দ্রব্যাদির রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া সাধারণ ইংরাজকে বাণিজ্যের অবাধ অধিকার দিতে হইল এবং সেই জন্যই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার লুপ্ত হইল। ইহার ফলে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে অতি সূক্ষ্মভাবে যন্ত্রবিজ্ঞান প্রবেশ করিতে লাগিল এবং যন্ত্রের প্রভাবে দেশের কারিগর শ্রেণীর মানুষ সহসা বৃত্তিচ্যুত হইল।

এই সনদে আরও দুইটি মূল্যবান ধারা সংযোজিত হইল। একটি ধারা অনুসারে ভারতে খ্রীস্টান মিশনারী সম্প্রদায়ের আগমনের বিরুদ্ধে আর কোন বাধা রহিল না ; ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দের পর হইতেই প্রকাশ্যে এবং প্রচ্ছন্ন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মান্তরীকরণ শুরু হইল। আর একটি ধারা অনুযায়ী—ভারতবাসীর

শিক্ষা বাবদ বার্ষিক একলক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হইল, যদিও বহুদিন এই অর্থ শিক্ষাবাবদ ব্যয়িত হয় নাই, তথাপি সহসা পার্লামেণ্ট এই ধারা যোগ করিল কেন, তাহার গূঢ় রহস্য অনুমান করা যাইতে পারে। ইংরাজ বুঝিয়াছিল যে, ভারতবাসী কিয়দংশে ইংরাজী ধরনে শিক্ষিত না হইলে তাহাদের রুচি ও প্রয়োজনের মান বৃদ্ধি পাইবে না। জনসাধারণকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন বিলাতী দ্রব্যের প্রয়োজন বোধ করিতে পারে। ডাফ্ ও মেকলে সাহেব ইংরাজী ভাষা প্রচারের জন্য কেন এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন তাহার কারণও সহজে অনুমেয়। তাঁহারা কোনক্রমেই ভারতপ্রেমিক ছিলেন না, তথাপি এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের জন্য তাঁহাদের কেন শিরঃপীড়া হইল, তাহার কাবণ, একদিকে ধর্মান্তরীকরণের উচ্চাশা, অপরদিকে ইংরাজের পণ্যকে ভারতেব গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য ভারতবাসীর প্রয়োজনের চাহিদা বৃদ্ধি করা।

১৮৩৩ সালের সনদে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বাধীন বাণিজ্যাধিকার একেবারে লুপ্ত হইল, চীন মহাদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকারও কাড়িয়া লওয়া হইল। অতঃপর বণিক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সত্য সত্যই শাসকে রূপান্তরিত হইল। সনদ পরিবর্তনের ফলে বাঙলা দেশে প্রতিক্রিয়া সম্প্রসারিত হইল। একটা উদাহরণ দিলেই ইহার স্বরূপ বুঝা যাইবে। বেন্টিংক্ ভারতীয়দিগকে শাসনবিভাগে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত করেন; তাহার কারণ জমিজমা-সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশীয় কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিল এবং কিছু কিছু শিক্ষিত বাঙালীকে (হিন্দু কলেজের ছাত্র) আমীন ও মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইল। ফলে বাঙালীর মধ্যে চাকুরীজীবী, স্বল্পে-সন্তুষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। অবশ্য ইহার সূচনা হইয়াছিল মুরশিদকুলি খাঁয়ের আমলে; আলিবর্দির সময়ে প্রধানতঃ হিন্দুগণই রাজস্ববিভাগে নিযুক্ত হইতেন। ইংবাজ শাসনের পূর্বেই এদেশে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে; কিন্তু কর্ণওয়ালিশের অতিশয় সঙ্কীর্ণ নীতির জন্য এই শ্রেণী সরকারী চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইয়া কলিকাতায় ব্যবসাবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিল। সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির মূল উপাদান ইহারাই; ইংরাজ বণিকও এই দেশীয় মুৎসুদ্দির সাহায্য বিকিকিনি করিত। কিন্তু দেখা গেল যে, বিশাল দেশের শাসনভার শুধু ইংলণ্ড হইতে আগত সিভিলিয়ান কর্মচারীদের দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাই ১৯শ শতকের তৃতীয় দশক হইতে (১৮২৯) আবার

হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সরকারী চাকুরী লাভ করিতে লাগিল ; উত্তরকালে এই সম্প্রদায়ই বাঙলার সংস্কৃতিকে সৃষ্টি ও লালন করিয়াছে।[৮] ডিরোজিওর অধিকাংশ ছাত্রই এই সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, এবং হিন্দুকলেজের এই তরুণ বিপ্লবী ছাত্রগণ ফরাসী বিপ্লব ও পাশ্চাত্য যুক্তি-দর্শনের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া ভারতের বহুকাল-সুপ্ত সমাজশরীরে প্রবল আঘাত হানিয়াছিলেন। এমন কি কেহ কেহ ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধেও বিষোদ্‌গার শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারাই যখন ডেপুটী কালেকটারের পদ লাভ করিলেন, তখন সেই বিদ্রোহ-বহ্নি প্রশমিত হইল এবং কলিকাতার 'ইয়ং বেঙ্গল'দের বজ্রবাণী ধীরে ধীরে নীরব হইয়া গেল।[৯]

১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দ, মোট কুড়ি বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ভারতের চতুঃসীমায় একটা স্থায়ী ও সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। অবশ্য তাহার জন্য একটা দুর্মূল্য দিতে হইয়াছিল। তাহা হইল ভারতের স্বাধীন সামন্ততান্ত্রিক শক্তিসমূহের আত্মদান। একদিকে যেমন এইভাবে বিদেশী বণিকশক্তি ভারতে ও ভারত-সীমান্তে স্বাধিকার স্থাপন করিল, ঠিক তেমনি অপর দিকে বাঙালীর সমাজ-জীবনেও নানা পরিবর্তন, বাদ প্রতিবাদ ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। শাসনগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বিন্যাস শুরু হইল।

১৮শ শতাব্দীতে বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মে যে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু-মুসলমান ও আর্মাণীয় বণিকগণ বাঙলা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছিল। শুধু আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যই নহে, পারস্য, তুরস্ক ও তিব্বতেও বাঙলা দেশের বাণিজ্যপ্রবাহ সম্প্রসারিত হইয়াছিল। অনেক বিদেশী বণিক বাঙালীর বাণিজ্যিক প্রাধান্য ও শিল্পোৎকর্ষের জন্য অভিযোগ করিত।[১০] কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের অবনতি দ্রুততর হইল। ব্যবসার প্রাণকেন্দ্রে বিদেশী বণিক হস্তক্ষেপ করিল ; ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি এবং বাঙালী তথা ভারতের শিল্পপ্রাধান্য হ্রাস করিবার জন্য পার্লামেণ্ট হইতে আইন পাস করাইয়া দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের শ্বাসরোধ করা হইল। ফলে যে সমস্ত বাঙালী এতদিন শিল্পকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ

করিয়াছিল, তাহারা স্থানচ্যুত হইয়া বিষম বিপাকে পড়িল, কেহ কেহ কৃষিকার্য অবলম্বন করিল, কিন্তু কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির মালিকানা স্বত্ব রায়তের অধিকারে ছিল না। ফলে ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই দেশে একটা বিরাট ভূমিহীন কৃষকসম্প্রদায় ও বৃত্তিহীন শিল্পীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, যন্ত্রবিজ্ঞান ধীরে ধীরে কুটীর-শিল্পকে গ্রাস করিতেছে, তাহার তরঙ্গ এদেশেও আঘাত করিল। বিদেশ হইতে আনীত যন্ত্রের সাহায্যে অনেক পরিশ্রমসাধ্য কর্ম সহজে নির্বাহ হইতে লাগিল, ফলে নিম্নবৃত্তিজীবী শিল্পিগণ দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। নিম্নে এইরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

১৮২৮ সনে এক সুতাকাটনী সংবাদপত্রে নিজের দারিদ্র্য দুঃখ নিবেদন করিয়া বলিয়াছিল যে, বিলাত হইতে তিন-চার টাকা সের দরে সুতা আমদানী হওয়ার ফলে টাকায় তিন-চার তোলা হাতেকাটা দেশী সুতা কে কিনিবে? ইহাতে সে অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হইয়াছে।[১১] একদিকে বিদেশ হইতে সুতা আমদানী হওয়ার ফলে সুতাকাটনী প্রভৃতি নিম্নবৃত্তিজীবীরা কর্মচ্যুত হইতে লাগিল; আবার অপর দিকে কলিকাতা ও শহরতলীতে যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বহুলোক অন্নহীন হইয়া পড়িল। ১৮৩০ সালের এক বিজ্ঞাপনে দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতায় গম পেষাই কল চালু হওয়াতে ময়দা বিক্রয়কারীরা শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল।[১২] বিদেশীর প্রতিযোগিতার ফলে রাজমিস্ত্রী, স্বর্ণকার, দরজী, নৌকাব্যবসায়ী—সকলেরই বৃত্তিতে আঘাত লাগিল।[১৩] এইরূপে দেশের মধ্যে একটা বৃহদংশ ধীরে ধীরে উপার্জন-বঞ্চিত হইয়া পড়িল। ১৮২৬ সালের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কলিকাতায় "তণ্ডুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র" স্থাপিত হওয়ায় দেশীয় ঢেঁকি ও ভাঁড়ানীদেরও প্রয়োজন ফুরাইল। কারণ এই যন্ত্রে একদিনে দুইজনের চেষ্টায় দশমন চাউল নিষ্কাশিত হইত, দেশীয় ঢেঁকিতে যাহা কখনও সম্ভব ছিল না।[১৪] ১৮২৯ সালের সংবাদ পত্রের এক বিজ্ঞাপনে দেখা যাইতেছে যে, গঙ্গাতীরে একটি "৩০ অশ্বের বলধারী বাষ্পযন্ত্র" চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুই হাজার-মন গম পিষিতেছে। সুতরাং ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের অভিশাপ বাঙলা দেশে ১৯শ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যে সমাজের নিম্নস্তরে দারিদ্র্যজনিত হতাশা সঞ্চার করিল। সাধারণ স্তরে এই দারিদ্র্য কী ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল,

তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ১৮২৮ সালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ঘটনায়। এই বৎসর বর্ধমানের এক কলু অন্নাভাবে স্ত্রী বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল।[১৫] ক্রমেই অর্থনৈতিক অবনতি মারাত্মক আকার ধারণ করিল। ১৮২৯ সালে কড়ির ব্যবহার রহিত হইল, শুরু হইল তামার পয়সার প্রচলন। মূল্যমানের এই পরিবর্তনের ফলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক বিপর্যয় সহজেই অনুমেয়।[১৬] বিত্তবান মধ্যস্বত্বভোগী ব্যক্তিগণের কলিকাতায় আগমনের ফলে ১৫৲ টাকা মূল্যের জমির দাম বাড়িয়া ৩০০৲ টাকায় উঠে। ইতিপূর্বে আট আনায় এক মণ মোটা চাউল মিলিত। কিন্তু ১৮২৯ সালের সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়, ঐ মোটা চাউলের মন ২৲ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল।[১৭]

উল্লিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝা যাইবে যে, রামমোহনের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার তিরোধান পর্যন্ত প্রায় বিশ বৎসরের অর্থনৈতিক ইতিহাস ক্রমেই অধোগতির পথে গিয়াছে। জনসাধারণ ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের শেষ স্তরে নামিয়াছে, য়ুরোপ হইতে যন্ত্রবিজ্ঞান আমদানী করা হইয়াছে, বৃত্তিজীবী বাঙালী ক্রমেই আশাভঙ্গের ব্যর্থতার মধ্যে পতিত হইয়াছে। অপরদিকে কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির জন্য মুৎসুদ্দি শ্রেণীর বাঙালী হঠাৎ ধনাগমে স্ফীতচিত্ত হইয়াছে। আবার সমাজের আর একদিকে কেহ কেহ মাহেশের রথে জুয়ায় হারিয়া স্ত্রী বিক্রয় করিয়াছে।[১৮] ১৮৩০ সালে নদীয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বানরের বিবাহে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।[১৯] অন্যদিকে জমিদারগণ সুপ্রীম কোর্টের মামলায় নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছিলেন। ১৮২৯ সালের 'সমাচারদর্পণে' প্রকাশ যে, ঐ সনে কলিকাতায় দুর্গোৎসব ও অন্যান্য উৎসবের আতিশয্য হ্রাস পাইয়াছিল। কারণ, বিত্তবান জমিদারগণ মামলা মকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছিল। এই যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ইহা একদিকে কৃষাণ শ্রেণীকে পীড়িত করিল, অপরদিকে নব্য সামন্ততন্ত্রের ধারক ও বাহকগণের আর্থিক অবস্থাকেও সকলের অলক্ষ্যে অবনতির পথে টানিয়া লইয়া চলিল। রামমোহন এই দারিদ্র্য-পীড়িত বাঙলা দেশের হৃদপদ্ম দলে আবির্ভূত হইয়া এবং বিচিত্র ও বিরোধী জীবনধারার সমন্বয় করিয়া ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই বাঙালীর নবজীবন-প্রভাতের মাঙ্গলিক গাহিলেন।

॥ ২ ॥

সমকালীন জনজীবনধারা

এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে আমরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠী ও শ্রীরামপুর মিশনারী সম্প্রদায়ের সাহিত্য-প্রচেষ্টা আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন বাঙালীর প্রাণধর্মের মূল ধাতুপ্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছি। আলোচ্য অংশেও বাঙালীর জীবনধারা ও মনোধর্মের একটা প্রাথমিক পরিচয় তৎকালীন সাময়িক-পত্র ও সাহিত্য হইতেই লাভ করা যায়।

নব্য কলিকাতা বণিগ্‌বৃত্তির দ্বারা সৃষ্ট হইলেও এই সদ্য-গঠিত নব নগরীকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর জীবনে ১৯শ শতকের প্রথমার্ধ একটা অননুভূতপূর্ব জীবনোল্লাস সৃষ্টি করিয়াছিল। রামমোহন এই ঐতিহাসিক সঙ্কটক্ষণে আবির্ভূত হইয়া প্রচলিত সংস্কার ও জীবনধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই কয় বৎসর (১৮১৩-১৮৩৩) বঙ্গ সংস্কৃতির পরম সঙ্কটক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

এই সময়ে একদিকে চলিতেছিল পূর্বতন ধারার পুনরাবৃত্তি, বিত্তস্ফীত ইজারাদারদিগের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কৌতুক পরিহাস ; আরেক দিকে নবীন যুবকগণের মনে নবযুগের দিব্যদাহ সঞ্চারিত হইতেছিল। নিকী নামক এক প্রসিদ্ধ রূপোপজীবিনীকে তৎকালে (১৮১৯) কলিকাতার কোন এক ধনীব্যক্তি মাসিক এক হাজার টাকা দক্ষিণা দিয়া রক্ষিতারূপে গ্রহণ করিয়া সমাজে পদস্থ ব্যক্তি বলিয়া সপ্রশংস বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন কি স্বয়ং রামমোহনও নিকী বাইজীর নৃত্যগীতাদি উপভোগ করিতেন ; তাঁহার বাটীতে এই আধুনিক 'বসন্তসেনা' বহুবার নৃত্যগীতাদি করিয়াছিল।[২০] দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিও নিকৃষ্ট আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিতেন। ১৮২৩ সালে তাঁহার নূতন বাটীতে গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে অনেক কৌতুকাবহ সং বা ভাঁড়ামির অভিনয় হইয়াছিল। একজন সুরসিক ভাঁড় বলদ সাজিয়া যথার্থই ঘাস খাইয়াছিল। ১৮২৫ সালে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে কলিকাতার রাজপথে দিবালোকে কুৎসিত সং বাহির করিবার অপরাধে কয়েক ব্যক্তির কঠোর শাস্তি হইয়াছিল।[২১] ঐ বৎসর এক বৈষ্ণবী দেড়শত টাকায় আপনার সুন্দরী কন্যা বিক্রয় করিয়াছিল। একদিকে এই নৈতিক অধোগতি, অপরদিকে বৈশ্য ধর্মের বিষ-নিঃশ্বাসে বাঙলা দেশে ধীরে ধীরে সামাজিক অনাচার প্রবেশ করিতে

লাগিল। ১৮২০ সালে ব্যবসায়ে অসাধুতার অন্য অনেক চতুর ব্যবসায়ী শাস্তি ভোগ করে, ঘৃতে চর্বি মিশ্রিত করিবার অপরাধে কয়েকজনের কঠোর দণ্ড হয়।[২২] ঐ বৎসরেই বাঙালী ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে কলহের সৃষ্টি হয়। ১৮২০ সাল হইতে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গার সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। ১৮২০ সালেব কার্তিক মাসে সপ্তমী পূজাব দিন চাঁদনীর নিকট দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, তাহাতে অনেক মুসলমান কঠোব দণ্ডলাভ করে, সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরও জরিমানা হইয়াছিল।[২৩]

প্রায় সমসাময়িককালে কলিকাতার কবিওয়ালা সম্প্রদায়ের অনেকের লোকান্তরেব ফলে কবিগান হীনবল হইয়া পড়িল। ১৮২৪ সালে হরুঠাকুর, ১৮২৫ সালে নীলু ঠাকুব ও নীলমণি কবিওয়ালাব মৃত্যুর ফলে কবিগানের ঐশ্বর্য ম্লান হইয়া আসিল। অবশ্য 'নেডী কবির দল' (গোলোকমণি, দয়ামণি, রত্নমণি) কিছুকাল কবিগানের শেষ দীপশিখাটি রক্ষা করিয়াছিলেন।[২৪] সৌখীন বাবুর দল সখেব কবিগান ও কবিব দল বাঁধিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাও নবযুগের বিপুল প্লাবনে ভাসিয়া গেল। কলিকাতার সমাজের এই অংশটুকু পুরাতন জীবনধারার উচ্ছ্বাবশে মাত্র। কলিকাতা সম্বন্ধে রাডিয়ার্ড কিপলিং বলিয়াছেন:

Thus the mid-day halt of Charnock
More's the pity
Grew a city.
As the fungus sprouts chaotic
From its bed
So it spread,
Chance directed chance-erected,
Laid and built
On the silt.

কলিকাতা নগরী খানিকটা আকস্মিক ঘটনার ফলে গড়িয়া উঠিলেও ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই নব্য-রেনেসাঁসের আলোক-শতদলে রামমোহনের আবির্ভাব হইল। রামমোহনের সমকালেই কলিকাতায় নবজীবন ও ভাবাদর্শের অকৃপণ প্রাচুর্য বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মত বাঙালীর চিত্তল-শায়ী জড়তার ঐরাবতকে কোন্ শূন্যে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

● ॥ ৩ ॥

সমসাময়িক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সভাসমিতি ও বাঙালীর নবজাগরণ

রামমোহনেব আবির্ভাবেব পব নির্বাপিত দীপগুলি আবাব জ্বলিয়া উঠিল; নব্যবঙ্গের প্রাণেব দীপধাবে একটা অভিনব বহ্নি-দীপ্তি আত্মপ্রকাশ কবিল। ফলে নানা সভাসমিতি ও শিক্ষাসংস্কৃতিব সূচনা ও প্রসার দেখা দিল। নিম্নে কতিপয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতিব পবিচয় দেওয়া যাইতেছে।

১৮০০ খ্রীঃ-অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার সহিত বাঙালীর জীবন ও সাধনার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। বিদেশী কর্মচাবীদেব জন্য যে বিদ্যায়তনেব সৃষ্টি, তাহাব সহিত এদেশেব কোন আত্মীয়তাব যোগ না থাকাই স্বাভাবিক। তবে এই কলেজেব তরুণ বিদেশী ছাত্রগণেব জন্য জন্য রচিত বাঙলা গদ্য গ্রন্থগুলি বাঙালীকে অভিনব অভিজ্ঞতার দ্বারপ্রান্তে পৌছাইয়া দিয়াছিল। ইহাবাও পূর্বে ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে হেস্টিংসের উদ্যোগে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয। ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে জোনাথান ডানকান কাশীধামে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন কবিয়া সংস্কৃত বিদ্যাকে একটা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে আনিতে চেষ্টা কবিয়ছিলেন। ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে স্যব উইলিয়াম জোন্স্ যখন এসিযাটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত কবিলেন, তখন বুঝা গেল যে, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি য়ুবোপেব মননশীল ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়াছেন। ইহার দ্বাবা প্রাচীন ঐতিহ্যেব প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চাবিত হইলেও নবীন জীবনেব জয়বার্তা তখনও আত্মপ্রকাশ কবিতে পারে নাই। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭) পব বাঙালী য়ুরোপীয় জীবনধারাব পরিচয় পাইল এবং সত্যকারেব নবজীবনের সূত্রপাত হইল। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা বামমোহনেব যুগকে ত্বরান্বিত ও নবজীবনবেগে চঞ্চল করিয়াছিল।

১। হিন্দুকলেজ (১৮১৭)।

২। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী (১৮১৭)।

৩। কলিকাতা স্কুল সোসাইটী (১৮১৮)।

৪। বিশপ্স্ কলেজ (১৮২০)।

৫। গোড়ীয় সমাজ (১৮২৩)।

৬। সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪)

৭। এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন (১৮২৮)

৮। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৬)

এই প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও কলিকাতা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটী (১৮২০), লেডিজ সোসাইটী ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন (১৮২৪) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল ; কিন্তু শেষোক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের সহিত সমগ্র বাঙালী সমাজের কতটুকু যোগ ছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কারণ প্রধানতঃ বিদেশিনীদের সহযোগিতা ও নির্দেশে এইগুলি পরিচালিত হইত। বিশপস্ কলেজকেও এই নবজাগৃতির সহিত সম্পৃক্ত করা ঠিক হইবে না ; ইহা কেবলমাত্র য়ুরোপীয় ও দেশীয় খ্রীস্টানদের শিক্ষার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন এখানে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে অধ্যাপক ছিলেন,—বাঙ্গালীর সহিত এই প্রতিষ্ঠানের এইটুকু মাত্র যোগাযোগ।

১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দুকলেজ মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল এবং রামমোহনের বিপ্লববাণী হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মনে বহ্নিদীপ্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী প্রকাশিত[২৫] পুস্তকগুলি পাঠশালার বালক-বালিকার মনে শিক্ষার মারফতে নবজীবনের ইঙ্গিত দিয়াছিল। বাস্তবিক হিন্দুকলেজ, স্কুলবুক সোসাইটী এবং স্কুল সোসাইটী, এই তিনটি প্রতিষ্ঠান রামমোহনের আবির্ভাবকে নানা দিক দিয়া সার্থক করিয়াছে ; ১৯শ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালী যে নবজীবন-প্রতীতি লাভ করিল, আধুনিক য়ুরোপকে দ্বার-প্রান্তে পাইয়া যুগান্তকালের মধ্যযুগীয় সংস্কার ত্যাগ করিয়া নবজীবনবাদের সাক্ষাৎ পাইল, তাহার মূলে আছে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রভাব। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর ছাত্রগণ ও অনুরাগী তরুণসম্প্রদায় (রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি[২৬]) ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া নবজীবনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের সে বহ্নি-শলাকা অনেক সময় গৃহদাহের অভিনয় করিয়াছে, জীবনের অতি প্রত্যক্ষ সত্যকে সগর্বে প্রচার করিতে গিয়া অনেক সময় তাঁহারা অতীতের বন্ধন-রজ্জুকে নির্মম

ভাবে ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন ; তথাপি তাঁহারা রামমোহনের আবির্ভাবকে নানা দিক দিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত জাতির বিদ্যুৎ-শক্তির প্রাণকেন্দ্র ছিল হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজ ও রামমোহন একে অপরের পরিপূরক। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং তরুণ ছাত্রগণ ডিরোজিওর বহ্নি-স্পর্শ লাভ না করিলে রামমোহনের আবির্ভাব অরণ্যেরোদনে পর্যবসিত হইত বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী পাঠশালার পুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি এবং শ্রীরামপুর মিশনের সক্রিয় সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান হইতে বালক বালিকার উপযোগী যে সমস্ত পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, একদা তাহা তরুণ শিক্ষার্থীর চিত্তোন্মেষে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিল। ষোল জন য়ুরোপীয় এবং আট জন দেশীয় ব্যক্তিকে লইয়া যে কমিটী গঠিত হয়, তাহার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, তারিণীচরণ মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সরল বাংলা গদ্যে পুস্তিকা লিখিয়া ও অনুবাদ করিয়া শিশুশিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

স্কুলবুক সোসাইটীর এক বৎসর পরে কলিকাতা স্কুল সোসাইটী (১৮১৮) স্থাপিত হয় প্রধানতঃ পাঠশালা সম্প্রসারণের জন্য স্কুলবুক সোসাইটী এক বৎসরের মধ্যেই এমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করে যে উক্ত প্রতিষ্ঠান-প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকাগুলি ঠিকমত প্রচার করিবার জন্য উপযুক্ত পাঠশালার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সেই জন্যই ডেভিড হেয়ার ও রাধাকান্ত দেবের যুগ্ম সম্পাদককে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সংস্থার সহায়তায় ঠনঠনিয়া ও চাঁপাতলায় দুইটি অবৈতনিক আদর্শ বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। পরে ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে এই দুইটি বিদ্যালয় একত্রে মিলিয়া গিয়া ডেভিড হেয়ার স্কুল নামে আখ্যাত হয়। ইংরাজী ধরনের বিদ্যা বিতরণ করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব অল্প নহে।

এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন ডিরোজিও সাহেবের প্রবর্তনায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে। এই প্রতিষ্ঠানটি একদা শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তরুণ বাঙালী ছাত্রগণ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং ইহাতে চিন্তাগ্রাহ্য যে-কোন বিষয় সম্বন্ধেই অসঙ্কোচে আলোচনা করিতেন। এমনকি সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে বিপ্লবী মনোভাবও ইহাতে স্থান

পাইত। ইহার মূলে ছিলেন হেয়ার ও ডিরোজিও—ইঁহাদের ধর্মবিরহিত মানবতাদ একদা তরুণ বাঙালীকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'তেও য়ুরোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান এবং বঙ্গদেশীয় সমাজ-জনপদের বিষয় আলোচিত হইত। রামমোহন-অনুচর তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছিলেন ইহার প্রাণস্বরূপ। হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্রগণের নেতৃস্থানীয় ছিলেন তারাচাঁদ; তাঁহারই নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। তরুণ ছাত্রগণ সকলেই তারাচাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেন বলিয়া হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসন ইঁহাদের নাম দিয়াছিলেন 'চক্রবর্তী ফ্যাকসন্'। ইঁহারা এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে তরুণ বাঙালীকে বিপ্লবী মনোভাবে দীক্ষা দান করেন। এই সংস্থার সদস্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একদা ইহার এক অধিবেশনে বৃটিশ সরকারকে তীব্রতম ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, যাহার ফলে রিচার্ডসন সাহেব ইঁহাদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

এই সময়ে আরও একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, নানা দিক দিয়া যাহার তাৎপর্য অসাধারণ। ১৮২৩ সালে "এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জনার্থে এক সমাজ স্থাপন" হয়।[২৭] ইহাই হইল সুপ্রসিদ্ধ, 'গৌড়ীয় সমাজ'। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র (১৮১৫) আট বৎসর পরে স্থাপিত এই সভায় তৎকালীন কলিকাতার বিত্তবান ও সংস্কৃতির নেতৃগণ যোগ দিয়াছিলেন; শুধু রামমোহন এই প্রতিষ্ঠান হইতে দূরত্ব রক্ষা চলিতেন। মূলতঃ হিন্দুর দেশাচার ও সনাতন তত্ত্বকে স্বীকার করিয়াই ইহার সূচনা হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভেই রসময় দত্ত বলিয়াছিলেন, "এই সভায় যদি কেবল বিদ্যাবিষয়ের উপায়ান্তর চেষ্টা করা যায় তবে আমি ইহার মধ্যে আছি আর যদি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে ও আমারদিগের ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা কেহ করে তাহার উত্তর লেখ তবে আমি তাহার মধ্যে নহি।"[২৮] রাধাকান্ত দেব, উমানন্দন ঠাকুর, কাশীনাথ মল্লিক, রামকমল সেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সনাতনপন্থী ও প্রগতিবাদী—উভয় শ্রেণীর বাঙালী ইহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। ইহাতে "সমাজবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন"[২৯] হইত, সমাজের উন্নতিজনক বিষয় আলোচিত হইত, বেদপাঠের ব্যবস্থাও ছিল[৩০],—বোধ হয় রামমোহন ও তাঁহার 'আত্মীয় সভা'র অনুসরণে। হিন্দু কলেজের উগ্র সমাজবিদ্রোহিতার সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটি স্থিতধী ও প্রাচীন

ঐতিহ্যে আস্থাশীল শক্তিশালী সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল ; নবজীবন কোথাও এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন, কোথাও বা গৌড়ীয় সমাজের মধ্য দিয়া আপনাকে সহস্র শাখায় প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল।

রামমোহনেব কলিকাতায় আগমন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার তিরোধান পর্যন্ত মোট বিশ বৎসবেব সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, হিন্দু কলেজের ভাবধারা এবং ডিরোজিওব বিদ্যুৎস্পর্শ তরুণ বাঙালীর মনের প্রান্তে যে বিপুল পবিবর্তন সূচিত করিতেছিল, তাহাবই ফলে নানা সভাসমিতির উদ্ভব হইল। ১৮১৫ সালে রামমোহন 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করিয়া আলাপ-আলোচনায় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার প্রায় একযুগ পবে ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে 'ব্রহ্ম সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় ; ইহাবও মূলে ছিল রামমোহনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। রামমোহনের অধিনায়কত্বে গঠিত এই দুই সভার কথা ছাড়িয়া দিলেও, ঐ সময়ে আবও অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যাহার দ্বাবা রামমোহনের আদর্শই নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে কার্যকবী হইয়াছিল। পূর্বে গৌড়ীয় সমাজের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ; আলোচ্য অনুচ্ছেদে আবও কয়েকটি সভাসমিতি ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা যাইতেছে।[৩১]

১। বঙ্গহিত (জুলাই, ১৮৩০)

২। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোসিয়েশন (সেপ্টেম্বর, ১৮৩০ ; স্কুল কলেজের ছাত্রদেব দ্বাবা গঠিত)

৩। জ্ঞানসন্দীপন সভা (অক্টোবর, ১৮৩০)

৪। চোববাগান ডিবেটিং ক্লাব (নভেম্বর, ১৮৩০)

৫। বঙ্গরঞ্জিনী (ডিসেম্বর, ১৮৩০ ; সম্পাদক—ঈশ্বর গুপ্ত)

৬। ধর্মসভা (১৮৩০ ; সম্পাদক—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

৭। সর্বতত্ত্বদীপিকা (জানুয়ারী, ১৮৩৩ ; ইহাতে প্রধানতঃ বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষাব উন্নতিকল্পে আলোচনা হইত।)

উল্লিখিত সভাগুলিব মধ্যে বিশেষভাবে 'ধর্মসভা'র নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কারণ রামমোহন ও নব্যতন্ত্রকে বাধা দিবার জন্যই রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সনাতনপন্থী হিন্দুগণ এই সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। রামগোপাল মল্লিক, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, হরিমোহন

ঠাকুর, কাশীনাথ মল্লিক, মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, আশুতোষ দেব গোকুলনাথ মল্লিক, বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক, নীলমণি দেব প্রভৃতি কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ও বিত্তবান্ ব্যক্তিগণ এই সভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। অবশ্য ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।[৩২]

সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপিত এই সমস্ত সভাসমিতির পরিচয় লইলে দেখা যাইবে যে, রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর মনে যে জিজ্ঞাসা ও আদর্শ-সঙ্কটের সমস্যা উদিত হইয়াছিল, তাহার ফলস্বরূপ এই সমস্ত সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা। তখন বাঙালীর নবজাগ্রত চিত্ত সহসা ১৯শ শতাব্দীর প্রশ্নমুখর উপলতটে আছড়াইয়া পড়িয়াছে নবজাগরণের স্পর্শে তন্দ্রাতুর সমাজদেহ কেবল জাগিয়াছে মাত্র; সেই চিত্তজাগৃতি ও আত্মবীক্ষণের মুহূর্তে কলিকাতার বাঙালীসমাজ নব নব জীবন-বোধের দ্বারা আলোড়িত হইতেছিল। রামমোহনের পূর্ববর্তী যুগে ১৯শ শতকের একেবারে প্রারম্ভে বাঙালী কলিকাতায় বিত্ত উপার্জন করিত, কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য করিত, ইংরাজ বণিকের মুৎসুদ্দি হইতে, পিত্রুস, সেরবার্ণ সাহেবের বিদ্যালয়ে[৩৩] সামান্য কিছু ইংরাজী শিখিত; আর অবসর সময়ে কবির দল বাঁধিয়া, পাঁচালী গাহিয়া 'সুর্তি-লাটি' (অর্থাৎ লটারী) খেলায় মাতিয়া নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কাল যাপন করিত। কিন্তু এই শতকের প্রথমেই পশ্চিম সমুদ্রতীর হইতে ঝঞ্ঝাবায়ু বহিয়া আসিল, পুরাতন জীবনের ভগ্ন খিন্ন গ্রন্থি বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল; নবজীবনের বজ্রস্তনিত আকাশ-তলে দাঁড়াইয়া রামমোহনের সমকালীন বাঙালী আপনাকে আবিষ্কার করিল। কবি ঈশ্বর গুপ্ত এই সময়ের বাঙালী-সমাজ বিবর্তন সম্বন্ধে সংক্ষেপে যথার্থই বলিয়াছেন:

"এই ক্ষণে ঘুড়ির লক্ দাবার ছক্, পাশার পাট্টী, ইয়ারের ফক্টী, তবলার খিড়িং, সেতারের পিড়িং, গেরাবুর ছক্কা, লোটন লক্কা, ইত্যাদি শুদ্ধ প্রাচীনদিগের আমোদের অবসান হইয়াছে। যুবকেরা বেকনের এসে, সেক্সপিয়রের প্লে, কালিদাসের কাব্য, গীতার শ্লোক, শ্রুতির অর্থ এবং বস্তু নির্ণয় প্রভৃতি সমুদয় সদ্বিষয়ের আলোচনা করিতেছে।"

—সংবাদ প্রভাকর, ১৩ মার্চ্চ, ১৮৫৪

এই আত্মদ্বন্দ্ব, চিত্তবিরোধ, ইতিহাসের তাৎপর্য সম্বন্ধে সংশয়,—তৎকালীন সভাসমিতির পরিচয়ের মধ্যেই নিহিত আছে। এই সময়ে রামমোহন এ্যাডাম সাহেবের ইউনিটারিয়ান চার্চে মিলিত হইতেছেন, 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করিতেছেন, বেদান্ত কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন (১৮২৫); সর্বশেষে স্থাপিত হইল 'ব্রহ্মসভা' (১৮২৮)। হিন্দুকলেজ এবং আধুনিক জীবনের

বার্তাবহ সভাসমিতিগুলির (বঙ্গহিত, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু এ্যাসোসিয়েশন, জ্ঞান-সন্দীপন সভা ও বঙ্গরঞ্জিনী) সাহায্যে বাঙালী নূতন জীবনাদর্শ সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল, ডিরোজিওর বিপ্লবী ভাবধারা ও বিশুদ্ধ জ্ঞান-মার্গের আধার এ্যাকাডেমি এ্যাসোসিয়েশন হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্রদিগকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। অপর দিকে সতীদাহ সম্বন্ধে দলাদলি চলিতেছে, অবসিতপ্রায় জীবনকে জাতির জীর্ণ কীলকের সহিত বাঁধিয়া রাখবার চেষ্টা চলিতেছে,—চাঁদা তুলিয়া ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে শুধু সতীদাহ প্রথা কায়েম করিবার জন্য।[৩৪]

উল্লিখিত সভাসমিতির মধ্যে একমাত্র ধর্মসভা ও আত্মীয়সভা ভিন্ন অন্য কোথাও ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হইত না। বরং ডিরোজিওর ছাত্র এবং শিষ্যগণ এ্যাকাডেমি এ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য সভায় প্রচলিত হিন্দু-ধর্মের প্রচণ্ড বিরোধিতা করিতেন, যে কোন ধর্মের প্রতি তাঁহাদের ছিল অন্তহীন বিরাগ। ১৯শ শতকের য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ তাঁহাদিগকে অধ্যাত্ম চেতনার প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল। এই সভাসমিতিগুলির মধ্যে তৎকালীন নব বঙ্গের চিত্ত স্পন্দন অনুভূত হইবে, এবং সকলের অন্তরালে রামমোহনের যুক্তিবাদ ধীরে ধীরে তরুণ মনে প্রভাব সঞ্চার করিতেছিল, তাহা বুঝা যাইবে।

নবজীবনের বাণী কিভাবে ধীরে ধীরে সমাজে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, দু' একটি সমসাময়িক ঘটনায় তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। ১৮২২ সালে বাখরগঞ্জে জলপ্লাবনের ফলে প্রচুর ক্ষতি হয়, কলিকাতার ইংরাজ ও বাঙালীরা সমবেতভাবে চাঁদা তুলিয়া বন্যাক্লিষ্ট নর-নারীকে প্রেরণ করেন।[৩৫] ১৮২৪ সালে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কলিকাতায় এক কমিটী গঠিত হয়।[৩৬] নূতন জীবনের কলোচ্ছ্বাস যে সমাজে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার আর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সিংহবাহিনীর পূজা উপলক্ষে ১৮২৬ সালে স্বরূপচন্দ্র মল্লিক অযথা আড়ম্বরে অর্থ ব্যয় না করিয়া, "দুঃস্থ ঋণগ্রস্থ কারাগারস্থ অনেক লোককে অনেক অর্থ প্রদানপূর্বক মুক্ত করিয়াছিলেন।"[৩৭] শুধু সমাজের উচ্চস্তরে বা শিক্ষিত সমাজেই নহে, গণমানসেও যেন একটা অভিনব ভাবের বন্যা আসিয়াছিল। ১৮২৭ সালে কলিকাতায় ঠিকা বেহারাগণ সরকারী আদেশের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হইয়া পালকি বহিবার কাজ একেবারে বন্ধ রাখিয়াছিল। অবশ্য এই ঐক্যের পশ্চাতে তখনও কোন শ্রেণীসচেতন অধিকারবোধ জাগ্রত হয় নাই, নিতান্ত প্রাণধারণের

প্রেরণায় মরিয়া হইয়া দরিদ্র মানুষ চরম পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহা যে নবজীবনের প্রত্যুষ সূচনা, তাহাও স্বীকার্য।

॥ ৪ ॥

সমসাময়িক সাময়িকপত্রে বাঙালীর মনোভাব

১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিস্ময়াবহ ঘটনা—সংবাদপত্র প্রকাশ। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই বাঙালীর আত্মজাগরণ এত দ্রুত হইতে পারিয়াছিল এবং রামমোহনের প্রতিভার কিয়দংশ সার্থক সাংবাদিকতার লক্ষণাক্রান্ত ছিল বলিয়া তিনি তাঁহার আবির্ভাবের অত্যল্পকালের মধ্যেই বাঙলা দেশে একটা অভিনব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সাময়িক পত্রগুলির মধ্যেই ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের চিত্ত-বিস্ফোরক নিহিত ছিল, রামমোহনের প্রতিভা সেই বিস্ফোরকে দীপশলাকার কাজ করিয়াছিল। বাস্তবিক ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের এমন কিছু সৃষ্ট হয় নাই, যাহা নিঃসংশয়ভাবে সাহিত্যের ছাড়পত্র দাবী করিতে পারে। শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক, স্কুলবুক সোসাইটীর শিশুপাঠ্য পুস্তক-পুস্তিকা, ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটীর ঐ জাতীয় কিছু কিছু ক্ষীণকায় অনুবাদ, রামমোহনের যুধ্যমান বিতর্কিকা, ভবানীচরণের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুতীব্র কশাঘাত এবং কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের রামমোহন-বিদ্বেষী রচনায় আর যে কোন লক্ষণ থাক, সাহিত্য হিসাবে তাহাদের মূল্য নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু এই সাময়িকপত্রের মধ্যে তৎকালীন বাঙলা দেশের হৃদস্পন্দন অনুভব করা যাইবে।

বাঙলা দেশের প্রথম সাপ্তাহিকপত্র শ্রীরামপুর মিশনারীদের প্রবর্তনায় ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়; ইহাই সুবিখ্যাত 'সমাচার দর্পণ'। সম্ভবতঃ ইহার দুই-এক মাস পূর্বে 'দিগ্‌দর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ঐ মিশনারীদের প্রযোজনায় প্রকাশিত হয়। ইহা খ্রীস্টানধর্ম প্রচারকামী মিশনারীদের পত্রিকা; কাজেই পরধর্মের, বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ ইহার প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। ইহার প্রতিবিধানকল্পে কলিকাতার শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায়

বাংলা সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হইলেন। লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ্য হইল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাচাঁদ দত্ত এই অভিলাষে 'সম্বাদ কৌমুদী' নামক এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২১ অব্দ)। স্বয়ং রামমোহন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ইহাতে নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখিয়া মিশনারীদের কটূক্তির যথোপযুক্ত জবাব দিতেন। 'সম্বাদ কৌমুদী'র পৃষ্ঠায় রামমোহন সর্বপ্রথম গণনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন, ইতিপূর্বে তাঁহার গ্রন্থে শাস্ত্রসম্পর্কিত যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কবিতর্ক থাকিত তাহা জনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরে ছিল। কিন্তু 'সম্বাদ কৌমুদী'র আলোচনা যেমন সমাজ-বিপ্লবী, তেমনি প্রচণ্ড গতিশীল। সতীদাহ-প্রথা নিরোধকল্পে তিনিই এই পত্রিকায় যোদ্ধৃবেশে অবতীর্ণ হন এবং নিস্তরঙ্গ বাঙলা দেশে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যা সৃষ্টি করেন। তাঁহার এই সমাজবিপ্লবী মনোভাবের জন্য অনেকেই এই পত্রিকার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন, ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী' ত্যাগ করিয়া ১৮২২ সনের ৫ই মার্চ 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন এবং এই পত্রিকা রামমোহন বিরোধী দলের মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৮১৮ হইতে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান সাময়িকপত্রগুলি প্রকাশিত হয়।

১। দিগ্‌দর্শন (১৮১৮)— মাসিক
২। সমাচার দর্পণ (১৮১৮)— সাপ্তাহিক
৩। বাঙ্গাল গেজেট (১৮১৮)— ঐ
৪। ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১)— ঐ
৫। সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১)— ঐ
৬। পশ্বাবলী (১৮২২)— মাসিক
৭। সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২)— সাপ্তাহিক
৮। সম্বাদ তিমির নাশক (১৮২৩)— ঐ
৯। বঙ্গদূত (১৮২৯ — ঐ
১০। সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১)— ঐ
১১। জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১)— ঐ
১২। সম্বাদ রত্নাকর (১৮৩১)— ঐ
১৩। জ্ঞানোদয় (১৮৩১)— মাসিক

১৪। বিজ্ঞান সেবধি (১৮৩২) ঐ

১৫। দলবৃত্তান্ত (১৮৩২)— সাপ্তাহিক

১৬। সংবাদ রত্নাবলী (১৮৩২)— ঐ

১৭। বিজ্ঞান সারসংগ্রহ (১৮৩৩)— পাক্ষিক

—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাংলা সাময়িকপত্র

১৮১৮ হইতে ১৮৩৩, মোট পনের বৎসরের মধ্যে যে পঁচিশখানি (এখানে প্রধান পত্রিকাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে) সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে উল্লিখিত সতেরখানি পত্রিকা বাঙলা দেশে যে নবতম ভাবধারা আনয়ন করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পত্রিকা কয়টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইলে বাঙলা দেশের তৎকালীন মনোভাব কোন্ দিগন্তে কি মেঘ সঞ্চার করিতেছিল, তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

এই পনের বৎসরের মধ্যে বাঙলা দেশের উপর দিয়া নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। রামমোহন সেই ঝড়ের দিশারী হইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। ধর্মকলহ ও ধর্মসংরক্ষণ প্রবৃত্তি এই যুগের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। ইতিপূর্বে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালীর একটা স্থাবর সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং শ্রীরামপুরের মিশনারীদের আক্রমণমূলক ব্যবহারে কলিকাতার হিন্দুসমাজে তাহার প্রতিক্রিয়া জাগিতেছিল। স্বসমাজ ও সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষাকল্পে বাঙালীর মধ্যে যে একটা প্রতিরোধমূলক আত্মরক্ষাবোধ জাগ্রত হইল, রামমোহন তাহাতেই বল সংযোগ করিলেন। রামমোহনের আবির্ভাব, সংবাদপত্র পরিচালনা এবং মিশনারীদের পবতপ্রমাণ মূঢ়তার বিরুদ্ধে তাঁহার দ্বারা যুক্তির শাণিত অস্ত্র প্রযুক্ত হইবার ফলে কলিকাতায় বাঙালী হিন্দুর মধ্যে গোষ্ঠী-চেতনা ফিরিয়া আসিল। যদিও জাতিপ্রেম তখন সুদূরপরাহত ছিল, তথাপি হিন্দুসমাজকে খ্রীস্টানী আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। রামমোহন মিশনারীদের আক্রমণ হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে গিয়া সহসা বহুকালাশ্রিত লোকাচারের প্রতি বিমুখ হইলেন এবং হিন্দুর শাস্ত্র-সংহিতাকে সংস্কারমুক্ত যুক্তির দ্বারা পরখ করিতে লাগিলেন। ফলে তাঁহার সহযোগী ভবানীচরণের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ এবং তাহার ফলে পথভেদ অনিবার্য হইয়া পড়িল। এইভাবে ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দ হইতেই কলিকাতা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে ধর্মকলহ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিতে লাগিল।

শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়, সমাচার দর্পণ, গসপেল ম্যাগাজিন, 'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' প্রকাশ করিয়া খ্রীস্ট-মহিমা প্রচারচ্ছলে পরধর্ম-দ্বেষণা শুরু করিলেন এবং তাহারই প্রতিবাদ করিতে গিয়া কলিকাতার হিন্দুগণ 'ব্রাহ্মণসেবধি' 'সম্বাদ কৌমুদী' 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিপ্লবী রামমোহনের দ্রুত ধাবমান ভাবধারার দুর্নিবার গতিবেগ ও প্রজ্জ্বলন্ত প্রাণবহ্নির উত্তাপ রক্ষণশীল দল সহিতে পারিলেন না, তাঁহারা তাঁহার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ করিলেন এবং একযোগে মিশনারীর হিন্দুধর্ম বিদ্বেষ এবং রামমোহনের অপৌরাণিক মত ও বৈদান্তিক একেশ্বরবাদের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। রামমোহনের সতীদাহনিরোধ মতবাদের বিরুদ্ধে কটু প্রতিবাদ উত্থিত হইল। বলা বাহুল্য রামমোহনের প্রতিবাদীরা যেমন সংখ্যায় ছিলেন প্রচুর, তেমনি ছিলেন বিত্তবান্। এই ধর্মকলহে কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করিল ; ভালমন্দ নির্বিশেষে যাহা কিছু হিন্দু নামে পরিচিত, দেশাচার, লোকাচার—যাহাই হোক না কেন, সব কিছুকেই পরম আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিবার বাসনা জাগ্রত হইল। রামমোহনের প্রতিবাদীরা কালসমুদ্রের তরঙ্গ গণনা করিতে পারেন নাই। ঈশাণকোণে ক্রমসঞ্চীয়মান মেঘ দেখিয়াও তাহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন। এক কথায়, তাঁহারা প্রচলিত সংস্কারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া 'কমঠ বৃত্তি' অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ সমস্তই ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯শ শতাব্দীর যে জাগরণ, তাহা প্রধানতঃ হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুত্থান ; রামমোহনের প্রতিবাদী ভবানীচরণ, রাধাকান্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণ হিন্দুর প্রচলিত সংস্কারকে একমাত্র অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন ; ইহার দ্বারা স্বাজাত্য সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠাই সূচিত হইতেছে। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ প্রধানতঃ নব্য হিন্দুসংস্কৃতির পুনরুত্থান বলিয়াই বিবেচিত হইতে পারে। যদিও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর মানস-জাগৃতির ক্ষেত্রে নব নব বীজ বপন করিয়াছিলেন, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—সকলেই হিন্দুধর্মের চিরকালীন সত্তাটিকেই যুগোপযোগী করিয়া বাঙালীর চিত্তলোকে নবজীবন-প্রত্যয় সৃষ্টির প্রয়াস করিয়াছিলেন। রামমোহনের সমকালে তাঁহার বিরুদ্ধে যাঁহারা অস্ত্রধারণ করিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া নস্যাৎ করিয়া দিলে ঐতিহাসিক কালবিবর্তনের ধারাকেই

অস্বীকার করা হইবে। তাঁহারা নবজীবনের বার্তা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য সব সময়ে অনুধাবন করিতে পারেন নাই। ভবানীচরণ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন[৩৯], রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সতীদাহের পক্ষপাতী হইলেও নারীশিক্ষার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন।[৪০] সুতরাং ইঁহাদিগকে প্রগতি-বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সে যাহা হউক, এই সময়ে ধর্মকলহের প্রধান বাহন হইয়াছিল সাময়িক পত্র; অবশ্য তখনও রাজনৈতিক উত্তাপ পত্রিকাগুলিকে ইন্ধনে পরিণত করিতে পারে নাই। তবে কিছু কিছু প্রতিবোধমূলক রাজনৈতিক চেতনারও আভাস পাওয়া যাইতেছে। ১৮২৩ সনের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য যে সমস্ত অপমান-জনক আইন পাস হয়, তাহার প্রতিবাদকল্পে রামমোহন তাঁহার ফারসী সংবাদপত্র 'মীরাৎ উল-আখ্‌বার' বন্ধ করিয়া দেন। সংবাদপত্র নিরোধক এই আইন জনসাধারণ বা কোন কোন সম্পাদকের মনে বিরূপতা সৃষ্টি করিলেও তখনও প্রকাশ্যে কোন বিদ্রোহ ধূমায়িত হয় নাই। এই আইন ১৮২৩-১৮৩৫ সন পর্যন্ত বলবৎ ছিল; পরে ১৮৩৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর স্যার চার্লস্ মেটকাফ ইহা তুলিয়া দেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে (১৮২৩-১৮৩৫) অন্ততঃ বিশখানি মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা সরকারী বন্ধনরজ্জু গলদেশে ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। একা রামমোহন এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮২৩ সনের মার্চ মাসে উক্ত আইনের ব্যাপার পূর্বাহ্ণে জানিতে পারিয়া উহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করেন। সেখানে ব্যর্থ হইয়া ১৮২৫ সনে সপারিষদ সম্রাট চতুর্থ জর্জের নিকট আবেদন করেন।[৪১] সফল হন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রামমোহনের একক প্রয়াস ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁহার সহিত সহযোগিতা করে নাই। তখন ধর্মনৈতিক আন্দোলন জাতির সদ্য-জাগ্রত মনকে এমনভাবে আঘাত করিয়াছিল যে, রাজ-নৈতিক চেতনার আবির্ভাব ঘটিবার অবকাশ ঘটে নাই। অবশ্য ধর্মনৈতিক আন্দোলনের মূলে যেমন ছিল রক্ষণশীল প্রবৃত্তির তাড়না, তেমনি আবার সংস্কার-মুক্ত যুক্তিবাদও শিক্ষিতচিত্তে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। 'সম্বাদ সুধাকর' (১৮৩১) নামক সাপ্তাহিক পত্র সম্ভবতঃ রামমোহনের প্রভাবেই উদারপন্থী মত গ্রহণ করিয়াছিল। 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১) সাপ্তাহিক পত্রিকা নব্যতন্ত্রের মুখপত্র হইয়াছিল; ডিরোজিওর শিষ্যগণ এই পত্রিকার সাহায্যে যে

নব্য মত প্রচাব করিতে আরম্ভ করিলেন, বামমোহন তাহার আদি প্রবক্তা। যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা এব' লোকস'স্কাব হইতে চেতনার মুক্তিলাভ, ইহাই হইল এই যুগধর্মেব প্রধান উদ্দেশ্য।

ধর্মীয় আন্দোলন তৎকালীন গণচেতনাকে একটা প্রবল উচ্ছ্বাসে উৎক্ষিপ্ত কবিয়াছিল, একদিকে ধর্মসভা, সমাচাব চন্দ্রিকা, ভবানীচবণ ও রাধাকান্ত দেব,—অপবদিকে বামমোহন, সম্বাদ কৌমুদী, জ্ঞানান্বেষণ, ডিবোজিওর শিষ্যগণ। এই চিত্ত-সঙ্কট ও আদর্শ দ্বন্দ্বেব মধ্যে বাঙালীব ভাবাদর্শ আন্দোলিত হইতেছিল। অবশ্য শুধু ধর্মনৈতিক আন্দোলনই নহে, আধুনিকতাব যে প্রধান লক্ষণ—জিজ্ঞাসা, জীবনবহস্য মন্থনেব চেষ্টা এবং মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধির উপব নিষ্ঠা,—তাহা আবও কয়েকখানি পত্রিকাব মধ্যে অত্যন্ত অস্পষ্ট আকারে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। এই জাতীয় পত্রিকাব মধ্যে শ্রীবামপুব মিশন প্রকাশিত প্রথম মাসিক পত্র দিগদর্শন (১৮১৮) কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী প্রকাশিত পশ্বাবলী (১৮২২), বিজ্ঞান সেবধি (১৮৩২) ও বিজ্ঞানসাবস'গ্রহেব (১৮৩৩) উল্লেখ করিতে পাবা যায়। দিগ্‌দর্শনেব প্রথম সংখ্যাব সূচী পাঠ কবিলেই দেখা যাইবে যে, মিশনারীগণ নিছক ধর্মীয় চেতনার বশবর্তী হইয়া লোকহিতে ব্রতী হইলেও তাঁহারাই সর্বপ্রথমে বিশ্বসম্বন্ধে নানা কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী উল্লেখ করিয়া বাঙালীর কূপমণ্ডূক চিত্তকে জগৎ ও জীবনের অপাব রহস্য সম্বন্ধে অবহিত করিতে চাহিয়াছিলেন। নিম্নে 'দিগ্‌দর্শনে'র দুই সংখ্যাব সূচী উল্লেখ করা যাইতেছে:—

প্রথম ভাগ

১। আমেরিকাব দর্শন বিষয়, ২। হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ, ৩। হিন্দুস্থানের বাণিজ্য, ৪। বলুন দ্বাবা সাদলব সাহেবের আকাশ গমন, ৫। মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র বায়েব বিববণ, ৬। শঙ্কর তবঙ্গেব কথা।

দ্বিতীয় ভাগ

১। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা, ২। ভারতবর্ষে জন্মে অথচ ইংলণ্ডে না জন্মে যে যে বৃক্ষ

তাহারদের বিবরণ, ৩। ইংলণ্ডের বাদশাহের পৌত্রীর মৃত্যুর বিবরণ, ৪। বাষ্পের দ্বারা নৌকা চলানোর বিষয় ৫। কৌমিল্লার পাঠশালার বিষয়, ৬। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের কথা।[৪২]

বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকাগুলি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী অথবা পাদ্রী সাহেবগণ সম্পাদনা করিতেন। 'পশ্বাবলী'র প্রথম পর্য্যায় পাদ্রী ল'সন সম্পাদনা করেন এবং ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স বাংলায় অনুবাদ করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের পশ্বাবলী (১৮৩০—১৮৪৪) সম্পাদনা করেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র। 'বিজ্ঞান সারসংগ্রহে'র (১৮৩৩) অন্যতম পরিচালক হিসাবে 'শ্রীডবলিউ. এন্. উলেস্টন' সাহেবের নাম রহিয়াছে। 'বিজ্ঞান সেবধি'র (১৮৩২) প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এইচ. এইচ. উইলসন। স্বল্পশিক্ষিত দেশবাসী যাহাতে ভূগোল ও বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারেন, প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়। য়ুরোপ হইতে সদ্য-আনীত বিরাট বিশ্বের বিবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র রহস্য প্রধানতঃ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া বাঙালীর মনোলোকে স্থান পাইল। এই পর্যায়ের (১৮১৮—১৮৩৩) সাময়িক সাহিত্যের একপ্রান্তে রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), আর একপ্রান্তে উইলসনের 'বিজ্ঞান 'সেবধি' (১৮৩২)। প্রথমে ধর্মকলহ লইয়া যাহার সূচনা, পরে রামমোহন-ডিরোজিওর শিষ্যসম্প্রদায় ও তাঁহাদের দ্বারা স্থাপিত 'জ্ঞানান্বেষণের' (১৮৩১) সাহায্যে জীবনচেতনার অপার বিস্ময় আবিষ্কার। ধর্ম সংক্রান্ত আচার-বিচার ও প্রথা-সর্বস্বতা ত্যাগ করিয়া মানবকল্যাণ-বোধের দৃষ্টিকোণ হইতে জীবনকে দর্শন করা—সংবাদপত্রের প্রথম পর্যায়ের মধ্যে বাঙালীর মানসসংস্কৃতিগত এই পরিচয়টুকুর আভাস পাওয়া যাইতেছে। ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর এই সময়ে প্রকাশিত হইলেও রামমোহনের যুগের পরবর্তী কালে এই পত্রিকা বাঙালীর রুচিকে শাসন করিয়াছে, নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টিতেও আত্মদান করিয়াছে। (ঈশ্বর গুপ্ত ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রসঙ্গে গুপ্তকবি ও সংবাদ প্রভাকর সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।)

পাদটীকা

১। রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে রামমোহন ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খ্রীঃ) বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতেও এই ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দই স্বীকৃত হইয়াছে।

২। Shibnath Shastri—*History of Brahmo Samaj*, Vol 1, p. 79.

৩। Ramesh Ch Majumder and others—*An Advanced History of India*, PP. 698—728

৪। *Ibid* pp. 729—763

৫। *Ibid*, p. 767

৬। *India Gazette* Quoted from Dr Bimanbihari Majumder's *History of Political Thought in India*, pp 186-87.

৭। *Ibid*, p, 193

৮। Majumder & Others—*An Advanced History of India*, p.800.

৯। Dr Bimanbihari Majumder — *op cit*

১০। Majumder & others—*op cit*, pp 809-10

১১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা

১২। ঐ, পৃ ১৮২

১৩। ঐ. পৃ ১৮৩-৮৪

১৪। ঐ, পৃ ১৮৬

১৫। ঐ, পৃ ১৭৬—৭৮

১৬। ঐ, পৃ ১৮৮

১৭। ঐ, পৃ ৩৩৯

১৮। ঐ, পৃ ২৫৬

১৯। Shibnath Shastri-*op. cit.* pp 12-13

২০। সমাচার দর্পণ, ১৭ই অক্টোবর, ১৮১৯

২১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ ১৮৩

২২। ঐ, পৃ ১৮৬

২৩। ঐ

২৪। ঐ

২৫। C. Lushington—*The History, Design and Present State of the Religious, Charitable and Benevolent Institutions in Calcutta and its vicinity.*

২৬। Bimanbihari Majumder *op cit*,

২৭। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ ৯

২৮। ঐ, পৃ ১০

২৯। ঐ, পৃ ১২

৩০। ঐ, পৃ ১৩

৩১। ঐ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

৩২। ঐ, পৃ ৩০৬

৩৩। Peary Chand Mitra—*Life of David Hare.*

৩৪। ১৮৩০ সালে ২৩এ জানুয়ারী ধর্মসভার এক অধিবেশনে বেন্টিংকের সতীদাহ নিরোধের প্রতিবাদ করিয়া বিলাতে পার্লামেন্টে আরজি পাঠাইবার জন্য সভাস্থলেই ৯১২৬০৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল।—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, পৃ ৩০০—৩০৩

৩৫। ঐ, পৃ ১৪৯

৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ ১৫০

৩৭। ঐ, পৃ ১৫২

৩৮। ঐ, পৃ ৩৪৪-৪৫

৩৯। ভবানীচরণ শ্রীভাগবত, মনুসংহিতা, উনবিংশতি সংহিতা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথের 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়' নামক পুস্তিকার পৃ ৩১ দ্রষ্টব্য।

৪০। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—রাধাকান্ত দেব

৪১। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পৃ, ৪২০

৪২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙলা সাময়িক পত্র, পৃ ৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

রামমোহনের প্রভাব ও বাংলার নবজাগৃতি

রামমোহনের প্রবর্তনায় বাঙলার যে নবজাগরণ ঘটিল, তাহাকে পুনর্জাগরণ বলা যাইতে পারে। প্রায় সাত শত বৎসর সেমীয় শাসনের ফলে বাঙলার প্রাণরস, সংস্কৃতির ধারা ও মননশীলতা শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। মহাপ্রভু হইতেছেন এই যুগের ঊষর মরুতলে প্রবাহিত নির্ঝর। খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে মুঘল শাসনের অব্যবহিত পূর্বে বাঙলা দেশ চৈতন্য-ভাবাদর্শের পাবনী স্পর্শে বহুকালের নিদ্রাতন্দ্রা ত্যাগ করিয়া জীবন-উল্লাসের অসহ ভাবোচ্ছ্বাস উপলব্ধি করিয়াছিল। ইহাই বাঙালীর প্রথম রেনেসাঁস বা পুনর্জীবন। তারপরে মুঘল শাসনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার তপ্তস্পর্শে বাঙালীর জীবন ও সাধনা ধারা ধীরে ধীরে ক্ষীণতর হইতে আরম্ভ করে এবং ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে ইহা গতিশক্তি হারাইয়া রুদ্ধতোয় পল্বলে পর্যবসিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাবলী যে বাঙালীর মনোজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।[1] ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে[2] কলিকাতায় রামমোহনের আবির্ভাব হইবার পর হইতে এই নগরী নূতন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইল। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে ১৯শে নভেম্বর রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন।[3] মোট ষোলবৎসর তিনি স্থায়িভাবে কলিকাতায় বসবাস করেন এবং এই অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি বাঙলার মধ্যযুগীয় চেতনায় বজ্র হানিয়া একক প্রচেষ্টার দ্বারা যে নবযুগের সৃষ্টি করিলেন, তাহা ১৯শ শতকের য়ুরোপের রেনেসাঁস-স্থানীয়। রামমোহনের প্রভাবে বাঙালী যেমন একদিকে তাহার অতীত ঐতিহ্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিল; তেমনি আবার সমকালীন য়ুরোপের জীবনাদর্শ উপলব্ধি করিয়া নবজীবনের দ্বার-প্রান্তে উপনীত হইল। রামমোহন সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র বলিয়াছেন :

"He was by nature one of those who lead, not one of those who follow, —one of those who are in advance of, not of those who are behind their age."

কিশোরীচাঁদের এই উক্তি রামমোহনের যথার্থ পরিচায়ক। এই যুগমানবের বিস্ময়কর প্রভাবের ফলেই বাঙালী ১৯শ শতকের প্রথমার্ধে নবজীবনবোধ লাভ করিতে পারিয়াছিল।

॥ ১ ॥

রামমোহনের রচনাবলী

বাঙালীব মনোজগতে বামমোহনের প্রভাব এবং তাঁহার মনোধর্মের স্বরূপ আবিষ্কাব করিতে হইলে তাঁহার বাংলা রচনাবলীর মধ্যেই উহার তাৎপর্য অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাঁহার ইংরাজী রচনার সংখ্যাও প্রচুর।[৫] তবে বর্তমান প্রসঙ্গে প্রধানতঃ তাঁহার বাঙলা গ্রন্থগুলিকেই আলোচনায় গ্রহণ করিতে হইতেছে। এখানে প্রথমেই আমাদিগকে রামমোহনের গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ও প্রবণতা সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। রামমোহন সাহিত্যিক ছিলেন না তাঁহার বাংলা ইংবাজী—কোন রচনারই প্রেরণার মূলে সাহিত্যিক ভাবাবেগ ছিল না, লোকহিতৈষণাই ছিল তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহার গদ্য রচনা বহুস্থলে শ্রুতিসুখকব নহে, সারস্বত গুণেও ঋদ্ধ নহে। এবিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের উক্তিটি স্মরণীয়—

"দেওয়ানজী (অর্থাৎ রামমোহন) জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এ জন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।"[৬]

প্রমথ চৌধুরীব ন্যায় বাংলা গদ্যের সার্থক শিল্পী বলিয়াছেন, "সে লেখা জলবত্তরল হয়েছে"।[৭] কিন্তু রামমোহনের ভাষার মধ্যে যতই 'জলবত্তারল্য' থাক না কেন, সাহিত্যিক বাগ্‌ভঙ্গিমা ও রচনাশৈলীর অভিনবত্ব তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। তাহার কারণ সহজেই অনুমেয়। নব্যন্যায়ের সার্থক উত্তরপুরুষ রামমোহন ষোল বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় শুধু তর্ক করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, বিশ্লেষণ করিয়াছেন, পরমত খণ্ডন ও স্বমত প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার ভাষার প্রধান গুণ বোধগম্যতা, সারল্য ও ঋজুতা;—তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জাতীয় ভাষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

রামমোহনের বাংলা গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা অন্যূন তিরিশ ; ইংরাজী পুস্তিকার সংখ্যাও তদনুরূপ। অবশ্য ইহার অধিকাংশই প্রচার-পুস্তিকা, প্রতিবাদ বা প্রশ্নোত্তর জাতীয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র। তাঁহার বাংলা গ্রন্থ ও পুস্তিকা-গুলিকে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত করা যায় :

(ক) প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ

১। বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫)
২। বেদান্ত সার, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (১৮১৫)
৩। তলবকার উপনিষৎ, কেনোপনিষৎ (১৮১৬)
৪। ঈশোপনিষৎ (১৮১৬)
৫। কঠোপনিষৎ (১৮১৭)
৬। মাণ্ডূক্যোপনিষৎ (১৮১৭)
৭। গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮)
৮। মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯)

(খ) বিতর্ক ও বিচারমূলক রচনা

১। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬-১৭)
২। ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭)
৩। গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮)
৪। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮)
৫। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ, দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯)
৬। কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০)
৭। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০)
৮। ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ (১৮২১)
৯। চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২)
১০। পাদরি ও শিষ্য সংবাদ (১৮২৩)
১১। গুরু পাদুকা (১৮২৩)
১২। পথ্য প্রদান (১৮২৩)
১৩। কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার (১৮২৬)
১৪। সহমরণ বিষয় (১৮২৯)

এতদ্ব্যতীত তাঁহার 'প্রার্থনা পত্র' (১৮২৩), 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' (১৮২৬), 'ব্রহ্মোপাসনা' (১৮২৮), 'ব্রহ্ম সঙ্গীত' (১৮২৮), 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩, মৃত্যুর পর স্কুলবুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত) প্রভৃতি পুস্তিকাগুলি অল্লাধিক ধর্ম ও উপাসনা বিষয়ক রচনা। কেবল 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থখানি ভাষা শিক্ষা দিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল।

এই পুস্তক-পুস্তিকাগুলির বাহ্যিক আয়তন পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের আকার অতিশয় সংক্ষিপ্ত।[৮] রামমোহন স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য তার্কিকের বেশে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; যোদ্ধার বেশবাস সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, রামমোহন বাগ্‌বাহুল্য যথাসম্ভব বর্জন করিয়া অতিশয় পরিমিত বাক্যের সাহায্যে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ ও পরাভূত করিয়া আপন সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন; তাই তাঁহার ভাষা নিরাভরণ ও সংক্ষিপ্ত; এবং সেই জন্যই এই ভাষার মধ্যে সাহিত্যরসের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার সমসাময়িক অনেক লেখক তাঁহার অপেক্ষা ভাল গদ্য লিখিতে পারিতেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রত্যেকেই মনীষায় বা মননে রামমোহনের সমকক্ষ না হইলেও গদ্যরচনার গুণগত উৎকর্ষে তাঁহারা রামমোহনকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

তথাপি তিনি তার্কিকতার মূলসূত্রটি বাংলা গদ্যের মারফতে পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছিলেন। বিচারবিতর্কে প্রচুর পরিমাণে শাস্ত্র-সংহিতা উল্লেখ করিলেও আপ্ত বাক্য অপেক্ষা স্বাধীন ও মুক্তবুদ্ধির প্রতি তাঁহার ছিল আন্তরিক আকর্ষণ। য়ুরোপীয় জ্ঞানবাদ, ইসলামী মোতাজেলা সম্প্রদায় (পরে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য) এবং নব্যন্যায়ের পীঠস্থান বাঙলা দেশের তর্কবোধের ঐতিহ্যে লালিত হইয়া দক্ষিণে-বামে কিছুমাত্র না হেলিয়া তিনি ঋজু যুক্তির অনন্যনির্ভর শাণিত পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার অনুবাদ বহু স্থলেই আক্ষরিক ও মূলানুগ বলিয়া তাহা হইতে ভাষান্তরের জড়তা ঘুচে নাই। একটু উদাহরণ দিলেই একথা স্পষ্ট হইবে:

কঠোপনিষৎ:

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ। ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যং ॥ ১০ ॥

রামমোহন কৃত অনুবাদ :

প্রার্থনীয় যে কর্ম্মফল সে অনিত্য আমি তাহা জানি, যেহেতু অনিত্যবস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে নিত্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রাপ্ত হয়েন না ; কিন্তু অনিত্যবস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে অনিত্যবস্তু যে স্বর্গাদি ইহা প্রাপ্ত হয় এমং জানিয়াও আমি অনিত্যবস্তু দ্বারা স্বর্গফল সাধন যে অগ্নি তাহার উপাসনা করিয়া বহুকাল স্থায়ী যে স্বর্গ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।

দুরূহ উপনিষদের ভাষা তখনও বাঙলা গদ্যের মধ্যে সহজ সরল হইতে পারে নাই, সেইজন্য রামমোহন অনেক সময় অনুবাদের মসৃণতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই বিষয়ে আরও একটা কারণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। নিজ মতামত প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া রামমোহন প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং অনুবাদের যাথার্থ্যের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছিলেন। এই সামান্য ত্রুটি ছাড়িয়া দিলে রামমোহনই আধুনিক বিশ্বের কলমন্দ্রমুখর জীবন-বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং মধ্যযুগীয় বাঙালীকে তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়া আধুনিক যুগে স্থাপন করিয়াছিলেন। যুক্তির পারম্পর্য্য, বক্তব্য বিষয়ের স্পষ্টতা, আত্মনিষ্ঠা—সর্বোপরি সমস্ত আলোচনাকে জড়ত্বের বাহুপাশ হইতে উদ্ধার করিয়া একটা মননশীল তুঙ্গভূমিতে স্থাপন করিয়া রামমোহন বাংলা গদ্যকে নব-জীবনের বাহন করিয়া তুলিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের সাহিত্য-প্রতিভা উচ্চস্তরের ছিল সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার ন্যায় মনীষী ব্যক্তিও রামমোহনের সহিত লিপিযুদ্ধে চিত্তের উদারতা ও রুচির শুচিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।[৯] কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহার 'পাষণ্ড-পীড়নে' (পুস্তক) রঙ্গরসের যে লঘুতারল্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সাহিত্যিক মূল্য স্বীকার্য হইলেও তাঁহার রসরুচি সব সময়ে প্রাকৃত মনোভাবের স্থূল হস্তাবলেপ ভুলিতে পারে নাই।[১০] এই বিষয়ে রামমোহনের রুচি বিতর্ক ব্যাপারে আদর্শ স্থল হইয়া আছে।

॥ ২ ॥

রামমোহন ও সমসাময়িক বিশ্ববিবর্তন

বাঙলা দেশের প্রথম জাগৃতির আলোকবাহী শ্রীমন্মহাপ্রভু বাঙালীর ভৌম সঙ্কীর্ণতার অনুদারতা ত্যাগ করিয়া আন্তঃপ্রাদেশিক পরিমণ্ডলে বিহার করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের কবীর, তুলসীদাস, রজ্জব, দাদূ প্রভৃতি সাধক-কবিদের

ন্যায় মহাপ্রভুও ছিলেন ভারত-পথিক। সমগ্র ভারতের প্রাণরস উপলব্ধির জন্যই পরিব্রাজক চৈতন্যদেব ভারতের মানবতীর্থে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। মানসিক আত্মবিকাশের মূলে যে ভৌগোলিক উদারতা থাকা প্রয়োজন, একথা চৈতন্যদেব জ্ঞাতসারেই হউক, অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক—অনুধাবন করিয়াছিলেন। পুনর্জাগরণের যে মূলসূত্র, অর্থাৎ ব্যাপ্তি,—চৈতন্যদেব বাঙালীর বহুকালের কূপমণ্ডূকতার বেষ্টনী ভেদ করিয়া বৃহদ্ ভারতবর্ষের বহু সহস্রাব্দসঞ্চিত প্রাণরস উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

রামমোহন চৈতন্যদেবের উত্তরসাধক ছিলেন না, চৈতন্যের প্রেমধর্মের বাণী তাঁহার পৌরুষকে স্পর্শ করে নাই। মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী রামমোহন ধর্মের আবেগ-বেপথু উল্লাস বর্জন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কুলদেবতা কৃষ্ণ হইলেও তিনি মাতামহ-বংশের শাক্তমতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে তন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব ও রামমোহন—উভয়েই দুই যুগের বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির মূলে বারি নিষেক করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উভয়ের জীবন ও সাধনা সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাশ্রয়ী। চৈতন্যপ্রভু প্রেম ও আবেগজাত ঈশ্বর-ভক্তিকেই জীবনের পরম পুরুষার্থ বলিয়াছিলেন। রামমোহন বুদ্ধি ও যুক্তির বৈজ্ঞানিক পারম্পর্য বিচার করিয়া জগৎ ও জীবনকে মানববুদ্ধি ও জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছিলেন এবং সর্বপ্রকারে ভক্তি-আবেগার্দ্র পিচ্ছিলতা বর্জন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ভক্ত ও প্রেমিক; রামমোহন যুক্তিবাদী আত্মপ্রত্যয়শীল কর্মযোগী। 'গোস্বামীর সহিত বিচার' নামক বিতর্কিকায় রামমোহন বৈষ্ণব-ধর্মকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন এবং 'পথ্য প্রদানে' ঈষৎ রূঢ়ভাবেই বলিয়াছেন, "গৌরাঙ্গ যাঁহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্য চরিতামৃত শব্দ ব্রহ্ম, তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথাশ্রমের কারণ, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এপর্যান্ত চেষ্টা করা যাইতেছে।"[১১] এই বিদ্রূপ বক্রোক্তির মূলে আছে তাঁহার কুশাগ্রতীক্ষ্ণ ধীশক্তির জয় ঘোষণা; নব্যন্যায়ের উত্তর সাধক রামমোহন ভক্তি-প্রেম-বিহ্বল ঐশী চেতনাকে সর্বথা অস্বীকার করিয়াছেন।

রামমোহনের এই যে মুক্ত বুদ্ধি, ইহার মূলে নিহিত আছে ১৯শ শতাব্দীর বিশ্ববিবর্তনের ইতিবৃত্ত। রামমোহন যে বিচ্ছিন্ন ও সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিক মানুষ নহেন, সমগ্র বসুধার নিকট-আত্মীয়,—ইহা তিনি নিজস্ব সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি এবং ১৯শ শতকের য়ুরোপীয় জীবনধারা হইতে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বলিতে গেলে ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পশ্চিম সভ্যতা বিশ্বধারাকে একটা অভিনব জীবনবোধে অনুপ্রাণিত করে। ইহার অর্থ মানুষের সর্ববিধ বন্ধন বিনাশের ইতিহাস। রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম-জ্ঞানের সাহায্যে এই ত্রিবিধ বিষয়ে শুভমুক্তির জয়োচ্চারণ—ইহাই ১৯শ শতকের য়ুরোপের বাণী। এতদ্দিন ধরিয়া য়ুরোপে রেনেশাঁসের প্রভাব চলিতে থাকিলেও মানুষেব সামাজিক বন্ধন শিথিল হইতে পারে নাই। এই শতাব্দীব অব্যবহিত পূর্বে দুইটি সুদূর-প্রসারী ঐতিহাসিক ঘটনায় পশ্চিমের জনজীবন নবতর তাৎপর্য লাভ করিল। তাহা হইল ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯-৯১) এবং আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (১৭৭৪)। একদিকে মানুষেব বাষ্ট্রিক ও সামাজিক নিপীডনের অবসান এবং স্বাধীন আত্মবিকাশেব কামনা, আর একদিকে ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব—যাহা একদিকে শারীর শ্রমকে উহ্য করিয়া প্রকৃতির উপর মানুষকে বিজয়ী করিল। রামমোহন যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন (১৭৭৪), ঠিক সেই বৎসর আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। তাই তিনি মধ্যযুগীয় ভারতের উপান্তভূমিতে জন্মগ্রহণ করিলেও য়ুরোপ-আমেরিকার আধুনিক জীবনবাদ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।[১২] একথা অবশ্য স্বীকার্য: "**Between his birth and death the French Revolution had come and gone. Napoleon's career had begun and terminated, the war of Indepedence in America had been fought and won.**"[১৩]

এই যে বিশ্ববিবর্তন, য়ুরোপ-আমেরিকার নবজীবন-জলতরঙ্গ, ইহাব বাণী রামমোহনের চিত্তভটেও যে আহত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার কবিতে হইবে। য়ুরোপের প্রাণের মুক্তিপ্রবাহ—যাহা ১৮শ শতকের শেষভাগ হইতে শুরু কবিয়া ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত বেগে বহিয়া চলিয়াছে, তাহা একদিকে য়ুরোপকে রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের নিপীড়ন হইতে রক্ষা করিল, অপরদিকে যন্ত্রবিজ্ঞানের সহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মিলনের ফলে মধ্যযুগ-শাসিত য়ুরোপের চিত্তগহনের ঘনান্ধকার দূরীভূত হইল; য়ুরোপ ১৮শ শতাব্দীর জ্ঞানবাদের নির্মোহ রূপটি প্রণিধান করিতে পারিয়াছিল। জ্ঞানবাদের সহিত প্রেম যুক্ত হইলে লোকহিতবাদের উৎপত্তি হয়। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপ যাহা বিজ্ঞানে বুঝিয়াছে, ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাহাকেই মানব-কল্যাণবাদের

দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বেন্থাম, স্টুয়াট মিল ও কোঁতের লোকায়ত হিতবাদে জ্ঞান ও প্রেম একটি সূত্রে বিধৃত হইল। রামমোহনের আবির্ভাব হইল এই পটভূমিকায়।

জন ডিগ্‌বির অধীনে কর্ম করিবার কালে রামমোহন যেমন ইংরাজী ভাষা শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন,[১৪] তেমনি ডিগ্‌বির নামে য়ুরোপ হইতে যে সমস্ত সাময়িকপত্র আসিত, তাহা পাঠ করিয়া তিনি তৎকালীন য়ুরোপীয় জীবনের বিস্ময়কর বিস্ফোরণ সম্বন্ধেও অবহিত হইয়াছিলেন। রামমোহনই প্রথম ভারতীয়, যিনি য়ুরোপেব ১৯শ শতকের বাণী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। য়ুরোপে যাইবার পূর্বেই তিনি যে য়ুরোপীয় বৃহজ্জীবনের উত্তাপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে।

১। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-প্রণালী স্থাপিত হইলে রামমোহন সেই উপলক্ষে কলিকাতা টাউনহলে প্রকাশ্য ভোজ দিয়াছিলেন।

২। তাঁহাব অন্তরঙ্গ এ্যাডাম সাহেব বলিয়াছিলেন যে, পর্তুগালে অনুরূপ শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইলে রামমোহন আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৩। গ্রীসেব প্রতি তুরস্কের অত্যাচারে তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন, এবং যাহাতে গ্রীক জাতি তুরস্কের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার জন্য কায়মনে প্রার্থনা করিতেন।

৪। নেপল্‌সে স্বাধীনতাকামী জনসঙ্ঘ পরাজিত হইলে রামমোহন অতিশয় মুহ্যমান হইয়া পড়েন।

৫। ১৮৩০ সনে দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের সংবাদেও তিনি ফরাসী জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছিলেন।

৬। ১৮৩০ সনে ইংলণ্ডে 'The Repeal of the Test and Corporation Acts'-এর বলে নির্জিত রোমান ক্যাথলিকগণ রাষ্ট্রিক মর্য্যাদা লাভ করিলে রামমোহন অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

৭। ১৮৩০ সনে হুইগগণ ক্ষমতা লাভ করিলে তিনি অতিশয় সুখী হন।

৮। ১৮৩২ সনে ইংলণ্ডে রিফরম বিল পাস হইবার সময় তিনি বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন; ঐ আইনের দ্বারা যাহাতে মধ্যবিত্ত ইংলণ্ডবাসিগণ ভোট দানের ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে, তজ্জন্য তিনিও আগ্রহ প্রকাশ

করিতেন এবং উদারপন্থী ইংলণ্ডবাসীদের সহিত সোৎসাহে সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণীগুলি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, য়ুরোপের জনতার এই জীবনোন্নয়ন, মানুষের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক মর্যাদা রামমোহনকে মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যে যে মানবধর্মের প্রস্তুতি দেখা যায়, রামমোহনের স্পর্শ-সচেতন অনুরূপ মানবধর্মী মন য়ুরোপীয় রাষ্ট্র-জীবনের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। রামমোহনের পূর্বে এদেশের কেহই রাষ্ট্র-জীবনের প্রতি বিশেষ কৌতূহল অনুভব করেন নাই। রামমোহনের মানবপ্রেম য়ুরোপের রাষ্ট্র-সাধনার মধ্যে মানব-মুক্তির বাণী প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তিনি ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে ১১ই আগষ্ট তারিখে বাকিংহামকে লিখিয়াছিলেন: "Enemies of Liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful."[১৫] তিনি য়ুরোপের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা লক্ষ্য করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

রামমোহনের ভাব-জীবনের অন্যান্য প্রভাবের কথা পরে আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের বস্তুগত স্বরূপ, য়ুরোপ-আমেরিকার রাজনৈতিক আন্দোলন, সমাজদর্শন—সর্বোপরি মনুষ্যত্বের মর্যাদা—যাহা ১৯শ শতকের য়ুরোপকে দুরূহ যজ্ঞাবসানের সার্থক যজ্ঞফল দান করিয়াছে, রামমোহনও সেই ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। মানসিক বিকাশ-পরম্পরা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, রামমোহন বিশ্বমানবের উদার পটভূমিকায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং সে বিশ্ব হইতেছে ১৯শ শতকের মানবমুক্তির বাণীবাহী-য়ুরোপ-আমেরিকা।

॥ ৩ ॥

রামমোহনের মনোলোকে বিভিন্ন প্রভাব

রামমোহনের বাংলা ও ইংরাজী রচনাবলী এবং তাঁহার জীবনের ঘটনাসমূহ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহাকে যে বিশ্বমানব বলা হয়, তাহা অযথার্থ নহে। বিশ্বের কয়েকটি বিশিষ্ট ভাবাদর্শ তাঁহার চিত্ত ও চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। শুধু ভারতীয় জীবনবাদ নহে, বা শুধু হিন্দুর ঔপনিষদিক

ব্রহ্মবাদ নহে ; তাঁহার উদার ও কৌতূহলী মনে সমকালীন রাজনৈতিক ও অন্যান্য চিন্তামূলক ভাবাদর্শ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অবশ্য তাঁহার মধ্যে একটা সহজাত বুদ্ধিপ্রবণতা সর্বদা লক্ষ্য করা যায়। তিনি যেন মধ্যযুগীয় বাঙলাদেশের নব্যন্যায়ের উত্তরসাধক ছিলেন। ১৯শ শতকের য়ুরোপের প্রধান বাণী দুইটি—বুদ্ধির প্রাধান্য ও মানব-হিতব্রতের প্রতিষ্ঠা। রামমোহনের মর্মমূলেও এই দুইটি চেতনা পূর্বাহ্লেই অনুসৃত হইয়াছিল। তাই, ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই, তাঁহার মধ্যে বুদ্ধিবাদের জয়ধ্বনি শ্রুত হয় ; তাহারই সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়াছিল মানব-কল্যাণবোধ। এই লোকহিতৈষণা কোন ধর্মীয় সংহিতা হইতে উদ্ভূত হয় নাই। বুদ্ধির যৌক্তিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি মানব-কল্যাণের বাণীটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাঁহার সহিত বিদ্যাসাগরের মানবপ্রেমের প্রধান পার্থক্য। (বিদ্যাসাগরের লোক-কল্যাণের মূলে আছে জীবের দুঃখ-বেদনার প্রতি প্রবল আবেগসঞ্জাত অমিত সহানুভূতি। তাঁহার হৃদয়াবেগ বুদ্ধিবাদকে খর্ব করিয়া রাখিয়াছিল। অপর দিকে রামমোহন ছিলেন বুদ্ধিবাদী, যুক্তিই তাঁহার প্রধান আয়ুধ। তাই তিনি আবেগকে যুক্তির গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।)

রামমোহনের চিত্ততটে যে বিভিন্ন ভাব-প্রবাহ আঘাত করিয়াছিল, তাহারই দুই একটি তরঙ্গভঙ্গের কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

১। ইসলাম ও রামমোহন—তদানীন্তন কালে সকলে রামমোহনকে 'জবরদস্ত মৌলবী' বলিত।[১৭] কারণ ফারসী ভাষা ও ইসলামী শাস্ত্রসংহিতায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি গৃহে বসিয়া ফারসী শিক্ষা করেন এবং মাত্র নয় বৎসর বয়সে আরবী শিক্ষার জন্য পাটনায় প্রেরিত হন। পাটনায় অধ্যয়নকালে তিনি আরবী ভাষায় ইউক্লিড ও অ্যারিস্টটল্ পাঠ করেন। পরবর্তী কালে তিনি যে বুদ্ধির দীপালোকে সত্য দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার উৎপত্তি এই বাল্যকালে। একদিকে ইউক্লিড ও এ্যারিস্টটলের যুক্তিবাদ, অপরদিকে ইসলামের একেশ্বরবাদ—এই দ্বিস্রোতে রামমোহনের কিশোরচিত্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। ইসলামের দুইটি দার্শনিক মত, 'মোতাজেলা' ও 'মুওয়াহিদ্দিন'—তাঁহার চিত্তে অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 'মোতাজেলা' অর্থাৎ যুক্তিবাদী সম্প্রদায় এবং 'মুওয়াহিদ্দিন' অর্থাৎ একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়—রামমোহনের

উপর ইঁহাদের প্রভাব তো থাকিবেই।[১৮] তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া মোতাজেলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদের প্রতি আনুগত্য পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং কিশোরবয়সেই মুওয়াহিদ্দিন সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদের তাৎপর্য অনুভব করিয়াছিলেন। ইহারই প্রভাবে ১৮০৩-১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক 'তুহ্‌ফত্‌উল-মুওয়াহিদ্দিন' অর্থাৎ 'একেশ্বরবাদীদিগকে প্রদত্ত উপহার' প্রকাশিত হয়। তখন রামমোহনেব বয়স উনত্রিশ। এই গ্রন্থে তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ে গুরুবাদ ও যাবতায় অলৌকিকতার বিরুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন।[১৯]

আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার এই যে, রামমোহন একদিকে যেমন ইসলামের প্রখর যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি আবার সুফী ভক্ত-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শুধু পাটনায় অধ্যয়ন কালেই নহে, পরবর্তী জীবনেও তিনি হাফেজ, মৌলানা রুমি, শ্বামী তাব্রিজ প্রভৃতি ভক্ত-কবিগণের কাব্য পাঠ করিতে ভালবাসিতেন।[20] তাঁহার মত বিচিত্র প্রতিভাধর ব্যক্তির পক্ষেই একাধারে ইসলামের নির্মোহ যুক্তিবাদ ও সুফী ধর্মের আবেগনম্র ভক্তিবাদ—এই বি-সম ভাবধারাকে মিলান সম্ভব হইয়াছিল। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"And it must never be forgotten that the Free thought and Universalistic outlook of the Mahommedan rationalists (the Muta Z'alis of the 8th century) and the Mahommedan unitarians (the Muwahiddin) were among the most powerful of the formative influences on the Rajahs's mental growth."[২১]

কাহারও কাহারও মতে রামমোহনের একেশ্বরবাদী বেদান্তধর্ম প্রচারের মূলে আছে একেশ্বরবাদী ইসলামের প্রভাব। ইহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কারণ রামমোহন শুধু দার্শনিক মতেই নহে, উত্তরকালে অশনবসনেও অল্প পরিমাণে ইসলামী ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।[২২] ইসলাম-প্রীতির জন্য তাঁহাকে হিন্দুসমাজে নিন্দিত হইতে হইয়াছিল।[২৩] ইসলামের ধর্মচেতনার মূলে যে প্রবল মর্ত্যবোধ ও যুক্তিবাদের আধিপত্য আছে, রামমোহনের মুক্তবুদ্ধি তাহার অনুশাসন মানিয়াছিল। তাই তিনি ইসলামের ধর্ম-দর্শন ও জীবনচর্যার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

২। খ্রীষ্টীয়তত্ত্ব ও রামমোহন—খৃষ্টান ত্রিতত্ত্ববাদকে (**Trinitarianism**) আক্রমণ করিয়া কলিকাতার নাগরিক সমাজে রামমোহনের প্রথম

প্রতিষ্ঠা। শ্রীরামপুরের মিশনারীরগণ খ্রীস্টানধর্মের মহিমা প্রচারের জন্য পরধর্মের দ্বেষণা করিতেন রামমোহন-ভবানীচরণ হিন্দুধর্মকে মিশনারীদের হীন আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য 'সম্বাদ কৌমুদী' বাহির করেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শুধু বাংলা সাময়িক পত্রেই নহে, রামমোহন ইংরাজ-সম্পাদিত পত্রিকায়ও খ্রীস্টানদের ত্রিতত্ত্ববাদকে আক্রমণ করিয়া পত্রাকারে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

১৮২১খ্রীঃ অব্দে ১৪ই জুলাই শ্রীরামপুরের জনৈক খ্রীস্টান পাদরি 'সমাচার দর্পণে' হিন্দুর দর্শন পুরাণ, পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতিকে আক্রমণ করেন। রামমোহন উহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া 'শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্ম' এই ছদ্ম নামে ঐ পত্রিকায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু দর্পণসম্পাদক মার্শম্যান তাহা প্রকাশ না করিয়া ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে দর্পণে লিখেন, "শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ শর্ম্মা প্রেরিত পত্র এখানে পঁহুছিয়াছে। তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়-দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।" তখন রামমোহন 'শিবপ্রসাদ শর্মা'র নামে ১৮২১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে "Brahminical Magazine. The Missionary & the Brahmin No 1" 'ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিসনারি সম্বাদ সং ১'—এই নামে একখানি দ্বিভাষী (ইংরাজী ও বাংলা)সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি ত্রিতত্ত্ববাদী খ্রীস্টানধর্মের বিরুদ্ধে কয়েকটি অখণ্ডনীয় যুক্তি উত্থাপিত করেন। ঈশ্বরকে নাম-রূপ-আয়তনের মধ্যে কল্পনা করা এবং সাকার ঈশ্বরকে "স্ত্রী পুত্র বিশিষ্ট ও বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয় গ্রামবাসী"[২৪] ভৌম মানবরূপে প্রতিষ্ঠিত করায় হিন্দুদর্শনের যৌক্তিকতার উপর মিশনারীগণ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তদুত্তরে রামমোহন 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র ২য় সংখ্যায় লিখেন—

"অতএব মিশনারি মহাশয় দিগো বিনয়পূর্বক জিজ্ঞাসা করি যে তাহারা রূপ বিশিষ্ট যিশুখ্রীষ্টকে ও কপোতরূপ বিশিষ্ট হোলি গোষ্টকে সাক্ষাত ঈশ্বর কহেন কিনা......"

অন্যত্র—

"আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে, ঈশ্বরের কপোতরূপ গ্রহণ করা আপনি স্বীকার করিয়াও কিরূপে হিন্দুকে উপহাস করেন যে, পৌরাণিক হিন্দুরা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর মৎস্য ও গরুড়ের বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। কি মৎস্য কপোতের ন্যায় নির্বাহ নহে। কি গরুড় পায়রা হইতে অধিক প্রয়োজনে আইসে না"

এই সূক্ষ্ম পরিহাসের মূলে আছে সর্ববিধ অলৌকিকতার বিরুদ্ধে রামমোহনের শাণিত বুদ্ধি। ত্রিতত্ত্ববাদী খ্রীস্টদর্শনের বিরুদ্ধে তাঁহার ক্ষুরধার যুক্তির তীক্ষ্ণতম আক্রমণ বুদ্ধিজীবী মানুষের পরম সম্পদ।

রামমোহন খ্রীস্টানধর্মের ঐক্যবাদী তত্ত্বের (Unitarianism) পরিপোষক ছিলেন। কারণ ঈশ্বরের অনন্যকর্তৃত্ব ও ঐকসত্তা তাঁহার যুক্তিবাদী মনের নিকট গ্রাহ্য হইয়াছিল। এ্যাডাম ও ইয়েট্‌স্ সাহেবের সহযোগিতায় তিনি বাইবেল অনুবাদে প্রবৃত্ত হন ; কিন্তু মূল বাইবেলের কোন অংশের তাৎপর্য্য লইয়া ইয়েটস্ সাহেবের সহিত তাঁহার মতভেদ হয়। ইয়েটস্ রামমোহনের সংশ্রব বর্জন করিলেন। এ্যাডাম প্রথমে ত্রিতত্ত্ববাদী ছিলেন। তিনি রামমোহনকে ত্রিতত্ত্ববাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিতে গিয়া নিজেই তাঁহার ঐক্যাশ্রয়ী খ্রীস্টানতত্ত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া আপনাকে ঐক্যবাদী বলিয়া প্রচার করিলেন। নিষ্ঠাবান রক্ষণশীল খ্রীস্টানগণ এ্যাডামকে "Second Fallen Adam" বলিয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। ১৮২১ সালে খ্রীস্টান-ধর্মের ঐক্যবাদ প্রচার করিবার জন্য কলিকাতায় 'ইউনিটেরিয়ান কমিটী' নামক একটি সমিতি গঠিত হইল এবং তাহাতে নিম্নলিখিত সভ্যগণ গৃহীত হইলেন: থিয়োডোর ডিকিন্‌স্ (সুপ্রীমকোর্টের কৌনসিলি), জর্জ জেমস্ গর্ডন (ম্যাকিনটস কোম্পানীর কর্মচারী), উইলিয়াম টেট (এ্যাটর্ণি), ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যে নিযুক্ত একজন ডাক্তার, নর্মাণ কার (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী), দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায় এবং রামমোহন রায়। এতদ্ব্যতীত এই কমিটিতে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের কয়েকজন লোকও ছিলেন। রামমোহন এই প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। হিন্দু জনসাধারণ তাঁহাকে এই জন্য নিন্দা করিত। তিনি বলিতেন যে, এই খ্রীস্টানী ঐক্যতত্ত্বে হিন্দুধর্মের বহুদেববাদ, ঈশ্বরের মানবীকরণ, অবতারবাদ এবং খ্রীষ্টানদিগের ত্রিতত্ত্ববাদ অস্বীকৃত হইয়াছে ; তাই তিনি এই ধর্মান্দোলনকে সমর্থন করিতেন। কিন্তু এই অভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত যে ভারতের প্রাণের যোগ থাকিতে পারে না, রামমোহন তাহা অল্পকালের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ক্রমে ইহার সংস্রব বর্জন করিয়া ১৮২৮ খ্রী: অব্দে 'ব্রহ্মসভা' স্থাপন করেন। তাঁহার 'Precepts of Jesus, Guide to peace and happiness' (1820), 'An Appeal to the Christian Public (1021) Final appeal (1823),'

'পাদরি-শিষ্যসম্বাদ' (১৮২৩) এবং 'হরকরা' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে টাইটলর সাহেবের সহিত প্রবল তর্কযুদ্ধে তিনি খ্রীস্টানধর্মের অলৌকিকতার ত্রুটি ও ত্রিতত্ত্ববাদের ভ্রম প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু খ্রীস্টানধর্মের নীতি, প্রেম ও মানবকল্যাণবাদের উচ্চ প্রশংসা করেন।

ইতিপূর্বে তিনি মুওয়াহিদ্দিন সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, খ্রীস্টানধর্মের মধ্যেও যতখানি যুক্তিমার্গচারী, অলৌকিকতা-সহিত বর্জিত মানবকল্যাণকর আদর্শ আছে, তিনি খ্রীস্টানধর্মের যুক্তিপন্থী একেশ্বরবাদকে ততখানি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঐক্যবাদী খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের কিছুকাল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই যে যুক্তির প্রাধান্য—রামমোহন ইসলামের মোতাজেলা সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহাই লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতি আকর্ষণ বোধ করিয়াছিলেন। হিন্দুর বেদপুরাণ তন্ত্রকেও তিনি বুদ্ধিবাদের দ্বারা মার্জিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং বেদান্ত-সূত্রের ব্রহ্মবাদের মধ্যে তাঁহার আপন অন্তরের বাণী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। মানসিক অবক্ষয়ের জন্য বাঙালীর যে যুক্তিবাদী মানস-প্রকরণ ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে লোকাচারের শৈবালদামে মজিয়া-বুজিয়া গিয়াছিল, রামমোহন তাহাকেই বুদ্ধিবাদের প্রবল স্রোতোস্পর্শে বেগবান করিয়াছিলেন। এই বুদ্ধিবাদের জন্যই তিনি চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন এবং কৌলিক বৈষ্ণবমত পরিত্যাগ করিয়া মাতামহ বংশের তান্ত্রিক বীরাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২৫] রামমোহনের প্রধান বাণী তিনটি—বুদ্ধিবাদের স্বরূপ-নির্ণয়, সর্বপ্রকার অলৌকিকতার কুহেলিকা হইতে নীতিধর্মকে উদ্ধার এবং ভৌম চেতনা অর্থাৎ বাস্তবতার পটভূমিকায় জগৎ ও জীবনের প্রতিষ্ঠা। খ্রীস্টানধর্ম বিষয়ে তাঁহার তর্কবিতর্কের মধ্যেও এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায়।

৩। বেদান্তধর্ম ও রামমোহন—১৮শ শতকের শেষভাগে বাঙলাদেশে বেদান্ত-উপনিষদ চর্চা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তন্ত্রের ব্যবহারিক দিকটি অপাত্রে পড়িয়া দিন দিন বিকৃত হইতেছিল। রামমোহনের বেদান্ত উপনিষদাদি প্রচারের কিছুপূর্বে ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে, হল্‌হেড্‌ সাহেব যে '*The Grammar of the Bengal Language*' রচনা করেন, তাহাতে অল্প কয়েকটি উপনিষদের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। রামমোহনের সমসাময়িক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কলিকাতার বাসায় ছাত্রদিগকে বেদান্তাদি শিক্ষা দিতেন।[২৬] কিন্তু জনগণের মধ্যে বেদান্তের

কোনরূপ প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামমোহনই বেদান্ত, উপনিষদ ও তন্ত্রাদিকে বাঙলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ সহ প্রায়শঃই বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। তিনি বেদান্ত-প্রতিপাদিত একেশ্বরবাদের পুনঃপ্রচারের চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও পুরাণ-সংস্কৃতিকে আদৌ শ্রদ্ধা করিতেন না।

রামমোহনের বেদান্ততত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার প্রচারিত মতের মধ্যে এই তত্ত্বগুলি লক্ষ্য করা যাইবে :

১। ব্রহ্মবাদ বা একেশ্বরবাদ।

২। ব্রহ্মতত্ত্বে গৃহীদেরও অধিকার আছে।

৩। ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি দেবতার তুল্য।

"রামমোহনের মতে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল যেমন জীবের সত্তার অধীন, জীবকে ছাড়িয়া স্বপ্নের যেমন সত্তা নাই, সেইরূপ জগৎ পরমেশ্বরের সত্তার অধীন। জগৎ অসত্য, এই কথার অর্থ কি? যথার্থ সত্তা,—পারমার্থিক সত্তা (Absolute Existence) কেবল এক পরমেশ্বরের। ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু নাই। ঈশ্বরাতিরিক্ত বস্তুই অসত্য। জগতের নিজের স্বাধীন নিরালম্ব সত্তা নাই। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা বিহিত কর্ম করিতে হইবে। যে দ্রব্যের যাহা গুণ, তদনুসারে কার্য করিতে হইবে। মুক্তির উপায় জ্ঞান ও শমদমাদি সাধন এবং জনহিতকর কার্যানুষ্ঠান। রাজা রামমোহন রায় সগুণ এবং নির্গুণ, কর্ম এবং জ্ঞান, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। যে বৈদান্তিক মতে জগৎ, মাতাপিতা ইত্যাদি সকলকে মিথ্যা জানিয়া সংস্কার ত্যাগ করা কর্তব্য বলিয়া প্রচার করা হয়, রাজা রামমোহন রায় সেইরূপ মত অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করিতেন।"[২৭]

রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উল্লিখিত মতামত বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, রামমোহন বেদান্তধর্মের মূলতত্ত্ব যে মায়াবাদ, তাহাকেই অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি প্রধানতঃ ব্রহ্ম, জগৎ ও জীব,—এই ত্রিবিধ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শুধু স্বীকার নহে, যাঁহারা জগৎকে অভাবাত্মক বলিয়া উহার অনন্যনির্ভর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন, রামমোহন তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গই করিয়াছেন। শাস্ত্র ব্যাখ্যাকালে তিনি অবশ্য বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের উপর নির্ভর করিয়াছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন—"আত্মার জ্ঞান যে পর্যন্ত না হয়, তাবৎ প্রপঞ্চময় জগতের সত্যজ্ঞান থাকিয়া নানাপ্রকার দুঃখ এবং দুঃখমিশ্রিত সুখের ভাজন জীব হয় কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না যেমন রাঙ্গেতে রূপার ভ্রম যাবৎ থাকে, সে পর্যন্ত তাহার প্রাপ্তির প্রয়াসে দুঃখ পায় সেই রূপার ভ্রম দূর হইয়া যথার্থ রাঙ্গের জ্ঞান হইলে তাহার প্রয়াস এবং তজ্জন্য দুঃখ আর থাকে না।"[২৮] এখানে তিনি বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের মূলতত্ত্বটি যথাযথভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সত্তা নাই, রামমোহনকে বারংবার নানা জনের সহিত তর্কবিতর্কে ইহাই প্রমাণ করিতে হইয়াছে। একদিকে যেমন তিনি ব্রহ্মতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, অপরদিকে গৃহী মানুষেরও যে ব্রহ্ম লাভের সামর্থ্য আছে, ব্রহ্মোপাসক মানুষ দেবতারও পূজ্য, ইত্যাদিও বলিয়াছেন। কিন্তু রামমোহনের ধর্মচেতনা ও সমাজ-চেতনার মধ্যে একটা স্ববিরোধ লক্ষ্য করা যায়। রামমোহন বহু পণ্ডিতজনের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, "Metaphysical distinctions of little or no practical use to Possessor or to society"—এবং য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। একদিকে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বেদান্তবর্ণিত মায়াবাদের আশ্রয় লইতেছেন, আবার অপরদিকে রাষ্ট্র ও সমাজ হইতে মায়াবাদ উৎখাত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার উক্তিগুলিই এবিষয়ে আলোকবর্তিকার কাজ করিবে :

"Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father brother, etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better."

তাঁহার যুক্তির মধ্যে দ্বৈধভাব দেখিয়া কোন লেখক মন্তব্য করিয়াছেন, "আমি এখানে রামমোহনের মধ্যে যে স্ববিরোধ যে অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে সমন্বয় করিবার কোন পথ পাইতেছি না।"[২৯] কিন্তু একটু অবহিত হইলেই রামমোহনের এই স্ববিরোধের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

রামমোহনের একেশ্বরবাদ প্রচার, 'তুহফা-তুল-মুওয়াহিদ্দিন' রচনা, বেদান্ত ব্যাখ্যান—এ সকলের মূলে আছে প্রচলিত হিন্দুধর্মকে পরিমার্জনা করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ ধর্ম রূপে গ্রহণ। বিশুদ্ধ ধর্মচেতন মন লইয়া রামমোহনের আবির্ভাব হয় নাই। তিনিই সর্বপ্রথম মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনের বাতায়ন হইতে ধর্মকে বিচার করিয়াছেন। বিভিন্ন উপধর্মশ্রেয়ী হতশ্রী হিন্দু-সমাজকে বেদান্তের ব্রহ্মবাদে দীক্ষা না দিলে এ জাতির রাষ্ট্রিক ও সামাজিক উন্নতি নাই—একথা, প্রখর যুক্তিনিষ্ঠ রামমোহন স্পষ্টরূপেই অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মসংস্কারের মূল লক্ষ্য ধর্মসংস্কার নহে—সমাজ সংস্কার। হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব যে বেদান্তের ব্রহ্মবাদের মধ্যে নিহিত আছে, ইহা তিনি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রয়োজনেই বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি এ বিষয়ে জন্ ডিগ্‌বিকে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন,

"I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-divisions among them, and the multitude of religious rites and ceremonies, and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise. It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort."

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যের জন্যই তিনি বেদান্তমতে হিন্দুর প্রচলিত ধর্মচেতনার সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর যেমন ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যতালিকা হইতে হিন্দুর ষড়দর্শন চর্চা তুলিয়া দিতে সুপারিশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ লোকশ্রেয় মতবাদের বশবর্তী হইয়া রামমোহনও বেদান্তচর্চায় নিযুক্ত বৃথা-পাণ্ডিত্যকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ধর্মের গুহাহিত নির্বিকল্প ও নিঃশ্রেয়স্ ব্যক্তিগত মুমুক্ষা অপেক্ষা সমগ্র জাতির ঐহিক শ্রেয়োবোধের দ্বারাই তিনি অধিকতর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাই নিজে ধর্মচর্চায় কালাতিপাত না করিয়া সংবাদপত্রের প্রতি উদ্দিষ্ট সরকারী আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট ও ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, ঐ আইনের প্রতিবাদে তাঁহার 'মীরাতুল আখবার' নামক ফারসী সংবাদপত্র তুলিয়া দেন; জুরীর দ্বারা বিচারের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, সতীদাহ নিরোধের জন্য তাঁহার পরিশ্রম ও সাধনা জাতির অন্যতম গৌরবস্থল হইয়া বিরাজ করিতেছে।

নারীর সম্পত্তিতে অধিকার-অর্জনের জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন; বিলাতে গিয়াও এদেশের কৃষকদের দুঃখ দূর করিবার জন্য পার্লামেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন।[৩২] তাঁহার এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলে তাঁহার জীবনধর্ম ও দার্শনিকতা সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না—তাঁহার জীবনের মধ্যেও অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাইবে না। তাঁহাকে যদি আমরা ধর্ম-সংস্কারক রূপে বিচার করিতে যাই, তবে বোধ হয় তাঁহার যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল করিব। য়ুরোপে যে মানবধর্ম বা লোকহিতবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, রামমোহন বিলাত যাইবার পূর্বে সাক্ষাৎভাবে তাহার সহিত পরিচিত না হইলেও মনোধর্মের দিক দিয়া তিনি ছিলেন বেন্থাম, মিল ও কোঁতের সহোদর। তাই মানবের সামাজিক কল্যাণকেই তিনি বিশেষ মূল্য দিয়াছেন। তিনিও বিদ্যাসাগরের মত স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন এবং বেদান্ত ও উপনিষদকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য দেখিয়া মনে হয়, তিনি বুঝি বাংলা দেশের নব্যন্যায়ের শেষ ও সক্ষম প্রতিনিধি। ধর্ম অথবা পার্থিব বিষয়—যে সম্বন্ধেই হোক না কেন, তিনি শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত বাস্তবজ্ঞানের সংমিশ্রণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "He was according to our humble opinion, a theo-philanthropist."[৩৩] রামমোহনের বেদান্ত আলোচনার মূল কথাও ইহারই সাক্ষ্য দেয়। স্বামী বিবেকানন্দের মত তিনিও লোক-হিতৈষণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করিয়াছেন। ম্যাক্সমুলার রামমোহনকে তুলনামূলক ধর্মালোচনার পথিকৃৎ বলিয়া সম্মান দিয়াছেন। কিন্তু শুধু আত্মজ্ঞান বৃদ্ধি বা ধর্মরহস্য আবিষ্কারের জন্যই তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেন নাই—তাঁহার ধর্মালোচনার মূলকথাই হইল মানবহিতবাদ। তাই তাঁহাকে শুধু বেদান্তবাদী ব্রহ্মবিৎ আখ্যা দিলে তাঁহার স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

॥ ৪ ॥

রামমোহনের মনোজীবনে বিদেশী প্রভাব

রামমোহন ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বমানবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারত ও যুরোপের সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপর জীবনের পূর্ণ প্রস্ফুটন নির্ভর করিতেছে, তাহা তিনি ডিগ্‌বীর অধীনে কর্ম করিবার সময়েই বুঝিয়াছিলেন। ভারতের ব্রহ্মবাদ, ইসলামের 'মোতাজেলা' সম্প্রদায়ের ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তি ও 'মুওয়াহিদ্দিন' সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদ এবং ঐক্যবাদী খ্রীস্টানী আদর্শের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ১৯শ শতকের বাংলা দেশে সংস্কারমুক্তি ও ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধির জাগরণ সর্বপ্রথম রামমোহনের মধ্যেই দেখা দিয়াছিল। তাই যে ধর্মের মধ্যে মানুষের যুক্তি মর্যাদা পাইয়াছে, অলৌকিকতা অপেক্ষা কার্যকারণ শৃঙ্খলার অন্তর্লীন বাস্তব-প্রতীতি অধিকতর মূল্যলাভ করিয়াছে, রামমোহনের নির্মোহবুদ্ধি তাহাকেই স্বীকৃতি দিয়াছে—তা' সে ব্রহ্মবাদই হোক, অথবা অন্য কোন সাম্প্রদায়িক মতই হোক। একেশ্বরবাদ প্রধানতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য ও যুক্তি-আশ্রয়ী, তাই তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া অলৌকিক ধর্মপ্রবণতার বশে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন নাই; এই ধর্মচেতনার অন্তরালে মানুষের বাস্তববুদ্ধি জয়যুক্ত হইয়াছিল। এই মুক্তবুদ্ধি মহাপুরুষের ধর্মচর্যায় ভাবালুতার লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না। তাই তিনি বৈষ্ণবধর্ম ও চৈতন্যসম্প্রদায়কে সুকঠোর ব্যঙ্গ করিয়াছেন. 'শ্রীভাষ্য'কে অবহেলা করিয়াছেন; কিন্তু একেশ্বরবাদী তন্ত্রধর্মকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, যাহা যুক্তিবাদের দ্বারা স্বীকৃত, তিনি তাহাই স্বীকার করিতেন, ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার—তাঁহার প্রত্যেকটি চেষ্টার মূলে ছিল বাস্তবনিষ্ঠ যুক্তিবাদ। এইখানে তাঁহার সহিত কেশবচন্দ্রের পার্থক্য। কেশবচন্দ্র ছিলেন প্রধানতঃ ভক্ত; বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উচ্ছ্বাস তাঁহার চিত্তে স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথও ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তি ছিল সংযত, অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত বেদ-বেদান্তের অভ্রান্ততা লইয়া বিচার বিতর্কের পর তিনি ধর্মালোচনায় যুক্তিবাদকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। রামমোহন প্রধানতঃ মানবব্রতী, হিউম্যানিস্ট্; এবং তাঁহার এই মানবহিতবাদ যুক্তিবাদ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বিদ্যাসাগরও মানবপ্রেমী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মানবপ্রেম যুক্তিনিরপেক্ষ প্রবল আবেগরূপে

আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। রামমোহনের আবেদন যুক্তির নিকট, বিদ্যাসাগরের আবেদন মূলতঃ আবেগের নিকট। এই স্থলে দুই যুগপুরুষের পার্থক্য।

রামমোহন ত্রিতত্ত্ববাদী খ্রীস্টান ধর্মমতকে (Trinitarianism) যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেন, এবং ঐক্যবাদী খ্রীস্টান মতকে (Unitarianism) শুধু স্বীকার নহে, প্রচারেও নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিমত আলোচনার যোগ্য :

"I have found the doctrines of Christ more conducive to moral principles, and better adapted for the use of rational beings, than any other which have come to my knowledge". ৩৪

খ্রীস্টের প্রধান বাণী সঙ্কলন করিয়া তিনি পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন ("*The precepts of Jesus, the Guide to peace and happiness*")। তাঁহার ধারণা ছিল, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় খ্রীস্টনীতি ও ভাবাদর্শ অধিকতর কার্যকরী : "Genuine Christianity is more conducive to the moral, social and political progress of a people than any other known creed."[৩৫]

তাঁহার উল্লিখিত মত ভ্রান্ত হইতে পারে। সম্ভবতঃ পুরাণ কথা ও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কাহিনীগুলি তাঁহার মনে বিভীষিকা সঞ্চার করিয়াছিল; তাই তিনি বিশুদ্ধ নীতি হিসাবে খ্রীস্টীয় নীতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে রামরাম বসুও হিন্দুধর্মকে নস্যাৎ করিয়া খ্রীস্টান ধর্মের জয়ঘোষণা করিয়াছিলেন। যদিও রামরাম বসু ঐহিক সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া টমাস-কেরীর মনোরঞ্জনের জন্যই খ্রীস্টানধর্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন বিদেশী ধর্মমতকে যুক্তির দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার করিয়া তবেই তাহার সার্থকতা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন।

রামমোহন ১৯শ শতাব্দীর য়ুরোপের যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন,—কেহ কেহ একথাও বলিতে পারেন। আমাদের মতে যুক্তিবাদ ছিল রামমোহনের স্বভাবধর্ম। বিশেষ গ্রন্থ বা মতবাদ আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে যুক্তির পাঠ লইতে হয় নাই। কিশোর বয়সে তিনি আরবী ভাষায় ইউক্লিড ও এ্যারিস্টটল পাঠ করিয়াছিলেন; ইহা তাঁহার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে। য়ুরোপে গিয়া তিনি দার্শনিক লকের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। জ্ঞানবাদী লক্ প্রত্যক্ষবাদে

বিশ্বাসী ছিলেন, রামমোহন নিশ্চয় লকের সহিত মতৈক্য বোধ করিয়াছিলেন। য়ুরোপের অন্যান্য দার্শনিকও যে তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা রামমোহন-জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

"যুক্তিবাদের মূলসূত্র সঙ্কারক বেকন ও লকের গ্রন্থ, এবং ইংলণ্ডীয় ডীযিষ্টগণের ফরাসী দেশীয় থিওফিলানথ পিষ্ট ও এনসাইক্লোপিডিষ্টদিগের ও টমাস পেনের গ্রন্থ এবং সংশয়বাদী হিউমের প্রবন্ধ পাঠে রাজা রামমোহন রায়ের মনের ভাব ও বিশ্বাস, শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ বিষয়ে বিকশিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ দ্বারা তাঁহার উপরে অধুনাতন ইউরোপীয় সভ্যতা ও স্বাধীন চিন্তার প্রভাব পতিত হয়। এই প্রকার মনের ভাব লইয়া তিনি তুহ্‌ফাতুল মোযাহিদ্দিন গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা তাঁহার কোন কোন গ্রন্থে লক, বেকন ও অন্যান্য স্বাধীন চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ, হিউম, গিবন প্রভৃতি এবং ফরাসী পণ্ডিত ভল্‌টেয়ারের নাম ও তাঁহাদের মতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।"৩৬

কিন্তু রামমোহন 'তুহ্‌ফাতুল' রচনায় ইসলামী মোতাজেলা ও মুওযাহিদ্দিন সম্প্রদায়ের দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কারণ ঐ গ্রন্থ ১৮০৩-৪ খ্রীঃ অব্দে রচিত হয়। ১৮০৫-১৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে তিনি জন ডিগ্‌বীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই সময়ের মধ্যেই ইংরাজী শিখিয়া থাকিবেন, তৎপূর্বে তিনি ইংরাজী ভাষার উপর অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই। সুতরাং তুহ্‌ফাতুল গ্রন্থের পশ্চাদপটে ইসলামের যুক্তিবাদ ও একেশ্বরবাদ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ বা দর্শন নহে। তাঁহার প্রথম যৌবনের চিন্তায় ইসলামী প্রভাব এবং উত্তরকালের জীবনে ও চিন্তায় য়ুরোপীয় প্রভাব পরিদৃষ্ট হইলেও, আচার-আচরণে তিনি কিয়দংশে মুসলমানী আদবকায়দা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই জন্য হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ তাঁহার নিন্দা করিতেন।

রামমোহন যে বিলাত গমনের পূর্বেই য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৮১০-১৮১৮ সনে লেঃ কর্ণেল কীটস্ ক্লারেন্স নামক একজন ভ্রমণকারী তাঁহার ভ্রমণ-বিষয়ক গ্রন্থে বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন লক্ এবং বেকনের লেখা প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন, এই ক্লারেন্স্ কলিকাতায় আসিয়া রামমোহনের সহিত আলাপাদি করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।৩৭ ইহাতেই অনুমিত হইতেছে যে, রামমোহন বিলাত গমনের বহু পূর্বে শুধু আরবীয় যুক্তিবাদে নহে, লক ও বেকনের যুক্তিমার্গের সহিত পরিচিত ছিলেন। ইংলণ্ডে গিয়া তিনি প্রসিদ্ধ

ঐতিহাসিক উইলিয়াম রস্কো, যুক্তিবাদী জেরিমি বেন্থাম ও সাম্যবাদী রবার্ট ওয়েনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। যে যুক্তিবাদ ও মুক্তবুদ্ধি রামমোহনের প্রধান অস্ত্র, তিনি বেন্থাম ও রস্কোর মধ্যে তাহার সাধর্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু সাম্যবাদী ওয়েনের সিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট প্রীতিকর হয় নাই; তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে ওয়েন পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই অনুমিত হয় যে, রামমোহন সাম্যবাদ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। আইনবিষয়ে তিনি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ আইনবিৎ উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, আর সম্ভবতঃ বেন্থামের উপযোগবাদের (ইউটি-লিটাবিয়ানিজম্) দ্বারাও কথঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন।

ম্যাক্সমুলার রামমোহনকে "Father of Comparative Theology" বলিয়াছেন বটে, [৩৮] কিন্তু রামমোহনের তুলনামূলক ধর্মালোচনা নিষ্কাম ধর্মৈষণা হইতে জন্মলাভ করে নাই—এই দিক দিয়া তিনি ছিলেন উপযোগবাদী (ইউটিলিটারিয়ান)। লোকহিতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয় মনীষীদের সহিত পরিচিত হইয়া তিনি মানব-কল্যাণব্রতের বাণী উপলব্ধি করেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা তাঁহার লক্ষ্য হইলে তিনি হিন্দুর ষড়্‌দর্শন, খ্রীস্টান ও ইসলামের ধর্মমতের তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন; হয়তো জার্মান দর্শনের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হইতে পারিতেন। কিন্তু ইহা তাঁহার আদর্শ ছিল না; লোক-কল্যাণই ছিল তাঁহার ধ্যানধারণার বস্তু। য়ুরোপীয় জ্ঞানবাদের নিবিড় সাহচর্য লাভ করিয়া তিনি সেই ১৯শ শতাব্দীর য়ুরোপের প্রাণস্পন্দন উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

॥ ৫ ॥

পরবর্তীকালের বঙ্গসংস্কৃতি ও রামমোহন

আমারা প্রধানতঃ রামমোহনকে কেন্দ্র করিয়াই ১৯শ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকা আলোচনা করিয়াছি। এখন দেখা যাক, পরবর্তীকালের বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য তাঁহার দ্বারা কী ভাবে এবং কতদূর অনুপ্রাণিত হইয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-প্রতিভা আলোচনা প্রসঙ্গে রাম-মোহনের প্রতি বাঙালীর বিরূপতা স্মরণ করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে বলিয়াছেন, "বঙ্গদেশ অদ্য এই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার

করিতে চাহে না।” ব্রাহ্মধর্ম-বিরোধী ও রক্ষণশীল নীতির পরিপোষক হিন্দু-সম্প্রদায় রামমোহনের ধর্মমত ও আদর্শের প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে রামমোহনের প্রভাব কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও-বা পরোক্ষভাবে কার্যকরী হইয়াছিল তাহাও অনস্বীকার্য। রামমোহনের সমসাময়িক ডিরোজিও-শিষ্যগণ—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি তরুণ ছাত্রগণ কলিকাতার নাগরিকসমাজে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। একদিকে ‘ধর্মসভা’, ভবানীচরণ ও রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বর গুপ্ত, ‘সংবাদ প্রভাকর,’ ‘বঙ্গদূত,’ প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী প্রাতষ্ঠান, ব্যক্তি ও সাময়িকপত্র, অপরদিকে ‘ইয়ং বেঙ্গল’দের এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন, পার্থিনন, জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি সংস্থা ও পত্রিকায় য়ুরোপের যুক্তিবাদ এবং ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অগ্নিবাণী। ডিরোজিও-শিষ্য ও হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ হিন্দুর যাবতীয় ধর্মকর্ম ও আচার-বিচারকে ঘৃণা করিতেন—তাহারা ডিরোজিওর নিকট সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিবাদের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেন্থামের জ্ঞানমার্গীয় উদারতর রাজনৈতিক মত, এ্যাডাম স্মিথের অর্থনৈতিক মত এবং বেকন, হিউম, টমাস পেইন প্রভৃতির বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের দ্বারা নব্যশিক্ষিত বাঙালী যুবক বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।[৩৯] রামমোহনের ধর্মৈষণা, বেদান্ত ও তন্ত্রাসক্তি প্রভৃতি ধর্মচর্চার দ্বারা নব্যবঙ্গের যুবকগণ কিছুমাত্র আকৃষ্ট হন নাই, যে কোন ধর্মের প্রতি তাঁহাদের চিত্ততলে প্রচুর ঘৃণা সঞ্চিত হইতেছিল। তাঁহাদিগকে গায়ত্রীপাঠ করিতে বলিলে তাঁহারা ইলিয়াড হইতে কয়েকছত্র আবৃত্তি করিতেন,[৪০] এবং দেবতার স্থলে যুক্তিবাদকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। টমাস পেইনের ‘*Age of Reason*’ নামক গ্রন্থের মূল্য ছিল এক টাকা। কিন্তু তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট এই পুস্তকের এত চাহিদা হইয়াছিল যে, এক টাকার পুস্তক পাঁচ টাকায় বিকাইত।[৪১] ডিরোজিওর শিষ্যগণ হেতুবাদ ও বিবেকের দ্বারা চালিত হইয়া এবং ফরাসী বিপ্লবের রক্ত-রঙিন পতাকার ছায়াতলে দাঁড়াইয়া জাতীয় মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। বিশুদ্ধ হেতুবাদের দ্বারা উৎপন্ন বস্তুবোধ এবং অলৌকিকতার বিরবন্ধনমুক্ত স্বাধীন বিবেক—‘ইয়ং বেঙ্গলগণ’ এই দুই অস্ত্রের সাহায্যে সমাজ

সংস্কারে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ডিরোজিও নাস্তিক ছিলেন, শত্রুপক্ষ ডিরোজিওর বিরুদ্ধে এই কথা রটাইত ; উইলসন ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ হইতে পদচ্যুত করিবার পূর্বে এই প্রশ্নগুলি করিয়াছিলেন :

"Do you believe in God ? Do you think respect and obedience to parents no part of moral duty ? Do you think the intermarriage of brothers and sisters innocent and allowable ?"

তদুত্তরে ডিরোজিও বলিয়াছিলেন :

"I have never denied the existence of a God in hearing of any human being. If it be wrong to speak at all upon such a subject I am guilty ; for I am neither afraid nor ashamed to confess having stated the doubts of Philosophers upon this head, because I have also stated the solution of those doubts. Is it forbidden any where to argue upon such a question ? If so it must be equally wrong to adduce an argument upon either side, or is it consistent with enlightened notion of truth to wed ourselves to only one view of so important a subject resolving to close our eyes and ears against all impressions that oppose themselves to it ?"[৪২]

এই উক্তি বিশ্লেষণ করিলে ডিরোজিওকে নাস্তিক না বলিয়া হিউমের অনুরূপ মতাবলম্বী[৪৩] অর্থাৎ সংশয়বাদী বলিতে হয়। তাঁহার ছাত্রগণ তাই হিন্দুর ধর্মসংস্কার উড়াইয়া দিয়াছেন, আচার বিচার ব্যঙ্গ করিয়াছেন—এক কথায় ভারতীয় জীবনধারার উৎসমূলকে অস্বীকার করিয়াছেন। রামমোহনের ভাবাদর্শ তাঁহাদের মধ্যে দৃঢ়মূল হইতে পারে নাই। কারণ রামমোহন ভারতীয় ঐতিহ্যে আস্থাশীল ছিলেন। ধূলিধূসর প্রাচীন শাস্ত্রকেই তিনি নবলব্ধ জ্ঞানবাদের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন—কোন অভিনব মতের প্রবক্তা বলিয়া তিনি কখনও আপনাকে প্রচার করেন নাই। শঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত শাস্ত্রবিচারের সময় তিনি বলিয়াছিলেন—

"In none of my writings nor in any verbal discussion, have I ever pretended to reform or to discover the doctrines of the Unity of God, nor have I ever assumed the title of reformer or discoverer."[৪৪]

বাস্তবিক তিনি কোন অভিনব মতের সৃষ্টি করেন নাই, একেশ্বরবাদী বেদান্ত ধর্মকেই যুক্তিবিজ্ঞান ও শাস্ত্রবচনের সাহায্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ঈষৎ পরবর্তীকালের নব্যবঙ্গের যুবকগণ শুধু তাঁহার সংস্কারমুক্ত যুক্তিবিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছিলেন। ঘূর্ণি ঝড়ের মত তাঁহারা কলিকাতার নাগরিক সমাজকে বিশৃঙ্খল করিয়াছিলেন। কিন্তু

তাঁহাদের সেই উদ্দাম প্রভাব বাঙলা দেশের অন্তরলোকে আদৌ সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়া সমন্বয়-সূত্র আবিষ্কার করিলেন। রামমোহনের জ্ঞানাত্মিকা ব্রহ্মবাদ পরবর্তীকালেও বাঙালীর মনে প্রবল প্রভাব সঞ্চার করিতে পারে নাই; রামমোহন যে আবেগপ্রধান ভক্তিবাদ ও অলৌকিক পৌরাণিক মতের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাহাই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিল। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র পুরাণকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও যুক্তির দ্বারা পুরাণবিশেষকে বা পুরাণের অংশবিশেষকে স্বীকার করিয়াছিলেন ('কৃষ্ণ চরিত্র')। চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শশধর তর্কচূড়ামণি, এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র নব্য হিন্দুধর্মের মূলে নূতন প্রতীতি ও মূল্যবোধের রস সঞ্চার করিলেন; অপরদিকে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আবির্ভাব হইল,—পৌরাণিক হিন্দুধর্মে আস্থা ফিরিয়া আসিল। ত্রিধাবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজও হীনবল হইয়া পড়িল। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রধানতঃ ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ গ্রহণ করিলেন, নববিধানের নেতা কেশবচন্দ্র প্রায় বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তি ও গুরুবাদের আবর্তে দিগ্‌ভ্রষ্ট হইলেন, এবং ভারতীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীস্টান মতের নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ফলে সমগ্র হিন্দুসমাজ হইতে এই তিনটি উপসম্প্রদায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। রাম-মোহন যে মহৎ আদর্শ লইয়া বাঙলা দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার লোকান্তরের পর সে আদর্শ বহুলাংশে হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। অবশ্য তাঁহার বহ্নিস্পর্শে বাঙালীর যে চিত্তশিখা জ্বলিয়া উঠিল, তাহা উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। তাঁহার ধর্মচর্যা ও বুদ্ধিবাদের জয়ধ্বনি বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তে নবযুগের নবীন মন্ত্র রচনা করিল। 'কৃষ্ণচরিত্র' বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র যে আয়ুধ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী এবং অলৌকিকতা-বিরোধী একটি বাস্তব প্রতীতি। রামমোহন যেমন যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রের মূল্য নির্ণয় করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ বিশুদ্ধ হেতুবাদকেই বিচারবুদ্ধির নিয়ামক শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামমোহনের পুরাণবিরোধিতা ও বৈষ্ণবধর্মের প্রতি ঔদাসীন্য অবশ্য ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে; শিক্ষিত বাঙালী আবার পুরাণ ও বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভাবালুতার অধ-আবেশে হীনবল বাঙালীর চিত্তে রামমোহন সূর্যকরোজ্জ্বল তমোঘ্ন যুক্তিপরম্পরা দান করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীর বাঙালী ভিন্নতর পথে যাত্রা করিলেও রাম-

মোহনের অনপনেয় যুক্তিবাদের স্বরূপ ভুলিতে পারে নাই। ১৯শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীচিত্তে রামমোহনের স্থান চিরকালের জন্য অম্লান হইয়া রহিয়াছে।

পাদটীকা

১। এই গ্রন্থের প্রথম পর্বের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত, পৃ ৩৫

৩। ঐ, পৃ ৪৩৭

৪। *Calcutta Review*, 1845.

৫। *The English Works of Raja Ram Mohon Roy*, Vol. 1 (1885), Vol. II (1887)—Edited by J. C. Ghosh.

৬। সংবাদ প্রভাকর, ১৩ মার্চ, ১৮৫৪

৭। প্রমথ চৌধুরী—বঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পৃ ১১। ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রমথ চৌধুরী উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে রামমোহনের গদ্য সম্বন্ধে অন্যকথা বলিয়াছিলেন: "কিন্তু তাঁহার (অর্থাৎ রামমোহনের) অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গ সাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য. আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।"—প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ ১ম, পৃ ৮০ (বিশ্বভারতী সংস্করণ),

৮। কয়েকখানি পুস্তিকার পত্র সংখ্যা—

(ক) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ, প্রথম সংস্করণ পত্রসংখ্যা—২২।

(খ) দ্বিতীয় সম্বাদের পত্রসংখ্যা—৩১

(গ) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, পত্র সংখ্যা—১৬

(ঘ) চারি প্রশ্নের উত্তর, পত্র সংখ্যা—২৬

(ঙ) গুরু পাদুকা, পত্র সংখ্যা—৬

(চ) সহমরণ বিষয়, পত্র সংখ্যা—১১

৯। বঙ্গন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী

১০। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত রামমোহন গ্রন্থাবলী, ৬ সংখ্যক', পৃ ৫৬-৫৭।

১১। ঐ, পৃ ১৩৪

১২। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত, পৃ ৩

১৩। *Ram Mohon Centenary Volume*, PP. 205-206.

১৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রাজা রামমোহন রায়, পৃ ২৪

১৫। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৪১৬-১৮

১৬। *Ram Mohon Centenary Volume*, P. 78

১৭। নগেন্দ্রনাথের ঐ গ্রন্থ, পৃ ২০৪

১৮। Shibnath Shastri—*History of Bramho Samaj*, Vol, 1, P. 30.

১৯। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস—তুহ্ফত-উল-মুওয়াহ্হিদিন (অনূদিত), পৃ ১১-১৩

২০। নগেন্দ্রনাথের ঐ গ্রন্থ, পৃ ১৬ এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর—*History of Bramho Samaj* Vol. 1. pp. 16-17

২১। Presidential Address of B. N. Seal at the death anniversary meeting of Ram Mohan Roy, Bangalore, 1924 (Quoted from Ram Mohan Centenary Volume).

২২। J. N. Farquher—*Modern Religious Movements in India*, p. 30.

২৩। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ড পীড়নে' এবং ১৮৩০ সনের ৪ঠা নভেম্বর সমাচার চন্দ্রিকায় "দ্বিজরাজের খেদোক্তি' নামক ব্যঙ্গ কবিতায় রামমোহনকে মুসলমান সংস্পর্শ-দোষের জন্য তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হইয়াছিল।—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ৭৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৪। রামমোহন গ্রন্থাবলী, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, ব্রাহ্মণ সেবধি, পৃ ১৪

২৫। রামমোহনের তান্ত্রিক বিশ্বাস সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রামমোহন জীবনীর পৃঃ ৬০১-৬০৩ দ্রষ্টব্য।

২৬। মৃত্যুঞ্জয় ভাষ্যসহ মূল উপনিষদ ও সভাষ্য বেদান্তদর্শন শিক্ষা দিতেন। শুধু তাহাই নহে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও কলেজের বাহিরেও অন্যান্য পণ্ডিতগণ বেদান্ত উপনিষদাদি চর্চা করিতেন। দ্রষ্টব্য—রামমোহন গ্রন্থাবলী, কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃ ৬৮

২৭। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঐ গ্রন্থ পৃ ৭৪-৭৫

২৮। রামমোহন গ্রন্থাবলী, সাহিত্য পরিষদ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, পৃঃ ২৫৫

২৯। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১২৬

৩০। *English Works* of *Ram Mohan Roy,* (Panini Edition) pp. 929-30.

৩১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পৃ ১৩২

৩২। নগেন্দ্রনাথের ঐ গ্রন্থ, পৃ ৫১৩

৩৩। *Catcutta Review*, 1845.

৩৪। Letter to Johan Digby, (1816)

৩৫। নগেন্দ্রনাথের ঐ গ্রন্থ, পৃ ৬৩

৩৬। নগেন্দ্রনাথের ঐ গ্রন্থ পৃ ৫৪৫। এ বিষয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উক্তি স্মরণীয় :—

"He was the peer of the Voltaires, and the Volneys, the Diderots and the Herders across the seas ; and he had seen and travelled beyond them all, a modern Ulysses, voyaging in the land of the setting sun, and descending—not once, not twice but many times,—into the dark underworld, to bring messages from the old prophets in the night of Ages." (Ram Mohan Centenary Volume)

৩৭। নগেন্দ্রনাথের ঐ গ্রন্থ, পৃ ৪৩৪

৩৮। ঐ পৃ ৬

৩৯। Bimanbehari Majumder—*History of Political Thought* in *India,* pp. 82-83.

৪০। Peary Ch. Mitra—*Life of David Hare*, pp. 17-18.

৪১। Bimanbehari Majumder—*Op. cit.*

৪২। Peary Ch. Mitra—*Op. cit.* pp, 23-25,

৪৩। Bertrand Russell—*History of Western Philosophy*, pp. 696

৪৪। *Ram Mohan's English works*, Vol I. pp. 106

তৃতীয় অধ্যায়

রামমোহনের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য

॥ ১ ॥

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত গ্রন্থাদি

১৮১৪ হইতে ১৮৩৩ সন, রামমোহনের কালকাতায় বাসস্থাপন হইতে তিরোধান পর্যন্ত, মোট উনিশ বৎসর ব্যাপী বাংলা সাহিত্যের পরিচয় লইলে আশান্বিত হইবার কোন কারণই থাকিবে না। বাঙালীর এই যুগের সাহিত্যজীবন বন্ধ্যা না হইলেও, নূতন কোন ঐতিহ্যেরও ইঙ্গিতবাহী নয়। রামমোহনকে ছাড়িয়া দিলে, এই বিশ বৎসরের মধ্যে এমন কোন সাহিত্যিক সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না, যাহার দ্বারা এ যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনোজীবনের ঘাতপ্রতিঘাত লক্ষ্য করা যাইবে। রামমোহনের বিপুলায়তন রচনার মধ্যে কতটুকু সাহিত্যধর্ম আছে, তাহাও বিতর্কের বিষয়। রামমোহন সৃজনশীল চেতনার অধিকারী ছিলেন; কিন্তু সেই চিত্তপটে জগৎ ও জীবনের নানা সমস্যা গাঢ়তর হইলেও, চিদানন্দময় সারস্বত চেতনা তাঁহার রচনায় আবির্ভূত হয় নাই, তাঁহার ভাব ও ভাবনা সাহিত্যরসের উপযোগী ছিল না। এমন কি তাঁহার সমসাময়িক লেখক মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র ভাষা রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্ত সার' অপেক্ষা অধিকতর সাহিত্য-গুণান্বিত। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ড পীড়ন' এবং রামমোহনের 'পথ্য প্রদান'-এর ভাষার তুলনা করিলেই একথা সুস্পষ্ট হইবে যে, চিন্তা ও রুচির দিক দিয়া কাশীনাথ উচ্চস্তরের ধীশক্তির পরিচয় দেন নাই, মৃত্যুঞ্জয়ের মত তিনিও মাঝে মাঝে ভব্যতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাহাকে সাহিত্যরস বলে, অর্থাৎ সমগ্র রচনাটির মধ্য দিয়া একটি ব্যক্তিপুরুষীয় সত্তার প্রতিফলন—তাহা কাশীনাথের মধ্যে একটু বেশি পরিমাণেই ছিল। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে রংপুরের

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের 'জ্ঞানাঞ্জন' প্রকাশিত হয়; ইনিও রামমোহন-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু গৌরীকান্তের রচনার মধ্যে এমন একটি গতিবেগ উপলব্ধি করা যায় যে, রামমোহনের অত্যন্ত অল্প রচনায় তাহার স্বাদগন্ধ পাওয়া যাইবে। রামমোহন ১৮শ—১৯শ শতাব্দীর য়ুরোপের রাষ্ট্রদর্শন, সমাজ-দর্শন ও অর্থনীতি সম্বন্ধে কতদূর অবহিত ছিলেন, তাহা তাঁহার বিপুল ইংরাজী রচনা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। কিন্তু তিনি সাহিত্যবিষয়ক কথা, কি ইংরাজী আর কি বাংলা,—কোন স্থানেই প্রায় উল্লেখ করেন নাই। বিলাতে অবস্থান কালে তিনি ফ্যানি কেম্বল্ নাম্নী এক অভিনেত্রীর নিকট কালিদাসের শকুন্তলার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং উইলিয়াম জোন্সের অনূদিত শকুন্তলার একখণ্ড সেই অভিনেত্রীকে উপহার দিয়াছিলেন।[১] কিন্তু যাহাকে সাহিত্যিক চিত্তবৃত্তি বা রসোপলব্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা বলে, রামমোহনের রচনায় তাহার বিশেষ প্রকাশ নাই। আজীবন পাশুপত-অস্ত্রধারী এই মহাক্ষত্রিয় শুধু সংগ্রামই করিয়াছেন, সাহিত্যরসাস্বাদনের অবসর পান নাই।

আলোচ্য সময়ে (১৮১৪-৩৩) শ্রীরামপুর মিশন, কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী, ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইতে বাল-পাঠোপযোগী বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ধর্মান্দোলনের ফলেও বাদপ্রতিবাদ অবলম্বন করিয়া নানা গ্রন্থাদি ও প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই আন্দোলনে সংবাদপত্রসমূহ যোগ দেওয়াতে উত্তেজনা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। রামমোহন ও তাঁহার প্রতিবাদীদের বিতর্কগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য, রাধাকান্ত দেববাহাদুর—প্রধানতঃ ইঁহারাই ছিলেন রামমোহন-বিরোধী। রামমোহনের নিরাকার ব্রহ্মবাদ, বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের প্রচার এবং সতীদাহের বিরোধিতা সে যুগের পৌরাণিক-মতাশ্রয়ী সর্বশ্রেণীর বাঙালীকে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিয়াছিল; তাই রামমোহনের বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দুসমাজই উত্থিত হইয়াছিল। রামমোহনের ন্যায় অমিত বিক্রমশালী ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কেহ সে বিরোধিতার সম্মুখে ঐরাবতের মত ভাসিয়া যাইতেন। গভীর ভূগর্ভে কঠিন মৃত্তিকার বুকে শিকড় বিস্তার করিয়া মহীরুহ যেমন ঝড়-ঝঞ্ঝা অবহেলাভরে তুচ্ছ করে, রামমোহনও তেমনি সুদৃঢ় যুক্তিবাদ আশ্রয় করিয়া সর্ববিধ আঘাত-অপবাদ

অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এই কলহ ও তাহার ফলস্বরূপ যে পুস্তিক-পুস্তিকাগুলির জন্ম হইয়াছে, তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য না থাক, সমাজ ও সংস্কৃতি বিচারে ইহাদিগকে একেবারে অবহেলা করা উচিত হইবে না।

শ্রীরামপুরের সমাচার দর্পণ, রামমোহনের সম্বাদ কৌমুদী, ভবানীচরণের সমাচার চন্দ্রিকা, নীলমণি হালদারের বঙ্গদূত এবং ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে যে কলহ প্রবল উত্থিত হইয়াছিল, তাহার পশ্চাতে ছিল সদ্য-নিদ্রোত্থিত বাঙালীর প্রাণের উষ্ণ-উচ্ছ্বাস। শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত সমাচার দর্পণে হিন্দুর ধর্মকর্ম ও সামাজিক আচার-আচরণের উপর যে সমস্ত কটূক্তি বর্ষিত হইত, তাহার যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিবার জন্যই রামমোহন ভবানীচরণ প্রভৃতি সমাজ-নেতৃগণ তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইরা 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রকাশনার পশ্চাতে নূতন তাৎপর্যের ইঙ্গিত দেখা যাইতেছে: হিন্দুধর্ম ও লোকাচারের প্রতি সমাচার দর্পণের মূঢ় আক্রমণের ফলে রামমোহন এবং অন্যান্য বাঙালী সমাজপতিগণের মধ্যে[২] স্বধর্ম রক্ষার প্রেরণা জাগিল, ইহাই দেশহিতৈষণার পূর্বরূপ। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের মারফতে প্রথম দেশচেতনা ও রাজনৈতিক অধিকারবোধ জাগ্রত হয় শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত হিন্দুর কুৎসা বিষয়ক পুস্তিকার প্রতিবাদ হইতে।[৩] জাতি-চেতনার প্রাথমিক রূপ তৎকালীন সাময়িক পত্রের ধর্মকলহের মধ্যে ধীরে ধীরে স্ফুটতর হইতেছিল। কিন্তু যথার্থ জাতীয়তাবোধ প্রথম বিকাশ লাভ করিল রামমোহনের বিলাত গমনের পর। ডিরোজিও শিষ্যগণই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক আলোচনা-সমালোচনার সূত্রপাত করিয়া নব্যশিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার করিলেন, যদিও সে চেতনার অনেকটাই ছিল বায়বীয় আদর্শলোকের রঙিন কল্পনা মাত্র।[৪] সে যাহা হউক, প্রথম দিকের সাময়িক পত্রে নানাবিধ ধর্মান্দোলনের দ্বারা জাতির অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে যে একটা শ্রদ্ধান্বিতভাব, কদাচিৎ আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি জাগ্রত হইল, তাহার অনুমানের স্বপক্ষে কারণ আছে।

আর একদিকে সমাজ-আন্দোলন। রামমোহনই বাঙালীর জড়সমাজে সর্বপ্রথম বুদ্ধি ও যুক্তির বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চার করেন। নারীর সম্পত্তিতে অধিকার, জুরীর বিচার, সংবাদপত্র-দমন আইনের বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই আন্দোলনে কোন কোনটিতে

তিনি হিন্দুসমাজেরও সমর্থন পাইয়াছিলেন; কিন্তু বেদান্তধর্মী ব্রহ্মবাদ প্রচার, পৌরাণিক ধর্ম ও কাহিনীকে অলীক বলিয়া নিন্দা এবং চৈতন্যসম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার ফলে সমগ্র হিন্দুসমাজ হতচকিত হইয়া পড়িল। আবার অন্যদিকে তিনি সতীদাহ প্রথা নিরোধকল্পে দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহার একদল মুষ্টিমেয় অনুচর ব্যতীত বাঙলার হিন্দুসমাজ তাঁহাকে প্রবলভাবে বাধা দিয়াছিল। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে মুক্তচিত্ত পুরুষ ছিলেন; জীবনযাপন প্রণালীতে হিন্দুর সামাজিক লোকাচার মানিয়া চলিতেন না; কিয়দংশে মুসলমান রীতিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় বাধা সৃষ্টি করেন। অবশ্য রামমোহনের প্রবল যুক্তি ও প্রবলতর পৌরুষের আঘাতে প্রায় সমস্ত বাধা তৃণবৎ ভাসিয়া গিয়াছিল। সমাচার চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত, সম্বাদ তিমিরনাশক,—এই সমস্ত পত্রিকা এবং ভবানীচরণ ও রাধাকান্ত পৃষ্ঠপোষিত 'ধর্মসভা' রামমোহনের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার করিয়াছিল, তাহাতে কিন্তু একটা সুফল হইল। সমগ্র জাতির তামসিক জড়ত্বে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল এবং ধর্মকলহের ফলে একদিকে যেমন অন্ধ অযৌক্তিকতা স্তূপীকৃত হইতে লাগিল, আবার অন্যদিকে তেমনি নব্যবঙ্গ-পরিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রে বাঙ্গালীচিত্তের আর একটি বৈশিষ্ট্য ক্রমেই আত্মপ্রকাশ করিল। রামমোহন যুক্তিবাদী হইলেও শাস্ত্র-সংহিতার বিহিতমার্গ অবলম্বন করিয়াই বাঙালীর চিত্ত-জাগরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্যই কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহাকে 'Theophilanthropist' এবং ম্যাক্সমুলার "Father of Comparative Theology" বলিয়াছিলেন। রামমোহনের সময় পর্যন্ত জাতীয়তাবোধের চারিদিকে একটা ধর্মবোধের পবিত্র বেষ্টনী ছিল। কিন্তু 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র বাঙালীর ধর্মনিরপেক্ষ বাস্তব-জীবনের নব নব অভীপ্সা সম্বন্ধে নূতন বাণী প্রচার করিল। কাজেই রামমোহন বাঙালীর চিত্তে যে যৌক্তিকতার বাণী সম্প্রসারিত করিতে চাহিয়াছিলেন, এই সংবাদপত্রগুলি তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার ফলে তাহা অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে লাগিল।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর (১৮১৭) উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট, জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডবলিউ. বি. বেলী, উইলিয়ম কেরী, রাধাকান্ত দেববাহাদুর, রামকমল সেন, তারিণীচরণ

মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ইংরাজ ও বাঙালী ভদ্রজনের প্রতি ইহার ভার অর্পিত হয়।[৫] ইহার কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত (১৮১৮, ১লা সেপ্টেম্বর) কলিকাতা স্কুলসোসাইটী বালক-বালিকার চিত্তে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। স্কুলবুক সোসাইটী দেশীয় ও বিদেশী নীতিমূলক আখ্যান, সচ্চরিত্র সম্পর্কীয় পুস্তিকা, ভূগোল প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী সরল ভাষায় রচনা করিয়া পাঠশালার ছাত্রদের অশেষ উপকার করিয়াছিল। তারিণীচরণের 'নীতিকথা' (১৮১৮), তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জনেতিহাস' (১৮১৯), রামকমল সেনের 'হিতোপদেশ' (অর্থাৎ ঈসপের গল্পের অনুবাদ, ১৮২০) 'ঔষধসার সংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি শুধু বালক বালিকার জন্য রচিত হয় নাই, বয়স্ক ব্যক্তিগণও ইহা হইতে প্রচুর জ্ঞান আহরণ করিতে পারিতেন। স্কুল সোসাইটী স্থাপিত হইবার পর য়ুরোপীয় ধরণের পাঠশালার নূতন কার্যক্রম শুরু হইল, এবং স্কুলবুক সোসাইটী প্রকাশিত, ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি এই সমস্ত আধুনিক পাঠশালায় পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হইলে অতি অল্পকালের মধ্যে কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলে আধুনিক জীবনের পরিচয়-বাহী পাঠশালা পুস্তক অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্কুলবুক সোসাইটী ও স্কুল সোসাইটী সক্রিয়ভাবে শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করিলে দেশের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে সরকার-পরিচালিত এডুকেশন কমিটী ইংরাজী, সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত কমিটি প্রকাশিত ইংরাজী পুস্তকের একত্রিশ হাজার কপি মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে বিক্রয় হইয়া গেলেও, সংস্কৃত ও আরবীগ্রন্থ বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে কার্যপরিচালকের বেতনও উঠে নাই।[৬] ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ কী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

শুধু স্কুলবুক সোসাইটী নহে, শ্রীরামপুর মিশন হইতে এমন সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহার উৎকট ভাষাভঙ্গী বাদ দিলে, শিক্ষা বিস্তারে তাহাদের বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজ বিজ্ঞান—প্রধানতঃ এই কয় বিষয়ে বহু পুস্তক শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার কিছু কিছু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য রচিত, কিছু-বা স্কুলবুক সোসাইটীর তালিকাভুক্ত হইয়া প্রকাশিত।

তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বাঙালীর চিত্তপ্রসারে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল :

জন ক্লার্ক মার্শম্যান—ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৩১)
বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮)
পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ (১৮৩৩)
জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮১৯)
সদ্গুণ ও বীর্যের ইতিহাস (১৮২৯)

ফেলিক্স কেরী—ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় (১৮২০)
বিদ্যাহারাবলী (১৮২০)

জন ম্যাক্—কিমিয়া বিদ্যাসার (১৮৩৪)

জন ল'সন—পশ্বাবলী (১৮২২)
রবিনসন ক্রুসোর জীবন চরিত

পীয়ার্স—ভূগোল বৃত্তান্ত (১৮১৮)

ইয়েট্স্—পদার্থবিদ্যা (১৮২৪)
পদার্থ বিদ্যাসার (১৮২৫)

উল্লিখিত লেখকদের শুধু সেই গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা হইল, যাহার দ্বারা বাঙালী পাঠকের চিত্ত-উন্মেষ হইতে পারিয়াছে। রামমোহনের আবির্ভাবকালের মধ্যে বাঙালীর প্রাণে যে নবজীবনের জোয়ার উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, উল্লিখিত গ্রন্থগুলি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে। প্রধানতঃ ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব—মানুষের কৌতূহল চরিতার্থ হয়—এমন বৈজ্ঞানিক বিষয় অবলম্বনে এই গ্রন্থগুলি রচিত হয়। বাঙালী ভারতবর্ষের ইতিহাসে আপনার অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে নূতন চেতনা লাভ করিয়াছে, ভূগোল-বৃত্তান্তে বিশ্বপরিচয় সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়াছে, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও শারীর-তত্ত্বের পুস্তক পাঠ করিয়া জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অনেক রহস্যের সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছে। রামমোহনের আবির্ভাবে যে চিত্ত-স্ফূর্তি ঘটিল, তাহার পশ্চাতে এই গ্রন্থগুলির প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। প্রাণী ও অপ্রাণী-জগতের প্রতি বাস্তববোধের উৎপত্তি হইল, চিত্তবৃত্তি প্রধানতঃ যুক্তির দ্বারা চালিত হইতে লাগিল; উল্লিখিত গ্রন্থগুলি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। কোন কোন গ্রন্থের একাধিক সংস্করণে ইহাদের জনপ্রিয়তার অসংশয়ী প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীরামপুর মুদ্রণশিল্পের কেন্দ্র হইলেও কলিকাতায় মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় (প্রধানতঃ হিন্দী ও উর্দ্দু) গ্রন্থ মুদ্রণে কলিকাতা ধীরে ধীরে প্রাধান্য অর্জন করিতে থাকে। ১৮১৯ সালের ২০এ ফেব্রুয়ারী সমাচার দর্পণের এক সংবাদে প্রকাশ যে "গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে।"[৭] তাহা হইলে ১৮০৯-১০ সন হইতে কলিকাতায় ছাপাখানার কাজ চলিতেছিল। আবার ১৮৩০ সনের ৩০এ জানুয়ারী তারিখের সমাচার দর্পণে প্রকাশ যে, "এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত করণের প্রথমোদ্যোগের কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে...।"[৮] অর্থাৎ ১৮১৪ সন হইতে কলিকাতায় বাংলা ছাপাখানায় রীতিমত গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইতেছিল। তারিখের সামান্য ইতরবিশেষ থাকিলেও কলিকাতা ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই যে গ্রন্থ প্রকাশনার কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮১৭-৩৩ সনের মধ্যে কলিকাতায় বাংলা ভাষায় যত গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল ও শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে কলিকাতায় আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অভিধান জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ আধিক্য দেখা যায়। নিম্নে এইরূপ কয়েকখানি সংস্কৃত, বাংলা বা বাংলা-ইংরাজী অভিধানের নামোল্লেখ করা যাইতেছে:

১। পীতাম্বর শর্ম্মার অমর সিংহকৃত অভিধান (১৮১৮)।

২। রাধাকান্ত দেবের শব্দ কল্পদ্রুম। ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ইহার মুদ্রণ আরম্ভ হয়। ১৮১৯ এর সমাচার দর্পণে প্রকাশ, "এইক্ষণে মোং কলিকাতায় শ্রীযুক্ত রায় রাধাকান্ত দেব এক নূতন অভিধান করিয়া ছাপা করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে, চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অদ্যাপি অর্দ্ধ হয় নাই।"[৯]

৩। ডাঃ উইলসনের সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান (১৮১৯)।

৪। ক্যাপ্টেন কেলি অনূদিত মেদিনী অভিধান (১৮২০)।

৫। রামকমল সেন ও ফেলিক্স কেরীকৃত ইংরাজী-বাংলা অভিধান (১৮২১)।

৬। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসকৃত প্রাণকৃষ্ণ শব্দাম্বুধি (১৮২২)।

৭। মেণ্ডিসকৃত জনসন্স ডিক্সানারি, ইংরাজী ও বাংলায় গৃহীত (১৮২২)।

৮। হপ সাহেবকৃত বর্ম্মা ডেকসিয়ানরি (শ্রীরামপুর)।

৯। রামকমল সেনকৃত ডাক্তার জানসান সাহেবকৃত ইংরাজী ডেকসিয়ানরি (১৮২৫)।

১০। ইংরাজী অর্থের সহিত নাগরী অক্ষরে ছাপা অমরকোষ (১৮২৫)।

১১। জানসেন ডেকসিয়ানারী বাঙ্গালা সমেত (১৮২৬)। বহুবাজার লেবেণ্ডর সাহেবের প্রেসে মুদ্রিত।"

ইংরাজী ও সংস্কৃত অভিধানের প্রতি যেমন নিষ্ঠা জাগিল, তেমনি আবার ব্যাকরণের দিকেও অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বস্তুতঃ এতাবৎকাল কেরীর বাংলা ব্যাকরণই শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত ছিল। রামমোহনের ব্যাকরণ অনেক পরে প্রকাশিত হয়। ক্রমে ব্যাকরণের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ১৮২১ সনে মুগ্ধবোধ কৌমুদীর অনুবাদ, ঐ সনেই রাধাকান্ত দেবের ব্যাকরণসহ সংস্কৃত উপাখ্যানের অনুবাদ (সমাচার দর্পণ, ১৮২১, ৩০শে জুন) এবং কিড সাহেবের ব্যাকরণ প্রকাশে ক্রমেই বুঝা যাইতেছে যে, সংস্কৃত ও ইংরাজী ব্যাকরণের প্রতি সকলের কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে। ১৮২৬ সনে রামমোহনের *Bengalee Grammar in the English Language* প্রকাশিত হইলে (ইউনিটারিয়ান প্রেস) বাংলা ভাষার ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক ভাষাবোধ আরও একটু অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু ইংরাজী-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ইহা হইতে কিছুই লাভ করিতে পারিত না। রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে স্কুলবুক সোসাইটী হইতে তাঁহার 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রকাশিত হইলে জনসাধারণ বাংলা ভাষা শিক্ষার সত্যকারের সুযোগ লাভ করিল।

এই সময়ে কলিকাতায় অনেকগুলি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কতিপয় মুদ্রাযন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে:

কলুটোলার ভবানীচরণের চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়, বহুবাজারের লেবেণ্ডর সাহেবের ছাপাখানা, মীরজাপুরের সম্বাদ তিমির নাশক ছাপাখানা, শাঁখারি টোলার মহেন্দ্রলাল ছাপাখানা, মীরজাপুরের মুনশী হেদাতুল্লার ছাপাখানা, বারাণসী আচার্যের আড়পুলিস্থিত ছাপাখানা, শ্রীরামপুরের নিকট বহেড়া গ্রামে 'বঙ্গাল গেজেট' খ্যাত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের ছাপাখানা, আড়পুলির হরচন্দ্র রায়ের প্রেস, শাঁখারিটোলার বদন পালিতের প্রেস, শোভাবাজারের বিশ্বনাথ দেবের প্রেস, এনটালির পীয়ার্স সাহেবের ছাপাখানা, শ্রীরামপুরের নীলমণি হালদারের ছাপাখানা, শ্রীরামপুর রত্নাকর

যন্ত্রালয়, কলিকাতার বঙ্গদূত যন্ত্রালয়, চোরবাগানের রামকৃষ্ণ মল্লিকের যন্ত্রালয়, মথুরানাথ মিত্রের যন্ত্রালয়, পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়, মহিন্দিলাল যন্ত্রালয় প্রভৃতি।[১০]

উল্লিখিত মুদ্রাযন্ত্র হইতে যে প্রচুর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়; অবশ্য তাহার প্রায় সবগুলিকেই মহাকাল তাহার সমার্জনীর আঘাতে বিস্মৃতির পরপারে নিক্ষেপ করিয়াছে। তৎকালীন সাময়িক পত্রিকায় 'নূতন পুস্তক' প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি পাঠেই শুধু তাহাদের নামমাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে শুধু নামগুলি উল্লেখ করিলেই তৎকালীন কলিকাতার একশ্রেণীর পাঠকের চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পুরাণ, স্মৃতি ও জ্যোতিষ গ্রন্থের অনুবাদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু রিরংসাবৃত্তি-উদ্বোধক পুস্তিকা এবং তন্ত্র নামধেয় আদিরসাত্মক রচনাগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৮২৪ সনে প্রকাশিত প্রাণতোষিণী নামধেয় লতা, মুণ্ডমালা মৎস্যসূক্ত, মহিষমর্দিনী, মায়াতন্ত্র, মাতৃকাভেদ, মাতৃকোদর, মহানির্বাণ, মালিনী-বিজয়, মহানীল তন্ত্র ও মহাকাল সংহিতা, মেরুতন্ত্র, ভৈরবীভূতডামর, বীরভদ্র, বীজ-চিন্তামণি, একজটা নির্বাণতন্ত্র, তারারহস্য এবং আদিরসাত্মক রতিমঞ্জরী (১৮২৫), চৌর পঞ্চাশিকা (১৯২৬), শৃঙ্গার তিলক (১৮২৬), রসমঞ্জরী (১৮৩০), পদাঙ্কদূত (১৮৩০), বিদ্যাসুন্দর (১৮৩০), নলদময়ন্তী (১৮৩০) প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকাগুলি অমেধ্য আহার্যের মত জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়াছিল। একদিকে যেমন রামমোহন ও তাঁহার বিরোধীদল তর্কবিতর্কের দ্বারা বাঙালীর বহুকালসুপ্ত ধীশক্তিকে খরতর করিয়া তুলিতেছিলেন, শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোলগুলি জনচিত্তে বৃহদ্বিশ্ব সম্বন্ধে কৌতূহল সঞ্চার করিতেছিল, নানা পত্র-পত্রিকায় বিশ্ব ও স্বদেশ সম্বন্ধে নানা সংবাদ বাহির হইতেছিল এবং গৃহগত-প্রাণ বাঙালীর অলস-জর্জর জীবনে জগতের চলোর্মিমুখর প্রাণধারা নবীন কর্মোদ্যম বহিয়া আনিয়াছিল,—ঠিক তেমনি আবার তাহার পাশে সমান্তরাল রেখায় আদিরসের পূতিগন্ধদূষিত পঙ্কস্রোতও বহিতেছিল। বাঙালীর যে-মন কবিগান-খেউড়গানের ধূল্যবলুণ্ঠিত ধুলোট উৎসবে মত্ত হইত, সেই মনই আদিরসাত্মক শ্লোক পাঠে জান্তব উল্লাসের উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িত। সাধারণ বাঙালীর উগ্র আদিরস-প্রীতির উদাহরণ দিতে গিয়া 'সমাচার দর্পণে'র এক পত্রপ্রেরক দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন:

"সংপ্রতি এই কলিকাতা মহানগরে বিদ্যাসুন্দর ও রতিমঞ্জরী ও রসমঞ্জরী প্রভৃতি আদিরস ঘটিত যে যে গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহা বাবুদিগের নিকটে আগতমাত্র সমাদর পুরঃসর মূল্য প্রদান পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দিবারাত্রি তদামোদে আমোদিত হইয়া থাকেন কিন্তু এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তিথিতত্ত্বের অন্তর্ভূত কর্মলোচন নামক এক গ্রন্থ অতি যত্নে ভাষাতে পয়ার করিয়া সংস্কৃত সমেত ৫০০ গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন অনেক চেষ্টাতেও শতাবধি গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোক দ্বারা আদৃত হওয়াতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঋণশোধ মাত্র হইয়াছে সে গ্রন্থের মূল্য ।।০ আধটাকার উর্দ্ধ নহে। এই গ্রন্থ আধুনিক বাবুজী মহাশয়দিগের নিকটে লইয়া গেলে প্রথমতঃ আদিরসজ্ঞানে হস্তে করেন পরে কিঞ্চিৎ দর্শনে রজ্জুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া নিকটস্থ লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলে কহেন যে বাহান্তুরে বেটাদিগের অন্য কোন কর্ম্ম নাই যে গ্রন্থ করিয়াছে ইহা পড়া ভাল নহে যেহেতু না জানিয়া কর্ম্ম করা ভাল জানিয়া করিলে দোষ হয় অতএব এ গ্রন্থ ভাল মানুষে পড়ে না।"[১১]

এই আদিরসের ধারা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিলেও ইহা নিঃশেষে বিলুপ্ত হইতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। স্বয়ং ভবানীচরণের তিনখানি 'বিলাসাখ্য' পুস্তিকা—বিশেষতঃ তাঁহার 'দূতীবিলাসের' রুচির স্থূলতা ভারতচন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। রামমোহনের প্রতিযোদ্ধা, 'ধর্মসভা'র সম্পাদক, বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদক ও প্রচারক, তৎকালীন সমাজে অতিশয় প্রতিষ্ঠাপন্ন ভবানীচরণ যখন স্বনামে এইরূপ একখানি গণিকাতন্ত্রের পুস্তিকা রচনা করিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, তখন অন্যের কথা সহজেই অনুমেয়। রামমোহনের মৃত্যুর তিনবৎসর পরে প্রকাশিত কালীকৃষ্ণদাসের 'কামিনীকুমার' (১৮৩৬.) নামক আখ্যানের বিষয়বস্তু ন্যক্কারজনক; কুৎসিত আদিরসের পঙ্কতিলক ভালে লেপিয়া এই সমস্ত কাম-সংহিতা সমাজে যথেচ্ছা প্রচার লাভ করিত।

আমাদের অনুমান, রামমোহনের ব্রহ্মসভা, ভবানীচরণ ও রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ধর্মসভা, নব্যবঙ্গের জ্ঞানসন্দীপন সভা, বঙ্গরঞ্জিনী সভা এবং সংবাদ-পত্রের ধর্ম ও সমাজনীতির আলোচনা, তর্কবিতর্ক সমাজের উচ্চশ্রেণী-সমারূঢ় ইংরাজীশিক্ষিত অথবা সংস্কৃতশিক্ষিত বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নিম্নস্তরে পুরাণ অথবা আদিরসের নিরুদ্বিগ্ন চর্চা চলিতেছিল। সমাজের এই দুই স্তরের মধ্যে তখনও সেতু রচিত হয় নাই।

॥ ২ ॥

রামমোহনের সমসাময়িক বাঙালী সাহিত্যিক

রামমোহনের সমসাময়িক কালে যাঁহারা সাহিত্য চর্চা করিয়া এখনও লোকস্মৃতির অন্তরালে নির্বাসিত হন নাই, তাঁহাদের মধ্যে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহাদের কেহই বিশুদ্ধ সারস্বত এষণার বশবর্তী হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। প্রধানতঃ রাধাকান্ত দেববাহাদুরের নির্দেশে এবং এদেশের উচ্চবংশীয়া মহিলাদের শিক্ষার নিমিত্ত প্রেরিতা শ্রীমতী কুককে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে ১৮২২ সালে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের অধিকাংশ রচনাই শাস্ত্রগ্রন্থ। রামমোহনের বিরুদ্ধে রচিত 'পাষণ্ড পীড়ন' (১৮২৩) নিতান্তই কটু তর্কমাত্র। ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়,' 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস' ও 'দূতীবিলাস' বোধ হয় সর্বপ্রথম সচেতন শিল্পসৃষ্টি, যদিও ইহাতে কলিকাতার সামাজিক অনাচার বর্ণনাই প্রাধান্য পাইয়াছে। ভবনীচরণের সাহিত্যপ্রতিভা ব্যঙ্গমূলক বলিয়া এই পুস্তিকাগুলিতে ঈষৎ তিক্ত ব্যঙ্গরসের উৎসার ঘটিয়াছে। এই তিনজন লেখকের মধ্যে রামমোহন ও নবযুগের প্রভাব কীভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্যই গৌরমোহনের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' প্রকাশিত হয়। তিনি বহুদিন স্কুলবুক সোসাইটী ও স্কুল সোসাইটীর সহিত জড়িত ছিলেন, কাজেই শিক্ষা ব্যাপারে তাঁহার আন্তরিক আকর্ষণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যুগের বিচিত্র চরিত্র রাধাকান্ত দেব-বাহাদুরের নির্দেশে এই পুস্তিকা রচিত হয়। রাধাকান্ত ছিলেন রামমোহনের প্রতিস্পর্ধী, ধর্মসভার মধ্যমণি, সতীদাহ প্রথার ঘোর সমর্থক;—আবার হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী, স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে একান্ত উৎসাহী; গৌরমোহনের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' বহুদিন রাধাকান্ত দেববাহাদুরের নামেই চলিয়াছিল। তাঁহার জীবনীতে তাহার সামান্য ইঙ্গিত আছে। তবে গৌর-মোহনই যে এই পুস্তকের রচয়িতা, তাহার নানা প্রমাণ আছে।[১২] গ্রন্থটি

অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল ; কয়েকমাসের ব্যবধানেই ইহার পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হইয়াছিল, এই দুই বৎসরের মধ্যে ইহার তৃতীয় পুনর্লিখিত সংস্করণ স্কুলবুক সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার পরেও এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির আরও অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল। চার্চ মিশনারী সোসাইটীর পৃষ্ঠপোষকতায় কুমারী কুক (পরে শ্রীমতী উইলসন) অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং সেই জন্য সামান্য সময়ের ব্যবধানে এই পুস্তিকাটির এতগুলি সংস্করণ হইয়াছিল ; কারণ ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া বালিকাদের একমাত্র পাঠ্যপুস্তক রূপে পরিগণিত ছিল।

আরও একটা কারণে এই পুস্তিকা এত জনপ্রিয় হইয়াছিল। রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে যখন শিক্ষিত বাঙালী আপনার প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন মিশনারী মহিলাদের দ্বারা হিন্দুর অন্তঃপুরিকাদের বিদ্যাভ্যাস অনেকেই বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। রাধাকান্ত দেববাহাদুরও ইংরাজ মহিলাদের স্কুলে হিন্দু বালিকার অধ্যয়ন সমীচীন বোধ করেন নাই। যখন গৌরমোহন এই পুস্তিকায় নানা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে দেখাইলেন যে, ইংরাজ আগমনের পূর্ব হইতেই বাংলা তথা ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার ধারা বহমান ছিল, তখন শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে নারীশিক্ষার প্রতি আস্থা ফিরিয়া আসিল। তাঁহারা এই মনে করিয়া আশ্বস্ত হইলেন যে, স্ত্রীশিক্ষা কুমারী কুক প্রভৃতি মিশনারী মহিলাদের দান নহে ; বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল। রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে যে ঐতিহ্য-চেতনা আমাদের মধ্যে ক্রমে স্পষ্টতর হইতেছিল, গৌরমোহনের এই পুস্তিকার মধ্যে তাহা ঐতিহাসিক গৌরব লাভ করিল। উপরন্তু পুস্তিকাটির ভাষা অত্যন্ত সহজ, বিশেষতঃ তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" নামক নাট্য লক্ষণাক্রান্ত অংশটুকু বাস্তবিক সাহিত্য-গুণান্বিত। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

প্র। হায় ২ কেমন দুঃখের কথা দিদি। ভাল প্রায় সকল গাঁয়েই তো পাঠশালা আছে, তবে কন্যারা আপনারাই সেখানে গিয়া কেন শিখে না। তবে তো বাল্যকাল থাকে কোন স্থানে যাইবার বাধা নাই।

উ। হেদে দেখ দিদি। বাহির পানে তাকাইতে দেয়না। যদি ছোট ২ কন্যারা বাটীর বালকের লেখাপড়া দেখিয়া সাদ করিয়া কিছু শিখে ও পাততাড়ি হাতে করে তবে তাহার

অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয়। সকলে কহে যে এই মদ্দা ঢেঁট ছুঁড়ি বেটা ছেলের মত লেখাপড়া শিখে, এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। এখন এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অঙ্কুরেই জানা যায়।—১৮২৪ সালের তৃতীয় সং, পৃ ৩-৪

এই অংশ পাঠ করিতে করিতে মাঝে মাঝে 'কথোপকথনে'র কথা স্মরণ হয়। রামমোহনের রচনাও গৌরমোহনের এই ক্ষুদ্র রচনাটির মত সুখপাঠ্য নহে। গৌরমোহনের 'কবিতামৃতকূপ' (১৮২৬) নামক বালকপাঠ্য হিতোপদেশের অনুবাদও বেশ সহজবোধ্য ও শিশুমনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—'পাষণ্ড পীড়নে'র ছদ্মবেশী লেখক কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহনের সমসাময়িক এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত কাশীনাথ অসাধারণ পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, সর্বোপরি বাংলা গদ্যে বিস্ময়কর দক্ষতা সত্ত্বেও রামমোহনের প্রভাবান্বিত বাঙালীর নব জীবনোল্লাসের মূল রহস্য অনুধাবন করিতে পারেন নাই। ইংরাজী ভাষার সহিত অপরিচয়ই ইহার প্রধান কারণ। যিনি মাত্র ৪০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারীরূপে প্রবেশ করেন, শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং মাত্র একবৎসর স্মৃতির অধ্যাপনা করার পর চব্বিশ পরগণা জিলার জজপণ্ডিত নিযুক্ত হন, তিনি যে সাধারণের উর্ধ্বে ছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু রামমোহনের মতের প্রতিবাদ করিয়া তিনি দুইখানি বিতর্কমূলক পুস্তক 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' এবং 'পাষণ্ড পীড়ন,' দার্শনিক গ্রন্থ 'পদার্থ কৌমুদী' (১৮২১) এবং 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' (১৮২২), অর্থাৎ কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে'র অনুবাদ ভিন্ন আর কিছু লিখিয়া যান নাই। তিনি রামমোহনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার যুক্তির খরধার অল্প ছিল না; তবে ব্যক্তিগত আক্রমণ মাঝে মাঝে ভব্যতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ভাষার প্রবল প্রাণশক্তি প্রায়ই চল্‌তি প্রবচন ও বাগ্‌ভঙ্গিমাকে আশ্চর্য শক্তির সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। "ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর" প্রতি তাঁহার কটূক্তি মাঝে মাঝে অতি তীব্র হইলেও, ভাষার সাহিত্যগুণের জন্য ব্যক্তিগত আক্রমণও পরম উপাদেয় হইয়াছে। 'পাষণ্ড পীড়নে'র একস্থলে তিনি অজ্ঞাতসারে সমাজবোধের দ্বারা চালিত হইয়া, জনসাধারণের বাণীই ভগবদ্বাণী (Vox populi, vox Dei)—এই কথ প্রচার করেন।

"এ স্থানে ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর কি ভ্রান্তি! দর্পণের অপেক্ষা কি, দশের মুখে কে হস্ত প্রদান করে, দশের বচনেই সত্যাসত্যের প্রমাণ হয়, অতএব সাক্ষিস্থলে ও বিচারস্থলে অনেকের বাক্যের প্রামাণ্য দৃষ্ট হইতেছে, কি শুভ, কি অশুভ, দশের মুখ হইতে যাহা নির্গত হয় তাহা কদাচ অন্যথা হয় না, ধর্ম্মই আবির্ভূত হইয়া দশের মুখ হইতে সুরব ও কুরব প্রকাশ করেন।"১৩

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভবানীচরণের মত একটি বিচিত্র প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবন ও সাহিত্যসাধনা বাস্তবিক বিস্ময়কর। রামমোহনের সমসাময়িক, সহযোগী এবং পরে প্রবলতম শত্রু ভবানীচরণ মূলতঃ সাহিত্যরসিক ও সাংবাদিক প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; প্রতিভা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় তিনি কোন দিক দিয়াই রামমোহনের অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। কিন্তু তিনি অনাগত নবজীবনের আবির্ভাব-বেদনাকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রামমোহনের সহিত তাঁহার চরিত্রের কোন কোন অংশের বাহ্য সাদৃশ্য আছে, এবং সেইজন্য রামমোহন কলিকাতায় বসবাস করিবার কালে যখন শ্রীরামপুরের মিশনারীদের বিরুদ্ধে পত্রিকা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন, তখন ভবানীচরণ তাঁহার সহযোগী হন। ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান নিতান্ত অল্প ছিল না। তাঁহার প্রভু রিজিনাল্ড হেবার তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন : "The Sircar (i.e. Bhabani Charan) was the most conspicuous,—a tall of a fine looking man in a white muslin dress, speaking good English......"১৪

বিষয়কর্মেও তিনি অতিশয় দক্ষ ছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদনা করিয়া ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের পূর্বেই তিনি সাংবাদিকতার একটা মান সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বৃহত্তম কীর্তি 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা। বিদেশী মিশনারী ও স্বদেশী 'কালাপাহাড়ে'র আক্রমণ হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম ও সদাচার রক্ষার জন্যই তিনি রাধাকান্ত দেববাহাদুর এবং অন্যান্য গণ্যমান্য বাঙালীর সহযোগিতায় এই সভা স্থাপন করেন এবং রামমোহনের একেশ্বরবাদ ও সহমরণ-নিরোধ আন্দোলনের প্রবল বিরোধিতা করেন। শুধু এই নেতিবাচক দিকই নহে, তিনি রামমোহনের ন্যায় নানা শাস্ত্রগ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত (১৮৩০), মনুসংহিতা (১৮৪৩), ঊনবিংশ সংহিতা (১৮৩৩), ভগবদ্গীতা (১৮৩৫), রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব (নব্যস্মৃতি ১৮৪৮) প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া হিন্দুর দুইখানি প্রধান ধর্মগ্রন্থ—ভাগবত ও গীতার প্রচার করেন। তবে

রামমোহন যেমন বিনামূল্যে শাস্ত্রগ্রন্থ বিতরণ করিতেন, তিনি তাহা পারেন নাই ; তাঁহার ভাগবতের মূল্য ছিল ৩২৲ টাকা।

ভবানীচরণ ব্যঙ্গবিদ্রূপমূলক কয়েকখানি সামাজিক নক্সা জাতীয় পুস্তিকা রচনা করিয়া সে-যুগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩), শ্রীপ্রমথনাথ শর্মা এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় ; 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'দূতীবিলাস' (১৮২৫) স্বনামে প্রকাশিত হয়, 'নববিবিবিলাস' (১৮৩০) প্রকাশিত হয় 'ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে'ব ছদ্মনামে। তাঁহাব এই রচনাগুলি লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। সাময়িক ব্যঙ্গবিদ্রূপে তিনি অতিশয় দক্ষ ছিলেন। যে আদর্শবাদের দ্বাবা অনুপ্রাণিত হইয়া 'ধর্মসভা' স্থাপন করেন, সমাচাব চন্দ্রিকা সম্পাদনা করেন, ঠিক সেই মনোভাবের বশবর্তী হইয়া এই সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গমূলক পুস্তিকাগুলি রচনা করেন।

তৎকালে কলিকাতা যুগসঙ্কট-মুহূর্তে উপনীত হইয়াছিল। একদিকে মিশনাবী সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্ম নিন্দা, আর একদিকে বামমোহনপন্থীদের সংস্কারেব নামে সনাতন হিন্দুধর্মের মূলে গহ্বব খনন করার চেষ্টা—এই দুই আঘাত হইতে হিন্দুব আচার, বিচার ও সমাজ জীবনকে বক্ষা করিবার জন্যই তিনি বিদ্রূপের শাণিত অস্ত্র লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। কিন্তু এই আক্রমণ ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উদ্যত হয় নাই, ইহাই পবম বিস্ময়াবহ ব্যাপার। 'সমাচাব চন্দ্রিকা'য় "বাবুর উপাখ্যান", "শৌখীন বাবু", "বৃদ্ধের বিবাহ", "বৈষ্ণব এবং বৈদ্যসম্বাদ" নামক যে সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার রচনাদৃষ্টে মনে হয়, ভবানীচরণই উহার রচয়িতা। এই আখ্যায়িকাগুলি এবং উল্লিখিত 'বিলাসাখ্য' ব্যঙ্গ পুস্তিকা তিনখানি আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে, তিনি ইহাতে যাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহারা কেহই উচ্চশিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' বা আত্মীয়সভা বা ব্রহ্মসভার সদস্য নহে। ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে কলিকাতায় যে বৈশ্যধর্মী ব্যবসায়ী-শ্রেণী ও সংস্কৃতিহীন ভূস্বামী-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের বিপথগামী সন্তানদের কদাচারই এই গ্রন্থগুলির মূল বক্তব্য। 'কলিকাতা কমলালয়' পুস্তিকাগুলিতেও কলিকাতার ধনস্ফীতি হেতু চিত্তভ্রষ্টতার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। 'নববাবুবিলাসে' তৎকালীন অধশিক্ষিত মূঢ় বাবুসম্প্রদায়ের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই অনাবৃত

চিত্রাঙ্কন ও নির্মম আঘাতের ফলে সমাজের হয়ত কথঞ্চিৎ উপকার হইয়াছিল। এক পত্রপ্রেরক 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"এক্ষণে নুতন বাবুরদিগের পিতৃগণ পুত্রের কাপ্তেনি ভয় ও কলিকাতা নিবাসী অবোধ পল্লীগ্রামবাসীর কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রমণী পতিবত্নীর কুক্রিয়া ভয় ও লম্পটগণ পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু নববাবুবিলাস ও কলিকাতা কমলালয় এবং দূতীবিলাস গ্রন্থ অপূর্ব্ব উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করিলেন তাহা কে না স্বীকার করিতেছে·· ··· ।"

'কলিকাতা কমলালয়' ও 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থ দুইখানি কলিকাতার নাগরিক জীবনের যথাযথ প্রতিচ্ছবি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু 'দূতীবিলাস' ও 'নববিবিবিলাস' বিশুদ্ধ কামায়নে পরিণত হইয়াছে,—সমাজসংস্কার অপেক্ষা সাহিত্যরস-বর্জিত দূষিত আদিরসের জুগুপ্সাই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। 'নববিবিবিলাস' ও 'দূতীবিলাস' সম্পূর্ণ কাল্পনিক ; তৎকালীন নারীসমাজের সহিত ইহার কিছুমাত্র যোগ নাই। এই অনাবৃত আদিরস কোন দিক দিয়াই সার্থক হইতে পারে নাই। ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে রচিত কালীকৃষ্ণ দাসের 'কামিনীকুমারে'ও এত পূতিগন্ধময় বর্ণনা নাই। 'নববাবুবিলাস' ও 'নববিবিবিলাসে' তবু লেখক সামাজিক আদর্শ বা কল্যাণের আবরণ বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু 'দূতীবিলাসে' সম্পূর্ণরূপে গণিকাতন্ত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। লেখক ভূমিকায় কোনরূপ উচ্চ আদর্শের ভণিতা করেন নাই ; কলিকাতার নিমাইচরণ মল্লিকের অনুরোধে "আদিরস ভক্তিরসঘটিত দূতীবিলাস সুরসিক রসদায়ক পুস্তক", রচনা করেন। গ্রন্থের সূচনায় লেখক পয়ার ছন্দে গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন—

দূতীভক্তি দূতীস্তুতি করে বহুজন।
গোপনে কেমনে দূতী করয়ে মেলন ॥
যুবক যুবতী পেয়ে ধরে কি আচার।
এসব বর্ণনা করি করিয়া বিস্তার ॥
প্রধানা এ গ্রন্থ মধ্যে হইবেক দূতী।
অতএব দূতীবিলাসাখ্য এই পুতি ॥
ভবানীচরণ ভাবি এসকল মনে।
আলোচনা করি গ্রন্থারম্ভিল রচনে ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, লেখক লোকহিতৈষণার প্রেরণায় 'দূতীবিলাস' রচনা করেন নাই।[১৫]

কেহ কেহ রামমোহনের সহিত তুলনা করিয়া ভবানীচরণকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিতে চাহেন। ভবানীচরণ রামমোহনের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও প্রতি-ক্রিয়াশীল বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি তাহা ছিলেন না। সনাতন হিন্দুধর্মকে মিশনারী, রামমোহন ও ডিবোজিও-শিষ্যদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে,— এই আত্মরক্ষামূলক মনোভাব হইতেই তিনি 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'ধর্মসভা' স্থাপন করিয়াছিলেন, শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং এই একই উদ্দেশ্যে সামাজিক ব্যঙ্গমূলক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। প্রবল জলোচ্ছ্বাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে যেমন পদতলে শক্ত মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হয়, তিনিও সেইরূপ প্রতীচ্য ভাব-সংঘাতের সর্বনাশা প্রভাব হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সনাতন সামাজিক আদর্শকেই একমাত্র অবলম্বনরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। তাই নবযুগের সঙ্কট-মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করিয়া অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী হইয়াও তিনি যুগের বাণী পাঠ করিতে পারেন নাই। তিনি বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, প্রবহমান নদীকে তাহার উৎসমুখে ফিরাইতে পারা যায় না। তাঁহার মত কর্মঠ ও আত্মসচেতন ব্যক্তি অসাধ্য সাধন করিতে গিয়াছিলেন, জাতির আকণ্ঠ প্রাণ-পিপাসার গভীরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাহা না হইলে ব্রাহ্মণ কম্পোজিটার দ্বারা শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রণের হাস্যকর চেষ্টা করিতেন না।[১৬] তাঁহার মধ্যে শিল্পসচেতন সাহিত্যবোধ থাকিলেও তাঁহার রচনায় নবজীবনের প্রভাব সঞ্চারিত হইতে পারে নাই ; তিনি যেন পশ্চিম দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। পারিপার্শ্বিকতাকে যথাযথভাবে পরিমাপ করিয়া দেখার মত দূরদর্শিতা তাঁহার ছিল না। কাজেই গতায়ু শতাব্দীকেই তিনি একমাত্র অবলম্বন জ্ঞানে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন।

রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে জাতির চেতনলোক আলোড়িত হইয়া উঠিল। য়ুরোপের ব্যক্তি-স্বাধীনতা, রাষ্ট্রনীতির উদারতা এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের দ্বারা রামমোহন বাঙালীর তরুণমনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। রামমোহনের একদা-সহযোগী ভবানীচরণ বহুকালাশ্রিত পৌরাণিক ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রধানতঃ লোকাচারকে যথাবস্থিতভাবে গ্রহণ করিয়া প্রচলিত মতবিশ্বাসকে সনাতন হিন্দুধর্মের মর্যাদা দিয়া ভবানীচরণ তদনুসারে সমাজ সংস্কারের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

রামমোহনের যুগ তখনও বাঙালীর চিত্তে সুচিরকালস্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারে নাই। ভবানীচরণ, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, রাধাকান্ত দেব-বাহাদুর আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত শুনিতে পান নাই। রামমোহনের বজ্রবাণী বহুদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত আবির্ভূত হইয়া সেই যুক্তিবাদকেই নূতন আকারে সাহিত্য ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পাদটীকা

১। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পৃ. ৪৭৩-৭৪

২। ভবানীচরণ ইংরেজী ভাষা ভালই জানিতেন। তাঁহার প্রভু হেবার সাহেব তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, ' Speaking good English."

৩। বিদ্বেষমূলক কয়েকখানি পুস্তিকার নামোল্লেখ করা যাইতেছে :

1. *Most Excellent Doctrine*—(A very valuable exposition and application to Hindoo superstition of Paul's discourse at Athens, by Carey).

2. *The Jewel of Salvation*. (A very popular piece of poetry exposing the worthlessness of the Hindoo incarnation and modes of salvation, and recommending the salvation of Christ.)

3. *Which Shastra is worthy of regard?*

4. *A letter discovering Error*. (A valuable tract by Mr. Buckingham, exhibiting the misery of men, and the inefficiency of the Hindoo Shastras, and setting forth the true means of Salvation.)

—এই পুস্তিকাগুলি শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

৪। Bimanbehari Majumder—*History of Political Thought etc.*

৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪০১

Lushington—*The History, Design and Present State of Religions etc. etc.*

৬। E. Trevelyan —*On the Education of the people of India.* p.9

৭। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ. ৬৭।

৮। ঐ, পৃ. ৯৬

৯। ঐ, পৃ. ৬৭

১০। ঐ, হইতে সঙ্কলিত

১১। সমাচার দর্পণ ২২-এ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৩

১২। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়কে'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য

১৩। ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'পাষণ্ড পীড়ন', পৃ ৭৭

১৪। ঐ সম্পাদিত 'কলিকাতা কমলালয়ে'র ভূমিকা হইতে গৃহীত।

১৫। ভবানীচরণের গ্রন্থ সম্পর্কে এই লেখকের "উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যে" বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

১৬। ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র অন্তর্ভুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক পুস্তিকার ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় পর্ব

ভাবদ্বন্দ্ব

অষ্টম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক পটভূমিকা

পূর্ববর্তী পর্বে আমরা রাজা রামমোহনের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং এই যুগসাহিত্যের অন্তরালবর্তী বাঙালী-জীবনের মর্মকথা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছি। রামমোহনের বিদ্যুৎসঞ্চারী অলোকসামান্য প্রভাবে দীর্ঘকাল প্রসুপ্ত বাঙালী জাতির তামসিক চিত্ততলে প্রচণ্ড আঘাত অনুভূত হইয়াছিল। হিন্দুকলেজ ও রামমোহনের প্রভাবের ফলেই বাঙালী জাতি ও ১৯শ শতকের বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ নূতন জীবন লাভ করিল। রামমোহন যাহার সূচনা করিয়া যান, পরবর্তী কালে তাহাই নবনব শক্তিমানের স্পর্শে আসিয়া অভিনব কায়াকান্তি লাভ করে। শ্রীমতী কোলেট রামমোহন সম্বন্ধে যথার্থ বলিয়াছেন : "Rammohun stands in History as the living bridge, over which India marches from her unmeasured past to her incalculable future."[১]

রামমোহন বাঙালীর পুনর্জাগৃতির পুরোধা, বাংলা সাহিত্যের মর্মমূলে তিনি যে যুক্তিবাদ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চেতনার বারি নিষেক করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে পরবর্তী প্রায় পঁচিশ বৎসরের (১৮৩৩—১৮৫৭) বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর সেই জাগ্রত চিত্তের অতন্দ্র পিপাসা ক্রমেই তীব্র হইতে থাকে। ১৮৩৩ হইতে ১৮৫৭, অর্থাৎ রামমোহনের তিরোধান ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির বৎসর হইতে শুরু করিয়া সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত—মোট পঁচিশ বৎসর কাল বাংলা সাহিত্যের প্রাণতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যদিও এই কালের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে কোন অভিনব সৃষ্টির স্পর্শ পাওয়া যায় নাই, তথাপি বাঙালীর মনোজগতের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে হইলে এই পঁচিশ বৎসরের সাহিত্যের মধ্যেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং এই যুগের সাহিত্যের পশ্চাদ্‌পটে বাঙালীর মনকে আবিষ্কার করিতে হইলে সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের পরিচয় লইতে হইবে। আমরা আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম পর্বের অন্তর্ভুক্ত ভূমিকাংশে দেখিয়াছি যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে মাটি ও রাষ্ট্রের সব সময়ে প্রত্যক্ষ

যোগ ছিল না, অনাধুনিক বাংলা সাহিত্য একান্তভাবে দেবপ্রধান, মাটি ও মানুষের স্থান সেখানে সঙ্কুচিত। তাহারই জন্য বাঙলা দেশের উপর দিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাষ্ট্র-বিশৃঙ্খলার স্রোত বহিয়া গেলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তাহার উত্তাপ প্রায়ই অনুভূত হয় নাই। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীতে যুরোপীয় জীবনধারা বাঙালীর সুখসুপ্ত অলস তন্দ্রাকে রূঢ়ভাবে আঘাত করিল; বাঙালী য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসাদ লাভ করিয়া জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া উঠিল, বাস্তব পরিবেশ সম্বন্ধেও অনবহিত রহিল না। তাই সাহিত্যের পশ্চাদ্‌পট আলোচনা করিতে হইলে সমসাময়িক রাষ্ট্রজীবন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও সমাজসমস্যার মৌলিক বৈশিষ্ট্য সন্ধান করা প্রয়োজন।

॥ ১ ॥

সমসাময়িক রাষ্ট্রজীবন

খ্রীস্টীয় ১৮৩৩ অব্দ হইতে খ্রীঃ ১৮৫৭, প্রায় পঁচিশ বৎসরের ভারত-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে বেন্টিংক ভারত ত্যাগ করিবার পর লর্ড অকল্যাণ্ড ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আগমন করিলেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিজয়শকট উদ্ধতবেগে ভারতের সবত্র অব্যাহত গতিতে বহিয়া চলিল। বেন্টিংকের সাত বৎসর ব্যাপী শাসনের ফলে অনেকগুলি সমাজসংস্কার সাধিত হইয়াছিল। প্রথমেই গণঋণের (Public Debt) কথা উল্লেখযোগ্য। বেন্টিংকের শাসন কালের মধ্যেই এই গণঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়, ব্যয়সঙ্কোচের ফলে সরকারের তহবিলে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। কাজেই বেন্টিংক ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে দেশের চারিদিকে একটা মন্থর শান্তি বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু অকল্যাণ্ড ও এলেনবুরোর উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে আফগান যুদ্ধে ব্যয় হয় প্রায় তের কোটি টাকা এবং সমস্ত ব্যয়ভার ভারতের স্কন্ধেই অর্পিত হয়। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে রণজিত সিংহের মৃত্যু হইলে শিখ সম্প্রদায়ের আত্মকলহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লর্ড ডালহৌসী শিখশক্তিকে নির্জিত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করেন (১৮৩৮)। ইহার অল্প পূর্বে সিন্ধুর আমীরদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরাজ সেই অঞ্চলও অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ১৮৫২ সনে

রেঙ্গুন, প্রোম ও পেগু অধিকৃত হইলে উত্তর-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত ভারতের সমগ্র ভূভাগ ইংরাজ অধিকারে আসিল।[২] এই গ্রাস-করণের (annexation) নীতি ইংলণ্ডের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারবর্গ ১৮৩৪ সনেই স্বীকার করিয়া লন, ১৮৪১ সনে ইহার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়।[৩] ব্রিটিশ বাণিজ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য এই ভূমিগ্রাসী নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। 'স্বত্বলোপ নীতি' বা Doctrine of Lapse-এর ফলে ডালহৌসী নিম্নলিখিত দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করেন:—

মাণ্ডবী (১৮৩৯), কোলাবা (১৮৪০), জলাউন (১৮৪০), সুরাট (১৮৪২), সাতারা (১৮৪৮), তৈগ্রংপুর (১৮৫১), সম্বলপুর (১৮৫১), উদয়পুর (১৮৫২), নাগপুর (১৮৫৩), সিকিমের একাংশ (১৮৫০), কর্ণাটক (১৮৫৩), তাঞ্জোর (১৮৫৫), বেরার (১৮৫৩), অযোধ্যা (১৮৫৬) ও ঝাঁসি (১৮৫৩)।

ডালহৌসীর এই স্বত্বলোপের নীতি ভারতীয় জনসাধারণকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) মূলেও ইহা সুগোপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির কথা স্মরণীয়। ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে সনদের মেয়াদ বর্ধিতকরণের সময় পার্লামেণ্ট ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার খর্ব করিয়া শুধু চীনে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দেন। কিন্তু ইহার বিশ বৎসর পরে ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে সনদের মেয়াদ পুনর্বৃদ্ধির সময় কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকার একেবারে লুপ্ত হইল; বণিকসম্প্রদায় কেবলমাত্র শাসনকার্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, এই মর্মে আরও বিশ বৎসরের জন্য অনুমতি পাইলেন। ইতিমধ্যে কোম্পানীর স্বরূপ বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইল এবং কোম্পানীর মূলধনের উপর শতকরা ১০·৫% সুদ দিয়া ঐ মূলধন শোধ করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল।[৪]

১৮৫৩ সনে পার্লামেণ্টে সনদের মেয়াদবৃদ্ধির প্রশ্ন উঠিল। বোর্ড অব ডিরেক্টারবর্গের সভ্য সংখ্যা হ্রাস করা হইল, স্থির হইল আঠার জনের মধ্যে ছয় জনকে রাজা মনোনীত করিবেন। সমস্ত চাকুরীও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সাধারণের নিকট উন্মুক্ত হইল। ব্রিটিশ সরকার যে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে পার্লামেণ্টের অধীনে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল, ইহাতেই তাহার সূচনা হইয়াছে। এই যে শাসনতন্ত্রগত রাজনৈতিক পরিবর্তন, দেশের ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমেই ইহার প্রতি কৌতূহলী হইয়া

উঠিতেছিল; কারণ ১৮২৯-৫৮ সালের মধ্যে ভারতীয়দিগকে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটারের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ফলে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি লোকে আকৃষ্ট হইল এবং এই শিক্ষপ্রণালী উচ্চ ও উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজে বিস্তার লাভ করাতে দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজ সচেতন হইল।

১৮৫৫ সনে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা সিদু ও কানু নামক দুই ভ্রাতার নেতৃত্বে প্রধানতঃ বাঙালী মহাজন ও কুশীদজীবীদের প্রতি খড়্গহস্ত হইলেও শেষ পর্যন্ত এই উদ্দাম বিশৃঙ্খলা ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়।[৫] সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রশমিত হইলেও ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদী ভূমিলোলুপতার ফলে উত্তর-ভারতের জনসাধারণ ও ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাঁহাদের অন্তরেও বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতেছিল। ইতিমধ্যে মিশনারীদিগকে সেনাবাহিনীর মধ্যে খ্রীস্টানধর্ম প্রচারের অবাধ অধিকার দেওয়ায় সিপাহীদের মনেও স্বধর্মরক্ষা সম্বন্ধে শঙ্কা জাগিয়াছিল। গো ও শূকর-চর্বিমিশ্রিত কার্তুজের সংবাদে এবং সামরিক বিভাগ কর্তৃক তাহা অস্বীকার করার ফলে দেশীয় সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া (১৮৫৭) অতিবৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে ভারত-সম্রাটরূপে ঘোষণা করে এবং ইংরাজের কবল হইতে ভারতের রাষ্ট্রশাসন ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। তাহার উত্তাপ বাঙলা দেশকেও স্পর্শ করিয়াছিল। কোন কোন জেলায় কিছু কিছু খণ্ড যুদ্ধ হয়, ইংরাজ কর্মচারী ও সাধারণ বাঙালী, সকলেই শঙ্কিতচিত্তে কালযাপন করিতে থাকে। বাকল্যাণ্ড সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন, "It will thus be seen that hardly a single district under Government of Bengal has escaped either actual danger or the serious apprehension of danger."[৬]

সিপাহী বিদ্রোহকে বাঙালী ঘৃণামিশ্রিত শঙ্কার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। তখনও ইংরাজ শাসনের প্রতি বাঙালীর অকুণ্ঠ বিশ্বাস, কাজেই যে-সিপাহিগণ ইংরাজ সরকারের শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনকে বিচূর্ণ করিয়া অরাজকতার বন্যা বহাইয়া দিতেছিল, সেই সিপাহীদের প্রতি বাঙালী জনসাধারণের আদৌ সহানুভূতি ছিল না। পাবনার বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী, রংপুরের রাণী স্বর্ণময়ী, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, ত্রিপুরারাজ প্রভৃতি ভূস্বামিগণ বিব্রত ইংরাজকে

প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও (ঢাকার নাজির জগবন্ধু বসু এবং খাজা আবদুল গণি ও আবদুল আমেদ) ইংরাজকে সাহায্যের ব্যাপারে মুক্তহস্ত হইয়াছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায় সিপাহীদের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে 'হিন্দু' এই ছদ্মনামে *"The Mutinees and People, or Statements of Native Fidelity exhibited during the outbreak of 1857-58* গ্রন্থে সগর্বে বলিয়াছিলেন :

"It was the general good will of the population which rendered the suppression of the Military Mutiny both practicable and beneficial."

সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবার কারণস্বরূপ তিনি কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নির্দেশ করেন। ঐতিহাসিকের ভাষায় :

"Harish Chandra lavished high praises on the permanent settlement who qe regarded 'as the most powerful bond which will unite Hindusthan to hBritain.' He ascribed the failure of Sepoy Mutiny in Bengal to the permanent settlement."[৭]

ঈশ্বর গুপ্তও সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নাই; বরং ঐ বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা নানা সাহেবকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন,

সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে, দস্যি ভেড়ে,
নস্যি কর তারে।

'সংবাদ প্রভাকরে'ও বিরূপ মন্তব্য করিয়া গুপ্তকবি লিখিয়াছিলেন,

"তৃণের অনলে সমুদ্রকে তপ্ত করা, পাখার বাতাসে পর্বতকে চঞ্চল করা, গোষ্পদের জলে হস্তিকে মগ্ন করা, শৃগালের শব্দে সিংহকে ভীত করা, বালির বন্ধনে জলধির বেগকে বন্ধ করা যেমন কখনই সম্ভবপর নহে, সেইরূপ হীনবল অবোধ বিদ্রোহী দলের বলের দ্বারা বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিশ-বিক্রমকে খর্ব করা কোন মতেই বিশ্বাসের স্থল হইতে পারে না।"

—সংবাদ প্রভাকর, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৫৮

সিপাহী বিদ্রোহের সহিত সমগ্র জাতির যোগ স্থাপন হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষার মাদকরসে হতচেতন বাঙালী এই বিদ্রোহকে বিষম সামাজিক উৎপাত বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সিপাহী বিদ্রোহের উগ্রতা ততোধিক উগ্র ইংরাজ-দমন-নীতির দ্বারা প্রশমিত হইল, ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর ভারতবর্ষ ভিক্টোরিয়ার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আসিল। অবশ্য তাহার পরেও ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্ব বজায় ছিল।[৮] পরে এই

কোম্পানীর কার্যকাল ফুরাইল এবং ব্রিটিশ জাতি ভারত সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করিয়া বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিল। মার্শম্যান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :

"It was created by the Crown two hundred and fifty years before, for the purpose of extending British Commerce to the East and it transferred to the Crown on relinquishing its functions an empire more magnificent than that of Rome."[৯]

১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দ হইতে ভারত শাসনের যেমন আমূল পরিবর্তন শুরু হইল, ঠিক তেমনি আবার বাঙালীর সারস্বত জীবনেও নব জন্মান্তর দেখা দিল। এই সময় হইতে ১৯শ শতকের নবীন আবির্ভাব জাতীয় ঐতিহ্যকে অভূতপূর্ব তাৎপর্য মণ্ডিত করিল। মধুসূদনের আবির্ভাব, প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' মুদ্রণ, 'সোমপ্রকাশে'র প্রকাশনায় সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিল। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের সহিত উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের একটা যুগের সমাপ্তি হইল।

॥ ২ ॥

বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবন

১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দের পর কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকার একেবারে লুপ্ত হইল বটে, কিন্তু বিলাতী পণ্যে বাঙলার বাজার ভরিয়া উঠিল। ব্রিটিশ পণ্যকে শ্রীবৃদ্ধিশালী করিবার জন্য আইন করিয়া ভারতের পণ্য ও শিল্প-বাণিজ্যকে বিনষ্ট করিয়া দিবার নীতি পূর্বেই অবলম্বিত হইয়াছিল। ইংরাজ বণিক কি ভাবে ভারতের শিল্পাদি নষ্ট করে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত মণ্টগোমারি মার্টিনের *Eastern India* হইতে :

"Under the pretence of free trade, England has compelled the Hindus to receive the products of the Steam-Looms of Lancashire, Yorkshire, Glasgow etc, at mere nominal duties : while the hand-wrought manufactures of Bengal and Behar, beautiful in fabric abr and durable in wear, have had heavy and almost prohibitive duties imposed on their importation to England"[১০]

১৮৩১ সালে এফ. জে. শোর তাঁহার *Notes on Indian Affairs* নামক গ্রন্থে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থসংরক্ষণের জন্য বাঙলার শিল্পবিলোপের কথা বলিয়াছিলেন।[১১] এই সময়ে আমদানী ও রপ্তানী পণ্যের হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে, ব্রিটিশ বণিকগণ মাত্র ২½% হারে শুল্ক দিয়া ভারতে পণ্য পাঠাইত; কিন্তু ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইলে শতকরা ৪০০% হারে শুল্ক দিতে হইতে।[১২] সুতরাং ১৮৩৭ সালে যখন ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন তখনই এদেশেব শিল্প বাণিজ্য প্রায় পূর্ণ অবলুপ্তিব পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে যে ভারত শিল্পে ছিল বিশ্বের ঈর্ষাব পাত্র, ১৯শ শতাব্দীব মধ্যভাগে সেই ভারতই হইল কৃপার পাত্র এবং শিল্পপ্রধান দেশ ধীরে ধীরে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইল।[১৩] ১৯শ শতাব্দীর শেষের দিকে (১৮৮২) বোম্বাইয়ে ভারতীয়দের দ্বারা কাপডেব কল প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভীত হইয়া শুধু লবণ ও মদ্য ছাড়া ভারতে আমদানীকৃত অন্য সমস্ত বিলাতী পণ্যের উপব শুল্ক একেবারে তুলিয়া দিলেন। একদিকে ইংলণ্ড হইতে পণ্যদ্রব্য প্রায় বিনা শুল্কে ভারতে আমদানী হইতে লাগিল, অপবদিকে বিলাতী যন্ত্রশিল্পেব প্রভাবে ভাবতীয জনসাধারণ বৃত্তিচ্যুত হইয়া পডিল। বিলাতী যন্ত্রবিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পকে 'সমাচাব চন্দ্রিকা' তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করিয়া লিখেন:

"কোম্পানী বাহাদুর এক্ষণে কলে কৌশলে রাজ্য করিতে বড নিপুণ হইয়াছেন। যে কোন কর্ম কলের দ্বারা হইতে পারে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ করিতে ত্রুটি করিবেন না এমত বোধ হইতেছে। ইহাদিগের কলের কথা শুনিয়া কে না বিকল হইবেন যাহা হউক ইংলণ্ডীয় বাহাদুর দিগের কলবল ছলকৌশল সকলই প্রশংসনীয়"

—সমাচার চন্দ্রিকা, ১৮৪৩, ৩০ এ জ্যৈষ্ঠ।

এই পত্রিকায় পরবর্তী সংখ্যায় "কস্যচিৎ কলকৌশল চতুবস্য" নামক এক ছদ্মবেশী পত্রপ্রেরক ইংলণ্ড হইতে আনীত যন্ত্রবিজ্ঞানের বিষম প্রতিক্রিয়া স্মরণ করিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন। যন্ত্রশিল্পের অভ্যাগমে বাঙলার কুটীরশিল্প অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল; এবং সমাজের নিম্নবৃত্তিজীবিগণ শোচনীয় অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল।

মধ্যবিত্ত ও ধনিসমাজও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ১৮৪৭ সনে বিলাতের বহু ব্যাঙ্ক কারবার বন্ধ করিয়া দেয়, কলিকাতার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কও এই সময়ে কারবার গুটাইয়া ফেলে। ফলে এই ব্যাঙ্কে যাঁহারা টাকা

গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা অকূল পাথারে পড়িলেন।[১৪] ইহার কিছু পূর্ব হইতেই বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে অর্থনৈতিক বিড়ম্বনা শুরু হইয়া গিয়াছিল। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে ম্যাকিণ্টস্ কোম্পানীর কুঠী বন্ধ হইয়া যায়, ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে ক্রুটণ্ডেন্ কোম্পানী দেউলিয়া হইয়া যায়। ফলে বাঙালী ব্যবসায়ী শিবচরণ পাল ও কাশীনাথ পাল পঁচিশ লক্ষ টাকার কারবার গুটাইয়া লইতে বাধ্য হন।[১৫] এই সময়েই বাঙালী ইংরাজী শিখিয়া চাকুরীজীবী হইয়া পড়িতেছিলে। তাই বাঙালীকে চাকুরী না দিয়া হিন্দুস্থানীকে দেওয়াতে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।[১৬] তখনও রামগোপাল ঘোষ এবং অন্যান্য 'ইয়ং বেঙ্গল'গণ বায়বীয় রাজনীতি ও আদর্শস্ফীত তত্ত্ব লইয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন, জাতির সর্বনাশা অর্থনৈতিক পরাজয় তাঁহারা ততটা মনোযোগ দিয়া ভাবিয়া দেখেন নাই। একদিকে বাঙালী অর্থনৈতিক জীবনে পশ্চাদপসরণ করিতেছিল, অপরদিকে জাতির দুইকূল ছাপাইয়া নব জীবনের বন্যা নামিতেছিল। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজী ভাষা সরকারী ভাষা রূপে গৃহীত হইলে এবং উচ্চতর শিক্ষায় এই ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হইলে সমগ্র জাতির প্রাণ-চেতনায় ভাববিপ্লবের বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চারিত হইল।

॥ ৩ ॥

নবশিক্ষার ধারা

সমকালীন সাহিত্যের পটভূমিকা বিচার ও ইহার উপর বিভিন্ন প্রভাব বিশ্লেষণ করিতে হইলে সদ্য-প্রচারিত তৎকালীন ইংরাজীশিক্ষার পরিচয় লইতে হইবে; ডিরোজিও তাঁহার অনুরাগী তরুণ ছাত্রগণের চিত্তে য়ুরোপের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন। সেই 'ইয়ং বেঙ্গল'গণের বিদ্রোহ অধিকাংশ স্থলেই বৃথা আস্ফালনে পর্যবসিত হইয়াছিল, তাঁহাদের বিপ্লব জাতির অন্তরে প্রসারিত হইতে পারে নাই। তাঁহারা নবলব্ধ য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া যে নবযুগবাণী সদম্ভে ঘোষণা করিলেন, অশিক্ষায় আকণ্ঠমগ্ন বাঙালী তাহাতে কর্ণপাত করিতে পারে নাই। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে মেকলের বিখ্যাত 'এডুকেশন মিনিট' (১৮৩৫, ফেব্রুয়ারী) প্রচারিত হইল এবং ১৮৩৫ সনের ৭ই মার্চ এই আইন বিধিবদ্ধ হইল যে, অতঃপর দেশীয় লোকের উচ্চশিক্ষা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই চলিতে

থাকিবে।[১৭] ১৮৩৭ সনে আদালত হইতে ফারসী উঠিয়া গেলে চাকুরীজীবী বাঙালী সমাজ ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইল।[১৮] মেকলে বাঙালীর ভালে কলঙ্কতিলক আঁকিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন :

"Deceit is to the Bengalee, what the paw is to the lion or the sting is to the bee"[১৯]

ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার দম্ভোক্তি কৃপার যোগ্য :

"I have never found one among them (i.e. the Orientalists), who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature."[২০]

তাঁহার এই সমস্ত মূঢ় ভাষণ 'ইয়ং বেঙ্গল'দিগকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। অবশ্য মেকলে ভারতীয়দিগকে ইংরাজী শিখাইতে চাহিয়াছিলেন কেন, তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতেই বুঝা যাইবে :

"It is my firm belief if our plans of education are followed up there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty years hence."[২১]

তাঁহার এই পবিত্র বাসনা বোধ হয় সফল হয় নাই। পৌত্তলিক বাঙালী দলে দলে যিশু ভজিবে, তাঁহার এই আশা দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তিনি যে মহৎ কর্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, শুধু তাহার জন্যই বাঙালীসম্বন্ধে তাঁহার বালসুলভ কটূক্তি ক্ষমা করা যায়। ঐতিহাসিকের ভাষায়—"It is the genius of this man, (i, e. Macaulay) narrow in his Europeanism, self-satisfied in his sense of English greatness, that gives life to modern India as we know it."[২২]

ইংরাজী শিক্ষা চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নিকট দুর্লভ বস্তু বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল; লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন ঘোষণা করিলেন যে, ইংরাজীনবীশ ভারতীয়দিগকে চাকুরীতে বহাল করা হইবে, তখনই প্রধানতঃ আর্থিক লাভালাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ইংরাজী শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য দেশের চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল।[২৩] স্কুলবুক সোসাইটী, স্কুল সোসাইটী ও হিন্দু কলেজ যাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, সেই ইংরাজী শিক্ষা রামমোহনের মৃত্যুর পর হইতেই যেন সহস্র শাখাবাহু বিস্তার করিয়া সদ্য-নিদ্রোত্থিত, বাঙালীর মানস-আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল।

১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে হোরেস হেমান উইলসনের কলিকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে কলিকাতা ও ইহার চতুষ্পার্শ্বের বিদ্যালয়ে প্রায় ৬,০০০ হাজার ছাত্র ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিত।[২৪] রামমোহনের যুগেই ইংরাজীশিক্ষার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৮৩০ হইতে ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত শহর, শহরতলী ও নিকটবর্তী গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় খুলিবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে :—

বর্ধমান (১৮৩১), টাকি (১৮৩২), চুঁচুড়া (১৮৩২), শান্তিপুর আকাদামি (১৮৩১), মুর্শিদাবাদের ইংলণ্ডীয় পাঠশালা (১৮৩৪), মেদিনীপুর (১৮৩৪), চন্দননগর (১৮৩৫), কৃষ্ণনগর (১৮৩৫), সুখচর (১৮৩৬), হুগলী (১৮৩৬), পানিহাটী (১৮৩৬), হুগলীর নিকট অমরপুর গ্রাম (১৮৩৭), কলিকাতার নিকট চানক (১৮৩৭), সৈদাবাদ (১৮৩৭), বরাহনগর (১৮৩৭), আন্দুল (১৮৩৮), মহেশপুর (১৮৩৯), বারাসত (১৮৩৯), তেলিনী পাড়া (১৮৩৯), ত্রিবেণী (১৮৩৯), হাওড়া (১৮৪৫)।[২৫]

ইংরাজী শিক্ষার প্রতি যে কিরূপ আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা শুধু এই কয় বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সংখ্যা বিচার করিলেই বুঝা যাইবে। রামমোহন-যুগের অব্যবহিত পরে, সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিবরণী অবলম্বনে কলিকাতার ইংরাজী শিক্ষার্থী ছাত্র সংখ্যার তালিকা দেওয়া যাইতেছে :—

বিদ্যায়তন	ছাত্র সংখ্যা
হিন্দু কলেজ—	৩৩৮
কলিকাতা স্কুল সোসাইটীর স্কুলসমূহ—	৩০০
ডাফসাহেবের পাঠশালা—	৩৫০
চার্চ মিশনারী পাঠশালা—	২০০
ওরিয়েন্টাল সেমিনারী—	২০০
ইউনিয়ান স্কুল—	১২০
জুভেনাইল স্কুল—	৭০
হিন্দু ফ্রি স্কুল—	১৬০
হিন্দু বেনাভোলেন্ট স্কুল—	৯০
নূতন হিন্দু স্কুল—	৪০
মোট—	১৮৬৮[২৬]

উইলসনের বিলাত যাত্রার দুই বৎসর পূর্বেই (১৮৩৪) শুধু কলিকাতাতেই প্রায় দুই হাজার ছাত্র ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিত। সুতরাং কি পরিমাণে যে ইংরাজী শিক্ষার অহিফেন-রস কলিকাতার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। এমন কি শুধু সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করিয়া অনেক তরুণ ব্রাহ্মণ ছাত্র পরিতুষ্ট হইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, সরকারী কর্মে বা সওদাগরী কুঠীতে ইংরাজীনবীশ বাঙালীর প্রয়োজন হইতেছে। বৃত্তিচ্যুত সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া "শ্রীযুত এডুকেসন কমিটির সেক্রেটারী সাহেব বরাবরেষু" এই মর্মে আবেদন করেন যে, সংস্কৃত কলেজেও ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হউক; কারণ শুধু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া তাঁহারা জীবিকা অর্জন করিতে পারিতেছেন না (১৮৩৪)।[২৭] ১৮৩৮ সালে কলিকাতার নিকটবর্তী আন্দুল গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনদিবসে ঐ অনুষ্ঠানের সভাপতি আন্দুলের ধনাঢ্য জমিদার মহারাজ রাজনারায়ণের নিম্নলিখিত উক্তি পাঠ করিলেই ইংরাজী শিক্ষার জনপ্রিয়তার অর্থ বুঝা যাইবে :

"ইংরাজী বিদ্যা বর্তমান রাজভাষা অর্থকরী পরম হিতকারিণী অর্থহীন ভদ্রলোকের সদুপজীবিকা ধনিগণের সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং ধনরক্ষাদির হেতু সর্বসাধারণের পক্ষে দয়া সভ্যতা জ্ঞান সাহসাদি বৃদ্ধির উপায় এবং মন্দক্রিয়া মিথ্যা কলহ পরনিন্দা পরদ্বেষাদি বারণের কারণ ইত্যাদি অশেষ গুণযুক্ত ইংরাজি বিদ্যা নিতান্ত শিক্ষাকরণের আবশ্যকতা হইতেছে।"[২৮]

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব যে কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রে এই মর্মে এক সংবাদ বাহির হয় যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে "শ্রীশ্রীপরমেশ্বর আছেন কিনা এবং পরমেশ্বরের কার্য কি," এই বিষয়ে বিতর্ক সভা হইয়াছিল। ঐ পত্রে ইহার ফলাফল প্রকাশিত হয় নাই। তবু এইটুকু অনুমান করা যায় যে, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে যে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদ ইতিপূর্বেই রামমোহন ও ডিরোজিও-শিষ্যগণের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বন্দী হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করিতে লাগিল।

১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল; ঐ বৎসরেই স্থাপিত হইল কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী। ১৮২৯ সনে মেকানিকাল

ইনস্টিটিউট অর্থাৎ কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু বাঙালী তখনও ভাবমার্গে বিচরণ করিতেছিল বলিয়া এই কারিগরী বিদ্যালয়টি বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।[২৯] একদল চাকুরীকামী সম্প্রদায় এবং একদল আদর্শবাদী যুবসম্প্রদায়—প্রধানতঃ এই দুই দলের মধ্যেই ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষা বন্দী অবস্থায় ছিল।

একদিকে যেমন ইংরাজী বিদ্যার প্রতি সকলের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ঠিক তেমনি আবার সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে কলিকাতায় চতুষ্পাঠীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, সংবাদপত্রে চতুষ্পাঠীর অতি সামান্য বিবরণী প্রকাশিত হইত।[৩০]

ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অতিশয় গুরুত্ব দেওয়ার ফলে কেহ কেহ সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন।[৩১] কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে সামান্য সামাজিক প্রতিক্রিয়া কিছুমাত্র বাধাসৃষ্টি করিতে পারিল না। বরং দেখা গেল যে, কলিকাতাব ধনিসমাজও ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন। রাজা বৈদ্যনাথ রায়, নরসিংহচন্দ্র রায়, কালীশঙ্কর রায়, বেনোয়ারিলাল রায়, গুরুপ্রসাদ বসু রায়, হরিনাথ রায়, ও শিবচন্দ্র রায় ইংরাজী শিক্ষাপ্রসারের জন্য যে আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ—১, ৭০, ০০০ টাকা।[৩২]

১৮৫৪ সালে চার্লস্ উড্ সাহেবের শিক্ষা সংক্রান্ত সনদ (চার্টার) প্রচারিত হইল। তাঁহার মতে, "Its aim should be the extension of European knowledge among all classes in India."*

উড্ সাহেবের এই শিক্ষাসনদ প্রচারিত হইবার পর এদেশে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সূচনা হইল; বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত (১৮৫৭) হইবার পর ইংরাজী শিক্ষা সমাজের সর্বস্তরে বিস্তার লাভের সুযোগ পাইল।

ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বাঙালী জাতির নবযুগ চেতনা ফিরিয়া আসিল; রামমোহনের লোকান্তরের পর বাঙলা দেশে অভূতপূর্ব আন্দোলন শুরু হইয়া গেল। সমসাময়িক সাহিত্যের পশ্চাদ্‌পটে এই যুগচেতনার পাবকস্পর্শ রহিয়াছে, একটু অবহিত হইলেই তাহা বুঝা যাইবে।

---

*V. Lovett, *India*, '*The Nation of to-day*' series, p, 76.

॥ ৪ ॥

নবযুগ-চেতনা

রামমোহন যে বহ্নি-কণা সৃষ্ট করিলেন, তাহাই পরবর্তী পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বাঙালীর চিত্তে দাবানলের দীপ্তি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল। ডিরোজিওর শিষ্যগণ সর্বপ্রথম হিন্দুর লোকাচার ও সংস্কারের সহস্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কেহ-বা নিরীশ্বরবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রামমোহন প্রধানত ভারতের বেদান্ত ও উপনিষদকে একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করিয়া জাতির মানসমুক্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন। ডিরোজিও ও রামমোহনের প্রভাবে রাজনীতির প্রতিও তরুণ বাঙালীর চিত্ত আকৃষ্ট হইল। ইংরাজ সরকারের শাসনের প্রতি রামমোহনের অকুণ্ঠ বিশ্বাস ছিল, তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে:

"Among other objects, in our solemn devotion, we frequently offer up our humble thanks to God, for the blessings of British Rule in India and sincerely pray that it may continue in its beneficient operation for centuries to come."৩৩

এই প্রসঙ্গে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংরাজ-স্তুতিও সকৌতুকে স্মরণীয়। প্রসন্নকুমার ১৮৩১ সনে সগর্বে বলিয়াছিলেন:

"If we were to be asked, what Government we would prefer, English or any other, we would, one and all reply, English by all means, ay, even in preference to Hindu Government."৩৪

রামগোপাল ঘোষও, "was the ardent and attached friend of British Supremacy, and should bitterly deprecate any event, which should weaken the ties which bound India to the people and Government of Great Britain."৩৫

গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই মত পোষণ করিতেন।৩৬ বিলাতে গিয়া দ্বারকানাথ যেভাবে নির্লজ্জ ইংরাজতোষণ করেন, তাহাতে তাঁহার মত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির এই জাতীয় বাচালতা অমার্জনীয়। তিনি আবেগের স্রোতে ভাসমান হইয়া ক্রমে ক্রমে সুর চড়াইয়া বলিতে থাকেন:

"It was England who sent out Clive and Cornwallis to benefit India by their counsels and arms. It was England that sent out to that distant

nation the great man had succeeded in establishing peace in the world, and she was the first who introduced a proper and permanent order of things in the East."৩৭

কিন্তু ক্রমেই শিক্ষিত বাঙালীর স্বপ্নভঙ্গ হইতে লাগিল। শেষে দ্বারকানাথও বলিতে বাধ্য হইলেন :

"They (i. e. the English) have taken all which the Natives possessed, their lives, liberty, property, and all were held at the mercy of Government."৩৮

এইভাবে ক্রমে ক্রমে তরুণ বাঙালীর মন ইংরাজ সরকারের অন্যায়শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট হইতে লাগিল। 'ব্ল্যাক এ্যাক্ট' বা কালাকানুন লইয়াই কলহের প্রথম সূত্রপাত হইল। রামগোপাল ঘোষ এই আইনের পক্ষে চিৎপুর অঞ্চলে ফৌজদারী বালাখানায় এমন অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা করেন যে, মার্শম্যানের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' সংবাদপত্রেও রামগোপালের বাগ্মিতার প্রশংসা বাহির হয়। ফলে সওদাগরী অফিসের কর্ণধার এবং সরকারী চাকুরিয়া ইংরাজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটীর সহকারী সভাপতির পদ হইতে বিচ্যুত করে। এই সময়ে বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনার মূলে যিনি প্রাণসঞ্চার করেন, তিনি বাঙালী নহেন, একজন ইংরাজ—জর্জ টমসন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের কালে লণ্ডনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রধান কর্মী জর্জ টমসনকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসেন (১৮৪২)। টমসন সাহেব তরুণ বাঙালীদের উপর, বিশেষতঃ ডিরোজিও-শিষ্যগণের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে বাঙালী যে রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিত, তাহা নিতান্তই রবিবাসরীয় আলোচনা-মাত্র; য়ুরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস ও তাহার গতি-প্রকৃতিই ছিল তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। টমসন কলিকাতার বহুস্থলে বক্তৃতা দিয়া বাঙালীকে বাস্তব রাজনীতিতে দীক্ষা দিলেন, মাটির প্রতি প্রেম জাগাইলেন। এ বিষয়ে ভোলানাথ চন্দ্রের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

"David Hare had prepared the soil on which George Thompson planted the first seed of Native political education in our country."৩৯

ফৌজদারী বালাখানায় প্রদত্ত রামগোপাল ঘোষ ও টমসনের অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায় এদেশের ফিরিঙ্গীসমাজ অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িল। ১৮৪৯-৫০ সালে খাস ব্রিটনদিগকে আইনের আওতায় আনিবার জন্য আইনসভা

দেশীয় বিচারকদের উপর শ্বেতাঙ্গের বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ইহাই 'ব্লাক এ্যাক্ট' বা কালা কানুন নামে পরিচিত। এদেশীয় ইংরাজদের প্রবল বাধাদানের ফলে তাহা বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই।[৪০] ইহার ফলে বাঙালীর প্রতি ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের যে ঘৃণাবিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়, তাহা ভবিষ্যতে বিদূরিত তো হয়ই নাই, বরং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতীয়দের প্রতি ইংরাজ জাতির যে ঘৃণা স্তূপীকৃত হয়, তাহা কোনদিনই মুছিয়া যায় নাই। সে যাহা হউক, টমসন আসিয়াছিলেন ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সংগ্রহের জন্য ; কিন্তু তাঁহার অপূর্ব বাগ্মিতার গুণে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ডিরোজিও-শিষ্যগণ তাঁহার নিকট বাস্তব রাজনীতি,—যাহাকে আইনানুগ আন্দোলন বলে, তাহাই শিক্ষা করিলেন। ১৮৪৩ সালের দ্বিভাষিক পত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেটার'-এ (৪।৫ সংখ্যা) টমসনের বক্তৃতার যে চুম্বক প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিয়া বাঙলার শিক্ষিত তরুণ সমাজ মাতিয়া উঠিয়াছিল। টমসনের শেষকথা—"Our weapons, therefore, are truth, reason, persuasion." (*Bengal Spectator*, 4—5 numbers, 1843).

টমসন সাহেব বাঙালীর অন্তররুদ্ধ বিক্ষোভকে ধূমায়িত করিয়া তুলিলেন ; কলিকাতায় উত্তেজনার ঝড় বহিতে লাগিল। লর্ড এলেনবুরোও দেশীয় লোকের ইংরাজীশিক্ষা লাভে পুলকিত হন নাই :

"It is said that his Lordship (i. e. Lord Ellenborough) has opined to the Deputy Governor, that the present system of education makes—copyists and mob-orators." (*Bengal Spectator*, Nov. 1, 1843)

ভূস্বামী-সম্প্রদায়ের মুখপত্র The Bengal Landholders' Association এবং তরুণ বাঙালীদের মুখপত্র The Bengal British Indian Association—এই উভয় দলকেই মিলাইয়া দেন জর্জ টমসন, এবং তাঁহারই নির্দেশে-উপদেশে দুই দলের সম্মিলিত সহযোগিতায় The British Indian Association of Bengal গড়িয়া উঠিল (১৮৫১)। তরুণ বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন এবং স্বসমাজ সম্বন্ধে বিশ্বাসনিষ্ঠ আত্মবোধ জাগরণে এই ভারতপ্রেমিক বিদেশী ব্যক্তিটি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

একদিকে যেমন ইংরাজীশিক্ষা মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি দ্রুতবেগে বিস্তার লাভ করিতেছিল, ঠিক তেমনি এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক

চেতনার প্রতিক্রিয়ার জন্য নব নব বাসনার আবির্ভাব হইল। এতদিন ধরিয়া দেশের নিরক্ষর জনসাধারণ নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেছিল; কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করিল, ১৮৫৬ সালে কলিকাতায় নীলকর বিরোধী আন্দোলন শুরু হইয়া গেল। ইহার সামান্য পরে ১৮৫৭ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণস্ পিকক মফঃস্বলে শেতাঙ্গদের অত্যাচার নিবারণকল্পে ফৌজদারী আদালতে সীমা বাড়াইয়া দেশীয় বিচারকের হস্তে শেতাঙ্গবিচারের ভার অর্পণ করিতে চাহিলেন; ফলে কলিকাতা চেম্বার অব কমার্স এসোসিয়েশন, ট্রেডার্স এ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্টার্স এ্যাসোসিয়েশন, প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ কলিকাতা টাউনহলে সভা করিয়া এই ব্যাপারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ করিল। বাঙালী অধিবাসীরাও নীরবে বসিয়া রহিলেন না। তাঁহারাও ঐ বৎসর (১৮৫৭) উক্ত সভার প্রতিবাদ করিয়া ১৮০০ শত গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টারদের নিকট আবেদন পত্র পাঠাইলেন; অবশ্য তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। তবে জনমত যে জাগিতেছিল, তাহার নির্দেশ পাওয়া গেল। একদিকে যেমন রাষ্ট্রচেতনা ফিরিয়া আসিল, অপরদিকে তেমনি আবার মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালী দণ্ডায়মান হইল। যে ডাফ সাহেবকে রামমোহন বিশেষ সম্মান করিয়া বাঙালীসমাজে শিক্ষাপ্রচারে সাহায্য করেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ডাফ সাহেবের উগ্র ভারতবিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ডাফ সাহেবের অশিষ্ট মন্তব্যের প্রখর আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ১৮৪৫ সালে ব্যাপার চরমে উঠিল। ঐ বৎসর ডাফ সাহেবের স্কুলের একটি ছাত্র উমেশচন্দ্র সরকার নাবালিকা স্ত্রীসহ খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করিলে দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য হিন্দু সমাজপতিগণ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ভুলিয়া ইহার বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করিলেন।[৪১]

এই নব জাগরণের তরঙ্গ শুধু পুরুষসমাজেই নহে, সুদূর গ্রামাঞ্চলে নারীসমাজের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৮৪৯ সনে বেথুন সাহেব কর্তৃক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বালিকাদের বিদ্যার্জনের পথ প্রশস্ত হইল; কিন্তু তাহার বহু পূর্বে ১৮৩৪ সালের সংবাদপত্র

হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীরামপুর, বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[৪২] এমন কি হীরা বুলবুল নাম্নী এক বারাঙ্গনা তাহার পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছিল, যাহার ফলে কলিকাতায় তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি হয়।[৪৩] আরও কয়েকটি সংবাদ লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যেমন—১৮৩৫ সালে শান্তিপুরবাসিনী এক কুলীন ব্রাহ্মণবিধবা 'সমাচার দর্পণে' বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।[৪৪] ঐ বৎসরেই চুঁচুড়া হইতে কতিপয় রমণী স্ত্রী-স্বাধীনতা দাবী করিয়া সংবাদপত্রে পত্র লিখিয়াছিলেন।[৪৫] ১৮৪০ সালে আর একটি সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, ধনীর কন্যাগণ সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দাবী করিতেছেন। এই সমস্ত ঘটনা আপাত তুচ্ছ মনে হইতে পারে; কিন্তু ১৮শ শতাব্দীর সাহিত্যের তাৎপর্য নির্ণয় ও পটভূমিকা বিশ্লেষণে ইহার প্রয়োজন আছে।

॥ ৫ ॥

নানাবিধ সমসাময়িক আন্দোলন

সভাসমিতি—তৎকালীন সভাসমিতি ও অন্যান্য আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইলে বাঙালীর মনোজীবনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কারণ ঐ সভাসমিতির কার্যানুষ্ঠানের মধ্যেই নবজাগরণের স্পর্শ রহিয়াছে। রামমোহনের মৃত্যুর পূর্বে ইয়ং বেঙ্গলগণ পরিচালিত Academic Association, Athenaeum এবং The Society for the Acquisition of General Knowledge (সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা) প্রভৃতি সভার দ্বার সাধারণের নিকট উন্মুক্ত ছিল না। এই সভাসমূহের আলাপ-আলোচনাদি ইংরাজীর মাধ্যমেই হইত, ফলে ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ জন ইহা হইতে লাভবান হইত না। ইহার মধ্যে 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র আলোচ্য বিষয়সমূহের অল্প কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে[৪৬]:

১। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—Reform Civil and Social, among educated natives.

২। মহেশচন্দ্র দেব—Condition of Hindoo women.

৩। গোবিন্দচন্দ্র সেন—Brief Outline of the History of Hindoostan.

৪। প্যারীচাঁদ মিত্র—State of Hindoostan under the Hindoos.

কিন্তু শুধু ইংরাজী শিক্ষিত নহে, বঙ্গভাষাভাষী জনসাধারণও সভাসমিতি সম্বন্ধে সচেতন হইতেছিল। নিম্নলিখিত সভাসমূহে "বঙ্গভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় কথোপকথন" হইত না।

বঙ্গরঞ্জিনী সভা—১৮৪৮

সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা—১৮৩৩

জ্ঞানচন্দ্রোদয়—১৮৩৬

শুভদা, খিদিরপুর—১৮৩৪

সিমুলিয়ার সভা—অদ্বৈতচরণ গোস্বামীর গৃহে স্থাপিত—১৮৩৪

ইণ্ডিয়ান একাডেমী—১৮৩৪

প্রবোধ উজ্জ্বল—অশুতোষ দেবের বাটীতে স্থাপিত।

প্রবোধ কৌমুদী—চাঁপাতলা—১৮৩৪।

(—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় ভাগ)

একদিকে 'ইয়ং বেঙ্গল'গণ বিশুদ্ধ য়ুরোপীয় রীতি গ্রহণ করিলেন, অপরদিকে জনসাধারণ বাংলা ভাষা চর্চা ও আলোচনাতে কৌতূহলী হইয়া উঠিল। কিন্তু যে সভা নব্যশিক্ষিত বাঙালী যুবকের চিত্তে অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা হইল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯)। প্রথমে ইহার নাম ছিল তত্ত্বরঞ্জিনী সভা। এই তত্ত্ববোধিনী সভা ও ইহার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (১৮৪১) নব্য বাঙালীর ভাবধারা ও মননের দিগ্‌দর্শনী হইয়া বিরাজ করিতেছে। 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'র প্রায় উনত্রিশ বৎসর পরে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বঙ্গভাষাভাষী জনসমাজের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; তত্ত্ববোধিনীর স্পষ্টতঃ স্বীকৃত ও প্রচারিত ব্রাহ্ম মতবাদের জন্য কোন কোন রক্ষণশীল হিন্দু ইহা হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতেন। তথাপি তত্ত্ববোধিনী সভা ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উচ্চশিক্ষিত স্বদেশপ্রেমী বাঙালী যুবকের মনে নব নব আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথা বলা যাইতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদ প্রচারের জন্য তত্ত্ববোধিনী সভাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রথম যুগে মহর্ষি বেদের অপৌরুষেয়তা ও অভ্রান্ততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। বিদ্যাসাগর ঈশ্বরবাদী ভক্ত ছিলেন না, তথাপি তত্ত্ববোধিনীর প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা আছে দেখিয়া তিনিও এই সভা ও পত্রিকার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবি ঈশ্বর গুপ্তও এখানে নিত্য গতায়াত করিতেন। এই সভাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙলাদেশে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগী, তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম নিষ্ঠাবান সভ্য এবং 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের দ্বারা বেদবেদান্ত প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্রের মূল্য নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম নিঃস্পৃহ বুদ্ধিবাদের বাতায়ন হইতে অধ্যাত্মতত্ত্ব, ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ ও বেদের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে প্রতিবাদের কর্কশধ্বনি তুলিয়াছিলেন। নবযুগ-চেতনায় এই ব্যাপার যে সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।*

সাময়িক পত্র—এই নবযুগের বাণী সাময়িক পত্রাদিতেও বীজাকারে সুপ্ত ছিল। সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (১৮৩৫), সম্বাদ ভাস্কর (১৮৩৯), বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর—(দ্বিভাষিক, ১৮৪২), তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩), বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১), এডুকেশন গেজেট (১৮৫৬), সোম প্রকাশ (১৮৫৮) প্রভৃতি পত্রের নামোল্লেখ করিতে হয়। ইহার মধ্যে 'সম্বাদ ভাস্কর'কে লইয়া কলিকাতায় প্রচণ্ড কোলাহল উঠিয়াছিল। উক্ত পত্রের সম্পাদক শ্রীনাথ রায় আন্দুলের জমিদারের নামে কটূক্তি করিলে প্রকাশ্য দিবালোকে কলিকাতার রাজপথ হইতে অপহৃত হন (১৮৪০), এবং তাঁহাকে নানাস্থানে লুকাইয়া রাখা হয়। তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে সর্বপ্রথম 'হেবিয়াস কর্পাসের' মামলা হয়; কিছু নির্যাতন ভোগের পর শ্রীনাথ রায় মুক্তি পান; জনসাধারণের আন্দোলনের ফলে ধনী জমিদার আইনের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই 'সম্বাদ ভাস্করে'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন সে যুগের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য। তিনি 'সম্বাদ রসরাজ' নামক একখানি পত্রিকা বাহির করেন (১৮৩৯); তাহাতে নানা জনের

* পরে ঈশ্বর গুপ্ত ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রতি কটূক্তি বর্ষিত হইত। তৎকালে নবজাগরণ সত্ত্বেও এই হীনরুচি পত্রিকার চাহিদা অল্প ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের 'পাষণ্ডপীড়ন' ও গৌরীশঙ্করের 'সম্বাদ রসরাজের' মধ্যে অতি অশ্রাব্য গালিগালাজ চলিত। এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন—"ঈশ্বরচন্দ্র 'পাষণ্ডপীড়ন' এবং তর্কবাগীশ 'রসরাজ' পত্র অবলম্বনে কবিতাযুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি এবং কুৎসা পূর্ণ কবিতায় পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের অশ্লীলতায় জ্বালাতন হইয়া লঙ সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান ও কৃতকার্য হয়েন। সেইদিন হইতে অশ্লীলতাপাপ আর বড় বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় না।" এই পত্রিকার অন্তত চারিশত সংখ্যা নিয়মিত বিক্রীত হইত। এই প্রসঙ্গে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' শ্রীরামপুর হইতে লিখিয়াছিলেন :

"It is no credit to Native Society, that four hundred copies of this Rasoraj should find purchasers in it. "[8৬]

ঈশ্বর গুপ্ত গৌরীশঙ্করের সম্পাদনায় প্রকাশিত অতিশয় দূষিতরুচির পত্র 'রসরাজ' ও তাহার সম্পাদককে নিন্দা করিয়া 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৩ই এপ্রিল, ১৮৫৫) লিখেন, "আমারদিগের সম্ভ্রান্ত সহযোগী ভাস্কর সম্পাদক আপনার কার্য ও বিবেচনা দোষে গ্লানি লেখার অপরাধে একাদশ বৎসরের পর পুনর্বার কারারুদ্ধ হইয়াছেন, এইবার লইয়া দুইবার হইল, এ দণ্ড নিতান্ত লঘুদণ্ড হয় নাই, যে চারি হাজার টাকা প্রতিভূ ছিল, তাহা রাজকোষে ন্যস্ত হইল, ছয় মাসের নিমিত্ত কারাবাস করিতে হইল, আবার ৫০০ টাকা দণ্ড দিতে হইবে, তদ্ভিন্ন মুক্তি পাইবার সময়ে ৫০০ টাকার করিয়া হাজার টাকার দুইজন জামিন এবং আপনাকে হাজার টাকার একখানা মুচলেখা লিখিয়া দিতে হইবে। সুতরাং পাঁচ ফুলে সাজিখানি বিলক্ষণরূপেই পূর্ণ হইল।"

'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকার বিদূষকবৃত্তি সাধারণ জনের নিকট যতই রসন-তৃপ্তিকর হোক না কেন, রামমোহনের মৃত্যুর পর (১৮৩৩) এবং ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর (১৮৫৯) মধ্যবর্তীকালের মধ্যে বাঙলা দেশে যে সমস্ত প্রধান প্রধান সাময়িকপত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার দ্বারা বাঙালীর চিত্ততলে নব আকাঙ্ক্ষার বাণী জাগ্রত হইতেছিল। একদিকে যেমন 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে' নানাবিধ সামাজিক আন্দোলন চলিতেছিল, অন্যদিকে তেমনি আবার

'সমাচার সুধাবর্ষণ', 'সংবাদ প্রভাকব', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বাঙালীব নবচেতনা জাগিয়া উঠিল। 'সমাচাব সুধাবর্ষণে' ১২৬২ সালে সর্বপ্রথম ইংরাজ-বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত তারিখে (১৭ই পৌষ, ১২৬২) যে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

উঠে হিন্দু বীরগণ ।২
রাক্ষস হইতে দেশ করহ রক্ষণ ॥
যায় বাক্ষসে লইয়া ।২
ইউবোপে যাত্রা করে সাগর বাহিয়া ॥
কেন দ্রব্য বহুমূল্য ।২
হিন্দুস্থানে যথাভূমি ফসলা অতুল্য ॥
অনাহারে প্রাণ যায় ।২
ঘটিয়াছে দেশে বুঝি মন্বন্তর দায় ॥
যার বহুধন আয় ২
সুখেতে আছয়ে যারা কি দুঃখ বা পায় ॥
কিন্তু দেখ চক্ষু তুলি ।২
স্বর্ণ বঙ্গদেশে দেখি হইয়াছে ধূলি ॥
দেখ জাহাজ সম্বাদ ।২
তবে তো জানিবে কত ঘটেছে প্রমাদ ॥
ভাগ্যে ভীত হিন্দুগণ ।২
তাহাতেই রাক্ষসের এত আয়োজন ॥
এসো যতেক পাণ্ডব ।২
ভারতের শত্রুদের কর সবে শব ॥
যদি থাকিত সাহস ।২
তবে কি এমন দুঃখে হৈত কেহ বশ ॥
অত কি কহিব আর ।২
লহ স্বদেশীয়গণ দুঃখিদের ভার ॥

এই যে ইংরাজশাসনের প্রতি বিদ্বেষ, দেশেব অর্থনৈতিক বিপর্যয়—ইহা তৎকালীন বাঙালীর মনে প্রতিবাদের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। বৃত্তিচ্যুত বাঙালীর অন্তরে এইরূপ ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জাগিতেছিল এবং সে প্রতিবাদের অগ্নিজ্বালা সমসাময়িক পত্রিকায় সঞ্চারিত হইতেছিল। জীবন-সমুদ্রের উপরিতলবিহারী

কবি ঈশ্বর গুপ্তও মাঝে মাঝে চিত্তচাপল্যের লঘুতা পরিত্যাগ করিয়া বেদনাবিদ্ধ হইয়া পড়িতেন, পরবশ বাঙালীর মর্মব্যথা তাঁহাকেও বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল; সে বেদনার হতাশা ১৮৪৮ সালের ১লা বৈশাখ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল :

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্ম রূপ ভূষাহীন হয়ে।
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানহত
মিছে কেন মর ভার বয়ে॥
মনেতে জেনেছি সার আমাদের ভাগ্যে আর
পোহাবে না দুঃখের যামিনী।
অতএব বাক্য ধর বৃথায় বিলম্ব কর,
হও মাগো পাতাল গামিনী॥

গুপ্তকবি আরও এক বিষয়ে সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ইংরাজশক্তি ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর অর্থ বিদেশে লইয়া যাইতেছে, এবং তাহার ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃই হীনবল হইয়া পড়িবে; এবং এই অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহতভাবে চলিলে অল্পকালের মধ্যে ভারতবর্ষ নিঃস্ব হইয়া যাইবে। এই দিকে বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :

"কিন্তু কি চমৎকার এই দুঃসময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশ হইতে রাশি ২ নগদটাকা জাহাজ পুরিয়া বিলাতে প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহারা এই সুবর্ণভূমি ভারতবর্ষের ধনদ্বারা নানা বিধায়েই স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে আবার আমাদিগের স্বর্ণরৌপ্যাদি হরণ করণেরও সূত্রপাত করিলেন, অতএব ইংরাজদিগের ইংরাজী কৌশলে এই রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের সমূহ প্রকার দুঃখ হইবার সম্ভাবনা।

—সংবাদ প্রভাকর, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮

ঈশ্বরগুপ্তের এই নৈরাশ্যবেদনা বাঙালী পাঠকের চিত্তেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। অবশ্য বাঙালী তখন মিশনারী-আক্রমণ হইতে আপনাদের সন্তান-সন্ততি ও ধর্মরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরাজ-শোষণের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ তখনও তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। রাধাকান্ত দেববাহাদুর, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও আশুতোষ দেবের মত দূরদ্রষ্টা সমাজনেতৃবর্গও অর্থনৈতিক দুর্ঘটনার দিকে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন

করিয়া শুধু মিশনারীসম্প্রদায়ের আক্রমণ হইতেই বাঙালী হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য খ্রীস্টান-বিরোধিতার প্রাচীর তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা ১৮৫১ সালে ৪ঠা মে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ কবিয়া হিন্দু-ধর্মকে মিশনারী-আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবাব জন্য জাতিসম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুকেই একত্রিত হইতে আহ্বান কবেন, এবং বলেন, "এতদ্দেশীয় লোকেরা পূর্বে বালক বা বালিকাদিগকে এই বলিয়া ভয় দেখাইত, 'ছেলেধরা আসিয়াছে, তোবা বাডীব বাহির হইস না।' এক্ষণে মিশনারীবা যথার্থই ছেলেধরা হইয়াছিল……।" ইঁহাবা 'ছেলেধবাব' আক্রমণ হইতে তরুণ বাঙালীকে বক্ষা করিতেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বব গুপ্তও ডাফ্ সাহেবকে কঠোবভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন; বসিক কবি বেভাঃ ডাফ্‌কে সর্বদা "হেদো বনে কেঁদো বাঘ" (হেদুয়াব নিকটে ডাফসাহেব বাস কবিতেন) বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেন। কিন্তু পুবাতন পথেব পথিকদেব মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম নবযুগ-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন। ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীব সভাপতি চার্লস উড সাহেবেব এডুকেশন ডেসপ্যাচ্ গৃহীত হইলে ভাবে· বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাব সম্ভাবনা দেখা দিল।[৪৮] এই ডেসপ্যাচ্ প্রকাশিত হইলে ঈশ্বব গুপ্তই সর্বপ্রথম উল্লসিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে অভিনন্দিত কবিয়া 'সংবাদ প্রভাকবে' (১৭ই জুলাই ১৮৫৪) লিখিয়াছিলেন:

"এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার যে কল্পনা স্থির হইয়াছে তাহা অতি উত্তম, ইংলণ্ড দেশে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যে প্রকার বিদ্যাশিক্ষা হইয়া থাকে এদেশীয় লোকে তাহার কোন বিষয়ই শিক্ষা করিতে অক্ষম নহে, কেবল শিক্ষা অভাবে ও রাজপুরুষদিগের দয়ার অভাবেই তাহারা যে সমস্ত বিষয় জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অত্রস্থ প্রজাদিগকে তদুপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিলে এতদিন তাহারা নানা বিষয়ে উপযুক্ত হইত।"

বাঙালীর নবচেতনা সঞ্চারে ঈশ্বব গুপ্তও যে কিরূপ সহায়ক হইয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত উদ্ধৃতি হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। গুপ্তকবি নবযুগধারা হইতে বিমুখ হইয়া ভবানীচরণের মত প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীনতার অন্ধ বিবরে মুখ লুকাইয়াছিলেন, সাধারণতঃ ইহাই হইতেছে ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা; কিন্তু তিনিও যে নবযুগ-প্রবাহের অনুকূলে তবী ভাসাইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তৎসম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকব' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে'র নানা সংখ্যায়

পাওয়া যাইবে। তিনি অবশ্য ফিরিঙ্গী শিক্ষা, বিশেষত ফিরিঙ্গী ভাবধারার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনিও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করিতেন। শুধু তাহাই নহে—উক্ত পত্রে (১৮৪৯ সাল, ২৮শে মে) তিনি "স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ে" 'দুইজন স্ত্রীলোকের কথোপকথন' নামে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কবিতায় নারীর উচ্চশিক্ষা ও পুরুষের কারিগরী বিদ্যা প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছিলেন। ঐ সংখ্যায় একটি রমণীর উক্তিরূপে গুপ্তকবির যে কবিতাটি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার শুধু ভাষা বা ছন্দই লক্ষণীয় নহে, উহাতে নারীজাগরণের আভাসও লক্ষ্য করা যাইবে :

বোন, পোড়া দেশের কাণ্ড দেখে
ভেবে হলো বাই লো।
পাপ, মেয়ে জন্ম কেন হলো
ভাবি বোসে তাই লো॥
সব বড ঘরের বড় কথা
বলতে নাহি পাই লো।
তাদের ঘরের বেলা নাফুর-নুফুর,
পরের বেলা ছাই লো॥
যত, নাদাপেটা বুদ্ধি মোটা
দলপতি চাঁই লো।
হায়, এরা হলো জেতের কত্তা,
আই লো দিদি, আই লো॥
বোন, মূর্খ হোয়ে এমন কোরে
বাঁচতে নাহি চাই লো।
ছি, মরতে গেলে নাহি মেলে
যমের বাড়ী ঠাই লো॥
হলো, মেয়েমুখো কত্তা মোদের
বুকর ছাতি নাই লো।
এমন ভাতারের ভাৎ আর খাবোনা
দেশান্তরে যাই লো॥

—সংবাদ সাধুরঞ্জন, ২৮শে মে ১৮৪৯

সমসাময়িক বাঙালীর মনোভাব বিশ্লেষণ করিতে গেলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও বিবিধার্থ সংগ্রহের সূচীপত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। ১৮৪৩

সালের ১৬ই আগস্ট হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে; এবং ইহাতে শুধু ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রাহ্ম ধর্মের পরিচয়-ব্যাখ্যান থাকিত না, সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই পত্রিকায় মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। বাঙালীর মানসমুক্তি ও নবযুগের অভ্যুদয় ত্বরান্বিত হইয়াছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সাহায্যে। 'বঙ্গদর্শন' (১২৭৮) যেমন বাঙালীর প্রাণের ক্ষুধা ও হৃদয়-পিপাসা নিবৃত্ত করিতে সাহায্য করিয়াছিল, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ও তেমনি বাঙালীর মননধর্মিতা বর্ধিত করিয়াছিল। বাঙালীর এই যে জ্ঞানবাদী, তার্কিক ও তত্ত্বজ্ঞ চিত্তের জাগরণ, ইহার জন্য অক্ষয়কুমারের অমানুষিক পরিশ্রমই দায়ী। ইহাতে তিনি জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা ভূতত্ত্ববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, স্বপ্নতত্ত্ব, এবারক্রম্বি ও রীড অবলম্বনে মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনা, প্রভৃতি নানা কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রকাশিত হইতে থাকিলে শিক্ষিত বাঙালী প্রাকৃতিক জগতের সহিত মানবজীবনের কার্যকারণের যোগাযোগ বুঝিতে পারিল।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র শিরোভাগে লিখিত থাকিত, "পুরাবৃত্তেতিহাস, প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।" প্রথম সংখ্যার পত্রে পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়:

"যাহাতে সাধারণ্য জনগণে অনায়াসে বিদ্যালাভ করে, যাহাতে বণিক এবং মোদক আপন২ কর্ম হইতে অবকাশমতে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে, যাহাতে বালক ও বালিকাগণ গল্পবোধে ক্রীড়াচ্ছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপন ২ জ্ঞানের বিস্তার করে যাহাতে যুবকগণ ইন্দ্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থসকল পরিহরণ পূর্বক উপকারক বিষয় চর্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি তুষ্টিজনক সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন, এমত উপায় করা এই পত্রের লক্ষ্য।"

—বিবিধার্থ সংগ্রহ, কার্তিক, ১৭৭৩ শকাব্দ।

বাস্তবিক রাজেন্দ্রলাল নব্য বাঙালীর অন্তর্লোকে জ্যোতিষ, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্ব—এককথায় যুক্তিপন্থী বস্তুবিজ্ঞান সম্বন্ধে 'তত্ত্ববোধিনী'র পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক আলোচনা থাকিলেও (দ্রষ্টব্য—১৭৭৫-৭৬ শকাব্দে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ্ অর্থাৎ তাড়িত বার্তাবহ সম্বন্ধে আলোচনা), এই পত্রের সাহায্যে বাঙালী প্রথম য়ুরোপ ও এদেশের ইতিহাস,

ভূগোল ও পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিল। নিম্নে ইতিহাস সম্বন্ধীয় দুই একটি প্রবন্ধেব উল্লেখ করা যাইতেছে :

১। আরব লোক দ্বাবা পারশ্যদেশের পরাজয়। ১৭৭৪ শক।

২। কাশ্মীর দেশের ইতিহাস। ১৭৭৪ শক।

৩। রোহিলাদিগেব ইতিহাস। ১৭৭৫—৭৬ শক।

৪। রুষিয়া রাজ্যের ইতিহাস।[৪৯] ১৭৭৫—৭৬।

৫। ভরতপুরের ইতিহাস। ১৭৭৫—৭৬ শক।

৬। হুলকর বাজ্যের বৃত্তান্ত। ১৭৭৫—৭৬ শক।

একদিকে যেমন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল, তেমনি আবার অপরদিকে প্রাচীনভারত সম্বন্ধেও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৭৭১ শকাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত "প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা" (৭১ সংখ্যা), "ভাবতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের পূর্বকালীন বাণিজ্য-বিবরণ" (৭৮ সংখ্যা) প্রভৃতি প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধ পাঠে নব্য বাঙালী আপনাদেব প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহলী ও সশ্রদ্ধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

শুধু ঐতিহাসিক বিবরণ বা পুরাতত্ত্বের আলোচনাই নহে, এই যুগের সাময়িকপত্রে যে সমস্ত নবপ্রকাশিত পুস্তকের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশিত হইত, তাহা হইতেও বাঙালীর মনোজীবনেব কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করা যাইবে। এ বিষয়ে রেভাঃ লঙ সাহেবের পুস্তিকা হইতেও বহু পুস্তকেব উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। লঙ সাহেবের পুস্তিকায় কিছু কিছু ভুল ত্রুটি থাকিলেও, ইহাতে তৎকালীন বাঙালীর মনোভাব চমৎকার ফুটিয়াছে। লঙ সাহেবের পুস্তিকায় (১৮১৮—৫৫) মোট সাঁয়ত্রিশ বৎসরেব প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা আছে। উক্ত তালিকাব মধ্যে আদিবসাত্মক আখ্যানের সংখ্যাই সর্বাধিক। নিম্নে এইরূপ কয়েকখানি আখ্যানের নামোল্লেখ করা যাইতেছে :

লেখক	গ্রন্থ
বনমালী ভট্টাচার্য	অপূর্বাখ্যান
বিশ্বেশ্বর ঘোষ	প্রেমোপদেশ নাটক
দ্বিজ পীতাম্বর	লয়লা-মজনু আখ্যান
গোবিন্দচন্দ্র ব্রহ্ম	মাধব-মালতী আখ্যান
গোপালচন্দ্র রায়	মৃগাবতী

লেখক	গ্রন্থ
জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বেশ্যারহস্য
জীবন শেঠ	কনক লতিকা
মধুসূদন শীল	প্রেমতরঙ্গ
নবকুমার কবিরত্ন	শুকবিলাস
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	রমণী নাটক
	রসিক তরঙ্গিণী
	প্রেম নাটক
	রস তরঙ্গিণী
প্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত	রস সাগর
শ্যামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কামিনী বিলাস

এই তালিকা পাঠ করিলে দেখা যাইবে, বাঙলার একশ্রেণীর পাঠক উগ্র আদিরসেব আখ্যান কুপথ্যেব মত গ্রাস করিতেছিল। কিন্তু সমাজের শিক্ষিত স্তরে যৌবন-জলতবঙ্গ প্রবেশ করিয়াছিল; ১৮৩৪ হইতে ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বাংলা সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা দেখিলেই অনুভূত হইবে যে, রামমোহন ও ঈশ্বর গুপ্তের লোকান্তরের মধ্যবর্তী (১৮৩৩—৫৯) কিঞ্চিদধিক পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাঙালীর চিত্ত নবনব জ্ঞানবিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। এখানে কেবলমাত্র কয়েকখানি অনুবাদ-গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে:

১। শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর অনূদিত সংক্ষিপ্ত সদ্বিদ্যাবলী অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসঙ্গ (১৮৩৩)।

২। তৎকর্তৃক গ্রে সাহেবের ইতিহাস গ্রন্থ পয়ারে অনুবাদ (১৮৩৫)।

৩। Murrey's Abridgment নামক ব্যাকরণের বঙ্গানুবাদ (১৮৩৩)।

৪। শিবচন্দ্র ঠাকুর কর্তৃক Robinson's Grammar of Historyর অনুবাদ (১৮৩৩)।

৫। পারশ্য ইতিহাস—গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাক কর্তৃক ইংরাজী হইতে বাংলা ভাষায় পয়ারচ্ছন্দে অনুবাদ।

৬। শ্রীরামপুর হইতে মনু ও রঘুনন্দনের সটীকা গ্রন্থপ্রকাশ (১৮৩৫)।

৭। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কর্তৃক ভগবদ্ গীতার বঙ্গানুবাদ (১৮৩?)।

৮। হরিমোহন সেন কর্তৃক Arabian Nights-এর বঙ্গানুবাদ (১৮৩৯)।

৯। গোবিন্দচন্দ্র সেন কর্তৃক মার্শম্যানের History of Bengal অনুবাদ (১৮৪০)।

—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড।

সংস্কৃত, ইংরাজী, আরবী ও ফারসী হইতে এই যে অনুবাদ হইতে লাগিল, তাহার দ্বারা পাঠকের যেমন বিশ্ববোধ বৃদ্ধি পাইল, ঠিক তেমনি আবার আখ্যান-উপাখ্যানের প্রতিও কৌতূহল আকৃষ্ট হইল। নীলমণি বসাকের 'পারস্য ইতিহাস' (১৮৩৪), 'আরব্য উপন্যাস' (১৮৫০-৫৩), 'নব নারী' (১৮৫২), হরিশচন্দ্র নন্দীর 'চাহর-দরবেশ' (১৮৫৪), রমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রোমায় সপ্তাশ্চর্য উপাখ্যান' (১৮৫৫), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বসুপলিতোপাখ্যান' (বোকাচিও রচিত 'ডেকামেরন', ১৮৫৮) প্রভৃতি ইসলামীয় ও য়ুরোপীয় কাহিনীর অনুবাদগুলি একদা পাঠক সমাজে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। এ বিষয়ে ভার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটী ও গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তক সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যান পুস্তকগুলি জনচিত্তে বিশেষ কৌতূহল সঞ্চার করিয়াছিল। ভার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত পুস্তকের কিছু কিছু তালিকা দেওয়া যাইতেছে ।—

কলম্বসের জীবনচরিত, সেক্সপিয়রের গ্রন্থ হইতে লাম্ব্‌ সাহেব কর্তৃক সঙ্কলিত গল্পের অনুবাদ, ঈজিপসিয়ান নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, সুমেরুদেশ, কীটের গৃহনির্মাণ চাতুর্য, বিহঙ্গমের গৃহনির্মাণ চাতুর্য, মেকেলে সাহেবকৃত ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ সাহেবের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক প্রস্তাবের অনুবাদ, ক্লমসের জীবনচরিত, দেবিস সাহেবকৃত চীনদেশীয়দিগের বিবরণ, পিতরের জীবনচরিত, চেম্বর সাহেবকৃত ক্ষুদ্র পুস্তক সংগ্রহ।

—১৭৫৫ শকাব্দের বিবিধার্থ সংগ্রহ হইতে সঙ্কলিত।

গার্হস্থ্য পুস্তক সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত পুস্তকগুলির কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

লর্ড ক্লাইভের চরিত্র, উইলিয়ম সেক্সপিয়রের নাটক হইতে সংগৃহীত গল্প, সংবাদ সার, রামরাম বসু প্রণীত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের অহল্যা হড্ডিকার জীবনবৃত্তান্ত, নূরজঁহান সম্রাজ্ঞীর জীবন চরিত, বায়ু চতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা, গোপালচন্দ্র মজুমদার প্রণীত নীতি দর্পণ—প্রথম খণ্ড।

—১৭৭৫ ও ১৭৭৯ শকাব্দের বিবিধার্থ সংগ্রহ হইতে সংগৃহীত।

এই সমস্ত গ্রন্থ নিতান্ত বালকবালিকার প্রীত্যর্থে রচিত হইয়াছিল, কাজেই শিক্ষামূলক আখ্যান ভাগই ইহার মধ্যে প্রধান।

ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিওয়ালাদের চরিত সংগ্রহ আরম্ভ করিলেও, পুস্তক সমালোচনার নবতম রীতি অনুসৃত হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) হইতে। রসিক ও মনস্বী রাজেন্দ্রলাল বাংলা গ্রন্থকে য়ুরোপীয় সমালোচনা পদ্ধতি অনুসারে বিচারবিশ্লেষণ শুরু করেন। তাঁহার 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র যে সমস্ত পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার কয়েকটির নামোল্লেখ করা যাইতেছে :—

১৭৭৪ শকাব্দ—অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের সংক্ষেপ বিবরণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের মর্ম, রত্নাবলী নাটকের সংক্ষেপ ইতিহাস।

১৭৭৫-৭৬ শকাব্দ—ভারতচন্দ্র রায়, কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের সমালোচনা, কাদম্বরী গ্রন্থের সার সংগ্রহ, শ্যামাচরণ শর্মার বাংলা ব্যাকরণ, বর্ধমানাধিপতি মহারাজের অনুমতানুসারে বাল্মীকি রামায়ণের নূতন অনুবাদ, পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত পতিব্রতোপাখ্যান, রাখালদাস হালদার প্রণীত শ্রীরামচন্দ্রের জীবন চরিত্র।

১৭৭৯ শকাব্দ—মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের হংসরূপী রাজপুত্রের বিষয়, পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনীমাতা, তিমুর শাহ-সিকন্দর, শাহ-চঙ্গেজ খাঁ, রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত কর্তৃক অনুবাদিত বেণীসংহার নাটকের সমালোচনা, দ্বারকানাথ রায়ের স্ত্রীশিক্ষা বিধান, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের চপলা চিত্তচাপল্য।

রাজেন্দ্রলাল যেমন পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর আত্মজাগরণের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি সত্যকারের সমালোচনা, য়ুরোপীয় রসতত্ত্বের আদর্শে সাহিত্য বিচারের দুর্লভ কৃতিত্ব তাঁহারই প্রাপ্য। পরবর্তীকালে, 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র যে সমালোচনার আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাও অল্পাধিক রাজেন্দ্রলালের খনিত পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে। মুক্ত-বুদ্ধির জনক রাজেন্দ্রলাল বিশুদ্ধ সাহিত্য-প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙালী তাহার অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবহিত হউক, ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র কামনা, এবং সেইজন্য তিনি ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে ও সংস্কৃত সাহিত্যবিচারে আপনার কৌতূহলী চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

সমকালীন পত্রিকার মধ্যে 'সর্বশুভকরী' (১৮৫০) নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাঙালীর জীবনে নূতন ভাবাদর্শের নির্দেশ দান করিয়াছিল। 'জ্ঞানান্বেষণে'র পর এই পত্রিকায় সর্বপ্রথম বাঙালীর সমাজ-জীবন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও তজ্জাত বিপ্লবী মনোভাব আত্মপ্রকাশ করে। "কৌলিন্য ব্যবস্থা, বিধবা-বিবাহ প্রতিষেধ, অল্প বয়সে বিবাহ প্রভৃতি যে কতিপয় অতি বিষম অশেষ দোষাকর কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত আছে," 'সর্বশুভকরী' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার ইহার সহিত গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন; সুতরাং ইহার বিপ্লবী প্রাণরসের উৎস যে কোথায় নিহিত ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' (১৮৪২), 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪), 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৭৮), 'এডুকেশন গেজেট' (১০৫৬), এবং 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮)—প্রতিটি পত্রিকা বাঙালীর চিত্তজাগরণের উৎসবে মশাল ধরিয়াছিল। 'মাসিক পত্রিকা'র প্রতি সংখ্যার উপবিভাগে সম্পাদকদ্বয় —প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সগর্বে এইকথা ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্ত ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতিমাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।"

এই সদম্ভ উক্তি—"বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই"—ইহাতেই অনুমিত হইতেছে যে, ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে কি ভাবে নূতন ভাবাদর্শের সম্মুখীন হইয়াছিল। গণবাণীর দিকে তৎকালীন সমাজ-সেবিগণ ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং জনসেবার মহৎ ব্রত গ্রহণ করিলেন। হরিশ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে যেভাবে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ও কৃষকদের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, তাহার সমকক্ষ উদাহরণ অক্ষয়কুমার সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লিখিত "পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন" নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় (১৮৫৫) ঘোষণা করেন—

"ঐক্যতা যে কি পরমোৎকৃষ্ট পদার্থ তাহাতে তাহারা এককালে বঞ্চিত থাকায় পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহোপলক্ষে সাধ্যমত অনর্থ অর্থ ব্যয় স্বীকার করিযাও পরানিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত রাখিয়াছেন। কেহ কোন ব্যয়সাধ্য সৎকর্মানুষ্ঠানার্থে তাহাদিগর নিকট যথাকিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করিলে কখনই তাহাতে সম্মত হয়েন না। বস্তু কি আক্ষেপের বিষয় তাহারা স্বীয় বারাঙ্গনা ও সুরা সেবন প্রভৃতি উপলক্ষে দিন দিন অকাতরে যে ব্যয় স্বীকার করেন, তদ্দ্বারা অশেষ প্রকার দেশের হিতসাধন ও মঙ্গলবর্ধন হইতে পারে। কোন কোন স্থানে বারয়ারি পূজোপলক্ষে বৎসর বৎসর যাহা ব্যয় করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা অনায়াসেই পাঠশালা সংস্থাপিত করিয়া বালকবৃন্দের জ্ঞানানুশীলন, লোকদিগের গমনাগমনোপযোগী বর্ত্ম, দুর্দান্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পীড়া শান্তির নিমিত্ত ঔষধালয়, পিপাসাতুর ব্যক্তিদিগের তৃষ্ণা শান্তির নিমিত্ত পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি পরমোপকারজনক সৎকর্মানুষ্ঠান করিয়া দেশোজ্জ্বল করিতে পারে। এই সমস্ত সামান্য বিষয়ে অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন। একৈক মতাবলম্বন পূর্বক যতদিন এতদ্দেশীয় লোকেরা অধীনতা শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনত্ব প্রাপ্ত হইবেন তাহা স্মরণ করিলে হতজ্ঞান হইতে হয়।"

"অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনত্ব প্রাপ্ত" হইবার জন্য তখন নব্য শিক্ষিত বাঙালীর মনে যে আত্মবিস্ফোরণ ঘটিতেছিল, তাহার আভাস 'বিদ্যোৎ-সাহিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যাতেই রহিয়াছে। সমসাময়িক সংবাদপত্রে আরও একটা বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। রামমোহন যখন বেদান্ত-প্রবর্তিত ব্রহ্মবাদ প্রচার করেন, তখন কলিকাতা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক আন্দোলন শুরু হইয়া যায়। ভবানীচরণ, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির প্ররোচনায় 'ধর্মসভা' সনাতন ও পৌরাণিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গল'দের প্রচণ্ড আঘাতে 'ধর্মসভা'র ভিত্তি শিথিল হইয়া গেল। 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর', 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি তরুণ সম্প্রদায়ের পত্রিকা ধর্ম সম্বন্ধে কখনও উন্নাসিক, কখনও বা উদাসীন ছিল। তরুণগণ ডিরোজিওর প্রভাবে কিছুকাল নীতি বা আদর্শের তীব্র প্রতিকূলতা প্রচার করিলেও ধীরে ধীরে চারিত্রনীতির দিকে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। এই নীতি কোন ধর্মশাস্ত্রানুসারী নহে, জীবনের প্রতি যে আস্তিক্যানুভূতি হইতে মানবনীতির জন্ম হয়, সেই অনুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরে'র লেখক হিন্দু-কলেজের ধর্ম ও নীতি নিরপেক্ষ শিক্ষাবিধিকে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন:

The absence of the study of moral science in the Hindu College particularly, is a desideratum which the sooner is supplied is better. It constitutes one of the prominent or perhaps the prominent defect that distinguishes the system of education, persued by the educational council."[৫১]

পরিশেষে উক্ত লেখক নীতি ও চরিত্র গঠনের আদর্শের জন্য Theory of moral sentiment এবং Bentham-এর 'Deontology' পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' মুক্তজ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন, বিধবাবিবাহ সমর্থন করিতেন—প্যারীচাঁদ মিত্রও বিধবাবিবাহ সমর্থন করিয়া 'মাসিকপত্রিকা'য় গল্প লিখিতেন। একদিকে নূতন আদর্শ—যাহা মূলতঃ য়ুরোপীয় জ্ঞানবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত,—অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহায়তায় বাঁশবেড়িয়া, রংপুর, কৃষ্ণনগর, তেলিনীপাড়া প্রভৃতি কলিকাতার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, বালকগণকে ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষাদান, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বেদ ও উপনিষদের অনুবাদ, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ও বৈদিক ও বৈদান্তিক মত প্রচার। রামমোহন ভক্তিবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বেদান্তাশ্রয়ী ব্রহ্মবাদ গ্রহণ করেন নাই, তিনি ছিলেন জ্ঞানবাদী ও বুদ্ধিজীবী মানুষ। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক মুক্তির জন্য অন্যান্য কুসংস্কার বর্জনের মত বহু-দেবোপাসনা ত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিলে হিন্দু সমাজের শ্রেণীবিভেদ জনিত অনৈক্য হ্রাস পাইবে—এই কারণেই রামমোহন বেদান্তধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ ছিলেন গীতোক্ত স্থিতধী ভক্ত ; তাঁহার বেদান্ত-আশ্রয়ের মূলকথা ঈশ্বর ভক্তি। তাঁহার সেই ভক্তিনত চিত্তের পরিপূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানগুলিতে। বেদ-বেদান্তের অভ্রান্ততায় অবিশ্বাসী অক্ষয়কুমার দত্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া মহর্ষির সহিত বিচার চালাইয়া পরিশেষে তাঁহাকে নিজমতানুবর্তী করিতে পারিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

১৮৩৩-১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের সাময়িক পত্রিকাদি হইতে এইটুকু জানা যাইবে যে, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম, বেদান্ত প্রতিপাদিত ব্রাহ্মধর্ম ও খ্রীস্টান ধর্মের পারস্পরিক কলহ সত্ত্বেও নবযুগের প্রধান বাণী যুক্তিবাদ তাহা বুঝা যাইতেছে। এই যুক্তিবাদের আতিশয্যের ফলে ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সদস্য অক্ষয়কুমার দত্ত, রাখালদাস হালদার, অনঙ্গমোহন মিত্র, কানাইলাল পাইন দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন এবং সেই মতান্তর ক্রমে 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠায় পর্যবসিত হয়—যাহা একান্তভাবে ছিল যুক্তিবাদী।

অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মারফতে যে জ্ঞানবাদের জয় ঘোষণা

করিয়াছিলেন, তাহা বৃথা হয় নাই। বস্তুতঃ এই যুগের সাহিত্য অপেক্ষা সাময়িক পত্রের মধ্যেই বাঙালীর মানস-জীবনের পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষিত হইবে।

পাদটীকা

১। Miss Collet—*Life and Letters of Raja Rammohun*, 2nd. Ed. p. 168.

২। Romesh Dutt—*Economic History of India in the Victorian Age*,

৩। Ramesh Ch, Majumdar & Others—*Advanced History of India*, p. 164.

৪। Sir Percival Griffiths—*The British Impact on India*, p. 95.

৫। Buckland—*Bengal under the Lieutenant Governors*, Vol. I, p. 12.

৬। *Ibid*--pp. 67-68

৭। Dr. Bimanbehari Majumdar—*History of Political Thought in India*, pp. 231-32

৮। P, E. Roberts—*History of British India*, p. 385 (f. n.)

৯। J C. Marshman—*The History of India*, Vol. III, p. 457.

১০। Romes Dutt—*The Economic History of India Under the Early British rule*, 3rd.ed. pp 289-90

১১। *Ibid*, pp. 11-12

১২। *Ibid*, p. 29.

১৩। Romesh Dutt—*The Economic History of India in the Victorian Age*, 4th.ed. p. viii.

১৪। Bholanath Chunder—*Life of Raja Digambar Mitra*, pp. 23-27

১৫। ব্রজেন্দ্রনাথ সঙ্কলিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য়, পৃ ৩৩০

১৬। ঐ

১৭। T. W, Wallbank—*India in the New Era*, pp, 76-77.

১৮। V. Lovett—*India*, p. 114.

১৯। Bholanath Chunder—*op. cit.*

২০। শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

২১। B. D. Bose—*The Rise of the Christian Power in India*. p. 791.

২২। Sardar K. M. Panikkar—*Survey of Indian History*, p. 244.

২৩। Ramesh Ch. Majumdar & Others—*Advanced History of India*, p. 815.

২৪। B. Majumdar—*op. cit.* p, 160,

২৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—২য়, পৃ ৬৩-৮৯

২৬। ঐ, পৃ ১৩৩

২৭। ঐ

২৮। ঐ, পৃ ৭০

২৯। শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদি, পৃ ১৬০

৩০। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য়, পৃ ৮৯-৯০

৩১। সমাচার দর্পণ, ১৮৩৭, সংবাদপত্রে সেকালের কথা হইতে উদ্ধৃত

৩২। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য়, পৃ ১৩৭

৩৩। J. C. Ghosh (Edited)—*English Works of Rammohun Roy*, Vol 1 p. 230.

৩৪। *India Gazette*, July 4, 1831.

৩৫। *The Bengal Hurukara*, 24th. April, 1843. Quoted from B. Majumder's book)

৩৬। *Selections from the Writings of Girish Chandra Ghosh*

৩৭। Kishori Chand Mitra—*Memoirs of Dwarkanath Tagore* p. 94

৩৮। Bimanbehari Majumdar—*op. cit.* p, 190

৩৯। Bholanath Chunder—*Life of Raja Digamber Mitra*, p. 34.

৪০। *Ibid*, pp. 58-59

৪১ Shibnath Sastri—*History of Brahmo Samaj* Vol 1 pp. 98 99

৪২। শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদি পৃ ১৮৮

৪৩। ঐ, পৃ ২০২

৪৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য়, পৃ ২৫৭

৪৫। ঐ, পৃ ২৫৭-৫৮

৪৬। শিবনাথ—রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদি পৃ ১৫৬

৪৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িক পত্র পৃ ৯৫

৪৮। "The British Parliament in 1853 for the first time thoroughly investigated Indian education In consequence a famous dispatch was issued in 1854 by Sir Charles Wood, who stated that its aim should be the extension of European knowledge among all classes in India In accordance with the instruction of the dispatch the Governor Ganeral Lord Dalhousie, in the 1850's began laying the foundation of a national system of education. The dispatch called for the setting up Universities, establishing training Colleges for teachers, expanding the Government Colleges and High Schools and the extension of the Vernacular elementary schools designed for the masses.—T. W. Wallbank—*India in the New Era*, P. 77.

৪৯। ১৯শ শতাব্দীতে ইংরাজের রুশভীতি প্রবল থাকিলেও, বাঙালী রুশ সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিত। 'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রের (১৮৬২) নিম্নলিখিত কবিতাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন :

ৠসিয়ার অধিপতি, নৃপ চূড়ামণি।
রাজার প্রধান বোলে তোমারেই গণি॥
পৃথিবীর অর্ধভাগ অধীন তোমার।
ধনে জনে তোমার সমান নাই আর॥

এই প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের দুই পংক্তি স্মরণীয়—

আপন বিক্রমে হব রুসিয়ার কিঙ।
টেবিলে বসিব খেতে হাতে দিয়ে রিঙ॥

৫০। J. Long—*A Return of the names and writings of 515 persons connected with Beng. Literature, from the year 1818 to 1855.*

৫১। *The Bengal Spectator*, November. 1842.

নবম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত

॥ ১ ॥

কথারম্ভ

নিশ্ছিদ্র অমাবাত্রিব সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন মনে হয় যে, এই কাল-বাত্রিব বুঝি কদাচ অবসান ঘটিবে না, তখন সহসা কখন যে পূর্বাশাব তোবণ অরুণিমায় ভবিয়া যায়, গগনপ্রান্তে শুকতাবাটি দপ্ দপ কবিতে থাকে, তাহা উপলব্ধি কবিতে পাবা যায় না। কিন্তু এটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, বজনী প্রভাতকল্পা। ঠিক সেইরূপ বামমোহনেব লোকোত্তব প্রতিভাব পাবকস্পর্শে এইটুকু অনুধাবন কবা যায় যে, মধ্যযুগেব মধ্যযামেব অবসান হইযা আসিতেছে। ১৯শশতাব্দীর বাঙালীব জীবনবোধ ও বোধি, জ্ঞান ও প্রতীতি, মনন ও ধ্যান—এক কথায় জাতিব সবাঙ্গীণ আত্মবীক্ষা জাগ্রত হইল একটি মানুষকে কেন্দ্র কবিয়া—তিনি বামমোহন। বহু শতাব্দী সঞ্চিত অন্ধকাব যেন সৌবকবস্পর্শে কাল বিলম্ব না কবিয়া অপসাবিত হইল। বাঙালীব যে সাহিত্যচেতনা বামমোহনেব মাবফতে জীবন লাভ কবিযাছে, তাহাবই মধ্যে বাঙালীব নব সৃজ্যমান চিৎ প্রকর্ষ যে বিচিত্র বসে ও রূপে আত্মপ্রকাশক্ষম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই নবজাগৃতিব আলোকোজ্জ্বল শুভ প্রত্যূষে আবও একটি চিত্তেব জাগবণ হইয়াছিল; তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ববীন্দ্রনাথ 'আধুনিক সাহিত্যে' কবি বিহাবীলাল চক্রবর্তীকে বাংলা গীতিকাব্যের "ভোবেব পাখী" বলিয়াছেন। কবিবব ঈশ্বব গুপ্তকেও আমবা "ভোরের পাখী" বলিতে পাবি। তিনি কাব্য-কবিতাব মাধ্যমে যে প্রভাতকলবব সৃষ্টি কবেন, তাহার সুব পুবাতন প্রবাহেব শেষ তবঙ্গধ্বনি, অথবা নবীন প্রাণবার্তাব আদিম মন্ত্র-গুঞ্জরণ, তাহাই আমাদিগকে বিচাব কবিতে হইবে।

বামমোহনেব মৃত্যু হইতে (১৮৩৩) আবম্ভ কবিয়া সিপাহীবিদ্রোহ পযন্ত (১৮৫৭) বাঙলা দেশেব সাংস্কৃতিক পরিচয় পূর্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই যুগের ভাবধর্ম ও ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙালীর সমাজ ও মানসজীবনেব প্রাথমিক ভাব-তারল্য বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। এই

সময় 'ইয়ং বেঙ্গল'গণের প্রথম প্রতিক্রিয়া ও উগ্র উচ্ছ্বাস দ্রবীভূত হইল, জাতির প্রাণের সহিত পরিচয় স্থাপনের প্রয়াস দেখা দিল, ডিরোজিও-শিষ্যগণের নিরীশ্বরবাদ ও সংশয়বাদকে আচ্ছন্ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে আস্তিক্যবাদের নিষ্ঠা সৃষ্টি করিল, ধর্মনৈতিক আস্তিক্যানুভূতি আবার ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিল। একদিকে দেবেন্দ্রনাথের আত্মস্থ বেদান্তভক্তি, অপরদিকে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের কুশাগ্রতীক্ষ্ণ চিত্তে জ্ঞানবাদ, ভৌমচেতনা ও জড়দর্শনের প্রভাবে কোঁৎ-মিল-পন্থী লোকায়ত হিতবাদের উদ্ভব। মাঝখানে ঈশ্বর গুপ্তের সীমিত পরিমণ্ডলে আত্মবিচার। এই পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্য ও বঙ্গ সংস্কৃতিতে ঈশ্বর গুপ্তের স্থান নির্ণয় করিতে হইবে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার রসতত্ত্ব ও কবিকৃতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মনোধর্মে বিভিন্ন প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লিখিত হইবে, অর্থাৎ কোন্ কোন্ প্রভাবে তাঁহার মানসিক ভাব-কল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে, তিনিই বা বাঙলা দেশে কোন্ যুগের অবতারণা করিয়াছেন,—ইহাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

॥ ২ ॥

গুপ্তকবির কবিতার সূচী

সাংবাদিকতা বৃত্তি ও বিলাস হিসাবে গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদপত্রেই তাঁহার যাবতীয় কবিতা ও গদ্য নিবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের যখন জন্ম হয় (২৫এ ফাল্গুন, ১২১৮) তখনও রামমোহন কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন নাই, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই কলিকাতা রামমোহনের প্রধান রণাঙ্গনে পরিণত হয়। রামমোহন বয়সে ঈশ্বর গুপ্ত অপেক্ষা আটত্রিশ বৎসর বড় ছিলেন।[১] তাঁহার বিলাত যাত্রার (১৯এ নভেম্বর, ১৮৩০) দুই মাস পরে (২৮এ জানুয়ারী, ১৮৩১) ঈশ্বর গুপ্ত মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশোদ্ভূত যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় 'সংবাদ প্রভাকর' নামক সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা কিছুকাল উত্থানপতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ১৮৩৯ সনের ১৫ই জুন দৈনিকে পরিণত হয় এবং ১৮৫৯ সনে ২৩শে জানুয়ারী ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হইলে তদনুজ রামচন্দ্র

গুপ্ত আরও কিছুকাল দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদনা করিয়াছিলেন। (ঈশ্বর গুপ্ত আপনার এবং ছাত্রস্থানীয়দের গদ্যপদ্য রচনা প্রকাশের জন্য ১৮৫৩ সনে 'সংবাদ প্রভাকরে'র একখানি মাসিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁহার অধিকাংশ কবিতা সাপ্তাহিক, দৈনিক ও মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল।) শুধু স্বরচিত কবিতা নহে, তিনি মাসিক 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রাচীন কবিচরিত ও প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিকের গৌরব অর্জন করেন। নিম্নে সেই প্রবন্ধগুলির কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে[২]:

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—১লা আশ্বিন, ১লা পৌষ, ১লা মাঘ, ১২৬০ সাল
রামনিধি গুপ্ত, নিধুবাবু—১লা শ্রাবণ, ১২৬১
রামবসু—১লা আশ্বিন, ১লা কার্ত্তিক, ১লা অগ্রহায়ণ, ১২৬১
নিত্যানন্দদাস বৈরাগী—১লা অগ্রহায়ণ, ১২৬১
হরুঠাকুর—১লা পৌষ, ১২৬১
রাসু, নৃসিংহ ও লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস—১লা মাঘ ১২৬১

('সংবাদ রত্নাবলী' (১২৩৯), 'পাষণ্ড পীড়ন' (১৮৪৬) ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (১৮৪৭) নামক তিনখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত হয়, তাহাতেও তাঁহার বহু কবিতা মুদ্রিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দী পরে 'বসুধা' পত্রিকায় অনেকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা মুদ্রিত হইয়াছিল।[৩] পুরাতন 'সংবাদ প্রভাকর' এবং তৎসম্পাদিত অন্যান্য পত্রিকার পুরাতন ফাইল পাওয়া সম্ভব হইলে তাঁহার সমস্ত কবিতার তালিকা প্রস্তুত করা যাইত, এবং তাঁহার যাবতীয় কবিতার সন-তারিখযুক্ত হিসাব পাওয়া যাইত, সেই কবিতাগুলির রচনাকাল ধরিয়া কবির মনোধর্ম বিশ্লেষণেরও সুবিধা হইত,) অন্তত একটা কালানুক্রমিক চিত্তবিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যাইত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে 'সংবাদ প্রভাকরে'র মাসপয়লা সংখ্যা অতি অল্পই রক্ষিত হইয়াছে; কাজে কাজেই ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্য-সঙ্কলনের সাহায্যে আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইতেছে। নিম্নে তাঁহার কাব্য-সঙ্কলনগুলির আকর-স্থানের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

(ঈশ্বর গুপ্তের জীবৎকালের মধ্যে প্রকাশিত হয় রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' (১৮৩৩), 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৫৫), 'প্রবোধ

প্রভাকর' (১৮৫৮)—এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় 'হিতপ্রভাকর' (১৮৬১), 'বোধেন্দুবিকাশ' (১৮৬৩)। অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত অগ্রজের প্রথম কবিতা-সংগ্রহ ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দ হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা ১৮৬২ সনে, চতুর্থ সংখ্যা—১৮৬৯, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা ১৮৭৩ এবং অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সনে। ইহাতে ঈশ্বর গুপ্তের অতি অল্প কবিতাই স্থান পাইয়াছিল।) গ্রন্থাবলী আকারে তাঁহার যে কবিতা-সংগ্রহগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় এবং গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশনায় কবিতা-সংগ্রহের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১২৯২ বঙ্গাব্দে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদনা করেন পূর্বতন প্রকাশক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২৯৩ সাল)। বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্কলন সম্পাদনায় স্থূলরুচি ও তথাকথিত অশ্লীল কবিতাগুলিকে একেবারে বাতিল করিয়াছিলেন। সঙ্কলনকালে তিনি বলিয়াছিলেন "যাহা অপাঠ্য তাহার উদাহরণ দিই নাই।" রুচির মুখ রক্ষা করিতে গিয়া তাহাকে ঈশ্বর গুপ্তের অনেক কবিতাই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংখ্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নানা বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।" এই পঞ্চাশ সহস্রের অতি অল্পই বঙ্কিমচন্দ্র ও গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণে স্থান পাইয়াছিল।

বাংলা ১৩০৬ সনে বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত 'কবিবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়। ইহাও পূর্বতন সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ মাত্র। ইহার দুই বৎসর পরে ১৩০৮ সনে কবির আত্মীয় মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত 'ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত গ্রন্থাবলীর' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। উক্ত সঙ্কলনের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন, "বঙ্গের লেখকাগ্রগণ্য পূজনীয় বঙ্কিমবাবু এবং প্রভাকরের ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কবিতা সংগ্রহে দাদা-মহাশয়ের অনেক কবিতা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সংগ্রহে তাঁহার সকল কবিতার স্থানও হয় নাই, অনেক কবিতা আবার অশ্লীল দোষে দূষিত বলিয়া বর্জিত হইয়াছিল।" মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত তাঁহার মাতামহের প্রকাশিত কবিতাদির পরিচয় জানিতেন; কাজেই তাঁহার সংস্করণে ঈশ্বর গুপ্তের সর্বাধিক কবিতা থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু মণীন্দ্রকৃষ্ণ

যখন কবিতা সংগ্রহে মন দিয়াছিলেন (১৩০৮), তখনই 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহার সংস্করণের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কবিতার সংখ্যা অন্যান্য সংস্করণ অপেক্ষা অনেক বেশি হইলেও তিনিও ঈশ্বর গুপ্তের সমস্ত কবিতার সন্ধান পান নাই। ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম সঙ্কলনের (বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত ও গোপালচন্দ্র প্রকাশিত, ১২৯২-৯৩) কবিতার সংখ্যা প্রায় ২৪০। এতদ্ব্যতীত শকুন্তলা নাটকের কাব্যানুবাদ অংশতঃ এবং হরপার্বতীর কৈলাসলীলা সংক্রান্ত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কবিতা ছিল, এই দুই শ্রেণীর পৃথক কবিতার সংখ্যা—২৫। মোট ২৬৫টি কবিতা ও গান বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্কলনে স্থান পাইয়াছিল। 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে 'পঞ্চাশ সহস্র' কবিতার কথা বলিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অতিরঞ্জিত। সে যাহা হউক, ঈশ্বর গুপ্তের সমগ্র কবিতার এক স্বল্পতম অংশ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সঙ্কলনে স্থান দিয়াছিলেন। তারপর বসুমতী সাহিত্যমন্দির হইতে ১৩০৬ সনে কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের সম্পাদনায় ঈশ্বর গুপ্তের যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়, তাহাও মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্কলন অবলম্বনেই গৃহীত। তাহার অনেক পরে বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের কর্তৃপক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র সম্পাদিত দুষ্প্রাপ্য সঙ্কলনটির প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র করিয়া প্রকাশ করেন। এখনও পর্যন্ত ঈশ্বর গুপ্তের এই সঙ্কলনটি সাধারণ্যে প্রচারিত আছে।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ও অনূদিত নাটকের (বোধেন্দুবিকাশ—১৮৬৩)[8] কিছু কিছু সঙ্কলন বাহির হইয়াছে, দুইখানি পদ্য গ্রন্থ[5] 'প্রবোধ প্রভাকর,' (১৮৫৮) ও 'হিতপ্রভাকর'—(১৮৬২) মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ গদ্য রচনা 'সংবাদ প্রভাকরে'র মাসপয়লা সংস্করণের বিবর্ণ পাতায় বন্দী হইয়া আছে, এখন সেই সংখ্যাগুলিও কালগর্ভে মহাপ্রয়াণ করিয়াছে।

রামগতি ন্যায়রত্ন ঈশ্বর গুপ্তের বিকট গদ্যের নমুনাস্বরূপ 'হিতপ্রভাকর' হইতে একটু উদাহরণ দিয়াছেন :

"রে মন! পরম পুরুষের পবিত্র প্রেম-পুষ্পের আমোদের আঘ্রাণ একবার নেরে একবার নে-র ; ওর মন! ভুবনটাকে একবার দেখরে-একবার দেখ-রে, মন-রে, মন-রে, শোন-রে শোন-রে…… !"

ইহার উল্লেখ করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, "যে সকল বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা বালক-বালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তকের কথা দূরে থাকুক,

এক্ষণকার সংবাদপত্রের শোভা পায় না।"৬ ন্যায়রত্নের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত; এখানে 'চিত্রপ্রভাকরে'র লেখক কবিগান ও পাঁচালীর দীর্ঘায়ত সুরবিন্যাস অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু শুধু এইটুকু খণ্ডরচনা উদ্ধার করিয়া গুপ্তকবির গদ্যরচনার মূল্য নির্ণয় করা যাইবে না। প্রতিবৎসর দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকরে'র ১লা বৈশাখ সংস্করণের প্রথমেই গুপ্তকবির একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ থাকিত, তাহাতে তাঁহার অনেক কবিতাও প্রকাশিত হইত। কবিতার কথা বাদ দিলেও, এই গদ্যের মধ্যে আদৌ জড়তা ছিল না, 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি আশ্চর্য সবল এবং সাংবাদিক সুলভ মিতভাষী। যাঁহারা তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ না করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য বলিবেন:

"Iswar Gupta was no prose stylist however, and his artificial rhythms, labyrinthine clauses, and jingling alliterations verge on the fantastic."৭

সমকালের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং ঈষৎ পরে প্রকাশিত দ্বারকানাথের 'সোমপ্রকাশে'র (১৫ই নভেম্বর, ১৮৫৮) ভাষা অতিশয় গুরুভার ছিল। গদ্যের জড়তা মুক্তির জন্য ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিক-সুলভ লঘু ধরণের বাক্য গঠন অবশ্য প্রশংসনীয়। সাংবাদিক রচনা-রীতির স্রষ্টা বলিয়াই ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা গদ্য সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার অধিকাংশ গদ্য রচনা 'সংবাদ প্রভাকরের' পাণ্ডুর পত্রে রহিয়া গিয়াছে। ইদানীং 'সংবাদ প্রভাকরে'র অতি অল্পই সর্বগ্রাসী কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাই গদ্যশিল্পী ঈশ্বর গুপ্তের কৃতিত্ব নির্ণয়ের উপায় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, কলিকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়মে৮ সামান্য কয় সংখ্যা কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতেছে, তাহা অবলম্বনে ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিক গদ্যের রূপ ও রীতি আলোচিত হইতে পারে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তাহার অবকাশ নাই বলিয়া শুধু আভাস মাত্র দেওয়া হইল।

॥ ৩ ॥

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার পটভূমিকা

ঈশ্বর গুপ্ত যে যুগে কলিকাতার সমাজ-রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা হইতেছে অব্যবস্থিত চিত্তের যুগ, রামমোহনের প্রভাবে বাঙালী সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যে চিত্তসঙ্কট দেখা দিয়াছিল, তাহা কবিকেও স্পর্শ করিয়া

থাকিবে। রামমোহনের বেদান্ত-প্রতিপাদিত একেশ্বরবাদী ধর্মকথা, ডিরোজিও শিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গল'গণের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ গ্রহণ ও ভারত সংস্কৃতি অস্বীকার, মিশনারীদের প্রকাশ্যে ধর্মান্তরীকরণ এবং এই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য রাধাকান্ত দেববাহাদুর ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ধর্মসভা'র প্রতিষ্ঠা। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী যে-চিত্তসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল, ঈশ্বর গুপ্তও সেই যুগজিজ্ঞাসার কবলে পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সেই মনোদ্বন্দ্ব ও চেতনার বিরোধ তাঁহার অসংখ্য কবিতায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া আছে। তাহার কবিতার মধ্যেই ১৯শ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালীচিত্ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তৎপূর্বে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম ১২৯২ বঙ্গাব্দে ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব সমালোচনা করিয়া তাঁহার কবিধর্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন আমরা অদ্যাপি তাহা ছাড়াইয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। বাঙালীর দৈনিন্দন জীবনের প্রতি যে-প্রবল আসক্তি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা যত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন, বাঙালীর সেই মর্ত্য-পিপাসা যেমন ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিক চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তেমনি গুপ্তকবির সুযোগ্য শিষ্য, অথচ গুরুর আদর্শে হতশ্রদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। "ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist, ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, ইহাতেও তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি অতিশয় যথার্থ। বাহ্যতঃ মনে হয়, ব্যঙ্গনিপুণ সুরসিক গুপ্তকবি জীবনের আপাতঃ বৈষম্যকেই ব্যঙ্গরসে অম্লাক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অজস্র কবিতায়, অসংখ্য পয়ার-ত্রিপদীর জলোচ্ছ্বাসকে তিনি এমন সংযমের বাঁধ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে হয়। এই পয়ার-ত্রিপদীতে তিনি পারমার্থিক "পিতা-পুত্র" সংক্রান্ত ন্যায়, বেদান্ত ও ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন; শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পয়ার লাচাড়ীর সাহায্যে ভক্তিশাস্ত্র মন্থন করিয়া উজ্জ্বল রসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু জরা বা শারীর বৈক্লব্য বশতঃ ঐ মহাগ্রন্থের পয়ারেও মাঝে মাঝে দুটি একটি স্খলন পতন লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের—

এখানেতে সে অনাদি নিত্য নিরঞ্জন।
ক বলিয়া জগতের হবেন কারণ॥

কারণ কারণ আর কার্য যাহা হয়।
উভয়েতে সমকালে স্থায়ী কভু নয়॥
যে সময়ে কার্যের উদ্ভব হয় নাই।
তার আগে কারণের অবস্থিতি চাই॥
কার্য আর কারণের সমকালীনতা।
কখনই হয় নাই এরূপ স্থিরতা॥
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হয় প্রকৃষ্ট প্রমাণ।
কারণ আপনি আগে হয় বর্তমান॥
পরে পরে করে যত কার্যের প্রকার।
সন্দেহ কি আর ইথে সন্দেহ কি আর॥
কুম্ভকার বস্ত্রকার আর স্বর্ণকার।
মাটি সুতা, কনক লইয়া সহকার।
পরে করে ঘটপট বসন ভূষণ।
কর দরশন, প্রভু, কর দরশন

অথবা,

ঈশ্বর যে গুণে হন ভবের কারণ।
বলি তবে সে কথাটি করহ শ্রবণ।
অনাদি সময়াবধি অখিল সংসার
পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয়ে হতেছে সংহার
ইথেই সহজ হয় তত্ত্ব নিরূপণ।
জগতের প্রতি হন ঈশ্বর কারণ
বিশ্বের প্রলয়দশা ঘটে যে সময়
কিছুই না রয় আর কিছুই না রয়
কেবল একাকী মাত্র সেই ভগবান
স্বরূপ স্বভাবসহ রন বর্তমান।

কিংবা,

এ জগতের জীব যত   নিজবোধ হয় হত
সকলেই জীব জীব হয়।
নিজে জীব কি পদার্থ   নাহি জানে ফলিতার্থ
সার অর্থ কেহ নাহি দেয়॥

ভ্রম সবে হর হর, স্থিরভাব ধর ধর
কর কর স্বরূপ নির্ণয়।
ঈশ্বর আপনি বিম্ব জীব তাঁর প্রতিবিম্ব,
এই জীব আর কিছু নয়॥
প্রতিবিম্ব যেবা যার, সমান স্বভাব তার,
অবশ্য সে করিবে ধারণ।
প্রতিবিম্ব জীব সবে, বিশ্বের সমান তবে
বলিতেই হবে এ বচন॥

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য, ঈশ্বর গুপ্ত স্বচ্ছন্দবাহী পয়ার-ত্রিপদীর সাহায্যে দুরূহ ন্যায় ও বেদান্ততত্ত্ব অবলীলাক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন—তাহার প্রমাণ দেওয়া। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর অনুরূপ তত্ত্বকথা সম্বলিত পয়ারের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে—

হেন জীবতত্ত্ব লৈয়া লিখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব॥
ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম বাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাঁহা উঠানো বিবাদ॥
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুতে পরিণামবাদ সেই সে প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্য-শক্ত্যে হয় অধিকারী
প্রাকৃত-চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥

—শ্রীচৈতন্য চরিতামমৃত, আদি, ৭ম

দুরূহ তত্ত্ববাদকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেমন অবলীলাক্রমে পয়ারের বাহনে ব্যক্ত করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ দুর্লভ শক্তি ঈশ্বর গুপ্তের ছিল; পয়ার তাঁহার হাতে যেন গদ্যের মত সহজ শিল্পে পরিণত হয়। তত্ত্বদর্শন, মিশনারীবিদ্বেষ, শিখযুদ্ধ, সিপাহীবিদ্রোহ, ব্রহ্মযুদ্ধ, কাবুলযুদ্ধ—যে কোন গদ্যাত্মক বিবৃতিমূলক বিষয়কেই তিনি পয়ারের চতুর্দশ অক্ষরের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিতেন।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার পশ্চাদ্‌পটে রহিয়াছে ১৯শ শতাব্দীর বাঙলা দেশ; সমগ্র বাঙলার সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় ছিল। বহু স্থলে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কাজেই বাঙালীর প্রাণের বাণীর সহিত যে সুপরিচিত হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবির সমগ্র জাতি-চেতনার সহিত এই আত্মীয়তার নিবিড়বন্ধন প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা পুনরুল্লেখযোগ্য—

"তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাঁহারাও তাঁহার মিষ্টভাষিতায় মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ভ্রমণসূত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের লোকের সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল।…ভ্রমণকালে কোন অপরিচিত স্থানে নৌকা লাগিলে তারে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগের বাটীতে যাইতেন ……বালকদিগেব অভিভাবকগণ শেষে ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যথাসাধ্য সমাদর করিতে ত্রুটি করিতেন না।"[৯]

একমাত্র দীনবন্ধু মিত্র এ বিষয়ে গুরু ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ; তিনিও সমগ্র বাঙলাদেশেব সহিত পরিচিত ছিলেন। "দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন বাঙ্গালাব এমত স্থান অল্পই আছে। যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছেন। যে তাঁহার আগমনবার্তা শুনিত, সে-ই তাঁহার সহিত আলাপের জন্য উৎসুক হইত।"[১০] নানা দিক দিয়া গুরু ঈশ্বর গুপ্তের সহিত শিষ্য দীনবন্ধুর সাদৃশ্য ছিল। বাঙলাব প্রাণের সহিত পরিচিত হইয়া এদেশের বৃহৎ পটভূমিকায় সাহিত্য রচনার কৃতিত্ব উভয়েরই প্রাপ্য।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ববিচার বা সাহিত্যগুণ বিশ্লেষণ আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে; আমরা সামাজিক পটভূমিকা ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণতলে ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যকে সংস্থাপিত করিয়া, যে উৎস হইতে তিনি প্রাণরস সংগ্রহ করিয়াছিলেন, শুধু সেই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্ত কবির সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার কবিতার গুণাগুণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আকারে আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং সে বিষয়ে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। ঈশ্বর গুপ্ত সমাজ-সচেতন পটভূমিকায় আবির্ভূত হন, কাজেই রসতীর্থে নির্বিকল্প স্বপ্নপ্রয়াণ অপেক্ষা পরিবেশ-সচেতন বাঙলার সৃজ্যমান সমাজ-জীবনের দ্বারাই তিনি অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। "মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গভীর, উন্নত স্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে

জানিতেন না, সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না।......তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম—এসব সামগ্রী বড় বেশী নাই।"[১১] বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি যথার্থ বটে। ঈশ্বর গুপ্তই আধুনিক বাঙলা দেশের প্রথম সমাজসচেতন কবি। রামমোহনের আবির্ভাব কাল হইতে বাঙলার সমাজে যে বিচিত্র জীবন-স্পন্দন অনুভূত হইতেছিল, ঈশ্বর গুপ্ত সেই সমাজ-মানসের কবি। "তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্য দেশের কবি।"[১২] কাজেই নাগরিক জীবনের নানা আন্দোলন, বিধবা-বিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, হিন্দুকলেজ, মিশনারী জুলুম, 'ইয়ং বেঙ্গল', ডাফ সাহেব, মার্শম্যান সাহেব, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি, বাঙালীর জীবনের অসংখ্য অসঙ্গতি ও সংস্কৃতির সংশয় তাঁহার পরিহাস-নিপুণ চিত্তকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তবু তিনি পোপ ড্রাইডেনের অনুরূপ ব্যঙ্গরসের কবিখ্যাতি ব্যতীত অক্ষয় কবিস্বর্গ লাভ করিতে পারেন নাই। পোপ ও ড্রাইডেন যেমন জীবন-প্রতীতির উপরিতলে বিহার করিতেন, তেমনি ঈশ্বর গুপ্তও ছিলেন বোধ ও বোধির উপরতলার অধিবাসী। তাই তাঁহার অসংখ্য কবিতার মধ্যে নানা চমক থাকিলেও বিশুদ্ধ কাব্যরস অতি অল্পই আছে। তথাপি সমাজসচেতন আন্দোলন, নানা রঙ্গব্যঙ্গ, বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের হাসিকান্নাকে কাব্যের মুকুরে ফুটাইয়া তোলার নিপুণ শক্তি তাঁহার ছিল। তাঁহার রুচি, অনুভূতি ও মনন মোটাসুরে বাঁধা ছিল, কবিগান ও আখড়াই গানের প্রভাব তিনি কোনদিন কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর রুচিকে সমর্থন করেন নাই। "অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটা প্রধান দোষ। .. .কেবল রঙ্গদারীর জন্য, শুধু ইয়ারকির জন্য এক আধটুকু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশকাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। ..তখন পূজাপার্বণ অশ্লীল, উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেও লোক-রঞ্জন হইত। পাঁচালী হাফ আখড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত সেই বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বর্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটুখানি মার্জনা করিতে পারি।" অবশ্য এই প্রবন্ধ রচনার ষোল বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭১ সালের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে 'Bengali Literature' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, "He was ignorant and unedu-

cated man. He knew no language but his own, and was singularly narrow and unenlightened in his views of the higher qualities he possessed none, and his work was extremely rude and uncultivated. His writings were generally disfigured by the grossest obscenity." এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সহানুভূতিহীন ভাষায় তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন, পরবর্তীকালে কিন্তু গুরুর কাব্য সম্পাদন করিতে গিয়া উদারতর দৃষ্টিকোণ হইতে ঈশ্বর গুপ্তকে বিচার করিয়াছেন।

উগ্র আদিরসাত্মক স্থূল 'গ্রামবার্তা'কেই বঙ্কিমচন্দ্র অশ্লীল বলিয়াছেন। দেহে-মনে বলিষ্ঠ বাঙালী গতশতাব্দীর প্রথমার্ধে রুচির শুচিতা সম্বন্ধে ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করে নাই; তা' ছাড়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালী রসরুচির দিক দিয়া কিয়ৎ পরিমাণে স্থূল রসের পথিক ছিল। ভারতচন্দ্রের মানসপুত্র ও কবিওয়ালাদের প্রতিনিধি-স্থানীয় ঈশ্বর গুপ্ত সেই মানসিক ভাবসংবেগে বর্ধিত হইয়াছিলেন। কাজেই বাঙালীর যে রুচি ১৯শ শতকের মধ্যভাগের পরে ব্রাহ্মসমাজ, আধুনিক ইংরাজী শিক্ষা 'মধ্যভিক্টোরীয়' (Mid-Victorian) সাহিত্যরুচির সাহায্যে রূপান্তর গ্রহণ করিল, সেখান হইতে ঈশ্বর গুপ্ত নির্বাসিত হইলেন। বিদ্যাসাগরও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার প্রতি প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করিতেন।[১৩] জীবন সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের লঘু চাপল্য বিদ্যাসাগরের ভাল না লাগিবারই কথা; উপরন্তু বিধবাবিবাহ ব্যাপারে ঈশ্বর গুপ্ত বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।[১৪] কাজেই বিদ্যাসাগর যে গুপ্তকবির কবিতা বরদাস্ত করিতে পারিবেন না, তাহা সহজেই অনুমেয়। তৎকালীন সমালোচকগণও ঈশ্বর গুপ্তকে হাস্যরসের কবি বলিয়া নগদ বিদায় করিয়াছিলেন। সে যুগের এক প্রাচীন সমালোচক ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "স্বভাব বর্ণনে যেমন কবিকঙ্কণ, পরমার্থ কালীবিষয়ে যেমন কবিরঞ্জন, আদিরসে যেমন রায়গুণাকর, হাস্যরসে তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অদ্বিতীয় কবি।"[১৫] আধুনিক কালেও তাঁহার কবিতার যথার্থ বিচার হয় নাই। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার প্রতি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রীতি বা শ্রদ্ধা ছিল না বলিয়া তিনি গুপ্তকবির সম্বন্ধে অনুদার মন্তব্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ময়ূরচড়া, টেরিকাটা, কার্ত্তিক স্বরূপ ঈশ্বর গুপ্ত।"[১৬] প্রভূত ক্ষমতাবান্ বিদ্যোৎসাহী বীঠন সাহেব তাঁহাকে

বঙ্গদেশের কবি জানিয়া ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে বাঙলার বালিকা বিদ্যালয়সমূহের পাঠোপযোগী পুস্তক রচনা করিতে অনুরোধ করেন।[১৭] বীঠন সাহেব কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, প্রস্তাবিত পাঠ্যগ্রন্থে যেন অশ্লীলতা না থাকে। সুতরাং সকলেই তাঁহার অশ্লীলতার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও 'আধুনিক সাহিত্যে' বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন, বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে সময়কার সাহিত্য অন্য যে কোন প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক, ঠিক সুরুচি শিক্ষার উপযোগী ছিল না।...... দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন, কিন্তু তাহার লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় না। তাহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।" বোধ হয় এই রুচির শুচিতার অভাব এবং অনুভূতির স্থূলত্বের জন্য কোন এক আধুনিক সমালোচক স্বল্প কথায় গুপ্তকবির কাব্য সমালোচনা করিয়াছেন, ঈশ্বর গুপ্ত তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। আজও তাহার উল্লেখ করিবার সময়ে রসিকেরা তাঁহাকে অকৃত্রিম বাঙালী বলিয়া থাকেন। অকৃত্রিম বাঙালী কবি কি পদার্থ, গুপ্ত-রসিকেরাই জানেন।" 'অকৃত্রিম বাঙালী কবি কি পদার্থ' তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীতে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একথা মনে রাখিলে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার রসাস্বাদন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে যে, পোপ-ড্রাইডেনের কবিধর্ম, কাব্যরস ও কবি-বাণীর সহিত যেমন শেলি-কীট্‌সের বৈসাদৃশ্য আছে, ঠিক সেইরূপ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার রস আর মন্ময় গীতিকাব্য বা ঘটনা-প্রধান মহাকাব্যের রস সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। ড্রাইডেনের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে যাঁহারা উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না, তাঁহাদিগকে টি. এস. এলিয়ট সব্যঙ্গে বলিয়াছেন, "If the prospect of delight be wanting (which alone justifies the perusal of poetry) we may let the reputation of Dryden sleep in the manuals of literature. To those who are genuinely insensible of the genius (and these are probably the majority of living readers of poetry) we can only oppose illustrations of the following

proposition that their insensibility does not merely signify indifference to satire and wit, but lack of perception of qualities not confined to satire and wit and present in the work of other poets whom these persons feel that they understand." (T. S. Eliot—*Selected Essays*, p. 305) এখানে এলিয়ট ড্রাইডেন-প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধেও তাহা বলা চলিতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার বাণী সুদূর প্রসারী নহে, সামাজিক বঙ্গব্যঙ্গ এবং বাঙালীর দৈনিন্দন জীবনের স্বাদু উপলব্ধিই তাঁহার কবিতার একমাত্র ফলশ্রুতি, এবং সে ফলশ্রুতি যে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি বাঙালীর অতি-প্রত্যক্ষ জীবনকে অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন, বাস্তব জীবনকে কাব্যের বিষয়বস্তু করিয়া, পরিচিত সংসারকে কখনও নিকট হইতে, কখনও বা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন, পরিহাস করিয়াছেন, স্থূলত্বের অন্ধকূপে ডুবিয়া ক্লেদ উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু ১৯শ শতকের উত্তপ্ত পিপাসা তাঁহাকেও স্পর্শ করিয়াছিল, তাহার অন্যান্য প্রমাণ আমরা পরে আলোচনা করিতেছি। এখানে শুধু একটা কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহার কবিতায় যে পরিচিত জীবনের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, দেশের ভূগোল-ইতিহাসের সহিত রহিয়াছে নিবিড় আত্মীয়তা,—তাহা তাঁহার 'পাঁঠা,'—'কৌলীন্য,' স্নানযাত্রা, 'এণ্ডাওয়ালা তপস্যা মাছ,' 'আনারস,' 'পৌষডার গীত' প্রভৃতি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। ১৯শ শতকের প্রায় মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া ঈশ্বর গুপ্ত সমগ্র বাঙলাদেশের পটভূমিকায় কবিতার বিষয়বস্তুকে স্থাপন করিয়াছেন। সে যুগের বাঙালীর প্রাণের বাণী এমন করিয়া আর কাহারও কাব্যে ধরা দেয় নাই। "সুদূর জলপাইগুড়ির কোল হইতে হিজলী পর্যন্ত সকল প্রদেশের সাধারণ বাঙ্গালা-নবীশ বাঙ্গালী ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে পারেন, ঈশ্বর গুপ্তের ভাবে মুগ্ধ হইতে পারেন।"[১৯] এখন দেখা যাক ঈশ্বর গুপ্ত কেবলই কি জীবন-বারিধির তরঙ্গে তরঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন, অথবা ১৯শ শতাব্দীর নব-জাগৃতির বাণী তাঁহাকেও স্পর্শ করিয়াছিল।

॥ ৪ ॥

ঈশ্বর গুপ্তের সমাজচেতনা

রামমোহনের প্রতিভাদীপ্তি ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই নবশিক্ষিত বাঙালীর মনে দাবানল সৃষ্টি করিয়াছিল, 'ইয়ং বেঙ্গলদের' মধ্যে মৃত ডিরোজিও যেন পুনরুজ্জীবিত হইলেন। প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষার দৃতিয়ালীতে তরুণ বাঙালী সমগ্র য়ুরোপের জীবন-উল্লাস ও সমাজচেতনার পাবক-স্পর্শ লাভ করিল। ১৮৩৪ হইতে ১৮৫৭—মাত্র এই কয় বৎসরের মধ্যেই মধ্যযুগীয় ভাবধারায় পরিপুষ্ট বাঙালী আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার উপল-উপকূলে নিক্ষিপ্ত হইল। বাঙালীর মন ও মননে, সত্তার গভীরে এই নবজাগৃতি সঞ্চারিত হইল। এই নবজাগৃতি য়ুরোপীয় রেনেসাঁস (অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা) নহে।[20] রামমোহনের বেদান্ততত্ত্ব অপেক্ষা কোঁতের পজিটিভিজম্ বা মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজম্ এই সময়ে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এখন দেখা যাক, এই নবভাবের তরঙ্গভঙ্গ ঈশ্বর গুপ্তের চেতনায় কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল কিনা। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে বলিয়াছেন, "কলিকাতা শহরের কবি।" রামমোহনের অবসান হইতে শুরু করিয়া সিপাহীবিদ্রোহ পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া নব্য বাঙলার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায় যে সাংস্কৃতিক সঙ্কট ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, ঈশ্বর গুপ্ত কি সেই উত্তপ্ত গগনতলে দাঁড়াইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, অথবা সেই তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন?

তখন যুগধর্মের প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল ইংরাজী শিক্ষার—যে ইংরাজী শিক্ষা বাঙালীর মনে চিন্তার স্বাধীনতা সূচিত করিয়াছিল। তৎকালীন সমাজ-জীবনের একপদ ইংরাজী শিক্ষায়, আর একপদ বাঙলা দেশের রাজধানীর উপর দৃঢ় নিবদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্ত এই ইংরাজী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত ছিলেন, নিতান্ত স্থূল ভাঁড়ামিপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন এবং যাহা কিছু বিদেশী ও য়ুরোপীয়, তাহাকেই ভবানীচরণের মত অবিশ্বাস করিয়াছেন।—গুপ্তকবির কবিতা পাঠে প্রথম পাঠার্থীর মনে এই ধারণাই দৃঢ় হইতে পারে। বাস্তবিক ঈশ্বর গুপ্ত অল্প বয়সে কলিকাতায় আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিলেও নবযুগের ভাবধারার প্রধান চাবি যে ইংরাজী ভাষা, তাহার প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার জন্মের চার-পাঁচ বৎসর পরেই হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি যখন কলিকাতায় আসেন তখনই কলিকাতা অঞ্চলে ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি

পাইয়াছিল। অবশ্য তাহার মূলে ছিল কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটী। তিনি বাল্যে স্কুল সোসাইটীর কোন পাঠশালায় পড়েন নাই, যৌবনেও হিন্দু কলেজ হইতে দূরে ছিলেন। সুতরাং নবযুগেব যে বাণী ইংবাজী ভাষাব মারফতে বাঙালীব চিত্তপ্রান্তে নব নব জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে অভিনব প্রত্যয় সৃষ্টি করিতেছিল, তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। কৈশোরে গুপ্তকবি কবিব দলে ও আখড়াই সমাজে গান বাঁধিতেন, যৌবনে ও প্রবীণ বয়সেও তিনি সেই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পাবেন নাই। অথচ তিনি অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাব এক বাল্যসখা ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের 'সংবাদ প্রভাকবে' লিখিয়াছিলেন, "ঈশ্বরবাবু যৎকালীন ১৭।১৮ বর্ষ বয়স্ক, তৎকালীন দিবারাত্রি একত্র সহবাস থাকাতে, আমার নিকট মুগ্ধবোধ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অনুমান হয় একমাস কি দেড়মাস মধ্যেই মিশ্র পর্যন্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। শ্রুতিধরদিগের প্রশংসা অনেক শ্রুতিগোচর আছে, ঈশ্বরবাবুর অদ্ভুত শ্রুতিধরতা সর্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে।" কিন্তু এই শ্রুতিধরেব শ্রুতি ইংবাজী বিদ্যাব প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। অথবা অর্থ-কৃচ্ছ্রতাব জন্য তিনি ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পান নাই, ইহাতে বাংলা সাহিত্যেব অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি যথার্থ, "তিনি সুশিক্ষিত হইলে তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে তাঁহাব কবিত্ব, কাব্য এবং সমাজেব উপব আধিপত্য অনেক বেশী হইত। আমাব বিশ্বাস যে, তিনি যদি তাঁহাব সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পববর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূব অগ্রসব হইত।" হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রেরও পূর্বে তাঁহার 'কবিচরিত ১ম' নামক বাংলা সাহিত্যেব প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে ঈশ্বব গুপ্ত সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "তাঁহার কবিত্ব শক্তির অনুযায়িনী বিদ্যাবত্তা থাকিলে বোধ হয় এরূপ দোষ ঘটিত না, তদংশে তিনি পূর্ববর্তী অধিকাংশ কবিগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন।"[২১] এখানে সমালোচকগণ 'সুশিক্ষা' ও 'বিদ্যাবত্তা' বলিতে ইংরাজী বিদ্যাই বুঝিয়াছেন। কারণ ঈশ্বর গুপ্ত সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার অনূদিত 'শকুন্তলা' কবিতা, 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের ভাবানুসরণ, 'বোধেন্দুবিকাশ,' 'হিত-প্রভাকর' (হিতোপদেশের কিয়দংশের অনুবাদ) প্রভৃতি পাঠ করিলে দেখা

যাইবে যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তিনি মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ১২৬৫ বঙ্গাব্দের মাঘমাসের মাসপয়লা 'প্রভাকরে' কবিতায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ ও অল্প কয়েকটি মাত্র শ্লোকের অনুবাদের পরেই দেহত্যাগ করেন। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় যে তাঁহার অধিকার ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে। ন্যায় ও বেদান্ত তাঁহার অনধিগম্য ছিল না। 'প্রবোধ প্রভাকরে'র ভূমিকায় (১৮৫৮) তিনি বলিয়াছিলেন, "জ্ঞানগুরু সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃপায় সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া কলিকাতা প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।" এই পদ্মলোচন ন্যাযরত্নের নিকট তিনি ন্যায় ও বেদান্ত নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন।

রামগতি ন্যায়রত্ন গুপ্তকবির 'প্রবোধ প্রভাকর' প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "গ্রন্থকার নিজে শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না, একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তায় গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে।"[১২] ইহা কিন্তু যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রও একস্থানে বলিয়াছেন, "তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্যহেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্যপদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়।" কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ঈশ্বর গুপ্তের সংস্কৃত ভাষায় যে বিশেষ অধিকার ছিল না, তাহার কোন প্রমাণ নাই; বরং তাহার বিপরীত প্রমাণই আছে। তাঁহার পিতা ও পুত্রের তত্ত্ববিষয়ক যে দীর্ঘ কবিতা আছে, তাহাতে যেভাবে তিনি ন্যায়দর্শন হইতে বেদান্ত এবং বেদান্ত হইতে ভক্তিমূলক দ্বৈতবাদে পরিক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ মনে হয় না। বিশেষতঃ সূক্ষ্ম দার্শনিক জ্ঞান না থাকিলে শুধু অধ্যাপকের সাহায্যে বা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তায় হিন্দুদর্শনের মূল রহস্য অনুধাবন করা যায় না। শুধু ন্যায় বা বেদান্তেই নহে, তিনি "একজন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডীর নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন।"[১৩] ঈশ্বর গুপ্তের অনুজ রামচন্দ্র গুপ্তের এই সাক্ষ্য অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবার কারণ নাই। আমাদের অনুমান, তাঁহার 'মহাকালীর স্তব' (বসুমতী সংস্করণ গ্রন্থাবলী, পৃ ১০৪) কবিতাটি তন্ত্রপাঠের ফলে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ইংরাজী ভাষা তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না, তাহা স্বীকার্য বটে; তবে কবিওয়ালারা যেমন ইংরাজী না জানিয়াও কবিতা ও গানের মধ্যে বহুপ্রচলিত দুই চারিটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, ঈশ্বর গুপ্তও তেমনি কলিকাতার অভিজাত সমাজে বিচরণ করিয়া এবং 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদনা কালে বহুজনের সংস্পর্শে আসিয়া বহু ইংরাজী শব্দ কবিতার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। উদ্দেশ্য ছিল—নিছক ব্যঙ্গ ও পরিহাস, কিন্তু ইংরাজী শব্দগুলির অর্থ যে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তাহা তাঁহার কয়েকটি শব্দের ব্যবহার দেখিলেই বুঝা যাইবে:

১। হোলি গোষ্ট ছাড়া নন এই পাঁচভূত (মায়া)।

২। বেরিবেষ্ট সেবিটেষ্ট মেরি রেষ্ট যাতে। —ইংরাজী নববর্ষ

৩। হিপ হিপ হুর্‌রে ডাকে হোল ক্লাস।
ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক দিস্ গ্লাস॥ ঐ

৪। ডোণ্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম। ঐ

৫। বেলাক নেটিভ লেডি শেম্ শেম্ শেম্। ঐ

৬। মেরিদাতা মেরি সুত বেরি গুড বয়।

৭। পাত্তরে খাব না ভাত গোটুহেল কাল।
হোটেলে টোটেল নাশ সে বরং ভাল॥ ঐ

৮। গ্রাণ্ট করি গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল্ (অর্থাৎ কলভিল্) কাল বিল করিলেন পাস॥

—বিধবা-বিবাহ আইন

৯। আপন বিক্রমে হবো কখিয়ার কিঙ।
টেবিলে বসিব খেতে হাতে দিয়ে রিঙ॥

—বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খ্রীষ্টান ধর্ম্মানুরক্তি

১০। টেক ফিস বলে ডিস কাছে দেয় ঠেলে। —এণ্ডাওয়ালা তপস্যা মাছ

১১। ওল্ড এক টেস্টামেণ্ট গোল্ড তায় বাঁধা। —বড়দিন

১২। আক্রস, পিক্রস আদি আণ্ডুস, মেণ্ডিস।
ডিকোষ্টা ডিরোজা জোনা, ডিসোজা গমিস॥ ঐ

১৩। ফ্রেস ফিস ভরা ডিস মধ্যে ভাতে ভাত॥ ঐ

১৪। ও মা, কেনিং কভু কনিং নন, বলী তিনি ধর্ম্ম বলে —নীলকর গীত

১৫। বলে, ফিরি টেরেড, বন্ধ কর্ত্তে কোন কালে কেউ পারে না। —দুর্ভিক্ষ, গান্ত

১৬। গো টু হেল ওল্ড কল্ল ড্যাম ড্যাম হাবা। —ঠোঁট কাটা

সুতবাং দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর গুপ্ত কিছু কিছু ইংরাজী শব্দের ব্যবহার জানিতেন। অবশ্য ইংবাজী ভাষাব মাধ্যমে যে নবচেতনা আমাদের সাহিত্যে সঞ্চাবিত হইতেছিল, তাহাব সম্যক পবিচয় লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অনেকে মনে কবিতে পাবেন যে, যাহা কিছু প্রগতিপূর্ণ সমাজচেতনা, য়ুরোপীয় সংস্পর্শজাত নব প্রতীতি, ঈশ্বর গুপ্ত যেন তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঈশ্বব গুপ্তেব অসংখ্য সমাজবিষয়ক কবিতা হইতে এইরূপ প্রমাণ উপস্থাপিত করা যাইতে পাবে। তিনি যে ইংবাজী ভাষা ও সেই জাতীয় শিক্ষাব ঘোরতব বিরোধী ছিলেন, তাহা প্রমাণের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক জ্ঞানেব প্রয়োজন নাই। ইংবাজী শিক্ষাব ফলে আমাদেব দেশের যুবক, বালক ও বালিকাবা স্বধর্ম ভ্রষ্ট হইয়া অর্ধফিবিঙ্গী জীবনাদর্শ বরণ করিয়া লইতেছিল; এই জন্য তিনি হিন্দু কলেজ, ইয়ং বেঙ্গল প্রভৃতি য়ুবোপীয় সংস্কৃতিকামী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানেব প্রতি প্রতিকূল ধাবণা পোষণ করিতেন। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি উদাহবণ দেওয়া যাইতেছে—

নগরে অনেক কেলে হিন্দুর কালেজ।
গেল তার হিন্দু নাম ঘুচিয়াছে তেজ॥
মদনের মণ্ডা নেই পড়িয়াছে মেজ।
জাতি গিয়া একেবারে হয়ে গেছে তেজ॥
এর পরে মিশনারি রোজ জ্বেলে সেজ।
খুলিবেন থিয়েটবে বাইবেলের পেজ॥
কাজ নাই নিয়ে আর ইংলিশ নালেজ।
কালেজের নাম হলো খিচুড়ি কালেজ॥

ইংবাজী সভ্যতা, যীশুখ্রীষ্ট ও পাদ্রী আলেকজাণ্ডাব ডাফ সাহেবকে ব্যঙ্গ :

ধন্যরে বোতলবাসী, ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতা সকল॥
দিশী কৃষ্ণ মানিনেক ঋষিকৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত বেরি গুড বয়॥
যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে চ্যাপেলেতে যাব॥

—ডব অর্থাৎ পাদ্রী ডাফ সাহেবের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ। মিশনারী ভীতি:

হেদো বনে কেঁদো বাঘ রাঙা মুখ যার।
বাপ বাপ বুক ফাটে নাম শুনে তার।

* * *

কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়।
মিশনারি ছেলেধরা ছেলে ধরে খায়॥

* * *

বিদ্যাদান ছল করি' মিশনরি ডব।
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্মের টব॥
মধুর বচন ঝাড়ে জানাইয়া লব।
ঈশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব॥

সুতরাং—

কাজ নাই স্কুলেতে লেখাপড়া ক'রে।

নারীশিক্ষাব বিরুদ্ধে শর নিক্ষেপ:

আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ম কর্ত্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আব কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন এ. বি, শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে।

অন্যত্র—

লক্ষ্মী মেয়ে ছিল যারা
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া চড়বে ঘোড়া।
ঠাট ঠমকে চালাক চতুর সভ্য হবে থোড়া থোড়া।
এরা পর্দ্দা তুলে ঘোমটা খুলে সেজেগুজে সভায় যাবে।
ড্যাম্ হিন্দুয়ানী বলে বিন্দু বিন্দু ব্র্যাণ্ডি খাবে॥
আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে সবাই দেখতে পাবেই পাবে
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

ইয়ং বেঙ্গল সম্বন্ধে কটূক্তি:

সোনার বাঙাল করে কাঙাল ইয়ং বাঙাল যত জনা।
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে কানে লাগায় ফোঁস ফোঁসনা॥
এরা না হিঁদু না মোসোলমান, ধর্ম্ম ধনের ধার ধারে না।

নয় মগ ফিরিঙ্গী, বিষম খিজি, ভিতর বাহির যায় না জানা।
ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে ঘটায় কত অঘটনা।
এরা লোনা জল ঢোকালে ঘরে আপন হাতে কেটে খানা।

ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুধর্মে আস্থাহীন বাঙালী যুবক সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি—

যত কালের যুবো যেন সুবো
ইংরাজী কয় বাঁকা বাঁকা।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো
ভিখারী কি অন্ন পাবে॥

*　　*　　*　　*

হোয়ে হিঁদুর ছেলে ট্যাসে চেলে
টেবিল পেতে খানা খাবে।
এরা বেদকোরাণের ভেদ মানে না
খেদ ক'রে আর কে বোঝাবে॥
ঢকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে
জুতো পায়ে দেখতে পাবে।
হোল কর্ম্মকাণ্ড লণ্ডভণ্ড
হিঁদুয়ানী কিসে রবে॥

হিন্দুর লোকপ্রচলিত সংস্কার ও ধর্ম সম্বন্ধে যেখানে হইতে বাধা আসিয়াছে, সেইখানেই ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী খরতর হইয়াছে এবং সে আক্রমণ হইতে বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেববাহাদুর—কেহই রক্ষা পান নাই।

১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়। বলা বাহুল্য সে যুগে অনেক উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত বিধবা-বিবাহ আদৌ সমর্থন করিতেন না, কাজেই বিধবা-বিবাহ ও তাহার উদ্যোক্তা উভয়কেই তিনি শাণিত ভাষায় ব্যঙ্গ করিয়াছেন। রুচির অনুরোধে তাহার কিছু কিছু উদ্ধার করা সম্ভব নহে। দু'একটি অপেক্ষাকৃত মার্জিত পংক্তি উল্লেখ করা যাইতেছে:

পরাশর প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে, এ যে দেখি সাগরের ঢেউ॥

বিধবা-বিবাহের উদ্যোক্তাদের প্রতি মারাত্মক ব্যঙ্গ—

যেখানে সেখানে শুনি এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব॥

সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে।

বিদ্যাসাগরের প্রতি কটূক্তি—

সকলেই তুড়ি মারে বুঝে নাক কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ।
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন।

অন্যত্র—

অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা
তাতে বিধবাদের কুলতরা অকূলেতে কূল পেল না।
*　　　*　　　*
সে যে অকূল সাগর দারুণ ডাগর কালাপানি বড় লোনা।
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিল তখনি গিয়েছে জানা।।

উল্লিখিত উদ্ধৃতি বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, তিনি পশ্চিম সমুদ্রতীরের লবণাক্ত কলোচ্ছ্বাসকে ব্যঙ্গের বাঁধ বাঁধিয়া কোন প্রকারে বাধা দিতে চাহিয়াছিলেন, নবজাগ্রত সমাজচেতনার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আন্দোলন করিয়াছিলেন। কোন এক সাহিত্যরসিক তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য :

"As a satirist he found ample material for ridicule in the transitional society of his day, but his ultra-conservative attitude made him laugh at everything that was new or European, irrespective of whether it was good or bad. He had grown up in the old ways, without English education (or regular education of any sort) and his roots were in the old Bengal untouched by Western influence."

একটু অবহিত হইয়া ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা এবং 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিলে তাঁহাকে এত দূর প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া মনে হয় না। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে তাঁহার চিত্তধর্মের অভিনবত্ব প্রমাণের প্রয়াস পাইব।

॥ ৫ ॥

ঈশ্বর গুপ্ত ও যুগধর্ম

যুগধর্মের সহিত ব্যক্তিমনের সমন্বয় সাধন করা স্থিতধী ব্যক্তির লক্ষণ। কেহ কেহ 'অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'র বলে নবযুগ সৃষ্টি করেন, কেহ-বা

যুগধর্মের সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত মনোধর্মের সমন্বয় সাধন করিয়া যুগধর্মকেই আরও একটা নূতন মূল্য দান করেন। ১৯শ শতাব্দীর যে যুগধর্ম ইংরাজী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিকট-সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালীর মধ্যযুগীয় সংস্কারকে এক মুহূর্তে ভস্ম করিয়া নূতন প্রতীতি সৃষ্টি করিল, ঈশ্বর গুপ্ত প্রত্যক্ষ ভাবে তাহার সহিত যুক্ত ছিলেন না। কারণ ইংরাজী শিক্ষার মাদকরস সেবন করিয়া শিরা-উপশিরার মধ্যে পশ্চিম সমুদ্রতীরের লবণাক্ত তরঙ্গোল্লাস উপলব্ধি করিবার মত মানসিক গঠন তাঁহার ছিল না। তবে তিনি উত্তমরূপে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিলে হয়তো অন্য এক ভাবে জীবন-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইতেন। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার পার্থক্য আছে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ইংরাজী না শিখিলেও শুধু বিশিষ্ট মনোধর্মের দ্বারাই আপন আপন পথ খনন করিয়া চলিতে পারিতেন। রামমোহন বাল্যকালেই অদ্বয়তত্ত্ব ও যুক্তিমার্গ সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন—তখনও তিনি ইংরাজী শিখেন নাই। বিদ্যাসাগরও নিঃস্পৃহ যুক্তিবাদী ছিলেন এবং এই যুক্তিবাদ তিনি ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া লাভ করেন নাই। বালক বয়সে মাইলস্টোনের ইংরাজী রাশি দেখিয়া ইংরাজী অঙ্কমালা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিবার গল্পেই তাহার ইঙ্গিত দেখিতে পাই। উনিশ হইতে দশ পর্যন্ত সংখ্যা দেখিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্র ইংরাজী অঙ্ক শিখিলেন: ঠাকুরদাস পুত্রের মেধা পরীক্ষার জন্য ছয়ের অঙ্ক না দেখাইয়া একেবারে পাঁচে আসিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া উত্তর দিল, "বাবা, এটা ছয়ের অঙ্ক, কিন্তু ভুলে পাঁচ লিখিয়াছে"।[২৫] এই যে আপন বুদ্ধির প্রতি অভ্রান্ত বিশ্বাস—ইহাই প্রতিভা। বালক একবারও আপন বুদ্ধিকে সন্দেহ করে নাই। বিদ্যাসাগর সমগ্র জীবন ধরিয়াই নিশিত তরবারির মত নির্মোহ মুক্ত বুদ্ধি সঙ্গে লইয়া জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত এইরূপ আত্মনিষ্ঠ অসংশয় বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন না; সুতরাং তিনি যুগধর্মের তাৎপর্য না বুঝিয়া তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইলে ক্ষমার যোগ্য। রাধাকান্ত দেববাহাদুরের মতো ভূয়োদর্শী ব্যক্তিও যুগধর্মের সম্যক অর্থ বুঝিতে পারেন নাই; ঈশ্বর গুপ্তের পক্ষে এই অসামর্থ্য এমন কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নহে।

কিন্তু একটু অবহিত হইয়া ঈশ্বর গুপ্তের রচনাদি, বিশেষতঃ 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে'র বিবর্ণ পৃষ্ঠা উল্টাইলেই ঈশ্বর গুপ্তের

আর একটি স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইবে। সেই বিচিত্র পরিচয় প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

বায়ুমণ্ডলে বাস করিয়া যেমন বাতাসের চাপ এড়াইয়া যাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি একটা বিশিষ্ট যুগধর্মের ভাবমণ্ডলে আবির্ভূত হইলে যে-কোন সচেতন মানুষের মনকে তাহা স্পর্শ করিবেই। ঈশ্বর গুপ্ত কিয়দংশে প্রাচীন পন্থী হইলেও তিনিও যুগধর্মের কবল হইতে পরিত্রাণ পান নাই। য়ুরোপীয় শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অবহিত না হইলেও, ইহার আদর্শ এবং চিত্তসঙ্কট তাহাকেও বিচলিত করিয়াছিল। মিশনারীদের ধর্মান্তরীকরণের বিরুদ্ধে তিনি কবিতার অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং মিশনারীদের বলপ্রকাশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আত্মরক্ষার জন্যই রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাধাকান্ত দেব এবং বঙ্কিমচন্দ্র মিশনারীদের এই অনাচারকে তীব্র আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তও সেই রণসজ্জার অন্যতম রথী ছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে ডাফ সাহেব নাবালক উমেশ সরকার ও তাহার নাবালিকা স্ত্রীকে বলপূর্বক খ্রীস্টান করিলে সমস্ত দেশবাসী এই ব্যাপারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি তুলিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মত আত্মস্থ ব্যক্তিও ক্রুদ্ধ হইয়া ইহার বিরুদ্ধে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে (১৭৬৭ শক, জৈষ্ঠ) প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার ভাষা অক্ষয়কুমারের হইলেও মূল প্রেরণা দেবেন্দ্রনাথের।[২৬] এই ব্যাপারের ফলে রক্ষণশীল হিন্দু ও নব্যসমাজের বিরোধিতা মিটিয়া গেল। সনাতনপন্থী হিন্দু সমাজের নেতা ও ধর্মসভার সভাপতি রাধাকান্ত দেববাহাদুর ও রাজা সত্যচরণ ঘোষাল প্রমুখ প্রাচীনগণ এবং অন্যদিকে নব্যবঙ্গের নেতা রামগোপাল ঘোষ—সকলেই একই উদ্দেশ্যে মিলিত হইলেন। সকলেই এই ব্যাপারকে জাতীয় আপৎ-পাত মনে করিয়া দলগত বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া মিশনারী-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ফলে 'হিন্দুহিতার্থী' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যায়তন হিন্দু বালক ও কিশোরকে মিশনারীদের কবল হইতে রক্ষা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়, "সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"[২৭] সুতরাং ঈশ্বর গুপ্ত মিশনারীদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করিয়া এই সামাজিক আন্দোলনকেই সক্রিয়ভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ধর্মান্তরিত খ্রীস্টানদিগকে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চিন্তা

করিয়াছিলেন এবং স্বামী দয়ানন্দের অনেক পূর্বেই শুদ্ধির প্রস্তাব করিয়া লিখিয়াছিলেন,

"মুসলমানদিগের তোবার ন্যায় আমাদের একটা উপায় করিলে অনেক সুফল দর্শিতে পারিবেক। শাস্ত্রে ইহার বিধি অবশ্যই পাওয়া যাইবেক, পাদ্রি সাহেবেরা যদি এক ফোঁটা জল দিয়া পবিত্র করিয়া লইতে পারেন তবে কি আমরা ভববন্ধন বিমোচনকারী তারকব্রহ্ম রাম নামের গুণে পুনর্বার স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিব না?"[২৮]

এখন কথা হইতেছে, তিনি কি য়ুরোপীয় শিক্ষাবিরোধী ছিলেন? হিন্দুসন্তান স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া যীশু ভজিবে, এই চিন্তাতেই য়ুরোপীয় ভাবাদর্শের প্রতি তাঁহার মন বিষাইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ইংরাজী শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য গুপ্তকবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন,

"এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার যে কল্পনা স্থির হইয়াছে তাহা অতি উত্তম, ইংলণ্ড দেশে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালযে যে ২ প্রকার বিদ্যার শিক্ষা হইয়া থাকে এদেশীয় লোকে তাহার কোন বিষয়েই শিক্ষা করিতে অক্ষম নহে,......এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অত্রস্থ প্রজাদিগকে তদুপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিলে এতদিন তাহারা নানা বিষয়ে উপযুক্ত হইয়া উঠিত।"[২৯]

সুতরাং তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষা-বিরোধী কি করিয়া বলা যাইতে পারে? যদিও তিনি কবিতায় বালিকাদের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে নিছক রঙ্গরস সৃষ্টিই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। যখন তিনি বলেন,

এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে সাঁঝ সেঁজোতির ব্রত গাবে
সব কাঁটা চামচ ধোরবে শেষে, পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে॥
ও ভাই, আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে পাবেই পাবে, দেখতে পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে॥

তখন ইহার মূল উদ্দেশ্য যে আপাতঃ অসঙ্গতির মধ্য দিয়া ব্যঙ্গরস সৃষ্টি তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আবার তিনিই 'সংবাদ প্রভাকরে' স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন,

"আহা, স্ত্রীলোকেরা জ্ঞান শিক্ষাকরণের উপায় প্রাপ্ত না হওয়াতে কত বিষয়ে আমাদিগের ক্লেশ বোধ হইতেছে, তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না, আমরা যদ্যপি গৃহবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ইত্যাদি অনিষ্ট ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করি তবে স্ত্রীজাতির অজ্ঞানতাকেই তাহার মূলীভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তাহারা বিদ্যাবতী হইলে ঐ সকল অনিষ্ট অনায়াসে নিবারণ হইতে পারে, আর সংসারে সুখ স্বচ্ছন্দতাও ক্রমে বৃদ্ধি হয়।"[৩০]

তিনি বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সে যুগের অনেক উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিই বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও বিধবা বিবাহ বিশেষ পছন্দ করিতেন না। "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিতও দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা বিধবাবিবাহ প্রচারেই অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত অথচ রক্ষণশীল লোকদিগকে বিরক্ত করিয়া তোলেন।"[৩১] বিধবাবিবাহ এমনই একটা ব্যাপার যাহাতে বহুকালাশ্রিত সংস্কারের মূলে আঘাত লাগে; দেবেন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্রের মত ঈশ্বর গুপ্ত সেই সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তাঁহাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা যাইতে পারে না। বরং কোন কোন বিষয়ে চিন্তার প্রগতিপরায়ণতা দেখিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে ইচ্ছা হয়।

সে যুগে সিপাহীবিদ্রোহকে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দেশের মুক্তি-আন্দোলন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের মত স্বদেশ-প্রেমিক সম্পাদক ইংরাজের সহিত কলহে অবতীর্ণ হইলেও সিপাহীবিদ্রোহকে একটা সাময়িক উৎপাত বলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন, "সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" এই উক্তির পশ্চাদপটে সিপাহী বিদ্রোহের রক্তাক্ত পরিণতি নিশ্চয় লুকাইয়া ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। সিপাহী যুদ্ধ, শিখ যুদ্ধ, কাবুল যুদ্ধ, ব্রহ্ম যুদ্ধ—প্রত্যেকটির বর্ণনায় তিনি অকুণ্ঠচিত্তে ইংরাজের স্তুতিগান করিয়াছেন এবং দেশীয় শক্তি পরাভূত হইলে উল্লসিত হইয়াছেন। সিপাহীদের সম্বন্ধে তাঁহার ক্রোধ—

পামর পাতকী পাষণ্ড যত।
পাপের ঘটনা করিতে কত॥
অদোষে হইয়া কুপথে রত।
রমণী বালক করিছে হত॥
শুনিয়া বধির হতেছি কানে।
সহেনা সহেনা সহেনা প্রাণে॥

অথবা,

অতিদীন জ্ঞানহীন চিরাধীন যারা।
মেরে লাফ কোরে পাপ দেয় তাপ তারা॥
অত্যাচারী বক্ষাকারী অস্ত্রধারী যত।
একেবারে এ প্রকারে পাপাচারে রত॥
নরে পশু হবে বস্তু কবে গস্তু নষ্ট।
হত রব কত কব কত সব কষ্ট॥
কি বিশাল সেনাপাল বামা বাল নাশে।
অকারণে ক্রোধমনে প্রভু গণে শাসে॥

বিদ্রোহী তাঁতিয়া টোপী, নানা সাহেব ও লক্ষ্মীবাঈকেও তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন,

এই ভারত কিসে রক্ষা হবে, ভেব না মা, সে ভাবনা।
সেই তাঁতিয়া টোপির মাথা, আমরা ধরে দেব নানা।

নানা সাহেব সম্বন্ধে,

সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে,
সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে দস্যি ভেড়ে নস্যি কর তারে।

অন্যত্র,

নানা পাপে পটু নানা নাহি শুনে না না।
অধর্ম্মের অন্ধকারে হইয়াছে কানা॥
ভাল-দোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু শেষে দেখ ফাঁদ॥

রাণী লক্ষ্মীবাঈকে ঈশ্বর গুপ্ত অতি কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেন,

হাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী
ঠোঁটকাটা কাকী
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি,
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেঁকি,
গোয়ালের বলে
এত দিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে।
হয়ে শেষ নানার নানী
হয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী
দেখে বুক ফাটে
কোম্পানীর মুলুকে কি বর্গিগিরি খাটে?

সিপাহীবিদ্রোহ দমিত হওয়াতে কবি ইংরাজ সরকারকে ধন্য-ধ্বনির দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছেন—

ধন্য লর্ড গবর্ণর, ধন্য চীফ্ কমেণ্ডর,
ধন্য ধন্য ধন্য সেনাপতি।
ধন্য ধন্য সৈন্য সব ধন্য ধন্য ধন্য রব
ধন্য ধন্য ব্রিটিশের পতি।।

ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে যেন কোথায় একটা স্বতঃ বিবোধিতা ছিল। কবিতায় তিনি ব্রিটিশের জয়গান গাহিয়াছেন, বিদ্রোহী সিপাহীদের ভাগ্যবিপর্যয়ে বা শিখজাতির দুরবস্থায় আনন্দিত হইয়া মহোল্লাসে বলিয়াছেন,

ব্রিটিশের জয় জয় বল সবে ভাইরে।
এসো সবে নেচে কুদে বিভুগান গাইরে।।

কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকরে' শিখদের স্বজাতি-প্রেমকে প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে 'বিদ্রোহী' বলাতে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া লিখিয়াছেন,

"শাকদিগকে বিদ্রোহী শব্দে বাচ্য করা কর্তব্য নহে, যাহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষণার্থ অস্ত্র ধারণ করে, তাহাদিগকে সাধুবাদ দেওযাই উচিত, তাহারা পুত্তলিকাবৎ রাজা দলিপ সিংহের রাজ্য রক্ষণার্থ যত্নযুক্ত নহে, কিন্তু পরাধীনতা শৃঙ্খল ভগ্ন করণার্থ উপযুক্ত প্রযত্ন এবং প্রয়াস প্রকাশ করিয়াছে।[৩২]"

তাঁহার মনেও যে বহ্নি-দীপ্তি সঞ্চারিত হইতেছিল, ইহাই তাহার প্রমাণ। স্বাধীনতার স্পৃহা ও স্বাতন্ত্র্য-বোধ সর্বপ্রথম ঈশ্বর গুপ্তই সঞ্চারিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি স্মরণীয়: "মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী।" ঈশ্বর গুপ্তের চারিটি কবিতা—'মাতৃভাষা,' 'স্বদেশ', 'ভারতের অবস্থা' ও 'ভারতের ভাগ্য বিপ্লব',—শুধু বাংলা সাহিত্যে নহে, বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম উদ্বোধনী সঙ্গীত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ অধিকারী, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু প্রভৃতি নব্যতন্ত্রের কবি ও লেখকগণ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রীতি।

মিছা মণি মুক্তা হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর

অথবা,

জননী ভারত ভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্ম্মরূপ ভূষাহীন হয়ে।

প্রভৃতি কবিতা একদা তরুণমনকে রাঙাইয়া দিয়াছিলে।)

নবজাগরণ ঈশ্বর গুপ্তকে যে কতদূর অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহার আরও কয়েকটা প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। তিনি কলিকাতার নানা সভাসমিতির সহিত জড়িত ছিলেন, এবং নানা স্থানে বক্তৃতাদি দিতেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিণী সভা, দর্জিপাড়ার নীতিসভা প্রভৃতি আধুনিক ভাবসঞ্চারিণী সভাসমিতির সহযোগিতা করিতেন। তিনি ১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খ্রীঃ অঃ) তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য হইয়াছিলেন।[৩৩] দেবেন্দ্রনাথের সহিতও তাহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। একেশ্বরপ্রতিপাদক তত্ত্ববোধিনী সভাকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত সুবিদিত:

"বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি সজ্জন, সত্যবাদী, প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, এবং সর্ব্বগুণজ্ঞ মহন্মনুষ্য। বরং পশ্চিম দিগে সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা আছে, বরং জন্মান্ধের চক্ষু প্রাপণের সম্ভাবনা আছে, তথাচ উল্লেখিত ঠাকুর বাবুর মুখনির্গত বাক্যের অন্যথা হওনের সম্ভাবনা নাই...।"[৩৪]

তত্ত্ববোধিনী সভাকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে, এসিয়াটিক সোসাইটী প্রকাশিত পুস্তক আলোচনা প্রসঙ্গে 'ভাস্কর' ও 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে তত্ত্ব-বোধিনী সভার নাম উল্লেখ না থাকাতে তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন, "বস্তুতঃ এদেশে বেদবিদ্যা প্রচার বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী সভা যত আনুকূল্য ও যত অনুরাগ করিয়াছেন ও করিতেছেন, অদ্যাপি এদেশের কোন সভা তদ্রূপ করিতে পারেন না।"[৩৫] তত্ত্ববোধিনীর প্রভাবে তিনি সম্ভবতঃ একেশ্বরবাদী বৈদান্তিক হইয়াছিলেন; কারণ তাঁহার পারমার্থিক কবিতায় নির্গুণ ও নিরাকার ঈশ্বর সম্বন্ধে এত বেশি উল্লেখ আছে যে, এবিষয়ে তাঁহাকে মহর্ষির অনুগামী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্ত-বিরোধী পুস্তিকা রচনা করিলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।[৩৬]

একদিকে বেদান্ত-আশ্রিত অদ্বয়তত্ত্ব, ও ভক্তিবাদ, অপরদিকে উদ্বেল যুগ-জিজ্ঞাসার আঘাত—ঈশ্বর গুপ্ত এই দুই ভাবধর্মের মধ্যে আন্দোলিত হইয়াছিলেন। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের অকূল সমুদ্র পার হইয়া তিনি দ্বৈতবাদের প্রেমভক্তির উপকূল লাভ করিয়াছিলেন,

তোমারি চরণ স্মরণ করি।
তোমারি ভাবনা ধ্যানেতে ধরি ॥
কাতরে তোমারে অন্তরে ডাকি।
মনের বিষয় মনেতে রাখি ॥
ধর হে আপন প্রভাব ধর।
কর হে বিহিত বিচার কর ॥
পালক শাসক তুমি এ ভবে।
নামের মহিমা রাখিতে হবে ॥

কিংবা,

এই তো রয়েছ তুমি অন্তরে আমার।
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর ॥
মিছে কাল হরিলাম মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এইতো রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

আবার অন্য দিকে তিনি জ্ঞানবাদী,-- য়ুরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানের প্রতি কৌতূহলী। বাঙলা দেশে অক্ষয়কুমার দত্ত সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা জগৎকে বুঝিবার চেষ্টা করেন। তিনিও ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য; ঈশ্বর গুপ্তই তাঁহাকে দেবেন্দ্রনাথের নিকট লইয়া গিয়া অক্ষয়কুমারের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে এবিষয়ে লিখিয়াছেন, "এই সময় (১৮৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে) অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহাকে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দেন। অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য হন।"[৩৭] অক্ষয়কুমারের বহু রচনা 'সংবাদ প্রভাকরে' বাহির হইত। ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থসমূহ সানন্দে পাঠ করিতেন, 'সংবাদ প্রভাকরে' তাহার দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করিতেন। অক্ষয়কুমার তাঁহার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থে নিরামিষ আহারের স্বপক্ষতা করিলে ঈশ্বরগুপ্ত দেশের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া ঈষৎ পরিহাসের ভঙ্গীতে অক্ষয়কুমারের উক্ত গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছিলেন—

হোল নিরামিষে শরীর শুষ্ক,
আমিষের মুখ দেখবো কবে,
ওরে উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ

এই ব্যবস্থা ধরি লবে।
এস অক্ষয় দন্তে গুরু কেড়ে
'বাহুবস্তু' পাড় তবে।

ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেই সর্বপ্রথম ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে উষ্মা উচ্চারিত হয়। কতকগুলি বিষয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' আন্দোলন করিয়াছিলেন—

"ষ্ট্যাম্পের কর, লবণের কর ও অফিসের একচেটিয়া বাণিজ্য ইত্যাদি উপায় যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাকে কোনমতেই রাজনীতি সিদ্ধ বলিয়া বাচ্য হইতে পারি না, কারণ একে রাজার বাণিজ্য করাই অন্যায় ও অনীতিসূচক, তাহাতে আবার একচেটিয়ারূপে বাণিজ্য করা কতবড় অন্যায় তাহা বিজ্ঞমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন।"৩৮

ইংরাজ যে ধীরে ধীরে ভারতের প্রাণরস শোষণ করিতেছিল, তাহার বিষময় প্রতিক্রিয়া তিনি অতি তীব্র ভাবে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ করিতেন। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-অনাচারকে কেন্দ্র করিয়া তিনি অনেকগুলি ব্যঙ্গরসপূর্ণ গান রচনা করিয়াছিলেন এবং নীল-আন্দোলন সম্বন্ধে বাঙালীকে অবহিত করিতে চাহিয়াছিলেন। যখন তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' এই বিষয়ে প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিতেন, তখন তাঁহাকে অতিশয় বুদ্ধিমান অর্থনীতিবিদ ও স্বদেশপ্রাণ নেতা বলিয়া মনে হইত; আবার সেই কথাই মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে যখন বাউলসুরে নিবেদন করিতেন,

মা তুমি কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হবো
ঘুসি খেলে বাঁচবো না।

তখন অসহায় বাঙালীর বিড়ম্বনা তীব্র ব্যঙ্গে রূপায়িত হইত। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে সেই অনাগত কালের বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল; তিনি বাঙলার নবজীবনের আগমনী গাহিয়া গিয়াছেন। যদিও তিনি য়ুরোপের ভাবজীবন সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন না, তথাপি নবজীবনের প্রভাব তাঁহার মনেও ছায়া ফেলিয়াছিল, ইহাই পরম বিস্ময়াবহ। য়ুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার অভাবে তাঁহার মর্মবাণী রঙ্গব্যঙ্গের মধ্যেই অপব্যয়িত হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার মনেও ১৯শ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক

সঙ্কট ছায়া ফেলিয়াছিল, এবং সমসাময়িক কালের বহ্নি-দীপ্তি তাঁহার রঙ্গ-নিপুণ এবং কবি-আখড়াইয়ের ঐতিহ্যে আবাল্য-বর্ধিত মনের উপর কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা গোপনে সেই যুগসঙ্কটের বজ্রস্তনিত মেঘপুঞ্জ ঘনাইয়া তুলিয়াছিল।>

পাদটীকা

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামমোহন রায়, পৃ ১২, পাদটীকা

২। ঐ —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, পৃ ২১, ৪র্থ সং

৩। ঐ — ঐ ,, পৃ ১৬

৪। ঈশ্বর গুপ্ত নাকি 'কলিনাটক' নামে আর একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন বা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গভাষার ইতিহাসে' (১৮৭০) ৫২ পৃষ্ঠায, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের ২৭৩ পৃষ্ঠায় এবং রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে'র (৩য় সং) ২২৫ পৃষ্ঠায় 'কলিনাটকের' উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র এবং মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ইহার আভাস পর্যন্ত দেন নাই। বাস্তবিক ইহা একটা প্রহেলিকা হইয়া আছে।

৫। 'ইহাতে পিতাপুত্রের প্রশ্নোত্তর ছলে কেবল নীতি এবং হিতোপদেশাদি বহুবিধ 'শবকব ।বষয লিখিত হইয়াছে।" ইহাতে গদ্যপদ্য সংমিশ্রিত ছিল, কবিতার অংশই অধিক।

৬। রামগতি ন্যাযরত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৩য় সং পৃ ২২৬।

৭। J. C. Ghsoh—*Bengali Literature*, p. 120

৮। *Indian Historical Quarterly*, (1926). দ্বিতীয় সংখ্যায় ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে এই কয় সংখ্যার পরিচয় দিয়াছেন: ১৮৫৮. অক্টোবর, ২,৬: ১৮৫৯; ২৯ মার্চ, ৫ এপ্রিল; ১৮৬১, ৭ ডিসেম্বর, ২৮ ডিসেম্বর।

৯। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ ১১৫।

১০। ঐ, পৃ ৮৩

১১। ঐ

১২। ঐ

১৩। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ ৭৯

১৪। দ্রষ্টব্য—'বিধবা বিবাহ', 'বিধবা বিবাহ আইন'

১৫। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—কবিচরিত, পৃ ১৭৫

১৬। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—বঙ্গভাষার লেখক, 'পিতাপুত্র', পৃ ৪৯২

১৭। 'হিতপ্রভাকরে' রামচন্দ্র গুপ্ত লিখিত ভূমিকা

১৮। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—মাইকেল মধুসূদন, পৃ ৬৭

১৯। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা', ১৩০৬, ভূমিকা।

২০। রেনেসাঁসের সংজ্ঞা—"If we insist upon the literal and etymological meaning of the word, the Renaissance was a rebirth."—Encyclopaedia Britannica.

২১। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—কবিচরিত, পৃ ১৭৬

২২। রামগতি—বাঙলা ভাষা ইত্যাদি, পৃ ২২৫

২৩। সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ, ১২৬৬

২৪। J. C. Ghosh—*Bengali Literature* p- 134

২৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, পৃ ২৮

২৬। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ৩য় সং, পৃ ১০৪-২০৫

২৭। ঐ, পৃ ১০৬

২৮। সংবাদ প্রভাকর, ২৫ এপ্রিল, ১৮৫১

২৯। ঐ, ২৭ জুলাই ১৮৫৪

৩০। ঐ, ৭ই আগষ্ট, ১৮৫০

৩১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃ ৩৪৭

৩২। সংবাদ প্রভাকর, ৬ই এপ্রিল, ১৮৪৯

৩৩। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস—অক্ষয় চরিত, পৃ ১৫

৩৪। সংবাদ প্রভাকর, ৭ই জুলাই, ১৮৫১

৩৫। ঐ, ৬ই মে ১৮৫০

৩৬। ঐ, ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫১

৩৭। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃ ৬৬

৩৮। সংবাদ প্রভাকর, ১লা মে, ১৮৫০

দশম অধ্যায়

ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য-সম্প্রদায়

বাংলা দেশের প্রথম সামাজিক কবি ঈশ্বর গুপ্ত,—সামাজিক অর্থে বিভিন্ন পাঠক ও লেখককে স্বীয় প্রভাবের পরিমণ্ডলে টানিয়া আনিয়া একটি নূতন সাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করিবার দুর্লভ শক্তি, এবং এই শক্তির অধিকারী ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁহার সমকালে বা কিছু পূর্ব হইতেই বাঙালীর চিত্ত-তটে যখন পশ্চিম-সমুদ্রের ভাব-তরঙ্গ কলোচ্ছ্বাসে ভাঙিয়া পড়িল, তখনই নব্যশিক্ষিত বাঙালী আত্মচৈতন্যকে প্রকাশ করিবার জন্য যেমন বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার সাহায্য লইয়াছে, ঠিক তেমনই সভাসমিতির মধ্য দিয়া নিজেদের নবলব্ধ প্রত্যয়কে নানাভাবে আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্য-সংস্থা বা সাহিত্যপত্র তখনও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই। সর্বপ্রথম ঈশ্বর গুপ্তই তাঁহার পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া তরুণ কবি-সাহিত্যিকদিগকে আকর্ষণ করিলেন; যাহারা নিতান্তই অর্বাচীন, স্কুলের বালক—তাহাদিগকেও তিনি উৎসাহ দিতেন এবং তাহাদের রচনায় কিঞ্চিন্মাত্র সাহিত্য-শক্তি থাকিলে তাহা সাগ্রহে প্রকাশ করিতেন। এই নবীন স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভার উদয়-প্রত্যূষে তিনি ধাত্রীর কর্তব্য সমাধা করিয়াছিলেন।

শুধু তরুণ লেখকদিগকে উৎসাহ দিয়াই নহে, কলিকাতায় নববর্ষের প্রথম দিনটিতে 'সংবাদ প্রভাকরে'র কার্যালয়ে তিনি একটি অধিবেশন আহ্বান করিতেন। তাহাতে তরুণদের রচনাদি পঠিত হইত; প্রশংসিত রচনার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল। সভান্তে সমবেত সকলে ভূরিভোজে আপ্যায়িত হইয়া গৃহে ফিরিতেন। বাংলা ১২৫১ সাল হইতে তিনি এই নববর্ষের উৎসব আরম্ভ করেন। এই উৎসবে মফঃস্বল ও কলিকাতার চার-পাঁচশত সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি সাদরে আমন্ত্রিত হইতেন এবং ঈশ্বর গুপ্ত সমবেত বান্ধবদিগকে শুধু ভোজনরসই নহে, স্বরচিত কবিতা প্রবন্ধাদি পরিবেশন করিয়াও নির্মল সারস্বত আনন্দ দান করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কলিকাতার মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ এই সভার সভাপতিত্ব করিতেন। ইহাই বাঙালীর সাহিত্যিক-গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা। ইহার অনেক পরে তরুণ

কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাহায্যে অনুরূপ সাহিত্যিক সংস্থা গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন ; গুপ্তকবি শুধু ১লা বৈশাখ নহে, প্রায়ই আত্মীয়-স্বজনকে আহ্বান করিয়া পানভোজনে প্রবৃত্ত হইতেন—অর্থাৎ তিনি মজ্‌লিসী আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতে ভালবাসিতেন। ডঃ জনসনের মত মানসিক শক্তি তাঁহার ছিল না ; তাঁহার যোগলকুঁড়িয়াস্থিত বাসভবন বা পটলডাঙার প্রভাকর যন্ত্রালয়কেও ডঃ জনসনের গোষ্ঠীর সহিত তুলনা করা যায় না। তথাপি তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি যে সমস্ত লেখক ও পৃষ্ঠপোষকদিগের নিকট সাহায্য পাইতেন, প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ 'সংবাদ প্রভাকরে'র মাসপয়লা সংস্করণে, তাঁহাদের নাম ঘোষণা করিতেন। ১২৫৭ সালের ২রা বৈশাখ সংখ্যায় তিনি এইরূপ একটি তালিকা দিয়াছিলেন :

"প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম। শ্রীযুক্ত প্রেম চাঁদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, বাবু নীলরতন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ধর্মদাস পালিত, বাবু কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, হরিমোহন সেন, জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক।"

ঈশ্বর গুপ্ত ঐ তারিখের পত্রে এমন আরও কয়েকজনের নামোল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহারা হয়তো সব সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের মতের পোষকতা করিতেন না। যথা—রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ রায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন, "বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্য বর্ধনবিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন।" নব্যদলের অন্তর্ভুক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষের নিকটেও তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর'কে সর্বশ্রেণীর বাঙালীর মুখপত্র স্বরূপ করিবার জন্য মতামত নির্বিশেষে যে-কোন শিক্ষিত বাঙালীকে এই পত্রে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। কোন কোন দিক দিয়া তাঁহার রসরুচি কিঞ্চিৎ স্থূল হইলেও অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণ ও আধুনিকমনা লেখকগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

গুরুর আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়া অনুরূপ রচনারীতির পুনরাবৃত্তি অবশ্য কবিধর্ম নহে। অসীম বৈচিত্র্যপ্রয়াসী কবিগণ গুরুর করধৃত দীপবর্তিকার সাহায্যে আপন অন্তর-প্রদীপটিকে জ্বালাইয়া লইয়া থাকেন। সেইজন্য পরবর্তী কালে তরুণ শিষ্যগণ যদি গুরুর পথ পরিত্যাগ করিয়া স্বখাত পথে যাত্রা শুরু করেন, তাহা হইলেও গুরুর গৌরব খর্ব হয় না। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি তরুণ লেখকদের রচনাসমূহ কখনও কখনও সংশোধন করিয়া 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' প্রকাশ করিতেন এবং তৎকালীন কবি-যশঃপ্রার্থী অনেকেই তাঁহার অনুগত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

"ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আব একজন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর একজন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজে প্রভাকবের নিকট বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই পরবর্তী কালে প্রায় সম্পূর্ণরূপে গুরুর আদর্শ পরিত্যাগ করেন। তাহা হইলেও ঈশ্বর গুপ্ত ইহাদের বাল্য-রচনাগুলিকে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ করিয়া এই কিশোর সাহিত্যিকদের বাণীমন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়াছিলেন। উত্তর-কালে এই শিষ্যগণ গুরুর পথ পরিত্যাগ করিলেও এ কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেন ; নিম্নে ঈশ্বরগুপ্তের কতিপয় শিষ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। গুপ্তকবির তরুণ শিষ্যগণ গুরুর দ্বারা কত দূর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, শুধু সেই দিকেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা যাইতেছে।

॥ ১ ॥

অক্ষয়কুমার ও রঙ্গলাল

অক্ষয়কুমার দত্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক ঈশ্বর গুপ্তের ভাবশিষ্য নহেন, কিন্তু দুইজনেই গুপ্তকবির অনুরাগী ছিলেন এবং 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদনে উভয়েই গুপ্তকবিকে সাহায্য করিতেন। অক্ষয়কুমার কবি হইবেন, ইহাই ছিল

তাঁহার কিশোর জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার অধুনালুপ্ত কাব্য 'অনঙ্গমোহন' নিতান্ত অপরিপক্ক বয়সের রচনা,—স্বয়ং কবি ইহার প্রচার রহিত করিয়াছিলেন। এই কাব্যটি কোন্ জাতীয় তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারি। 'কামিনী কুমার' বা 'জীবনতারা'র অনুরূপ, বিশুদ্ধ কামায়নে পরিপূর্ণ এই তুচ্ছ কাব্যখান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—ভালই হইয়াছে। অক্ষয়কুমার যে প্রধানতঃ প্রাবন্ধিক, যুক্তিমার্গের পথিক—তাহা তিনি কিশোর বয়সে বুঝিতে পারেন নাই। তৎকালে কলিকাতার শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সমাজে 'বিদ্যাসুন্দর' জাতীয় আদিরসাত্মক কাব্যের বিশেষ প্রতাপ ছিল। কিশোর অক্ষয়কুমারও সেই গলিত আদর্শকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। আরও কতদিন তিনি ঐ ব্যর্থ সাধনায় একটা মূল্যবান সারস্বত জীবনের ক্ষতি-করিতেন, জানি না। ঈশ্বর গুপ্তের সহিত পরিচয়ের ফলেই তাহার সুপ্ত মনীষা ও নিশ্ছিদ্র যুক্তিবাদ গদ্যরচনায় নূতন আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইল। অক্ষয়কুমারের জীবনীতেও এই ব্যাপারের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। একদা ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারকে ইংরাজী সংবাদপত্রের কোন একটি সংবাদ 'সংবাদ প্রভাকরের' জন্য অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। তখনও অক্ষয়কুমার ব্যর্থ কবিত্বের স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনিও যে এক-জন সার্থকতম গদ্যশিল্পী হইতে পারেন, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উজ্জীবিত করিয়া দিলেন।[৩] তিনি এই তরুণ কবিযশঃপ্রার্থীকে ভবিতব্যের উপহাস হইতে রক্ষা করিলেন; তাঁহারই উৎসাহে অক্ষয়কুমার গদ্য রচনায় ব্রতী হইলেন। তিনি সার্থক প্রবন্ধকার হইবার শিক্ষানবিশী করিয়াছেন 'সংবাদ প্রভাকরে'র স্তম্ভে। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত ইংরাজী হইতে অনূদিত প্রায় সমস্ত সংবাদ অক্ষয়কুমারের লেখনী প্রসূত। সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ তিনি ঈশ্বর গুপ্তের নিকট লইয়াছিলেন। গুপ্তকবিও এই তরুণ জ্ঞানতাপসকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধাদি ঈশ্বরচন্দ্র সাগ্রহে পত্রিকায় মুদ্রিত করিতেন এবং প্রতিবৎসর ২রা বৈশাখ 'সংবাদ প্রভাকরে' যে সমস্ত লেখক ও গুণগ্রাহীর নাম উল্লেখ করিতেন, তন্মধ্যে অক্ষয়কুমারের নামও থাকিত।

অক্ষয়কুমারের জীবন-নিয়ন্ত্রণে ঈশ্বর গুপ্ত প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। একদা তিনি অক্ষয়কুমারকে সঙ্গে করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভায় লইয়া গিয়া দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।[৪] অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসিয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান কর্ণধার হইয়াছিলেন। সুতরাং অক্ষয়কুমার পরবর্তী কালে বাঙালীর মনোলোকে যে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, গুরু ঈশ্বর গুপ্তই তাহার সূচনা করেন। ১৮৪৭ সালে 'সংবাদ প্রভাকরে' জীবিত লেখকদের যে তালিকা বাহির হয়, তাহাতে নিয়মিত লেখক হিসাবে অক্ষয়কুমারের নাম রহিয়াছে। তিনি গুপ্তকবির 'সংবাদ প্রভাকর'কে যে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহার প্রমাণ—যখন তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লইয়া সর্বতোভাবে ব্যস্ত রহিয়াছেন, তখনও 'সংবাদ প্রভাকরে'র কথা ভুলেন নাই। বাংলা ১২৫৭ সালেও তিনি মেদিনীপুরে রাজনারায়ণকে 'সংবাদ প্রভাকরে' স্থানীয় সংবাদ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। গুপ্তকবি তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং স্নেহ করিতেন বলিয়াই অক্ষয়কুমারের মতামত লইয়া মাঝে মাঝে মৃদু পরিহাস করিতেন। অক্ষয়কুমার আহার ও আচার বিষয়ে অতিশয় সংযমী ছিলেন এবং স্কটল্যাণ্ডের নৃতাত্ত্বিক আলেকজাণ্ডার কুম্ব-এর মতানুবর্তী হইয়া কেবল নিরামিষ আহার করিতেন; ফলে অল্পকালের মধ্যে তাহার শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। ভোজনবিলাসী ঈশ্বর গুপ্ত সংযমী শিষ্যকে ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"ঘুরিতেছে মাথামুণ্ডু মাথামুণ্ডু লিখে।" দেশের দুরবস্থার ফলে আমিষ আহার সংগ্রহ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া গুপ্তকবি মৃদু পরিহাসে অক্ষয়কুমারের প্রস্তাবিত নিরামিষ আহারের সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন—

এস অক্ষয় দত্তে গুরু কেড়ে
'বাহ্যবস্তু' পড়ি তবে।*
যত জ্ঞাত-কুটুম্ব, বেয়ারা হয়ে
খাটে করে ঘাটে লবে।।

যাহা হউক, ঈশ্বর গুপ্ত অবশ্য অক্ষয়কুমারকে কাব্যরচনায় দীক্ষা দেন নাই এবং অক্ষয়কুমারও ঈশ্বর গুপ্তের সাহচর্যে আসিবার পর কোন দিন আর কবিতা রচনা করেন নাই। তথাপি গুপ্তকবি বন্ধুর মত অক্ষয়কুমারকে গদ্যরচনায় সর্বদা উৎসাহ দিতেন।

---

* অক্ষয়কুমার দত্ত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক গ্রন্থে নিরামিষ আহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল 'সংবাদ প্রভাকরে'র সহিত জড়িত ছিলেন এবং তিনি 'র, ল, ব' এই ছদ্মনামে বহু কবিতা 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল ইদানীন্তন কালের প্রথম বাঙালী কবি, যিনি ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন। বাংলা কাব্যের রুচি ও রীতি পরিবর্তনের তিনি যে অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাই বলিয়া তিনি প্রাচীন বাংলা কাব্যকেও অস্বীকার করেন নাই। কবি কঙ্কণ ভারতচন্দ্র প্রভৃতির ভক্তপাঠক রঙ্গলাল আবার স্কট-বায়রণ-মূরেরও একনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন এবং তিনি সমসাময়িক বাংলা কাব্য-কবিতাকে সাময়িক তুচ্ছতা ও সাংবাদিক সঙ্কীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া বীর-রসপূর্ণ ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাই স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্তও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ১২৫৪ সালে ২রা বৈশাখ 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত লেখক ও অনুগ্রাহকবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসরে রঙ্গলাল সম্বন্ধে সগবে বলিয়াছিলেন,—

"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক-বন্ধু ; ইঁহার সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব ? এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃতবন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেল স্বরূপ হইয়া বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইঁহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা নর্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্যতালে ইঁহার মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।"

বলা বাহুল্য ঈশ্বর গুপ্ত উক্ত তালিকায় আর কাহারও বিষয়ে এত অধিক স্তুতিবাদ করেন নাই। রঙ্গলালের মধ্যে তিনি ভাবী সম্ভাবনার সার্থকতা দেখিতে পাইয়াছিলেন ; তাই এই স্তুতিবাদ। রঙ্গলাল যেমন রোমান্টিক আখ্যায়িকা হইতে বীররসপূর্ণ স্বদেশপ্রেমের প্রাণরস আহরণ করিলেন, তেমনই আবার প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে কাশীপ্রসাদ ঘোষের মত অবজ্ঞাও করিলেন না। বরং প্রভূত পাণ্ডিত্য সহ ইংরাজী ও বাংলা কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া বাংলা কাব্যকে কাশীপ্রসাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলেন। রঙ্গলালের চিত্তপ্রবণতার দুইটি বৈশিষ্ট্য —য়ুরোপীয় কাব্য-সাহিত্যের সুস্থ আদর্শ অনুসরণ এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রতিও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা—গুপ্তকবিকে নিশ্চয় মুগ্ধ করিয়াছিল। ১৮৫৪ সালে রঙ্গলাল 'বীঠন সোসাইটি'তে "বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ" নামক যে দীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তাহাতেও তাঁহার জ্ঞানের

গভীরতা ও রসবোধের বিস্ময়কর সমুন্নতি এক শতাব্দীর পরেও আধুনিক পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ঈশ্বর গুপ্তও উক্ত পুস্তিকার প্রতি নিশ্চয় আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন।

রঙ্গলালের প্রথম যুগের কবিতায় গুপ্তকবির কিছু কিছু প্রভাব থাকিতে পারে। ১৮৫৬ সালে ৩রা অক্টোবর 'সংবাদ প্রভাকরে' র, ল, ব, স্বাক্ষরিত যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তাহা রঙ্গলাল রচিত। তাহার কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

। প্রভাত ।

মৃণালাভা ম্লান হয় হেরি দিবাকরোদয়,
নিশাকর চলে অস্তগিরি।
যামিনী হইয়া সারা সমুদিত শুকতারা
সমীরণ বহে ধীরি ধীরি ॥

তরুণবয়স্ক রঙ্গলাল প্রকৃতিবর্ণনায় প্রথমদিকে ঈশ্বর গুপ্তের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন। পরবর্তী কালে কিন্তু পয়ারত্রিপদীর ধারাবাহিকতা অনুসরণ ভিন্ন রঙ্গলাল আর কোন দিক দিয়া ঈশ্বর গুপ্তের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই। রঙ্গলালের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ রঙ্গলালের রচিত বলিয়া কয়েকটি লঘু ধরণের কবিতা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

মরি কি সুন্দর ব্যবহার—
তব সম চুরিকার্য্যে কেবা তুল্য আছে আর।
বাল্যে বৃন্দাবন লীলা কত চুরি প্রকাশিলা
অন্নবস্ত্র দধিদুগ্ধ হরিলে হে ভারে ভার।
হরিলে হে ব্রজনারী কি মর্ম্ম বুঝিতে নারি,
মাতুলানী হরি নিলে, হায়, কি আচার।
লভিয়ে যৌবন কাল এ কি রুচি যদুলাল
কুবুজা দাসীরে হেরি মথুরায় কর বিহার।
প্রৌঢ়ে দ্বারকাতে গিয়ে শান্ত না হইলে হিয়ে
হরিলে ভীষ্মক সুতা, বিশেষ খ্যাত সংসার।
বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড় ডাকাতিতে পুত্র বড়
পৌত্রটি হরিল উষা, স্বপনে প্রেমসঞ্চার ॥

এই রচনায় কিছু কিছু ঈশ্বর গুপ্তীয় রসিকতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিশেষতঃ "বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়" এই অর্ধপংক্তি গুপ্তকবির সরস পংক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিলে, রঙ্গলাল উত্তর-জীবনে গুপ্ত কবির দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হন নাই। উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধা করিলেও রঙ্গলাল ঈশ্বর গুপ্তের একনিষ্ঠ শিষ্যের অন্তর্ভুক্ত নহেন। কিন্তু কোন কোন তরুণ কবি কৈশোরে ঈশ্বর গুপ্তকে কাব্যগুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যৌবনেও তাঁহারা সে প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই—তাঁহাদিগকেই যথার্থরূপে ঈশ্বর গুপ্তের ভাবশিষ্য বলা যায়। নিম্নে তাঁহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে।

॥ ২ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথ অধিকারী

আমরা উল্লিখিত তিন জনের 'গুরুপ্রণামী' দিয়া আলোচ্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৩ সালে নিতান্ত অর্বাচীন বয়সে "কালেজীয় কবিতার মারামারি" নামক ব্যঙ্গ কবিতায় কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারীকে শাণিত ভাষায় আক্রমণ করেন এবং তাঁহার কবিতাকে "নুনো" আখ্যা দিয়া ঈশ্বর গুপ্তের নিকট সত্যকার কবিতা শিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া উক্ত কবিতার শেষ চরণদ্বয়ে বলিয়াছেন:

সত্য কবিতায় রাখ, যতন বিশেষ।
কবি ঈশ্বরের ঠাঁই লহ উপদেশ॥

কৈশোরের কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকর'কে স্মরণ করিয়া প্রবীণ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন:

"আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।"

দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধুনী' কাব্যে স্বীয় কাব্যগুরুর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

ওই দেখ প্রভাকর পত্র যন্ত্রালয়,
এক বিনা একেবারে অন্ধকারময়॥

মরেছে ঈশ্বরগুপ্ত কবি সম্পাদক,
লেখনীতে বিকাশিত কবিতা চম্পক।
অনায়াসে বিরচিতে সুধার পয়ার,
কবির দলের গীত বসন্ত বাহার।
সমাদর করিত কোরক-কবিগণে,
সকলের প্রিয়পাত্র, জানে সর্ব্বজনে।
রসিকের শিরোমণি, কৌতুক রতন,
ভেঙ্গেছিল ভাল মান সুধা বরিষণ।

এখানে লক্ষণীয় যে, দীনবন্ধু যেমন একদিকে গুরুর কাব্য-নৈপুণ্য প্রশংসা করিয়াছেন ('লেখনীতে বিকাশিত কবিতা-চম্পক'), আবার অপরদিকে কবিকিশোরদের উৎসাহদাতা ঈশ্বর গুপ্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেও ('সমাদর করিত কোরক-কবিগণে') ত্রুটি করেন নাই।

কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং গুরুর রচনারীতি দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাঁহার "সুধীরঞ্জন" নামক কবিতাগ্রন্থে ইংরাজী ভাষা বাংলা ভাষাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছে—

তোমার ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা রচক।
লোকের হিতের হেতু লেখে না পুস্তক॥

দ্বারকানাথ গুরুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন; কিন্তু গুপ্তকবি শুধু তুচ্ছ ব্যাপারে কাব্যশক্তির অপব্যয় করিতেছেন, লোকহিতে সারস্বত-সামর্থ্যকে নিয়োগ করিতেছেন না—এই জন্যই শিষ্যের আক্ষেপ। এখানেও দেখা যাইতেছে যে গুরুর শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি তাঁহার কী পরিমাণে শ্রদ্ধা ছিল। এই তিনজন তরুণ ছাত্র কিশোরবয়সে ঈশ্বর গুপ্তের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, উত্তরকালে তাঁহারা হয়তো সে পথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুপ্রণামী দিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই।

এইবার ঈষৎ বিস্তারিত আকারে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য-সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করা যাক। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-সঙ্কলনের যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহার এক স্থানে আছে—"দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল

বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। শুনিয়াছি বাবু মনোমোহন বসু আর একজন।"

রঙ্গলালের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ হরিমোহন সেন নামক আর এক জনকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যশ্রেণীভুক্ত বলিয়াছেন। ১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত যে সমস্ত লেখক ও বান্ধবদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে হরিমোহন সেনের নাম আছে বটে, কিন্তু তাঁহার রচিত কোন কাব্যগ্রন্থ পাঠক সমাজে পৌঁছায় নাই। তাই আমরা প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ অধিকারী ও মনোমোহন বসুকে লইয়া আলোচনা করিব।

ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। হুগলী কলেজের কিশোর-বয়স্ক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাদীপ্ত তনুকান্তি দেখিয়া গুপ্তকবি নিশ্চয় আশান্বিত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যস্মৃতি হইতে ঈশ্বর গুপ্তের চিত্র মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে গিয়া বলিয়াছেন,

"যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক, স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমুজ্জ্বল। তিনি সুপুরুষ, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথার স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্তা কহিতেন…স্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভালবাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকে শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না।"[৫]

গুপ্তকবির সহিত বালক বঙ্কিমচন্দ্রের একটা স্নেহমধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় যে সমস্ত কবিতা ও গদ্য নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম-জীবনীতে কিছু কিছু কবিতা ও গদ্য নিবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্কিম-শতবার্ষিকী সংস্করণের 'বিবিধখণ্ডে' অনেকগুলি কবিতা ও দুইটি গদ্য নিবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৫২ সাল হইতে 'সংবাদ প্রভাকরে' বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা নিয়মিত মুদ্রিত হইতে আরম্ভ করে। বিষয়বস্তু ও রচনাকৌশলের দিক দিয়া বালক কবি বাধ্য ছাত্রের মত ঈশ্বর গুপ্তকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। অধিকাংশ কবিতাই আদিরসাত্মক এবং স্ত্রী-পুরুষের উক্তি-প্রত্যুক্তি অনুসারে সজ্জিত। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্কিম-শতাবার্ষিকী-সংস্করণের 'বিবিধখণ্ডে'র প্রথম কবিতা স্ত্রী ও পতির উক্তি-প্রত্যুক্তি', হেমন্ত বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রীর সহিত পতির 'কথোপকথন,'

'শিশির বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রী-পতির কথোপকথন' উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রীতিবিষয়ক প্রশ্নোত্তর' কবিতা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

ঈশ্বর গুপ্ত—

প্রশ্ন

বলনা বলনা প্রাণ ললিত নয়নী।
নলিনী মলিনী কেন করে সে রজনী ॥

উত্তর

যেরূপ স্বভাব যার সে চায় সেরূপ।
শক্তির বিস্তার করে করিতে স্বরূপ ॥
তিমিরে ত্রিলোক পূর্ণ, পূর্ণ করে যেই।
তামরসে তমোরাশি দান করে সেই ॥

বঙ্কিমচন্দ্র—

নারী

কেন কেন কান্ত হয়েছে একান্ত
নীরব কোকিল কুল।
কি হেতু বলনা না ক'রে কলনা
হিমে কেন প্রতিকূল ॥

পতি

শুন প্রাণ, বলি কোকিল কাকলী
যেহেতু হইল হারা।
মধু স্বরে তব, হইয়ে নীরব
তোমারে শাঁপিছে তারা ॥

ঈশ্বর গুপ্তের এই জাতীয় প্রশ্নোত্তরমূলক ঈষৎ আদিরসাশ্রিত রচনা ('হাসিহাসিমুখ—নায়কের উক্তি') কিশোর বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি এই জাতীয় আদিরসাত্মক কবিতায় যেমন ঈশ্বর

গুপ্তের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন, তেমনি আবার কয়েকস্থলে ভারতচন্দ্রের প্রভাবও স্বীকার করিয়াছেন। যথা :

যথা যাব তথা র'ব প্রেমডোরে বাঁধা তব,
অন্তরে অন্তরে বাঁধা প্রণয়ের পাশে লো।
স্বপনে নয়নে মনে হেরিলে সে চন্দ্রাননে
হেরিব সে বিধুমুখ মৃদু মৃদু হাসে লো।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বর্ষার মানভঞ্জন' কবিতাটি ঈশ্বর গুপ্তের 'মানভঞ্জন' কবিতার ছায়ানুসারে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবির এই 'মানভঞ্জন' কবিতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এক এক বার স্ত্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়। তাঁহার প্রণীত মান-ভঞ্জন নামক বিখ্যাত কাব্যের নায়িকা ঐরূপ।" স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত কবিতা সম্বন্ধেও ঐ একই মন্তব্য করা চলিতে পারে।

কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করিলেও নিতান্ত অপরিপক্ক রচনাতেও মাঝে মাঝে রোমান্টিক কবিত্বের বিদ্যুৎচমক বিলসিত হইয়াছে। দুই একটি উদাহরণ লক্ষণীয় :

১। যত তারাগণে তোমার নয়নে,
কাঁদিতেছে অবিরত।
নয়নের জলে নিহারের দলে
পতন করিতে রত।

২। হা বসন্ত মনোহর হা মোহন রূপধর,
হা রে হৃদি বিচঞ্চল কর॥
লইয়ে রূপের ভার কেন কর পরিহার,
এ মহীমণ্ডল মনোহর॥

এই দুইটি উদাহরণেই রচনাসৌকুমার্য সঞ্চারিত হইয়াছে, যাহা ঠিক ঈশ্বর গুপ্তের উত্তরাধিকার নহে। নিম্নে গুপ্তকবির অনুপ্রাসযুক্ত কবিতার ছায়ানুসারে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিণত বয়সের সাহিত্য চর্চার উদাহরণ দেওয়া গেল :

১। নাহি আর জলাধার কোথা বল পাব ধার
প্রেমাধার ধার বটে ধারি।

২। দ্বিগুণ বাড়ায় মান যত পতি সাধে।
ফলতঃ বাহিরে সেটা সাধে বাদ সাধে॥

গুপ্তকবি যেমন কবিতার পংক্তিতে মাঝে মাঝে সুকৌশলে নিজ নামভণিতা ব্যবহার করিতেন, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ ভণিতায় কখনও কখনও নিজ নাম প্রয়োগ করিতেন—

মানে মানে মান হারি মানিনী ভামিনী,
গরবেতে গৃহে যায় গজেন্দ্র গামিনী॥
মানের নিগূঢ় ভাব শেষে গেল বোঝা।
সুখেতে বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন সোজা॥

এই প্রসঙ্গে 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' বা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'কালেজীয় কবিতার মারামারি'৬ উল্লেখ করা কর্তব্য। হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কখনও "অষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায়" এই ছদ্মনামে কবিতা প্রকাশ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারী এবং হিন্দু কলেজের দীনবন্ধু মিত্র—তিনজন কিশোর 'সংবাদ প্রভাকরে' নিয়মিত রচনাদি লিখিতেন। ১৮৫৩ সাল হইতে সংবাদ প্রভাকরে 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' নামক বিচিত্র রচনারাজি প্রকাশিত হইতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে কৃষ্ণ-নগরের দ্বারকানাথ অধিকারীকে "বুনো" বলিয়া গালি দেন—তিনজনের পারস্পরিক কটূক্তিপূর্ণ দীর্ঘ কবিতা 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইতে থাকে। দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা বিচারপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।" কিশোর বঙ্কিমচন্দ্রও 'কালেজীয় কবিতার মারামারিতে' রুচি সম্বন্ধে বেপরোয়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুই একটি কিছু নিরীহ উক্তির উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

আইল অবিদ্যা তবে, দেখে কাঁপে বুক।
ঢেঙ্গা মাগী, পেট মোটা, হাঁড়ি পানা মুখ॥
বরণে হাঁড়ির তলা ঝক মেরে যায়।
দীর্ঘ চুল, দীর্ঘ দাঁত সাঁচিপান খায়॥
বসন মলিন অতি, পচা গন্ধ গায়।
তিনি ফের নাচিবেন, নমস্কার পায়॥

ধুপধাপ করে নাচে, মেঝে করে চুর।
পাঁকেতে লাফান যেন ব্যাঙ বাহাদুর ॥
কবিগণ হেসে মরে. বলে একি পাপ।
পলাতে পারিলে বাঁচি, বাপ্‌, বাপ্‌, বাপ্‌ ॥

দ্বারকানাথ অধিকারীকেই বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র আক্রমণ করেন। ১৮৫৩ সালে ২৭এ সেপ্টেম্বর সংবাদ প্রভাকরে 'বিষম বিচিত্র নাটক' নামে যে 'কালেজীয় কবিতার মারামারি' সূচিত হয়, তাহাতে দ্বারকানাথও আক্রমণ শুরু করেন; প্রায় প্রত্যেক কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে 'বুনো অধিকারী' বলিয়া উপহাস করেন। দ্বারকানাথ তাহার যথাযোগ্য কটূক্তিপূর্ণ প্রত্যুত্তর দিলেও ১৮৫৪ সালের ৩১ জানুয়ারী 'সংবাদ প্রভাকরে' তিনি ত্রুটি স্বীকার করিয়া 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধে' সন্ধিপত্র লিখেন। এই কবিতাযুদ্ধে কিশোর বঙ্কিচন্দ্রের উক্তির তীব্রতা মাঝে মাঝে ঈশ্বর গুপ্তের প্রবীণ রচনার সমতুল্য হইয়াছে। যথা :

১। হব সন্ন্যাসী এবার, হব সন্ন্যাসী এবার।
কোণের ভিতর শুক্‌নো নাড়ী, সইতে নারি আর ॥
তোর সনে লো পিরীত ক'রে শিবের পূজা গেল ঘুরে,
অধিকারী নামটা ধরে ঘণ্টা নাড়া সার ॥

২। চোপ চোপ, চোপ রহ, মৎ করো সোর ॥
পুলিসের ম্যাজিষ্ট্রেট পদ আছে মোর ॥
আমি বলিতেছি তুই চুরি করেছিস।
আমার কথায় হয়, ডিক্রী বা ডিস্‌মিস্‌ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬ সালে 'ললিতা তথা মানস' নামক দুইখানি আখ্যান কাব্য একসঙ্গে প্রকাশ করেন। এই কাব্য দুইটি সম্ভবতঃ প্রকাশের তিন বৎসর পূর্বেই অর্থাৎ ১৮৫৩ সালে রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে, তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন।" অর্থাৎ যখন তিনি 'দম্পতীর রসালাপ' জাতীয় কবিতায় গুরুকে অবিকল নকল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং 'কালেজীয় কবিতার মারামারি'তে যোগদান করিয়া কিশোর বয়সেই আদিরসাত্মক কবিতায় অকাল-পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিলেন, তখনই এই কিশোর কবি রোমান্টিক আখ্যানমূলক কবিতা রচনার চেষ্টা

করিতেছিলেন। রঙ্গলাল বীরত্ব ও প্রণয়কে কেন্দ্র করিয়া আখ্যান কাব্য রচনায় নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু রঙ্গলালের কিছু পূর্ব হইতেই কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র য়ুরোপীয় রোমান্টিক আখ্যানের অনুকরণে 'ললিতা তথা মানস' রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য কাব্যরীতি বিচারে উক্ত আখ্যান দুইটি সাহিত্য-সভায় প্রবেশাধিকার পাইবে না। কিন্তু যখন বঙ্কিমচন্দ্র 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধে' জয়লাভ করিবার জন্য লেখনীকে ব্যঙ্গের পাথরে শাণ দিয়া লইতেছিলেন, তখনই যে তিনি 'ললিতা তথা মানস' আখ্যান কাব্যে একটা নবতর রচনারীতি পরীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতে হয়। উক্ত আখ্যানের ভাষা ও ছন্দ গীতিকবিতার সুরতরঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, এবং বহু স্থলে রোমান্টিক চিত্তধর্ম সঞ্চারিত হইয়াছিল। 'ললিতা' আখ্যানের সুন্দরী রমণী সম্বন্ধে উক্তি :

কি গভীর নিরমল প্রেমের প্রতিমা।
ইচ্ছা করে পায়ে ধরি পূজি সে মহিমা॥

এই যে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রতি কিশোর কবির বৈদেহী আকাঙ্ক্ষা—ইহা ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণ নহে, কারণ গুপ্তকবির কাব্যপ্রত্যয় এই জাতীয় ছিল না। 'মানস' কাব্যে প্রকৃতির অনাবৃত সৌন্দর্য্যের প্রতি কিশোর কবির মুগ্ধ দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে। তাই তিনি নামপত্রে বাল্মীকির "ফলানি চ মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে। গিরীংশ্চ পশ্যন্ সরিতঃ সারাংসি চ॥" এবং বায়রনের চাইল্ড্ হ্যারল্ড্-এর

'There is a pleasure in the pathless woods,
There is pleasure on the lonely shore."

ছত্রগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। গিরিদরী, অরণ্যানী এবং পন্থাহীন বিজন অরণ্য-মাধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্ততলে নূতন সাড়া আনিয়াছিল। একদিকে যেমন তিনি বিশ্ববসুধার পরিচিত নিসর্গ মাধুরীর মধ্যে অপূর্ব সৌন্দর্য্যের জাল বুনিতেছিলেন, তেমনি মর্ত্যপ্রেমের অপার্থিব রোমাণ্টিক উচ্ছ্বাস হৃদয় ভরিয়া পান করিয়াছিলেন :

দুজনে দুজনে পেয়ে দুজনার মুখ চেয়ে
অনিমিক ঝরিছে নয়ন।
হৃদয়ে ডাকিছে হৃদি কেন কেন আরে বিধি,
সে সময় হলো না মরণ॥—ললিতা

ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ স্বরূপ, মর্ত্যপ্রেমের বেদনামাধুরীপূর্ণ এই বিষামৃত —উত্তর কালে তাঁহার উপন্যাসে অভিনব শিল্পরূপ লাভ করিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের প্রিয়শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র যখন গুপ্তকবির উৎসাহে নিতান্ত তুচ্ছ রচনায় উল্লসিত হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহার অন্তরলোকে আর একটি সুর ধ্বনিত হইতেছিল—যাহা 'ললিতা তথা মানস'-এ আভাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহার সংবাদ ঈশ্বর গুপ্ত রাখিতেন না, দ্বারকানাথ-দীনবন্ধুও জানিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর প্রভাব যখন সাগ্রহে স্বীকার করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার অন্তরে গুরুর প্রভাবের অতিরিক্ত আরও একটি কাব্যপ্রত্যয় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। 'ললিতা তথা মানস'-এর শিল্পরূপ যতই অপরিপক্ক হোক না কেন, ইহাতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে তাহা স্মরণীয়।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র তখনও গদ্যরচনায় গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রভাকরে সম্পাদকীয় মন্তব্য বা অন্যান্য টীকা-টিপ্পনীতে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহা সাংবাদিক-সুলভ অতিশয় সহজবোধ্য ; কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকরে'র মাসিক সংস্করণে যখন কোন সাহিত্যবিষয়ক বা অন্য কোন গুরুতর বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচিত হইতে, তখন অনুপ্রাস-যমকের বেষ্টনে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিত। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র এই গুরুভার গদ্যের মাদকতায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৫২ সালে ২৩এ এপ্রিল 'সংবাদ প্রভাকরে' বঙ্কিমন্দ্রের এইরূপ একটি গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :

"যে রসনা প্রমদাধর রস না পান করিয়া অন্যরস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক। যে নাসিকাস্থলে চন্দনও বন্দনা পায় না, সে নাসিকা দুর্গন্ধ কীটাদি এবং গলিত শব মাংসের ঘ্রাণ গ্রহণে বাধ্য হইবেক…। দিবাকর কর প্রকাশে মধুকরনিকর যে করে কমলিনী ভ্রমে মকরন্দ লোভে ভ্রমিত সে কর কদর্য কীট নিকরে ব্যাপ্ত হইবেক।"

১৮৫২ সালে ১০ই জুলাই 'সংবাদ প্রভাকরে'বর্ষাঋতু' নামক তাঁহার যে ক্ষুদ্র রচনাটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সুরও যেমন চড়া, ভাষারীতিও তেমনি স্খলদ্‌গতি। যথা—

"অনাথ শশধর-বিরহিণী বিঘোর তমসাম্বরাবৃতা গভীরা নিশীথিনী সঙ্কাশ নিবিড় জলধরমাল গগনমণ্ডলে নিয়ত নিরীক্ষণ করিতেছি। মন্মথোত্থিত জনরম্যাজী হৃদয়বিদারক ঘোর ঘন নির্ঘোষ নিনাদ শ্রবণে চমকিত চিত্ত-চাপল্য প্রাপ্ত হইতেছে। নিবিড় নীলাঙ্গিনী

যমুনাপুলিনে শ্রীরাধাচাতকী নীরদ কদম্ববিহারী শ্যাম শরীরোপরি তরলিত বিকচ বিমল বনমালা তুলিয়া নীল জলধরোপরি শম্পা কম্পায়মানা হইতেছে, কর্ণকুহর বিদারক ভীষণাশনি নিনাদে ভুবন চমকিত হইতেছে, কাদম্বিনী বর্ষিত বারিবিন্দু বিশাল বেগে ধরাতলে পতিত হইতেছে।"

এই উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কৈশোরে বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবির সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের আলঙ্কারিক ভাষাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৫৬ সালের মধ্যেই বোধ হয় তিনি এই প্রকার আড়ষ্ট গদ্যের কৃত্রিম প্রভাব হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। কারণ ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত 'ললিতা তথা মানস' আখ্যানকাব্যের ভূমিকায় লেখক সহজবোধ্য ভাষায় বক্তব্য নিবেদন করিয়াছিলেন:

"সুকাব্যালোচক মাত্রেরই কবিতাদ্বয়পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে, ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনারীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।"

তাঁহার 'ললিতা তথা মানসে' যেমন "বঙ্গীয় কাব্য রচনারীতি পরিবর্ত্তনে"র চেষ্টা করা হইয়াছে, তেমনি সমকালীন গদ্য রচনাতেও স্বকীয়তা ফিরিয়া আসিয়াছে; কিশোর রবীন্দ্রনাথ যৌবনে পৌঁছিয়াও বিহারীলালের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু কৈশোরেই ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য বা পদ্য রচনারীতির প্রভাব ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন —উল্লিখিত 'ললিতা তথা মানস'-এর ভূমিকা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

এইবার ঈশ্বর গুপ্তের অন্যতম প্রধান শিষ্য দীনবন্ধু মিত্রের কথা আলোচনা করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন প্রথম যৌবনের গুরুর প্রভাব ত্যাগ করিয়া নিজ প্রতিভার অনুকূল ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিলেন, দীনবন্ধু তাহা না করিয়া কাব্যক্ষেত্রে বহুদিন ঈশ্বর গুপ্তকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রিয় সুহৃৎ দীনবন্ধুর জীবনী ও কবিত্ব প্রসঙ্গে (১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত) যথার্থই বলিয়াছিলেন, "দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্যশিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য-শিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর কতকটা কবিত্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার, তাহা গুরুর অনুকারী, বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী।"

হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছায়াতলে বর্ধিত হইয়াও গুরু ঈশ্বর গুপ্তের নিকট কাব্য রচনা শিক্ষা করেন; 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' তাঁহার বহু কবিতা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথের মধ্যে দীনবন্ধুই সমকালীন রুচির তরঙ্গে পাল তুলিয়া দিয়া কাব্যতরণী ভাসাইয়াছিলেন। প্রকৃতি, মানব-জীবন, দৈনন্দিন সুখদুঃখের কাহিনী—প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার কিশোর বয়সের যে সমস্ত কবিতা 'সংবাদ প্রভাকরে' মুদ্রিত হয়, তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে 'পদ্যসংগ্রহ' নামক দীনবন্ধুর বাল্যরচনার সঙ্কলন প্রকাশিত হয়; ইহাতে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রায় যাবতীয় কবিতা সংগৃহীত হইয়াছিল। এই কবিতাগুলির কয়েকটি প্রকৃতি বিষয়ক (সন্ধ্যার পূর্বে সরোবরের শোভা, মাঘমাসে প্রাতঃস্নান, চন্দ্র), নীতি বিষয়ক (মানবচরিত্র, জনক জননীর স্নেহ), আদিরসাত্মক (নায়কের অনাগমে নায়িকার খেদ, বসন্তের অনাগমে সুমতি ও কুমতি সহচরীদ্বয় সহিত বিরহিণীর কথোপকথন, বসন্তের আগমনে বিরহিণীর খেদ, দম্পতি প্রণয়), সামাজিক নকসা (জামাই ষষ্ঠী) এবং অবশিষ্ট সমস্ত কবিতা কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের রণদামামা নির্ঘোষক অর্থাৎ দ্বারাকানাথ অধিকারীর সাহিত তাঁহার লিপিযুদ্ধের বিবরণী। ঈশ্বর গুপ্তের রচনারীতি তাঁহাকে যে কতদূর প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

১। এ আমার ও আমার সে আমার বশ।
আমিতো কাহারো নহি আমারো অবশ॥
আমি যদি আমি নহি তবে কি কারণ।
আমার লোকেরে ভাবি আমার কারণ॥
সোদর সোদরা দারা তনয় তনয়া।
কোথা রবে তারা সবে হইলে বিনয়া॥

২। কাহারো বসন্তকাল কাহারো বসন্ত কাল,
কালাকাল কালসহকারে॥

৩। বৃথা কেন যাবে কোথাও না পাবে
ভাতার দাদার মতো॥

৪। কেহ বলে, হে গো দিদি, শোন্ দেখি চেয়ে।
খশুরের বাড়ী নাকি, গেছে তোর মেয়ে॥

কবে বা আনিলি হেথা না জানিতে পারি।
তাড়াতাড়ি পাঠাইলি রেখে দিন চারি ॥
আহা, বন, কি বলিব, দুরন্ত জামাই।
কি জানি করিবে রাগ, না যদি পাঠাই ॥

ভাষাপ্রয়োগ ও শব্দযোজনা পুনঃ পুনঃ ঈশ্বর গুপ্তকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

দীনবন্ধু দ্বারকানাথ অধিকারীর বিরুদ্ধে কালেজীয় কবিতা যুদ্ধে মাতিয়া উঠেন এবং প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের মত তীক্ষ্ণ ভাষা ব্যবহার করিয়া "বুনোকবি" দ্বারকানাথকে যৎপরোনাস্তি অপদস্থ করেন। অবশ্য "চোকে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই" (সংবাদ প্রভাকর, ৯ আগষ্ট, ১৮৫৩) নামক গদ্যপদ্যমিশ্রিত রচনার শেষাংশে কলহ ত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বারকানাথ—তিন জনেই বন্ধুভাবে মিলিত হইয়াছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল দীনবন্ধুর নক্‌সা জাতীয় কবিতায়। দীনবন্ধু, প্রবীণ বয়সেও এই আদর্শ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার নাটক হইতে এইরূপ দুই চারিটি পংক্তি উদ্ধার করা যাইতেছে—

১। মুড়কী-মুখী ময়রা দিদি নবীন বয়েস তোর,
ছোট্ট মাজা নিরেট বাঁজা, বড় কপালজোর।—জামাই বারিক

২। দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি,
যে ঘরেতে রাঙ্গা বৌ, সেই ঘরেতে চুরি। ঐ

৩। আমি ফচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি মড়ি-পোড়ানীর ঝি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিছি। ঐ

৪। নৌকা ডিঙে চাইনে আমি আজ্ঞে যদি পাই,
গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে শ্বশুর বাড়ী যাই। ঐ

৫। ভুবনে ভোজনে ভক্তি কর ভবজন
ভয়াবহ ভবভয় হবে নিবারণ —কমলে কামিনী

৬। ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের ঘায়।
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায় ॥ —নীলদর্পণ

৭। মন উচাটন, মালতী কারণ, কই দরশন পাই গো তার।
মলেতে মল্লার, বেহাগ বাহার, বাজে চমৎকার
বাঁচিনে আর ॥

—নবীন তপস্বিনী

দীনবন্ধু যে গুরুর পদাঙ্ক অনুকরণ করিয়া ভাষা, শব্দ যোজনা ও ছন্দ-কুশলতায় একই রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত' পংক্তিনিচয়েই প্রমাণ পাওয়া যাইবে। উত্তরজীবনেও তাঁহার চিত্তধর্ম ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শকে কিয়দংশে গ্রহণ করিয়াছিল। জীবনে অসঙ্গতির প্রতি প্রীতিমধুর হাস্য-পরিহাস আর তাহারই সহিত অন্তরের সহানুভূতি—দীবন্ধুর মনোধর্মের এই দিকটির সহিত কবি ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তবে মাঝে মাঝে ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী যেমন জ্বালাময় ব্যঙ্গে পর্যবসিত হইত, দীনবন্ধুর একমাত্র 'ভোঁতারাম ভাট' ও 'কুঁড়ে গোরুর ভিন্ন গোঠ' বাদ দিলে তাঁহার রচনায় এই জাতীয় ব্যঙ্গাত্মক কটু জ্বালা নাই বলিলেই চলে। রেভাঃ লালবিহারী দে-র প্রতি এই কটূক্তি ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যাবিদ্বিষ্ট অন্তর্দাহ হইতে বিষ সংগ্রহ করিয়াছিল। ইহা ছাড়িয়া দিলে দীনবন্ধুকে জীবন-রস-রসিক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের রুচির তুলনামূলক আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সে সময়কার অসংযত বাক্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে বর্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা যে কি আশ্চর্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন। কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতার প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়াছেন, "যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকেই দুষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর।" দীনবন্ধু বাল্যরচনা 'মানবচরিত্র' ('সংবাদ সাধুরঞ্জনে' প্রকাশিত) হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণত বয়সের 'সুরধুনী' ও 'দ্বাদশকবিতা'য় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবের দ্বারা চলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অনবদ্য নির্মল হাস্যরস সৃষ্টিতে গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। জীবনের অসঙ্গতিকে হাস্যস্পর্শে লঘুতরল করিয়া তাহার সহিত কিছু অন্যরসের ব্যঞ্জনা (অধিকাংশ স্থলেই করুণ রস) সৃষ্টি করিয়া দীনবন্ধু যাহা নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বর গুপ্তের কোন যোগাযোগ নাই বটে, কিন্তু কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তী কালেও গুরুকে বিস্মৃত হন নাই। প্রায়-কৈশোরে লিখিত 'জামাই ষষ্ঠী' এবং প্রায় প্রবীণ বয়সে লিখিত 'প্রভাত' কবিতা দুইটির রচনারীতির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই

এবং দুইটি কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। 'জামাই ষষ্ঠী'র—

দু'তিন ছেলের বাপ যে সব জামাই।
তারাও উঠেছে ক্ষেপে বলে যাই যাই॥
ছেলে দেখিবারে যাব, বাটা নিতে নয়।
পো-নামে পোয়াতি বাঁচে, সর্ব্বলোকে কয়॥

এবং 'প্রভাত'-এর

ঘোমটা দিয়ে   ঘাটে বসিয়ে
ছোট বোয়ের কুল।
মাজছে বাসন   বাজছে কেমন
তাবিজ লঙ্গ ফুল॥
পরস্পরে   মধুর স্বরে
মনের কথা কয়।
ঘোমটা থেকে   থেকে থেকে
হাসির ধ্বনি হয়॥

বর্ণনা ঈশ্বর গুপ্তের লেখনীপ্রসূত বলিয়া ভ্রম হয়। ১৮৫৫ সালে দীনবন্ধু-রচিত এই কবিতাটিতে দীনবন্ধুর নাম না থাকিলে ইহাকে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা বলিয়া চালান যাইত।

এমন সুখের দিন কবে হবে বল দিদি, কবে হবে বল্ গো,
কবে হবে বল।
এত দিনে যাবে যত বিপক্ষের বল, দিদি, বিপক্ষের বল লো
বিপক্ষের বল॥

*   *   *

ধুক্ ধুক্ করে মনে সদা দুখানল, দিদি, সদা, দুখানল লো,
সদা দুখানল।
শীতল হইবে পেলে বিবাহের জল, দিদি, বিবাহের জল লো
বিবাহের জল॥

ঈশ্বর গুপ্ত বিধবাবিবাহের বিপক্ষে ছিলেন, এইটুকু জানা আছে বলিয়াই এই কবিতা ঈশ্বরগুপ্তের হইতে পারে না, তাহা অভিজ্ঞ পাঠক বুঝিয়া লইবেন। কিন্তু ছন্দ ও শব্দযোজনার মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের অতিপ্রত্যক্ষ প্রভাব রহিয়াছে। কবিতা রচনার এই রীতি দীনবন্ধু কোন দিনই ত্যাগ করিতে পারেন নাই। —এই স্থলেই তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান পার্থক্য।

দীনবন্ধুর প্রথম যুগের গদ্য রচনাও ঈশ্বর গুপ্তের অবিকল অনুসরণ মাত্র। ১৮৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী 'সংবাদ প্রভাকরে' "জনক জননীর স্নেহ" নামক দীনবন্ধুর গদ্যপদ্য মিশ্রিত যে দীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়, তাহাই বোধ হয় তাঁহার প্রথম গদ্য রচনা। অনুপ্রাস-যমকের চমকে বালক দীনবন্ধু গুরুকে কিরূপ নিপুণভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

"সর্ব্বতেজঃপুঞ্জ—করুণাবরুণাগার-নির্মল-নির্ব্বিকার-সর্ব্বসদ্‌গুণাধার-পরম-পবিত্র-অনাদ্য-নন্তদেবমণ্ডিত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় সৃষ্টিবস্তু দৃষ্টিপথে পতিত হয় অথবা সেমুষী সহযোগে মনোভাণ্ডারে আনা যায়, তৎসমূহের প্রতি ক্ষণকাল অনন্যমনে এবং সরলান্তঃকরণে জ্ঞানালোচনা করিয়া দেখিলে অচিরাৎ প্রতীতি হইবে তাহারা নিরন্তর নিয়ন্তার গুণরাশি প্রকাশ করিতেছে।"

এই রচনাকে বালসুলভ অনুকরণ বলিয়া না হয় ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহার প্রবীণ বয়সের 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' এবং 'পোড়া মহেশ্বর' নামক দুইটি গদ্য রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের একশ্রেণীর গুরুভাব গদ্যের প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য সে গুরুভার ইচ্ছাকৃত, হাস্য-রস সৃষ্টির জন্য তিনি মাঝে মাঝে একটা কৃত্রিম গদ্যরীতির সাহায্য লইতেন। যথা—

"সরোবরতীরে বিস্তীর্ণ গালিচা পাতিয়া ব্রহ্মা সলিলশীকর-সম্পৃক্ত সুশীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে বেদচতুষ্টয়ের চতুর্থ সংস্করণের প্রুফ দেখিতেছিলেন। সংশোধন এমনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু সম্মুখে দণ্ডায়িত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।"

—যমালয়ে জীবন্ত মানুষ

অথবা—

"এইরূপ কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, একদিন মধ্যাহ্ন সময় প্রখর-প্রভাকর-কর-নিকরে অবনী দগ্ধবৎ, পুষ্করিণীর নীর সীতা-কুণ্ডোদকাপেক্ষাও উষ্ণ, দুঃসহ আতপ-তাপিত গাভীকুল প্রান্তরস্থ কদম্বতলে শয়ন করিয়া রোমন্থনে নিযুক্ত, কৃষকেরা প্রান্তরের প্রান্তভাগে আম্রকাননে উপবিষ্ট হইয়া গৃহিণী-প্রেরিত পান্তাভাত কচিনেবু-রস সহযোগে ভক্ষণ করিতেছে, শুষ্ক কণ্ঠে জলপ্রার্থনা করিতে চাতকিনীর কণ্ঠরোধ, বিজাতীয় রৌদ্র, কাহার সাধ্য তাহার দিকে চাহিয়া দেখে……।"

—পোড়া মহেশ্বর

এই উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'র মাসপয়লা সংস্করণে মাঝে মাঝে যে গুরুভার গদ্য লিখিতেন, দীনবন্ধু প্রবীণ বয়সেও তাহার প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু

তিনি কৈশোর বয়সেও একপ্রকার সরল ভাষা ব্যবহার করিতেন; 'সংবাদ প্রভাকরে'ই তাঁহার এইরূপ লঘু ধরণের কিছু কিছু গদ্য নিবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল। যথা—

"নিস্তারিণী বলিলেন, না বোন, ভট্টাচার্য্য ও গোঁসাঞি সর্ব্বনেশেদের যে শ্রী ও বিদ্যাবুদ্ধি, তাহারা কি বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিতে পারে, তাহারদিগের শরীর দেখিলেই বোন ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা হয়, পণ্ডিত পোড়ারমুখোরা পা ফাটা চাঁচা গায়ে কতকগুলা গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া ঠিক যেন কুমারটুলির একমেটে ঠাকুর, আ মরি! গোঁসাঞিদের বা কি ঢং, ঠিক যেন অক্রূর দত্তের রাসের সং, গা-ময় তিলক ছাব দিয়া যেন সদর দেওয়ানী আদালতের ফয়সালা বেরুলেন…।"

সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৬, ২৫শে ফেব্রুয়ারী

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে অবশ্য প্যারীচাঁদ-রাধানাথ সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'র ভাষার কিছু কিছু প্রভাব রহিয়াছে। তিনি যে এত সরল গদ্য লিখিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই পরম বিস্ময়াবহ ব্যাপার। অবশ্য এইরূপ সরল রচনা দীনবন্ধুর কৈশোর বা যৌবনেও বড় বেশি পাওয়া যাইবে না। সে যাহা হউক, নাটক রচনার ক্ষেত্রে দীনবন্ধু অভিনব আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিলেও গদ্য রচনায় অনেকাংশে গুরু ঈশ্বর গুপ্তকে অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্তের তরুণ শিষ্যত্রয়ের মধ্যে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী দীর্ঘকাল ধরিয়া গুরুর আদর্শ অনুসরণ করিতে পারেন নাই, কারণ অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হন। তাঁহার রচনারীতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "তাঁহার রচনাপ্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল। সরল স্বচ্ছ দেশী কথায়, দেশী ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থকিলে বোধহয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন।"[৭] দ্বারকানাথ বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর মত ছাত্রাবস্থাতেই 'সংবাদ প্রভাকরে'র নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধে' তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর দ্বারা বিষম আক্রান্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহাকে দুই জনেই 'বুনো কবি' আখ্যা দিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের উপর ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবের একটু উদাহরণ—

পাপিনীর উক্তি

তাপিনী পাপিনী রাণী মহারাগে বলে।
এ মাগীর কথা শুনে জলে অঙ্গ জ্বলে॥

মনে করিযাছ, হাঁলো, সত্যবতি তুমি।
পুনরায় প্রাপ্ত হবে এ ভারতভূমি।।৮

ছন্দ ও অনুপ্রাসে ঈশ্বর গুপ্তের পদাঙ্ক অনুসরণ সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে।

'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধে' দ্বারকানাথ 'চটুকবি' বঙ্কিমচন্দ্র এবং 'মিত্রকবি' দীনবন্ধুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ১৮৫৪ সালে দুইজনের সহিত সন্ধি করেন। কিন্তু কিশোর বঙ্কিম-দীনবন্ধুর মত তাঁহার লেখনী ও তীব্র কটূক্তিপূর্ণ ছিল। ১৮৫৩ সালে লিপিযুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিলে দ্বারকানাথও সুর চড়াইয়া লিখিয়াছিলেন,

তুই বেটী কম বড় নোস,
দাঁড় তো দাড়া তো মাগী যে কথায় আমি রাগি
সেই কথা মোর কাছে বার বার কোস।

অবশ্য দ্বারকানাথ কিশোর বয়সেই বঙ্কিম-দীনবন্ধুর মত আদিরসাত্মক কবিতা রচনায় উদ্দাম হইয়া উঠেন নাই। এই জন্য সম্ভবতঃ ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাকে সবিশেষ স্নেহ করিতেন। বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর আদিরসাত্মক বালচাপল্য গুপ্তকবি 'সংবাদ প্রভাকরে' মুদ্রিত করিতেন বটে, কিন্তু রসিকতার ছলে মাঝে মাঝে কিশোর শিষ্যদ্বয়কে আদিরসাত্মক কবিতারচনার জন্য সাবধান করিয়া দিতেন। ১৮৫২ সালে ১৪ই চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্র 'শ্রীঅষ্টাবতার চট্টোপাধ্যায়', এই ছদ্মনামে 'রূপক। বসন্ত। পদ্য' এই শিরোনামা দিয়া স্ত্রীপুরুষের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক উগ্র আদিরসাত্মক কবিতা লিখিয়া 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ করিয়াছিলেন। গুপ্তকবি উক্ত কবিতাটি মুদ্রিত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন, "এ রসের অধিক বাড়াবাড়ি করিয়া ছড়াছড়ি করিলে চড়াচড়িরাও লজ্জা পাইতে পারে।" দীনবন্ধুর 'জামাই ষষ্ঠী' কবিতা 'সংবাদ প্রভাকরে' (২৫এ মে, ১৮৫২) প্রকাশিত হয়। কবিতাটি ছাত্রের রচিত হইলেও সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে কিশোর দীনবন্ধু বয়সের অনুপাতে অত্যধিক আদিরসাত্মক পরিপক্বতা দেখাইয়াছিলেন বলিয়া সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত কবিতাটির শেষে মৃদু পরিহাসমিশ্রিত এই মন্তব্য সংযোজিত করেন—"এ জামাইটির কশুর নাই। ফুল না ধরিতেই রসের ছড়াছড়ি করিয়াছেন।" কিন্তু দ্বারকানাথ আদিরসাত্মক কবিতা প্রায়শঃই পরিহার করিয়া চলিতেন বলিয়া সম্ভবতঃ ঈশ্বর গুপ্তের সস্নেহ আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ, ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৫৫ সালে তরুণ দ্বারকানাথের

'সুধীরঞ্জন' নামক নীতি-মূলক দীর্ঘ কবিতাগ্রন্থ 'সংবাদ প্রভাকর' মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ সালের ২০এ নভেম্বর তারিখে দ্বারকানাথ 'সংবাদ প্রভাকরে' বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, "মদ্রচিত গদ্য পদ্য পরিপূরিত এই অভিনব পুস্তক উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।" প্রধানতঃ স্বদেশের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও বিভিন্ন নীতিবিষয়ক এই কবিতাগ্রন্থটি একদা অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এই তিনজন তরুণ ছাত্র ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইলেও দ্বারকানাথই গুরুর গভীরতর রচনার ভাবাদর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ তরুণ বয়সেই লোকান্তরিত হন, সুতরাং কবিত্ব পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। দীনবন্ধু যদিও গুরুর আদর্শ অনুসরণ করিয়া উত্তর জীবনেও অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ নাট্যকার; সুতরাং কবিতার মানদণ্ডে তাঁহার প্রতিভা বিচার্য নহে। বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভেই গুরুর সমস্ত প্রভাব পরিত্যাগ করিয়া মহত্তর শিল্পনৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং গুপ্তকবির তিনজন ভাবশিষ্যই, কেহ লোকান্তরিত হইয়া, কেহ-বা উন্নততর সাহিত্যাদর্শের সংস্পর্শে আসিয়া, কখনও আংশিক-ভাবে, কখনও-বা পরিপূর্ণভাবে গুরুর প্রভাব বর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও গুরুর আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই মনোমোহন বসুর উপর ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব আলোচনা করা যাইতেছে।

॥ ৩ ॥

মনোমোহন বসু ও ঈশ্বর গুপ্ত

মনোমোহন বসু ঈশ্বর গুপ্তের শেষ ও সক্ষম শিষ্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘজীবী হইয়া তিনি গুরুর ভাবাদর্শ পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে কবিগান, আখড়াই গান ও হাফ-আখড়াই গানের আসরে ঈশ্বর গুপ্ত ছড়া বাঁধিতেন, ঠিক অনুরূপ আদর্শ অনুসরণ করিয়া মনোমোহনও কবিগানের শুষ্ক ধারাটিকে কিছুকাল সজীব রাখিয়াছিলেন। নাট্যকার হিসাবে তাঁহার প্রতিভাবিচার বর্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত; কিন্তু যে মনোমোহন ঈশ্বর গুপ্তকে সার্থক ভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গুরুকৃত্য একটু ভিন্নরূপ। তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা ও গান লিখিতেন, গুরুর আদর্শ অনুসরণ হালকা

চালের লঘু গদ্যরচনা প্রকাশ করিতেন, এমন কি, 'সংবাদ প্রভাকরে'র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ১৮৫২ সালে 'সংবাদ বিভাকর' নামক একখানি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন।

ঈশ্বর গুপ্তের যথার্থ মানসশিষ্য হইতেছেন মনোমোহন বসু। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে যেমন অনাধুনিক বঙ্গ সংস্কৃত শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে, আবার নব ভাবপ্রবাহ গুপ্তকবিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ মনোমোহনের মধ্যেও দুই প্রকার ভাবাদর্শ যুগপৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। একদিকে তিনি প্রাচীন বাঙলার লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক; যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, দাঁড়াকবি, আখড়াই সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, তেমনি আবার অন্যদিকে 'চৈত্রমেলা' বা 'হিন্দুমেলা'য় জাতীয় ভাবোদ্দীপক আধুনিক রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়া লোকচিত্তে স্বাদেশিকতা সঞ্চার করেন, 'সাংবাদ বিভাকরে' জাতীয় সংস্কৃতির যথার্থ প্রগতি সম্বন্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়া লিখেন, "স্থির হও; উন্নতির পথে যাইতেছে, উত্তম। কিন্তু একটু মন্থর গতিতে চল; শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপ কর; সহযাত্রীদের কুড়াইয়া লও, সঙ্গী ছাড়িয়া কোথা যাও?"

হাফ আখড়াই ও কবিগানের শেষ-প্রতিনিধি মনোমোহন। বস্তুতঃ তিনি গুরুর আদর্শ অনুসরণ করিযা কবিগানের দলে বাঁধনদার হইয়া গান বাঁধিয়া দিতেন এবং এই জাতীয় রচনার সময় সামাজিক ভব্য রুচিকে গুরুর মতই অকাতরে বিসর্জন দিতেন—গ্রাম্য, অশ্লীল, অবাচ্য শব্দ ব্যবহারে কিঞ্চিন্মাত্রও আপত্তি করিতেন না। স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্ত একদা তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ শিষ্য মনোমোহনের সহিত হাফ আখড়াই কাব্যযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[৯] তিনি একবার মাত্র গুরুকে পরাজিত করিলেও আজীবন গুপ্তকবির একনিষ্ঠ ভক্তশিষ্য ছিলেন এবং গুরুর রচনারীতির অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য গান ও কবিতা হইতে গুরুর প্রভাব-নির্দেশক কতিপয় উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে:

এ বিভব ভবধব! মানব তরে কি সব
ভাবিয়া এ দয়া তব! আপনা হারাই।
এই করো ভবঘুরে নাহি হই ভবঘুরে
নিত্য চিন্তা মণিপুরে যেতে যেন পাই॥

বলা বাহুল্য, ইহার রচনারীতি ও সুর ঈশ্বর গুপ্তের কৃপাপুষ্ট। মনোমোহন গুপ্তকবির "মানিনী নায়িকা" জাতীয় কবিতার বিষয়বস্তুকে ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া পাঁচালীর গান বাঁধিয়াছিলেন।[১০] ঈশ্বর গুপ্তের ভাবাদর্শের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ তিনি যে সমস্ত লঘু চালের পাঁচালীর গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের উল্লেখ করা যাইতেছে :

পূজো-আচ্ছা নেম্-নিমেষা. সকলি হোল রদ্;
রাতদিন কেবল রব শুনি, দে মদ, দে মদ্!
বাঁকা তেড়ি, বাঁকা ছড়ি, পায় বাঁকা বুট;
বাঁকা মেজাজ বাঁকা মুখে ড্যাম ড্যাম হট।
ওয়াচ গার্ড গলায় ঝোলে, ট্যাঁকে ওয়াচ ঘড়ি;
জোটে না বাবুদের কেবল দড়ি কলসীর কড়ি।

পৌষমাসে হৌস থেকে নগদ মাল আসে—
বড়দিন আর ছোটদিনের ছুটি-ছুটাবার আশে।
বাইরে ঝোলে গ্যাঁদার মালা ঘরের ভিতর র্যাঁদার জ্বালা,
বৈঠকখানায় টেবিল কোলে ডেবিল দল বসে :
হোটেল থেকে আসে খানা খটেল ইয়ার জোটে নানা,
কিন্তু 'গোটু হেল' ভাষে, যদি উঠনোর মুদি আসে।[১১]

ঈশ্বর গুপ্তের 'ইংরাজী নববর্ষ,' 'বড়দিন' প্রভৃতি সামাজিক রঙ্গমূলক কবিতার ছায়াতলে বসিয়াই মনোমোহন এই জাতীয় পরিহাসমিশ্রিত কবিতা ও পাঁচালী গান রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার—

কোথায় মা, ভিক্টোরিয়া, দেখ আসিয়া ইণ্ডিয়া তোর
চলেছে কেমন।

এবং গুপ্তকবির—

ওমা কুইন, তোমার ইণ্ডিয়া ধাম
ক্বইন কোরো নাক।

প্রায় একই প্রকার।

শিষ্য মনোমোহন গুরু ঈশ্বর গুপ্তের ঔদরিক কবিতাগুলির সার্থক অনুসরণ করিয়াছিলেন। ভোজনবিলাসী বাঙালী প্রাচীন যুগ হইতে রসের সহিত

রসনার আত্মীয়তা আবিষ্কার করিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত 'পাঁটা' "এণ্ডাওয়ালা তপস্যা মাছ', 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য', 'আনারস' প্রভৃতি বিবিধ খাদ্যবিষয়ক কবিতায় বিচিত্র আহারপ্রীতির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তবে গুরু যেমন আমিষের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত ছিলেন, শিষ্য সেরূপ নহেন। তিনি নিরামিষ খাদ্যের প্রতি অধিকতর অনুকূল ছিলেন। নিম্নে মনোমহনের এইরূপ কয়েকটি কবিতা-পংক্তির উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

১। শুক্তকে কে তিক্ত বলে এমন মিষ্ট নিমের ঝোলে,
সুধামাখা কলাফুলের ঘণ্ট খেয়ে প্রাণ জুড়ালেম।
অড়হর ডাল ডালের রাজা শাকের ঘণ্ট আলুভাজা,
খেতে সাধ যায় ফেলে খাজা, পেঁপের ডালনায় মজা পেলেম।

২। পাই যদি ডুমুরের ডালনা, আর কিছুই না চাই।
তাজা ডুমুরভাজা পেলে খাজা ফেলে খাই।

৩। আকালের তাল বড় রসাল বড়া করে খেলেম।
দুধ জুবড়ে, চুষে কামড়ে, কত মজা—আহা আমি কতই
মজা পেলেম।
মাঘ ফাগুনে এমন মেওয়া ভাগ্যবল বৈ কঠিন পাওয়া
চিনির রসে ডুবিয়ে দেওয়া, ঘি-ভাজা তায়—
বড়া নয় তো, সুধা খাওয়াই বুঝে নিলেম।

এই উদ্ধৃতি গুলিতে খাদ্যরসের প্রতি কবির যে গভীর আসক্তি ফুটিয়াছে, তাহা ঈশ্বর গুপ্ত ব্যতীত অন্যত্র প্রায় দুর্লভ। ঈষৎ পরিহাস সহ গৃহী বাঙালীর পরিচ্ছন্ন জীবনভোগের একটা মধুর চিত্র এখানে বাস্তব মাধুরীর সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যধারা মনোমোহনেই শেষ হইয়া যায় নাই। হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গপ্রধান সামজিক নক্‌সা জাতীয় কবিতাগুলি ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শেই রচিত হইয়াছিল ঈশ্বর গুপ্তের প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে কেবল মনোমোহনই গুরুর প্রতিভার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন; কবিগান আখড়াই গানের দলে শুধু গান বাঁধিতেন না, প্রয়োজন স্থলে কবিওয়ালা রূপেও আসরে আবির্ভূত হইতেন। ঈশ্বর গুপ্তর অন্যান্য শিষ্যগণ প্রথম বয়সে গুরুর আদর্শ অনুসরণ করিলেও কিছুকাল পরেই আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক সারস্বত সাধনার পথ ধরিয়াছিলেন। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ অধিকারী, রঙ্গলাল—কেহই দীর্ঘকাল ঈশ্বরগুপ্তের নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া

চলেন নাই। কিন্তু একমাত্র মনোমোহন বসু নিজ প্রতিভার তৈল নিষেকের দ্বারা গুরুর প্রতিভা দীপ্তিকে অগ্নিহোত্রীর মত সমগ্র জীবন ধরিয়া রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বর গুপ্ত আরও অনেক তরুণ কবি ও স্কুল-কলেজের ছাত্রকে সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং প্রকাশের যোগ্য না হইলেও ছাত্রদের অনেক কবিতা ও গদ্য নিবন্ধ 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ করিতেন। হুগলী কলেজের আর এক ছাত্র গোপাল চন্দ্র সেন ('সংবাদ প্রভাকর' ১৮৫৩, ২২এ মার্চ), কোতরঙ্গ নিবাসী বিশ্বম্ভর দাসবসু ('সং, প্র, ১৮৫৩, ২৪অ মার্চ), শিবপুরের সূর্যকুমার সেনগুপ্ত (সং, প্র, ১৮৫৩, ১৫ই এপ্রিল), ফরাসডাঙ্গা নিবাসী কৃষ্ণদাস শূর এবং মেদিনীপুর নিবাসী অক্ষয়কুমার দাসের অনেক কবিতা গুপ্তকবি 'সংবাদ প্রভাকরে' মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ফলতঃ তরুণদিগকে উৎসাহ দিয়া ঈশ্বরগুপ্ত একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই তিনি ১৯শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

পাদটীকা

১। সংবাদ প্রভাকর, ২রা বৈশাখ, ১২৫৪

২। বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ, বিবিধখণ্ড, পৃ ১০৭-৮

৩। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস—অক্ষয় চরিত, পৃ ১৪-১৫

৪। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ৩য় সংস্করণ, পৃ ৬৬

৫। বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ ১১৯-২০

৬। সংবাদ প্রভাকর, ২৭এ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩

৭। বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ ১২০

৮। সংবাদ প্রভাকর, ১৭ই মার্চ, ১৮৫৩

৯। হিতবাদী, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩১৮

১০। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মনোমোহন-গীতাবলী, পৃ ১৬৩

১১। ঐ, পৃ ১৮৪-১৮৫

একাদশ অধ্যায়

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বঙ্গসংস্কৃতি

॥ ১ ॥

বাংলা কাব্যে পুরাতন রীতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির বিদ্যুৎস্পর্শ আরও একটি মানুষকে কি ভাবে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল, জীবন-প্রতীতির উদারতর পরিমণ্ডলে স্থাপন করিয়া চিত্তলোকে একটা সমস্যা-সঙ্কুল অশান্তি জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা মদনমোহন তর্কালঙ্কারেব (চট্টোপাধ্যায়) কীর্তিকথা বিশ্লেষণ কবিলে অনুভূত হইবে। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ নানা জীবনদর্শনের সংঘাতে উচ্চকিত, নানা অশান্তিতে বিচঞ্চল। এই যে সামাজিক অসন্তোষ, অপূরণীয় আকাঙ্ক্ষার আর্তনাদ—যাহাব সম্বন্ধে মিল্ বলিয়াছেন, "It is better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied"—মদনমোহনের জীবনেও এই শতাব্দীর কূট সঙ্কট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে যেমন আমরা দ্বিমুখী ভাবদ্বন্দ্বেব পরিচয় পাইয়াছি,—একদিকে কবিগান, আখডাই গান, 'পাষণ্ডপীডন' পত্রিকার স্থূল রঙ্গব্যঙ্গ, 'সম্বাদ রস-রাজে'র ব্যক্তিগত গালি-গালাজ,—অপরদিকে নবযুগের দ্যোতনা—ঠিক তেমনি মদনমোহনের মধ্যেও এই দুই প্রকার পরস্পরবিরোধী অনুভূতি দেখা যাইবে। একদিকে সংস্কৃত কলেজে অধীত সংস্কৃতবিদ্যা, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন ও স্মৃতি অধ্যয়ন, 'বাসবদত্তা' ও 'রসতরঙ্গিণী'র দেহপ্রমাথী আদিরসের কটু রসায়ন, অপরদিকে নবজীবনের বার্তাবহ মদনমোহনের স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে আত্মদান, বিধবা বিবাহের আন্দোলনে মহোল্লাসে যোগদান, জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা, কন্যাদিগকে একেশ্বরববাদে দীক্ষাদান এবং নিজ জীবনে নিরীশ্বরবাদী লোকহিতবাদ বা কোঁৎ-প্রচারিত পজিটিভিজম্ স্বীকার; কখনও বা সংশয়বাদের অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত বিষণ্ণতার আবরণে আশ্রয় গ্রহণ। ঈশ্বর গুপ্তের ইংরাজী ভাষা-জ্ঞান ছিল না বলিলেই চলে; তাঁহার যে চিত্তে যুগসঙ্কট ঘনাইয়াছিল, তাহা যুগের আবহাওয়া হইতেই আসিয়াছিল, ইংরাজী বিদ্যা

হইতে নহে। কিন্তু মদনমোহন সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্র হইলেও ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য, য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। কাজেই তাঁহার চিত্তবিপ্লব আরও গভীর, দূরাবগাহ ও বিপুলপ্রসারী।

মদনমোহন ছিলেন বিদ্যাসাগরের সহপাঠী, সহকর্মী ও আজীবন সুহৃৎ। সেই উত্তপ্ত বহ্নিকণাস্পর্শে মদনমোহনের প্রাণ-শমীও অগ্নিময় হইয়াছিল—এবং তাহাই স্বাভাবিক। তিনি ১৮২৯ হইতে ১৮৩৯, মোট দশবৎসর সংস্কৃত কলেজে পাঠ করিয়া জজ-পণ্ডিতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন এবং হিন্দু পাঠশালা, বারাসত গভর্ণমেণ্ট স্কুল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি বিদ্যায়তনে বেশ কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়া ১৮৫৫ সালে মুর্শিদাবাদে জজপণ্ডিতের কর্ম নির্বাহ করার পর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। সুতরাং তিনি যুগপৎ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য এবং আধুনিক য়ুরোপীয় জ্ঞানবাদে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্য তাঁহার চিত্তে ১৯শ শতাব্দীর বাণী এমন গভীর ভাবে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল।

তাহার সাহিত্যজীবন স্বল্পপ্রসারী। নিতান্ত অপরিণত বয়সে তিনি যে দুইখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া আছেন—যদিও সেই পুস্তক দুইটি স্মরণের যোগ্য নয়। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সময়েই মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তিনি 'রসতরঙ্গিণী' (১৮৩৪) রচনা করেন। সংস্কৃত আদিরসাত্মক উদ্ভট কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদটি যে জনপ্রিয় হইয়াছিল, ইহার অনেকগুলি সংস্করণ দৃষ্টেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। অলঙ্কার শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় সদ্য-অর্জিত আলঙ্কারিক জ্ঞান বাংলা ভাষায় অবতারিত করিবার জন্য তিনি এই ক্ষুদ্র অনুবাদখানি প্রকাশ করেন। ভূমিকায় সংস্কৃত কলেজের সপ্তদশবর্ষীয় ছাত্রের উপযুক্ত গুরুগম্ভীর শব্দঝঙ্কারের বাহ্বাস্ফোট করিয়া বলেন,

"যদিচ এতৎ কবিতা সকলের অনেকাংশ ভুবনাবতংস পণ্ডিত-বংশোত্তংস পরম পণ্ডিত মহাশয়দিগের বিমল-বদন-বিকচ-কমল-কুহরে বিরাজমান আছে কিন্তু তন্মধু শ্রীমন্মধুব্রত মহাশয়দিগের মধুব্রত ভঙ্গাশঙ্কায় প্রায় সঙ্কুচিত থাকাতে সাধারণ সকলের সুলভ নহে, এটা তন্মহাশয় মাত্রেরি নৈসর্গিকী রীতি, সুতরাং তত্তৎ সাধুকাব্য সাধারণের আস্বাদনযোগ্য না হওয়াতে কালক্রমে ক্ষীণতাই হইতেছে, অতএব এইক্ষণে অমি উদ্ভট কবিতা সকল সঙ্কলন করিয়া সাধারণ জনগণের আস্বাদনার্থ তত্তৎ কবিতার্থ যথারূপে ভাষায় পয়ারাদি নানা ছন্দোবন্ধে ভাবিত করিয়া প্রকাশ করণেচ্ছু হইয়াছি, তন্মধ্যে প্রথমতঃ আদ্যরস ঘটিত শ্লোক-সকল এতদ্গ্রন্থে প্রকাশ করিলাম।"[২]

প্রায় কৈশোর কালেই মদনমোহন পয়ার, ত্রিপদী ও অন্যান্য ছন্দরচনায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

লোচনে হরিণগর্ব্বমোচনে
মা বিভূষয় কৃষ্ণাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
শুদ্ধ এব যদি জীবহারকঃ
সায়কো' হি গরলৈর্ন লিপ্যতে॥

মদনমোহনের অনুবাদ—

শুধু সুধামুখি নয়নে তব।
যদি যুবজনা মোহিত সব॥
তবে বল দেখি কি ফল দেখে।
উজ্জ্বল করিছ কজ্জল মেখে॥
সুধু শরে যদি জীবন হরে।
কি ফল গরল মাখিয়া তারে॥

সপ্তদশবর্ষীয় প্রায়-বালকের পক্ষে এ অনুবাদ বিস্ময়কর বৈকি। অবশ্য পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইহার যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার মাধুর্য ও মূলানুগত্য অধিকতর উপভোগ্য—

হরিণ-গর্ব-মোচন লোচনে
কাজল দিও না সরলে,
একেই তো বাণ নাশ করে প্রাণ—
কি কাজ লেপিয়া গরলে?

মদনমোহন অপরিপক্ক বয়সে ভারতচন্দ্রীয় আদিরসের মত্ততা ও উদ্ভট সংস্কৃত কবিতার অহিফেন-রসে মুগ্ধ হইয়া এই অনুবাদ-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার কাব্যমূল্য বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ইহা পড়িতে পড়িতে একটা কথা মনে হইতেছে: যে সমাজে কিশোর ছাত্র এইরূপ জুগুপ্সিত আদিরসের উল্লাসে আত্মসমর্পন করিতে পারে, সে সমাজের ভাবজীবন কোন্ পথে ধাবমান হইতেছিল। রামমোহনের মৃত্যুর মাত্র এক বৎসর পরে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহনের বেদান্তবাদ ও ডিরোজিও-শিষ্যদের সমাজবিদ্রোহ শিক্ষিত বাঙালীর মনে অসহিষ্ণু প্রাণ-বেদনা সৃষ্টি করিলেও, আর একটি প্রাচীনপন্থী শিক্ষিতসমাজে সংস্কৃত

আদিরস এবং ভারতচন্দ্রীয় দেহবিলাস অব্যাহত ছিল, তাহা মদনমোহনের তরুণ বয়সের এই কবিতা পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। এই সমাজে কালীকৃষ্ণ দাসের 'কামিনীকুমারের' মত নির্জলা কামায়ন শ্রেণীর পুস্তিকার বিশেষ প্রভাব ছিল। অবশ্য মদনমোহনের পরবর্তী কালের মার্জিত রুচি এই উগ্র কামকলাকুতূহলী কাব্যের জন্য সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তাঁহার জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ১২৭৮ বঙ্গাব্দে 'বাসবদত্তা'র যে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ভূমিকায় বলেন—

"রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা এই দুই গ্রন্থই আদিরস-বহুল হওয়াতে কবি পূর্ণ বয়সে যুবাকাল-লিখিত এই দুই গ্রন্থের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার জীবদ্দশায় বাসবদত্তা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার এক ভগিনীপতি নিজের নাম দিয়া কেবল রসতরঙ্গিণী দুই একবার মুদ্রিত করিয়াছিলেন।"

ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। বিদ্যাসাগরের সতীর্থ ও সুহৃদ, বীটন সাহেবের শ্রদ্ধাভাজন, নারীশিক্ষার প্রধান প্রবক্তা, 'সর্ব শুভকরী পত্রিকা'র অন্যতম উদ্যোগী মদনমোহন উত্তরকালে প্রথম যৌবনের চিত্তচাঞ্চল্যজনিত কাব্য-কণ্ডূয়নের নিদর্শনে যে ব্রীড়াবনত হইবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? শুধু তিনি বা তাঁহার জামাতা নহে, সে যুগের প্রায় অধিকাংশ সমালোচক এই পুস্তিকার অনাবৃত আদিরসের উৎসারের জন্য কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শ্বশুরের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাশীল হইয়াও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "রসতরঙ্গিণীর রচনা এত সুমধুর ও প্রাঞ্জল যে আদিরসপূরিত না হইলে বোধ হয় ইহা আবালবৃদ্ধ সকলেরই হৃদয় মন হরণ করিত।"[৩] এখানে অবশ্য যোগেন্দ্রনাথ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, 'রসতরঙ্গিণী' জাতীয় রচনা 'আদিরস পূরিত' না হইয়াই পারে না। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (১ম) নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতেও বলিয়াছিলেন, "ইহার ('রসতরঙ্গিণী') রচনা প্রণালী বাসবদত্তা অপেক্ষা উত্তম, কিন্তু বর্ণিত বিষয় অত্যন্ত অশ্লীল। পিতাপুত্র একস্থানে পাঠ করিবার উপযুক্ত নহে।"[৪] রামগতি ন্যায়রত্নও এই পুস্তিকা সম্বন্ধে সঙ্কোচ বোধ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহার আদ্যোপান্ত নিরবগুণ্ঠন আদিরসাশ্রিত হওয়ায় সর্ববিধ পাঠকের তৃপ্তিকর হয় না।"[৫]

১৯শ শতকে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে আমাদের যে রুচিবোধ গড়িয়া উঠে, তাহার মানদণ্ড দ্বারা বিচার করিতে গিয়া তৎকালীন

মার্জিত রুচির সমালোচকগণ মদনমোহনের এই পুস্তিকার অশ্লীলতার জন্য কিছু কিছু বক্রোক্তি করিয়াছেন। একমাত্র কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'পুরাতন প্রসঙ্গে' (১ম) মদনমোহনের রুচিঘটিত কোন প্রশ্ন না তুলিয়া বলিয়াছেন, "গদ্য ও পদ্য লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার অতি অদ্ভুত ছিল।……আমার মনে হয়, তিনি যদি ডিপুটিগিরি চাকুরী করিতে না গিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যসেবায় রত থাকিতেন, তাহা হইলে এক্ষণে আমরা যে প্রশংসা-পুষ্পাঞ্জলি কেবল বিদ্যাসাগরেব চবণে অর্পণ করিতেছি, তাহা অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া দুই জনকে দিতে হইত।"[৬] 'পুরাতন প্রসঙ্গে'ব আব এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, "তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্যই বাঙলা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিষ।"[৭] কোঁতের একনিষ্ঠ ভক্ত ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রগাঢ় রসিক আচার্য কৃষ্ণকমল বোধ হয় ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীর আদিরসঘটিত নৈতিক ছুঁৎমার্গের উপবে উঠিতে পারিয়াছিলেন।

১৮৩৬ সালে মাত্র বিশবৎসর বয়সে মদনমোহন ছাত্রবস্থাতেই সুবন্ধুবিবচিত সংস্কৃত গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা' নামক রোমান্স্ অবলম্বনে এবং ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যা-সুন্দরে'র আদর্শ অনুসরণ করিয়া 'বাসবদত্তা' নামক দীর্ঘ আখ্যানকাব্য রচনা কবেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে ফিটজ্ এডওয়ার্ড্ হল্ সম্পাদিত **'The Vasavadatta, A Romance'** প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে এই গদ্যকাহিনী বাঙলা দেশে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল না, কারণ অন্য কোন অনুবাদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ফিটজ্ এডওয়ার্ডে'র প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে তরুণ কবি মদনমোহন ভারতচন্দ্রীয় আদর্শ অনুসরণ করিয়া প্রায় বিদ্যাসুন্দরের ছাঁচে এই কাব্য রচনা করেন। বিষয়বস্তু ও ছন্দ-বিন্যাস তো বটেই, এমন কি গ্রন্থ-সমাপ্তির পুষ্পিকাতেও ভারতচন্দ্রেব অনুসবণ করিয়া প্রাচীন কবি-রীতির মত কৌশলে কাব্যেব রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন। 'অন্নদামঙ্গল' রচনার শেষে ভারতচন্দ্র যেমন বলিয়াছিলেন,

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

ঠিক তেমনি মদনমোহনও সঙ্কেতের সাহায্যে 'বাসবদত্তা' রচনার তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন—

বসু পশুপতি-ভাল একত্র মিলেছে ভাল
সঙ্গে ঋষি চাঁদের মেলানী।
সেই শক নিরূপণ এই গ্রন্থ সমাপন
করিলেন শঙ্কর-শিবানী ॥

তিনি শুধু ভাবতচন্দ্রকে অনুসরণ করেন নাই, প্রথম যৌবনে মানসিক ঔদ্ধত্য বশতঃ রায়গুণাকরকে পরাজিত করিয়া নবতম কাব্য রচনার প্রয়াস করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এ বিষয়ে একটা নূতন সংবাদ দিয়াছেন, "ভারতচন্দ্রকে পরাজয় করাই তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বাসবদত্তা সমাপ্ত হইলে তর্কালঙ্কাব মহাশয় বাসবদত্তা ও বিদ্যাসুন্দর উভয় পুস্তকেব বচনাপ্রণালী সমালোচনা করিয়া বিদ্যাসুন্দর উৎকৃষ্ট হইয়াছে স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলেন যে, আর কখনও কবিতা লিখিবেন না। ততবধি প্রথম ভাগ শিশু শিক্ষার শেষ ভাগের কবিতাগুলি ব্যতীত জীবনে আর কবিতা লিখেন নাই।"[৮] আমাদের মনে হয়, যোগেন্দ্রনাথের এই অনুমান ঠিক নহে। কাবণ মদনমোহন সুবন্ধু হইতে কাহিনীর বহিরঙ্গ গ্রহণ করিলেও ভারতচন্দ্রের নিকটেই সবিশেষ ঋণী। বলিতে কি তিনি স্থানে স্থানে বিদ্যাসুন্দবেব আক্ষবিক অনুসবণ কবিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও মদনমোহনের বাসবদত্তাব যে যে স্থানে সাদৃশ্য আছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে :—

	বাসবদত্তা (মদনমোহন)		বিদ্যাসুন্দর (ভারতচন্দ্র)
১।	তমালিকা সমভিব্যহারে কুসুম নগরে গমন	...	সুন্দরের বর্ধমান প্রবেশ
২।	ষষ্ঠীপূজার নিমিত্ত আগত রমণীগণের কুমারের দর্শনে নানা বিতর্ক	...	সুন্দর দর্শনে নারীগণের খেদ
৩।	কুমাবের বাজাব ও রাজ-বাটী প্রভৃতি দর্শনান্তর নিশিতে মদনিকার বাটীতে অবস্থিতি	...	মালিনীর বাটীতে সুন্দরের প্রবেশ
৪।	কুমার আনিবাব পরামর্শ	...	সুন্দর সমাগম পরামর্শ

৫।	কামিনীর মন্দিরে কুমারের আগমন	···	বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি
৬।	কামিনীর ও কন্দর্পকেতুর বিবাহ		বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ
৭।	সম্ভোগ-শৃঙ্গার বর্ণন	..	বিহারারম্ভ, বিহার
৮।	কুমারের বাসায় বিদায়		সুন্দরের বিদায়

উল্লিখিত সাদৃশ্য বিচার করিলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত 'বিদ্যাসুন্দর' জাতীয় যে সমস্ত উত্তপ্ত আদিরসের কাব্যধারা কোথাও গদ্যপদ্য মিশ্রিত অকিঞ্চিৎকর রচনায়, কোথাও-বা কবিগান, পাঁচালী ও আখড়াই গানের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছিল মদনমোহন নিতান্ত তরুণ বয়সে তাহার দ্বারা সম্মোহিত হইয়াছিলেন এবং এই জাতীয় কাব্যের রসিক চূড়ামণি ভারতচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিভিলিয়ান ছাত্রদিগকে বিদ্যাসুন্দর পড়াইতেন, এবং সেই সময় ভারতচন্দ্রের কোন প্রামাণিক গ্রন্থ না থাকাতে তিনি উদ্যোগী হইয়া কৃষ্ণনগর রাজবাটীর পুঁথি অবলম্বনে 'অন্নদামঙ্গল' মুদ্রিত করিয়াছিলেন ('কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূল পুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত'—১৮৪৭)। অবশ্য তিনি তরুণ বয়স্ক সিভিলিয়ানদিগকে বিদ্যাসুন্দরের স্থানবিশেষ পড়াইতে সঙ্কুচিত হইলেও ভারত-চন্দ্রের প্রতি তাঁহার কেমন একটা আকর্ষণ ছিল। এ বিষয়ে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সাক্ষ্য গৃহীত হইতে পারে:

"আমি তাঁহাকে (বিদ্যাসাগর) কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের কবিতা গদ্‌গদ-ভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে, একদিন তিনি 'হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে এবং বলিতে লাগিলেন, দেখ দেখি, পরিষ্কার কেমন ঝরঝরে ভাষা।"[৯]

অবশ্য বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের ক্ল্যাসিক বাক্‌রীতির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং 'বিদ্যাসুন্দরে'র অশ্লীলতা সর্বপ্রযত্নে ঘৃণা করিতেন। কিন্তু তবু ভারতচন্দ্রের প্রতি তাঁহার আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। মদনমোহন তরুণ বয়সে বিদ্যাসুন্দরের দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া 'বাসবদত্তা' রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি পরবর্তী কালে এই রচনাগুলিকে লোকলোচনের বাহিরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে তাঁহার উত্তর জীবনের পরিচয় লইতে হইবে।

॥ ২ ॥

মদনমোহন ও নবযুগের বাণী

ঈশ্বর গুপ্ত নবযুগেব বাণী শুনিয়াছিলেন আপনার অজ্ঞাতসারে, এবং কোন কোন বিষয়ে পুবাতনপন্থী হইয়াও তিনি প্রধানতঃ ১৯শ শতাব্দীর সন্তান—তাহা তাঁহার কবিতা এবং গদ্য রচনাদি পাঠ করিলেই জানা যাইবে। মদনমোহন কিন্তু সজ্ঞানে ১৯শ শতাব্দীর নবজাগবণেব বাণী উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগবের সাহচর্য এবং ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফলেই তিনি অল্পকালের মধ্যেই আদিবসের পঙ্ককুণ্ড ত্যাগ করিয়া জাতির উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্যাব সংস্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই প্রথম যৌবনের যে চিত্ত-চাঞ্চল্য 'রসতরঙ্গিণী' ও 'বাসবদত্তা'য় অনাবৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তিনি জীবিতকালে তাহা নিজে ভুলিতে এবং পাঠককে ভুলাইতে চাহিয়াছিলেন। 'বাসবদত্তা'কে যে তিনি পুনর্মুদ্রিত কবিতে দেন নাই, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সেই যে বাণী—মানবকল্যাণবাদ, য়ুরোপীয় মানবতন্ত্রী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া ভৌমজীবনকে মহামহিমায় প্রতিষ্ঠা,—মদনমোহন জজ-পণ্ডিতের পদ অধিকার করিবার পূর্বেই তাহার স্বাদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তর জীবনের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে তাঁহার মনোধর্মকে এইভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারি :

(ক) স্ত্রীশিক্ষায় আত্মনিয়োগ।

(খ) জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ।

(গ) শিশুশিক্ষার নিমিত্ত গ্রন্থ প্রকাশ।

(ঘ) প্রগতিমূলক সংবাদপত্রের সহিত সংযোগ।

নদীয়ার বিল্বগ্রাম নিবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্র মদনমোহনের বিপ্লবী কার্যক্রমের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়া রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছিলেন, "তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের যোগ্য।" বাস্তবিক মদনমোহন যেভাবে বীঠন সাহেবকে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছিলেন এবং নব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁহার দুই কন্যা কুন্দমালা ও ভুবনমালাকে

পাঠাইয়া দিয়া বিপ্লবী মনের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সে যুগে বিশেষ সুলভ ছিল না। এই বালিকাবিদ্যালয়ে প্রথম প্রথম দেবেন্দ্রনাথ, রাধাকান্ত দেববাহাদুব প্রভৃতি মান্যগণ্য ব্যক্তিরাও কন্যাদের পাঠাইতে সাহস করেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিতবংশের সন্তান মদনমোহন আপনার কন্যাদ্বয়কে সর্বাগ্রে ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেন। নারীশিক্ষা বিস্তারে বীঠন সাহেবকে সাহায্য করিয়াছিলেন তিন জন—'নব্য-বঙ্গীয়'দের নেতৃস্থানীয় রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং প্রাচীন বঙ্গের মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ডিরোজিওর প্রভাবে বর্ধিত রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন যে, যে-কোন প্রগতিশীল আন্দোলনের সহিত যোগ দিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কিন্তু মদনমোহন প্রাচীন সংস্কৃত-আদর্শে লালিত হইয়া যে মানসিক বলেব পবিচয় দিয়াছিলেন, তাহাব একমাত্র তুলনাস্থল তাঁহাব সতীর্থ ও আবাল্যসুহৃৎ বিদ্যাসাগর। মদনমোহন শুধু দুই কন্যাকেই বেথুন বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেন নাই, নিজে বিনা বেতনে এই বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে অধ্যাপনা করিতেন এবং বালক, বিশেষতঃ বালিকাদের জন্য 'শিশুশিক্ষা' তিনখণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন। বীঠন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীকে এক পত্রে তাহা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন:

"Pandit Madan Mohan Turkalunker, one of the Pundits of Sanskrit College, who not only sent two daughters to the school, but has continued to attend it daily, to give gratuitous instruction to the children in Bengali, and has employed his leisure time in the compilation of a series of elementary Bengali Books expressly for their use."[১২]

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া জনসাধারণের মনে নারীশিক্ষার প্রতি উৎসাহ সঞ্চার করিবার জন্য মদনমোহন 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় (১৭৭২ শক, আশ্বিন) "স্ত্রীশিক্ষা" নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী সম্প্রদায়ের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করেন। ইহাতে তিনি কোঁৎ ও মিলের মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন লিখিলেন, "বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিক স্থাপন করেন নাই"—তখন তাঁহার এই উক্তির মধ্যে নবযুগের শ্রেণীহীন সাম্যবাদের ধ্বনিই যেন অস্পষ্টাকারে শ্রুত হইল। তিনি উক্ত প্রবন্ধে ঐতিহাসিক নজির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, প্রাক্-মুসলমানযুগে ভারতে স্ত্রীশিক্ষার অপ্রতুলতা ছিল না। স্ত্রীশিক্ষার ফলে নারীগণ—

"অন্তঃপুরে বসিয়া নানাবিধ শিল্পকার্য ও কারুকর্ম নির্মাণ করিয়া তদ্দারা অনায়াসে অভিলষিত অর্থেরও অধিগম হইতে পারিবে। পুরুষেরা গৃহে বসিয়া যে সকল লেখাপড়া করেন স্ত্রী জাতির তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য দান করিতে পারিবে। গৃহস্থালী ব্যাপারের আয়ব্যয় বিষয়ক লিখনপঠন নির্বাহার্থে বেতন দিয়া যে সমুদায় লোক নিযুক্ত করিতে হয় গৃহের গৃহিণী ও নন্দিনীরা অনায়াসে তৎসমুদয় সম্পাদন করিতে যে সমর্থা হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?"১১

এখানে লক্ষ্য করা যাইবে যে, তিনি বাস্তব পবিপ্রেক্ষিত ও প্রয়োজনেব বাতায়ন হইতে স্ত্রীশিক্ষাব বিচার কবিয়াছেন। এই প্রবন্ধেই তিনি বাল্যবিবাহেব বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাহেব স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থিত কবিয়া বলিয়াছেন,

"স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা ভাবতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশে প্রচারিত করিবেন, বাল্য পরিণত প্রথা সুদূর পরাহত করিয়া দিবেন। বিধবাগণের দারুণ যন্ত্রণা ও দুঃখ দূর করিয়া দিয়া তাহাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার প্রদান করিবেন এবং সকল দুরবস্থার নিদানভূত যে জাত্যভিমান তাহাকে আর স্থান দিবেন না।"

বালকবালিকাব পাঠ্য-গ্রন্থের অভাব মোচনের জন্য তিনি তিনখণ্ড 'শিশু-শিক্ষা, প্রণয়ন কবেন। বীঠন সাহেব ঈশ্বব গুপ্তকে ঐ মর্মে অনুরোধ করিলে গুপ্তকবি যে 'হিতপ্রভাকব' রচনা কবেন, বীঠন বোধ হয় তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কাবণ উহা হিতোপদেশের আদর্শে বচিত এবং ঈশ্বর গুপ্ত মাঝে মাঝে আদিবসাত্মক প্রসঙ্গকেও নির্বিচাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা'র তিন খণ্ডে (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে, তৃতীয়খণ্ড ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে) শিশুশিক্ষার আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। লেখক প্রথম ভাগেব ভূমিকাতেই শিশুপাঠ্য গ্রন্থরচনাব গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন, "অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশভাষা শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা আশয়ে যে পুস্তক পবম্পরা প্রস্তুত কবিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্রদ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত কবিলাম।" বাস্তবিক এই তিনখানি বাল্য-পাঠ্যগ্রন্থ আজ প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া বাঙলার শিশুসমাজে অধীত হইয়া আসিতেছে। তৃতীয়ভাগে তিনি কিশোর চিত্তের কৌতুকজনক ও শিক্ষাপ্রদ নূতন নূতন আখ্যান সংযুক্ত করিয়া মুখবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণেব উন্মেষোন্মুখ চিত্তে কোন প্রকাব কুসংস্কাব সঞ্চারিত করা আমাদিগেব অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত

হংসীর স্বর্ণডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস নিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গহ্বরে বৃষপাকস্থালী ও কাষ্ঠভার দর্শনে ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়ন, পুরস্কার লোভে বক কর্ত্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া কাকের স্বীয় মধুর স্বরে পরিচয় দান প্রভৃতি অসম্বন্ধ অবাস্তবিক বিষয় সকল প্রস্তাবিত না করিয়া সুসম্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বদ্ধ করা গেল।"

শিশুশিক্ষার তৃতীয় ভাগের এই মুখবন্ধ হইতে মদনমোহনের শিক্ষাবিষয়ক মনোভাব অনুমান করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষবাদী মদনমোহন শিশুশিক্ষায় ঈশপের জীবজন্তুর অবাস্তব গল্প অপেক্ষা প্রত্যক্ষ নীতিজ্ঞান-সম্বলিত কাহিনীকেই শিশুশিক্ষার অধিকতর উপযোগী মনে করিয়াছেন। কি জীবনে, কি আদর্শে, কি শিশুশিক্ষায়—মদনমোহন সর্বত্র প্রত্যক্ষ বাস্তবচৈতন্য হইতে জগদ্-ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়াছেন; এই শিশুশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ কয়খানিতে সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে।

আরও এক বিষয়ে তাঁহার কীর্তি স্মরণীয়ঃ তিনি একদিকে যেমন শিশুশিক্ষার জন্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তেমনি আবার অনেক মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ও বিদ্যাসাগরের মিলিত প্রচেষ্টায় সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি নামক যে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়, তাহা হইতে মদনমোহনের সম্পাদনায় সংস্কৃত দর্শনের কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী, চিন্তামণিদীধিতি, বেদান্তপরিভাষা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্, আত্মতত্ত্ববিবেকঃ এবং বাণভট্টের কাদম্বরী, দণ্ডীর দশকুমার চরিত, কালিদাসের মেঘদূত ও কুমারসম্ভব (১ম—৭ম সর্গ) প্রকাশ করিয়া তিনি সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্য পাঠের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

॥ ৩ ॥

মদনমোহনের চিত্তসঙ্কট

মদনমোহন প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া এবং রক্ষণশীল গ্রামে বর্ধিত হইয়া আধুনিক ভাবধারাকে যে-ভাবে সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি যে শুধু স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা

নহে ; কার্য ব্যপদেশে যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মদনমোহনের জীবনচরিতে এইরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নামোল্লেখ করিয়াছেন।[১৪] মুর্শিদাবাদে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে তিনি বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, ঐ একই উদ্দেশ্যে অতিথিশালা স্থাপিত হয়। কান্দীতে যে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার মূলে ছিল তাঁহার অকৃপণ উৎসাহ ও সাহায্য। বহির্জীবনে তিনি কিয়দংশে বিদ্যাসাগরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিধবা-বিবাহ প্রচারেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিধবা-বিবাহের জন্য তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়া এই বিপ্লবাত্মক শুভকর্ম সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছিলেন।[১৫] 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় তিনি "স্ত্রীশিক্ষা" শীর্ষক যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়াছিলেন। স্কুলে কন্যাদিগকে প্রেরণ, এবং বিধবা-বিবাহ সমর্থনের জন্য তাঁহাকে আট-নয় বৎসর স্বগ্রামে 'একঘরে' হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। ইহা তো গেল তাঁহার কীর্তিবহুল জীবনের কথা। কিন্তু তাঁহার অন্তর্জীবন, ধর্মবিশ্বাস—এক কথায় চিত্তলোকের গহন বার্তা লইলে চমৎকৃত হইতে হইবে।

মদনমোহনের ধর্মমত লইয়াই যত কিছু সমস্যার উদয় হইয়াছে। প্রথম যৌবনে তিনি সম্ভবত শাক্ত মতাবলম্বী ছিলেন। কারণ তাঁহার 'বাসবদত্তা'য় তিনি যে সমস্ত ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ স্থলেই কালিকার উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

(ক) রস-রত্নাকর দ্বিজ মদনে রচিল।
কালীর প্রভাবে ভাব প্রকাশ পাইল।

(খ) কাব্যরস-রত্নাকরে করিয়া মজ্জন।
কালীর আভাসে ভাষে মদনমোহন॥

(গ) মদনমোহন করিয়ে যতন
কালীর সম্প্রীতি তরে।
আসার আশার করিতে সুসার
ভাষায় রচনা করে॥

(ঘ) কালীর আদেশে মদন ভাষে।
সুরসিক জন শুনিয়া হাসে॥

প্রথম যৌবনে তিনি দেশাচার ও কুলাচার অবলম্বনে বিশ্বাসের বাঁধাপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি যে ব্রত উপবাসাদিকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন না, তাহার প্রমাণ 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'য় "স্ত্রীশিক্ষা" প্রবন্ধেই রহিয়াছে। তিনি প্রকাশ্যেই ব্রত ইত্যাদি পূজা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া, স্ত্রী অশিক্ষিত হইলে কি কি কুফল জন্মে, সে বিষয়ে লিখিয়াছিলেন—

"গৃহের স্ত্রীবর্গেরা অনেকেই এমত অবোধ যে, গৃহস্থের দুঃসময়, দুরবস্থা ও অসঙ্গতি প্রতি একবারও নেত্রপাত করে না, কখন পুরোহিতের প্রতারণায়, কখন-বা প্রতিবেশিনীগণের কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া অশেষ ব্যয়ায়াসাধ্য বৃথা ব্রতাদ্যনুষ্ঠানে সঙ্কল্পারূঢ় হয় এবং তজ্জন্য গৃহস্বামীকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করে।"

এই প্রবন্ধের আব একস্থলে তিনি কল্পনা-নয়নে দেখিতেছেন যে, "আমাদেব নারীগণ শিক্ষিত হইয়া সাবিত্রী পঞ্চমী, অনন্ত পিপীতকী প্রভৃতি ব্রতোপাস-নানুষ্ঠানে পরাঙ্‌মুখ ও তত্তন্নাম কীর্তনেও বিলজ্জিতা হইয়া ইতিহাস পুবাণাদি পুস্তকে পারায়ণব্রতে দীক্ষিতা হইতেছে।" এই উদ্ধৃতি হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রতানুষ্ঠানাদির প্রতি তাঁহাব কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু তাঁহার ধর্মমত বিদ্যাসাগরের মত অনুমান করা দুরূহ কি? এ বিষয়ে তাঁহার জামাতা যোগেন্দ্র-নাথ বিদ্যাভূষণ যে তথ্যবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। "তিনি অধুনা-প্রচলিত হিন্দু ধর্মেব প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন না বলিয়া তাঁহারা (অর্থাৎ গ্রামবাসীরা) গ্রামের হিতকবী তাঁহাব সকল চেষ্টাই বিফল করিতেন।"[১৬] এমন কি মদনমোহন বিল্বগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চাহিলে, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের এরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তর্কালঙ্কার বিদ্যালয় তৎস্থাপন করিয়া গ্রামের বালকদিগকে খ্রীষ্টান করিবেন।"[১৭] তর্কালঙ্কারের ধর্মমতের জন্য তাঁহার গ্রামবাসিগণ তাঁহার উপব বিরক্ত হইয়াছিলেন। তবে, তিনি কি ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের অনুরূপ একেশ্বরবাদী ছিলেন? যোগেন্দ্রনাথের মতে "মদনমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন। ধর্মবিষয়ে তর্কালঙ্কারের কিরূপ বিশ্বাস ছিল তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না; তবে কন্যাগণকে একেশ্বরবাদিনী করিবার নিমিত্ত তিনি যেরূপ চেষ্টা পাইতেন তাহাতে এরূপ অনুমান হয় যে, অন্ততঃ কার্যতঃ তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তর্কস্থলে তিনি বর্তমান অনিশ্চিতবাদীদিগের (Sceptics) ন্যায় মত প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত

বিশ্বাস অনির্ণীত থাকিলেও মনুষ্যজাতির হিতসাধন যে তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলা যাইতে পারে।"[১৮] যোগেন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মদনমোহনের মনে আত্মার সঙ্কট ঘনাইয়াছিল। তিনি তাঁহার কন্যাদিগকে একেশ্বরবাদে দীক্ষা দিতেছেন, আবার নিজে তর্কস্থলে অনিশ্চিতবাদীর মত ঈশ্বর-অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করিতেছেন। কন্যাদিগকে একেশ্বরবাদে দীক্ষা দিলেও তিনি ব্রাহ্মসমাজ বা 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'র সহিত যুক্ত ছিলেন না। বিদ্যাসাগরও বোধ হয় ঈশ্বর তত্ত্বে সংশয়বাদী ছিলেন।* কিন্তু তবুও তিনি 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'র সহিত সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। আমাদের অনুমান, মদনমোহন নিজে অন্তত মনে মনে কোঁতের পজিটিভিজ্‌ম মতে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু কন্যাদিগকে নানা কারণে (সম্ভবত বৈবাহিক কারণে) নাস্তিক্যবাদ বা সংশয়বাদে দীক্ষা দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বরং কোঁতের লোকশ্রেয় হিতবাদের ঠিক পরেই যদি কোন তত্ত্বকে স্থান দিতে হয়, তাহা হইলে একেশ্বরবাদেই আশ্রয় লইতে হইবে। তাই তিনি কন্যাদিগকে একেশ্বরবাদিনী হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত্‌কে ঠিক সংশয়বাদী না বলিয়া বরং কোঁৎ ও মিলের অনুগামী বলা যাইতে পারে। কার। তিনি যে মানব-হিতব্রতী ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের মধ্যে উত্তমরূপে বিবৃত হইয়াছে। "মনুষ্যজাতির হিতসাধন যে তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল,—এ সম্বন্ধে আমাদের কোন দ্বিধা সংশয় নাই।" সুতরাং তাঁহার মনোভাবকে কোঁতের পজিটিভিজ্‌ম্ ও মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজিম্—এই দুয়ের সংমিশ্রণে জাত লোকহিতবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে বিপুল কর্মপ্রেরণা ও মানবপ্রেম ছিল, মদনমোহনও সেই ভাবনায় বর্ধিত হইয়াছিলেন; আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, তাঁহার অগ্রজ রামকমল ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কোঁৎ-পন্থী দার্শনিকগণ কোঁতের ধ্রুববাদ শুধু দার্শনিক চিন্তায় সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন; মানবপ্রেম তাঁহাদিগকে মাটির বুকে টানিয়া আনিতে পারে নাই। কিন্তু মদনমোহনের দার্শনিক মত সম্বন্ধে সংশয় থাকিলেও, তিনি যে মানব-প্রেমিক ও সংস্কারমুক্ত বিপ্লবী প্রতিভাধর ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালীর মনে যে নব জীবনচেতনা জাগিয়াছিল, মদনমোহন তাহার সংঘাতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রধানত বিপুল কর্মশক্তি ও

* পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

অটুট পৌরুষের অভাবে তাঁহার শক্তি সব সময়ে আত্মপ্রকাশের পথ পাইত না। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের চরিত্রের তুলনা করিয়া কৃষ্ণকমল যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণযোগ্য :

"বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগর দুই জনেই বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র-অংশে আসমান্-জমিন প্রভেদ। যাহাকে back bone কহে, বিদ্যাসাগরের তাহা পূর্ণ মাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয়তো vertebrate শ্রেণীর অন্তর্গত হবেন কিনা সন্দেহ।"[১৯]

প্রবল পৌরুষের কিঞ্চিৎ অভাব ছিল বলিয়াই মদনমোহনের চিত্ততলশায়ী বীজগুলি ১৯শ শতকের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইতে সুযোগ পাইল না। তবু তাঁহাকে ১৯শ শতাব্দীর বাঙলা দেশের নব নব উপলব্ধি আঘাত করিয়া মনোলোকে একটা নূতন অশান্তি, আকাঙ্ক্ষা ও আত্মার দ্বন্দ্ব জাগাইয়া তুলিয়াছিল,—তাঁহার জীবনকথা হইতে অন্তত এই বৈশিষ্ট্যটুকু স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে য়ুরোপীয় জীবনধারার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালীর সমগ্র চেতনার রূপান্তর শুরু হইয়া যায়, জীবনের মূল্যমান পর্যন্ত পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে। সেই উন্মত্ত তরঙ্গ শুধু ডিরোজিও-শিষ্য বা ব্রাহ্মসমাজকেই চঞ্চল করিয়া তুলে নাই, ঝড়ের ঝাপটে খাঁচার পাখিরাও যে পাখার মধ্যে নীল আকাশের আহ্বান উপলব্ধি করিয়াছিল, তাহা ঈশ্বর গুপ্ত ও মদনমোহনের জীবনধারা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু যাঁহারা ১৯শ শতাব্দীর বহ্নিকুণ্ড হইতে অগ্নি চয়ন করিয়া বাঙালীর বক্ষপঞ্জরে দীপশলাকা জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, সেই অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনার পশ্চাদ্‌পট আলোচনা করিলেই ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাঙালী-জীবনের পারস্পরিক স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে।

১। George H. Sabines—*A History of Political Thought.* Reprint, (1952,) p. 549.

২। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'রসতরঙ্গিণী'র ১৯২২ সংবতে প্রকাশিত ৩য় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত।

৩। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদগ্রন্থ সমালোচনা, সংবত-১৯২৮, পৃ ৪

৪। ঐ, পৃ ৪৪

৫। রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, তৃতীয় সং, পৃ ২১৬

৬। পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ ১৩৬

৭। ঐ, পৃ ৫৩

৮। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত কবিবর মদনমোহনের জীবনী ইত্যাদি

৯। পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ ১৩৫

১০। রাজনারায়ণের আত্মচরিত', তৃতীয় সং, পৃ ৩৯

১১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'র অন্তর্গত ১ সংখ্যক পুস্তিকা, পৃ ২৯

১২। "স্ত্রীশিক্ষা" নামক প্রবন্ধ 'সর্বশুভকরী' পত্রিকা হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত পুস্তিকায় পুনর্মুদ্রিত।

১৩। ঐ

১৪। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ২০-২২

১৫। ঐ, পৃ ১২

১৬। ঐ, পৃ ৩৯

১৭। ঐ, পৃ ৯-১০

১৮। ঐ, পৃ ৪৪

১৯। পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ ১৩৬

দ্বাদশ অধ্যায়

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণা

"নূতন উষার স্বর্ণদ্বার, খুলিতে বিলম্ব কত আব ?" অক্ষয়কুমারের আবির্ভাবে ভবিতব্যেব কণ্ঠ হইতে এই প্রশ্ন বর্ষিত হইল। বাঙলা দেশে এবং বাঙালীব অন্তর্লোকে অক্ষয়কুমাবেব সুগভীর প্রভাব এবং তাঁহার চিন্তা ও মননেব বিচিত্র ঐশ্বর্য সম্বন্ধে এখনও সম্যক অনুসন্ধান হয় নাই। তাঁহাব মধ্যে যে নিঃস্পৃহ বুদ্ধিবাদ এবং বৈজ্ঞানিক চেতনাব উদ্বোধন লক্ষ্য কবা যায়, তাহা বাঙালীকে বিস্মিত করিয়াছে, কিন্তু অনুপ্রাণিত কবে নাই। তাঁহাব সমসাময়িক বিদ্যাসাগর আসিয়া বাঙালীর আবেগ ও সংস্কাবকে এমন প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেন যে, অক্ষয়কুমাবের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের নৈর্ব্যক্তিক চেতনা তৎকালীন সাধারণ বাঙালীকে গভীরভাবে আকৃষ্ট কবিতে পাবে নাই। যে জন্য বামমোহনও আংশিকভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেই একই কাবণে অক্ষয়কুমাবেব জীবন, সাধনা ও মনোধর্ম বাঙালীর চিত্তের ভাণ্ডারে সোনাব ফসল ফলাইতে পারে নাই। নব্য-ন্যায়ের ঐতিহ্যে পরিবর্ধিত বাঙালী বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের পূজাবী নহে, ইহাই পরম বিস্ময়। বুদ্ধির সহিত হৃদয়ের সমানুপাতিক মিলন না হইলে বাঙালী তাহাকে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়। রামমোহন কুশাগ্রতীক্ষ্ণ বুদ্ধির আঘাতে বাঙালীর বহু-শতাব্দী-সঞ্চিত জড়তা-গ্রন্থিকে ছিন্নভিন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণ বাঙালী এই সমাজ-বিপ্লবীকে দূর হইতে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে, অপ্রমত্ত বুদ্ধির শুভ্র নিরঞ্জন সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছে, কিন্তু অন্তর্লোকে তাঁহার বাণী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। রামমোহন যে শুধু সংস্কারে আঘাত করিয়াছিলেন বলিয়াই বাঙালী তাঁহাকে হৃদ্‌পদ্মে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, তাহা নহে। বিদ্যাসাগরও বাঙালীর আজন্মলালিত সংস্কারে বজ্রাঘাত করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহাকে রামমোহনেরও অধিক সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তবু লোকাচারের পরম শত্রু বিদ্যাসাগরকে বাঙালী অন্তরে স্থাপন করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, বিদ্যাসাগরের আবেদন হৃদয়ের নিকট,—বুদ্ধি, শাস্ত্র-সংহিতা—ইহা গৌণ। রামমোহনেব আবেদন মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক বুদ্ধির নিকট। আমরা বুদ্ধি দিয়া যাহা বুঝি, হৃদয় দিয়া তাহা সব সময়ে গ্রহণ

করি না; সংস্কার প্রায়শঃই হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। কাজেই হৃদয়ের তুষারতীর্থে আবেগের সূর্যকিরণ সম্পাত করিতে পারিলে অনেক সময় কিছু না বুঝিয়াও অনুপ্রাণিত হইতে পারা যায়। বিদ্যাসাগর বুদ্ধিবাদী হইলেও শাস্ত্র-সংহিতার সহিত আবেগকেও প্রধান অস্ত্র রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার সমাজসংস্কার সাধারণ বাঙালীর নিকট প্রতিকূল বিবেচিত হইলেও, সমগ্রভাবে তিনি বাঙালীর অন্তর্লোকে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। রামমোহনের ভাবশিষ্য জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমারও গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহুকালের জড়তাগ্রস্ত বাঙালীর চিত্তে উজ্জ্বল সূর্যকরের মত তীব্র বুদ্ধিবাদ জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আত্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব, বুদ্ধির কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা আবিষ্কার এবং সেই বুদ্ধি ও বুদ্ধিলব্ধ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎ ও জীবনকে বিচার করা—বুদ্ধিবাদের প্রধানতঃ এই তিনটি লক্ষ্য। অক্ষয়কুমার বাঙালীকে এই নব্য বুদ্ধিতন্ত্রে দীক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার যে যুক্তিবাদের আনুগত্য স্বীকার করিলেন, তাহা কিয়দংশে রামমোহন-প্রভাবান্বিত। রামমোহনের যুক্তিবাদ তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই হীনপ্রভ হইয়া যায় নাই, অক্ষয়কুমারের আবির্ভাবের দ্বারা তাহা সুপ্রমাণিত হইল। রামমোহনকে অক্ষয়কুমার অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। (দ্রষ্টব্য—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৬ শক, ১লা বৈশাখ)

অবশ্য রামমোহনের শাস্ত্রনিষ্ঠাকে স্বীকার না করিলেও তাঁহার যুক্তিপন্থাকে অক্ষয়কুমার অন্তরের পীঠস্থানে ধ্রুব আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনা ভার গ্রহণ করিয়া রামমোহনের যুক্তিবাদকে চিন্তা ও কর্মের একমাত্র নিয়ামক শক্তিরূপে স্থাপন করিলেন এবং তদনুসারে জীবনের প্রতিটি প্রতীতিকে বিচার করিতে লাগিলেন। রামমোহনের যুক্তিবাদ অক্ষয়কুমারের মধ্যে ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া জন্মান্তর গ্রহণ করিল। তিনি রামমোহনের উপনিষদ-বেদান্ত-তন্ত্রের প্রতি কোনদিন আকর্ষণ বোধ করেন নাই; রামমোহন যুক্তির সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকে সাময়িক গ্লানি হইতে উদ্ধার করিয়া প্রাচীন মহিমায় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহার প্রতি অক্ষয়কুমারের বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। তাহা হইলেও যুক্তিবাদের মূল সূত্রটি, অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়, তিনি রামমোহনের নিকট লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই তিনি রামমোহনকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন।

॥ ১ ॥

অক্ষয়কুমারের বাল্য-যৌবন

যিনি বাংলার নৈয়ায়িক প্রতিভা, এবং ১৯শ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদী দার্শনিক মনীষী জেম্‌স্‌ মিল, জেরিমি বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল, স্কটল্যাণ্ডের জর্জ কুম্ব এবং ফরাসী দেশের অগুয়েস্ত্‌ কোঁতের বুদ্ধিজীবী বিশ্ব-বীক্ষাকে বুদ্ধির রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মিলাইয়া দিয়া বাঙালীকে ১৯শ শতাব্দীর উন্মুক্ত রাজপথে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহার বাল্যের প্রতি আমাদের স্বতঃই কৌতূহল সঞ্চারিত হয়। প্রসিদ্ধ নরকরোটী-বিশারদ (ফ্রেনলজিষ্ট) কালীকুমার দাস যুবক অক্ষয়-কুমারের মস্তক বিচার করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, "I see a crown of intellect over his forhead."[১] যৌবনে তাঁহার বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা উক্ত নর-করোটী-বিশারদ লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ এবং জগৎ রহস্যের প্রতি কৌতূহল সাধারণতঃ মানুষের চিত্তকে দুইদিক হইতে আকর্ষণ করে। নিতান্ত বাল্যবয়সে গ্রাম্য পাঠশালার গুরুর নিকট রিঘাকালি অঙ্ক কষিতে কষিতে অক্ষয়কুমারের চিত্তে যে প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল, তাহা যেমন অভিনব, তেমনই বিস্ময়কর।

"বাল্যকালে কলাপাতায় রিঘাকালি কষিতে কষিতে তাঁহার মনে হইল, আচ্ছা, পৃথিবীটার কালি কত? ওটা কত বড়? উহার শেষসীমাই বা কোথায়?"[২]

এই যে জিজ্ঞাসা, বিশ্বসীমা সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল, বাল্যে যাহার সূচনা,— সমগ্র জীবন ধরিয়া সেই জিজ্ঞাসা, সেই জীবনরহস্য সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধিৎসা অক্ষয়কুমারকে সুস্থ এবং স্বস্থ থাকিতে দেয় নাই। সারা জীবন ধরিয়া এই জ্ঞানদৈত্য সিন্ধুবাদ নাবিকের মত তাঁহাকে তাড়া করিয়া ফিরিয়াছে। মধ্য বয়সে যখন তিনি দারুণ শিরঃপীড়া রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন, তখনও এই নির্মম বুদ্ধিবাদ তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। বালী গ্রামে নির্জন উদ্যান-ভবনে কলিকাতার জনসমাজ হইতে দূরে বাস করিয়া, শয্যাশায়ী হইয়াও তাঁহার জ্ঞানচর্চার নিবৃত্তি হয় নাই; এই অসুস্থতার সময় তিনি তাঁহার প্রধান প্রধান গ্রন্থ, বিশেষতঃ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' সম্পাদনা করেন। শিশুকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে পাঠশালায় যাইতে দেখিয়া তিনি আবদার ধরিয়াছিলেন, "আমি লিখবো, আমি লিখবো।[৩]" সমগ্র জীবন ধরিয়াই তিনি শুধু পড়িয়াছেন ও লিখিয়াছেন। গ্রামে

বাল্যবয়সে তিনি আমীনুদ্দিন নামক এক মৌলবীর নিকট ফারসী অধ্যয়ন করেন এবং গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের টোলেও কিছুকাল সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন; তখন তাঁহার বয়স মাত্র নয় বৎসর। তিনি পরেও যে ফারসী চর্চা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ, তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে তিনি বহু স্থলে মূল ফারসী হইতে উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। রামগতি ন্যায়রত্নের মতে, "অক্ষয়কুমার বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের নিকট সামান্যরূপ বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়া কিঞ্চিৎ পারসী অধ্যয়ন করেন।"[৪] কিন্তু উত্তরকালে তাঁহার ফারসী বিদ্যা নিতান্ত 'কিঞ্চিৎ' ছিল না, তাহা তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানসম্বন্ধেও ন্যায়রত্ন মহাশয় অনুদার মত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "অক্ষয়বাবুর সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষরূপে অধিকার ছিল না।"[৫] কিন্তু ভারতীয় দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিলে বোধগম্য হইবে।

অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগর অপেক্ষা বয়সে মাত্র দুই মাসের বড় ছিলেন। ১৮২০ খ্রীঃ অব্দে ১৫ই জুলাই অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়; বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ করেন ঐ ১৮২০ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। অক্ষয়কুমার যে বয়সে কলিকাতায় আগমন করেন, বিদ্যাসাসাগরও ঠিক সেই বয়সেই (৯ বৎসর) সংস্কৃত কলেজে প্রেরিত হন বাল্যবয়সে অক্ষয়কুমার খিদিরপুরের দুইজন শিক্ষকের নিকট (জয় মাষ্টার ও গঙ্গানারায়ণ মাষ্টার) ইংরাজী শিক্ষা করেন। কিন্তু শিক্ষকদ্বয়ের স্বল্প বিদ্যা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে পারিল না, তিনি খিদিরপুরের এক খ্রীস্টান মিশনারীর নিকট ইংরাজী অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার বয়স বার-তের বৎসরের অধিক হইবে না। সেই বয়সেই তিনি খ্রীস্টানধর্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এমন কি, তাঁহার মতিগতি দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পর্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন। নয় বৎসরে যাঁহার ইংরাজী বিদ্যার সূচনা, বার-তের বৎসরে তাঁহার মনে খ্রীস্টানধর্মের প্রতি অনুরক্তি সঞ্চার হইল। জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রতিভা সম্বন্ধে অনেক উক্তি চলিয়া আসিতেছে। জন স্টুয়ার্ট মিল পিতা জেম্‌স্ মিলের কঠোর তত্ত্বাবধানে তিন বৎসর বয়সে গ্রীক ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন, স্বয়ং বেন্থামও তিন বৎসর বয়সে ল্যাটিন ও ইতিহাস পাঠ আরম্ভ করেন। মিল্ আট বৎসর বয়সে হেরোডেটাস্, আইসোক্রেটিস ও প্লেটোর গ্রন্থাবলী শেষ করিয়া ল্যাটিন ভাষা

শিখিতে আরম্ভ করেন।[৬] বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের বাল্যপ্রতিভা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরাও অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে তাহারই পুনরাবৃত্তি করি : "তবে যখন স্টুয়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা সাহিত্য জগতে চলিয়া গিয়াছে তখন এ কথাটা চলুক।" অক্ষয়কুমার যে বয়সে প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি সন্দিহান হইয়া খ্রীস্টানধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই বয়স যে-কোন গভীর চিন্তা ও কার্যকারণতত্ত্বের পরিপন্থী; সুতরাং অক্ষয়কুমারের বাল্যবয়সে খ্রীস্টান ধর্ম-প্রীতি গভীর কোন তত্ত্ববাহী নহে। তথাপি এইটুকু অন্ততঃ বুঝা যাইতেছে যে, অক্ষয়কুমার নিতান্ত বাল্যবয়সে কিরূপ মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার একটু বেশি বয়সে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ষোল বৎসর। এই সময়েই তিনি জ্ঞানমন্দিরের চাবি খুঁজিয়া পাইলেন। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে তিনি য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান লুণ্ঠ করিয়া হইলেন। অবশ্য দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার খ্রীস্টানধর্মের প্রতি কৌতূহল সঞ্চারিত হইয়াছিল, আর ষোড়শ বর্ষ বয়সে পোপকৃত ইলিয়াডের অনুবাদ পাঠ করিতে করিতে তাঁহার ধারণা হইল, হিন্দুধর্ম অভ্রান্ত নহে।[৭] ইলিয়াড কাব্য পাঠ করিতে করিতে কেন যে তাঁহার মনে এই রূপ অদ্ভুত ধারণা হইল, তাহার কারণ রহস্যাবৃত। ইলিয়াডে দেব-দেবীর যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হিন্দু দেবদেবী অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে; গ্রীকজাতির পেগান ধর্মও হিন্দুধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। অথচ দেখিতে পাইতেছি, সে যুগের 'ইয়ং বেঙ্গল'গণ গায়ত্রী আবৃত্তির স্থলে কয়েক ছত্র ইলিয়াড আবৃত্তি করিয়া বসিতেন। আমাদের অনুমান, এই বয়সে অক্ষয়কুমার হিন্দু শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কারণ কলিকাতায় আসিয়া নয় হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত তিনি শুধু ইংরাজী শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রাদি শিক্ষার কোন সংবাদ তাঁহার প্রথম যৌবনে পাওয়া যাইতেছে না। ষোল বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে প্রবেশ করেন, এবং ইহার আড়াই বৎসর পরে পিতার মৃত্যু হইলে অর্ধপথেই বিদ্যাভ্যাস ত্যাগ করিয়া বিষয়কর্মের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। এক সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যুসংবাদে ভ্রাতৃগণ অতিশয় শোকার্ত হইয়া পড়িলে এই তরুণ যুবক নিঃস্পৃহ ও অনুদ্বিগ্ন মনে সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন, "কাপড় পুরাণ হইলে আমরা যেমন তাহা পরিত্যাগ করি—পিতারও তেমনি সময় হইয়াছে, তিনিও পুরাতন শরীর ছাড়িয়া গিয়াছেন—সে জন্য আর দুঃখ

কেন ?" উনিশ বৎসরের যুবকের মুখে গীতোক্ত নিষ্কামধর্মের ব্যাখ্যান শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বীতরাগ বীতস্পৃহ অক্ষয়কুমাব বাল্য হইতেই সজীব কৌতূহলের পরিচয় দিয়াছিলেন; তিনিই আবার গীতার নিষ্কামদর্শন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাব জীবনের ষোল বৎসর হইতে বিশ বৎসর—মোট চাবি বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যাহাকে জীবনের গঠনকাল বলে তাহা এই কয়বৎসবেব মধ্যেই এক প্রকার নির্মিত হইয়া গিয়াছিল। গৌবমোহন আঢ্যেব স্কুলে পডিবার সময় একদিকে ইলিয়াড পাঠে তাঁহার হিন্দুধর্মেব প্রতি আস্থা হ্রাস পাইল, আবার অন্যদিকে তিনি য়ুরোপে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক নানা গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া মানবজীবনের মর্মমূলে যে সহজাত যৌক্তিকতা বর্তমান রহিয়াছে, সে বিষয়ে অবহিত হইলেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহ তাঁহার প্রথম জীবনেব সঙ্গী হইয়াছিল:—

জয়েস প্রণীত 'Scientific Dialogue' ইউক্লিড প্রণীত Geometry (Books--1-4), জ্যোতিষ ও উচ্চতব গণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি (ট্রিগনমেট্রি), শঙ্কু গণিত (কনিক্স), ক্যালকুলাস্, বলবিজ্ঞান (মেকানিক্স), স্থিববাবি বিজ্ঞান (হাইড্রোস্টাটিক্স), বায়ুবিজ্ঞান (মেটিয়বলজি), জ্যোতির্বিজ্ঞান, নবকরোটী বিজ্ঞান (ফ্রেনলজি)।

এই সময় তিনি ওবিয়েণ্টাল সেমিনারীব অধ্যক্ষ হার্ডম্যান জেফ্রয় (Hardman Jeffroy) সাহেবেব নিকট গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু ও জার্মাণ ভাষা শিক্ষা করেন। স্কুল ত্যাগ কবিযা মাত্র উনশ-কুড়ি বৎসব বয়সেব মধ্যেই তিনি বিজ্ঞান, বিশেষতঃ গণিতেব বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ কবেন। তখন কলিকাতায় (১৮৩৯-৪০ খ্রী:) ডিবোজিও শিষ্যগণ বিরাট সমাজ-আন্দোলন সৃষ্টি কবিয়াছেন, বামমোহন লোকান্তবিত হইয়াছেন, বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিভিলিয়ান ছাত্রদিগকে 'বিদ্যাসুন্দব' পড়াইতেছেন, বামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বসিককৃষ্ণ মল্লিক কলিকাতায় সমাজ ও বাষ্ট্রনীতিঘটিত আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এই সমাজ ও সংস্কৃতিব ঘূর্ণিবাত্যায় জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব। তরুণ বয়সেই তিনি ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যস্থতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকাব সহিত পবিচিত হইলেন। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের উক্তি:-

"এই সময় অর্থাৎ ১৮৩৯ সালের শেষ ভাগে অথবা ১৮৪০ সালের প্রথম ভাগে অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহাকে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দেন।"[৮]

এই পরিচয় যে দেবেন্দ্রনাথকে কত দিক দিয়া সাহায্য করিয়াছিল, তাহা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে। তরুণ অক্ষয়কুমারের বুদ্ধির প্রাখর্যে মুগ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক নিযুক্ত করিতে চাহেন। কিন্তু তৎপূর্বে তাঁহার প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইবার জন্য তিনি আরও কয়েকজন যুবককে লইয়া একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন।

"পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকের রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর; আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজুট মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মত বিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা অবশ্য পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব।"[৯]

১৮৪৩ সালে ১৬ই আগস্ট 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। তখন অক্ষয়কুমারের বয়স মাত্র তেইশ বৎসর। এই বয়সে তাঁহার নিকট "জটাজুটমণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসী" প্রশংসিত হইয়াছিল, ইহা কৌতুককর সন্দেহ নাই। যিনি সর্ববিধ অধ্যাত্ম আপ্তবাক্য ও অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মচেতনার ঊর্ধ্বে উঠিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে মানবজীবনের যৌক্তিক ক্রমবিকাশের অর্থ প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি প্রথম যৌবনে জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে প্রশংসা করিয়াছিলেন, এ সংবাদ যেন স্বতোবিরোধী মনে হয়। অক্ষয়কুমার কোন দিনই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন না,—'চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস' শুধু দেবেন্দ্রনাথেরই নহে, অক্ষয়কুমারেরও মত-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বলিয়াছেন, "অনেকে পরমেশ্বরের বিশেষ প্রসন্নতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় সকল সারভূত সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়েন। কিন্তু তাহাতে যে পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না।"[১০] কিন্তু তরুণ বয়সে

তিনি সন্ন্যাসের প্রশংসা করিলেন কেন? আমাদের অনুমান, বিশ বৎসর বয়সে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন করিতে শুরু করেন; ফলে ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রের সংরক্ষক সন্ন্যাসীর প্রতি তিনি হয়তো কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন। অথবা তত্ত্ববোধিনী সভার কর্ণধার দেবেন্দ্রনাথ হয়তো সন্ন্যাস-জীবনকেই অধিকতর পছন্দ করিবেন, এই মনে করিয়াই তিনি উক্ত প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় সন্ন্যাসধর্মের প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ইহার পর তিনি আর কোথাও সন্ন্যাসধর্মের জয়গান করেন নাই। বরং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে মাঝে মাঝে সন্ন্যাসধর্মের প্রতিকূলতাই সূচিত হইয়াছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় যেমন প্রথম যৌবনের এক পিচ্ছিল মুহূর্তে ডিরোজিওর ভাবাদর্শে উত্তেজিত হইয়া পক্ষকালের জন্য সনাতন হিন্দুধর্মে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ সন্ন্যাসে অনুরক্তি অক্ষয়কুমারের একটা পরধর্ম। তিনি অবশ্য অল্পকালের মধ্যে ঐ সন্ন্যাসধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং প্রধানতঃ যুক্তিকেন্দ্রিক বুদ্ধিবাদের দ্বারা জগৎ ও জীবনের অন্তরালবর্তী একটি অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

॥ ২ ॥

অক্ষয়কুমারের তত্ত্ববাদ ও বাঙালীর চিন্তাবিপ্লব

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করিয়া একদা বাঙালীর চিন্তা-জগতে যে মহাপ্রলয় ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সেই তিমিরান্ধ সংশয়ের মধ্যে অক্ষয়-কুমারের অম্লান জ্ঞানপ্রদীপ জ্বলিতেছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' 'বঙ্গদর্শনের' প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাঙালীর চিন্তায় আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে। সেকালের প্রধান প্রধান বাঙালী লেখক ও চিন্তাবীরগণ—বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সমাজ ও সংস্কৃতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই পত্রিকার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় এই পত্রিকা ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মুখপত্র হইয়াও সমস্ত বাঙালীর মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থই বলিয়াছেন, "তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্বে বঙ্গ সাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা কি ছিল

এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকরী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না।"[১১] স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথও কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একসময় ৭০০ জন গ্রাহক ছিল ; তাহা কেবল একা অক্ষয়বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।"[১২] বাস্তবিক 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় (১২ বৎসর সম্পাদনা করেন, ১৮৪৩—১৮৫৫) প্রকাশিত হইয়া বাঙালীর চিন্তার রাজ্যে যে বিপ্লব সূচিত করিয়াছিল, তাহার তুলনা এই যুগে দুর্লভ। ব্রাহ্ম সমাজের পত্রিকা হইয়াও যে এই পত্র সমস্ত শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাবের বাহন হইয়াছিল, তাহা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই উক্তি হইতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে—"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তখন এখনকার মত একটি মাত্র সভার কাগজ হয় নাই, উহা তখন সমস্ত বাংলার ইউরোপীয় ভাব প্রচারের মিশনারি ছিল, উহা ধর্মসমূহ সম্বন্ধে কত যে, নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন। বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে ইংরাজী ভাব প্রবেশ করান, সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা সাধিত হয়। তিনিই বাঙ্গালীর সর্বপ্রথম নীতিশিক্ষক।"[১৩]

এই একটি পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, উপনিষদ অনুবাদ, ঋগ্‌বেদ অনুবাদ, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের ধর্ম ব্যাখ্যা, বিদ্যাসাগরের মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশের অনুবাদ, স্বয়ং অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মসম্প্রদায়, পুরাতত্ত্ব বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে থাকে। রমেশচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন,

"People all over Bengal awaited every issue of that paper with eagerness, and the silently and sickly but indefatigably worker at his desk swayed for a number of years the thoughts and opinions of the thinking portion of the people of Bengal."

এই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সাহায্যে একদিকে বেদান্ত-উপনিষদ চর্চা, অপরদিকে—

"Discoveries of European science, moral instructions, accounts of different nations and tribes, of the animate and inanimate creation."

এই দুই দিকে সমভাবে সমতা রক্ষার দুরূহ ব্রত অক্ষয়কুমারের আয়ত্তে ছিল। তথাপি সংঘর্ষ সৃষ্টি হইল এবং এই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে কেন্দ্র করিয়াই অক্ষয়কুমার মতানৈক্যের ঘূর্ণিবাত্যাব মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

॥ ৩ ॥

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার

প্রথম যেদিন দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমাবেব সন্ন্যাস-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহাব রচনার দোষগুণ সম্বন্ধে সতর্ক হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই সংঘর্ষের সূচনা হইল। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে :

"আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কর্ম্মসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত যে-সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি, ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক।"[১৪]

সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে প্রধানতঃ ব্রাহ্মমতের মুখপত্ররূপে প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর, তেলেনীপাড়া, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যে সমস্ত ব্রাহ্ম বা বেদান্তবাদী ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন, তাঁহাদিগকে একটা সংস্থার মধ্যে আনিবাব জন্যই এই পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হইল। আর তাহার সহিত ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক ব্যাখ্যা-ব্যাখান ও বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ কবার বাসনাও রহিল। সর্বশেষে জনসাধাবণেব জ্ঞানবৃদ্ধি, ও চরিত্র সংশোধনের কথাও দেবেন্দ্রনাথ চিন্তা কবিয়াছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র এই দুই দিক সংরক্ষণের ভার পড়িল দুই জনেব উপর—ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের গুরুভার রহিল দেবেন্দ্রনাথেব উপর, আর অক্ষয়কুমার জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক নানা তত্ত্বকথা প্রচাবেব ভার লইলেন। অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রচনা তত্ত্ববোধিনীতে দ্বাদশবর্ষের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই প্রবন্ধগুলি তাঁহার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-

প্রকৃতিব সম্বন্ধ বিচাব,' দুইখণ্ড, 'ধর্মনীতি', 'পদার্থবিদ্যা', 'ভূগোল', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'—দুইখণ্ড, 'চারুপাঠ,—তিনখণ্ড প্রভৃতি পুস্তকেব মধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের মধ্যে তত্ত্বদর্শন, চিন্তা-প্রণালী ও মনঃপ্রকৃতিগত মৌলিক পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ শাস্তরসাস্পদ ব্রহ্ম-উপাসক, অক্ষয়কুমাব তত্ত্বজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক ও নিঃস্পৃহ দার্শনিক। অবশ্য ১৮৪৩ সালে ২১এ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীধব ভট্টাচার্য, শ্যামাচবণ ভট্টাচায, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুব, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুব, আনন্দচন্দ্র ভট্টাচায, তারকনাথ ভট্টাচার্য, হবদেব চট্টোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র নন্দী, লালা হাজাবীলাল, শ্যামাচবণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচবণ সেন, চন্দ্রনাথ বায় রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র রায়, লোকনাথ বায় প্রভৃতি একুশ জনেব সহিত অক্ষয়কুমাবও আনুষ্ঠানিকভাবে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ কবেন।[১৫] কিন্তু অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইয়াও ধর্মৈষণা অপেক্ষা বিজ্ঞান ও দর্শনেব জ্ঞানানুসন্ধিৎসার প্রতি অধিকতব আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেই সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রিকাব মাধ্যমে বেদবেদাস্ত প্রচার করিয়া সুখী হইলেন। "বেদবেদাস্ত ও উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সঙ্কল্প ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।"[১৬] কিন্তু অক্ষয়কুমাবের যুক্তিবাদী চিন্তাপ্রণালী যে দেবেন্দ্রনাথের নিকট প্রীতিকব হয় নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অক্ষয়কুমাব ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ সেবকও ছিলেন, এমনকি যেদিন দুবারোগ্য শিরঃ-পীড়ায় আক্রান্ত হন, সেদিনও তিনি ব্রাহ্ম সমাজেব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নানা স্থানে তিনি ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ ছিলেন জ্ঞানপন্থী। এবিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব উক্তি স্মবণীয়, "অক্ষয়বাবু আমাদেব ব্রাহ্মসমাজেব জ্ঞানমার্গেব প্রহবিরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন।" কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ দেবেন্দ্রনাথেব মনঃপূত হয় নাই। ব্রহ্মবোধকে তিনি চেতনাব রসে রাঙাইয়া লইয়া বলিয়া'ছিলেন, "যখন তাঁহাব অন্তবে আমাব আত্মাকে দেখি, তখন বলি, তুমি অন্তরতব অন্তরতম, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার সখা। যখন তাঁহাকে বাহিরে দেখি, তখন বলি, তব রাজসিংহাসন অসীম আকাশে। যখন তাঁহাকে তাঁহাব আপনাতে দেখি, তাঁহার

স্বীয় ধামে সেই পরম সত্যকে দেখি, তখন বলি, তুমি শাস্তং, শিবমদ্বৈতং, তুমি শান্তভাবে আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছে।"[১৭] কাজেই তিনি অক্ষয়-কুমারের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ-জাত ঈশ্বরতত্ত্ব প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। অক্ষয়কুমারের রচনার বহু স্থান কাটিয়া কুটিয়া দিয়া মহর্ষি তাঁহাকে নিজ বেদান্ত-ধর্মের অনুকূল করিতে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু উভয়ের জীবনদর্শনগত স্তরভেদ হইয়া গিয়াছিল; শুধু ভাষা পাল্টাইয়া বা শব্দ কাটিয়া দিলেই অক্ষয়কুমারকে স্বমতানুবর্তী করা যাইবে না, তাহা মহর্ষি বুঝিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে তাঁহার হতাশাব্যঞ্জক উক্তি স্মরণীয়ঃ

"আমি কোথায়, তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন' বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ।"[১৮]

এই মতভেদ মাঝে মাঝে চরমে উঠিত। অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু কখনও নিজ মত পরিত্যাগ করেন নাই এবং যাহা তাঁহার মতানুবর্তী নহে, দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'য় তাহা প্রকাশ করিতে চাহেন নাই। ১৮৪৫ সালে 'জগবন্ধু' নামক পত্রিকায় বেদের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশিত হইলে দেবেন্দ্রনাথ ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য অক্ষয়কুমারকে 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'য় প্রবন্ধ লিখিতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সম্পাদক হিসাবে অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের এই নির্দেশ মানিয়া লইলেন না। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ হইলেও 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'য় নিজ নামে বেদ বা বেদান্তের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ রচনা করেন নাই। তখন দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসু নিজ নিজ নামে ঐ প্রতিবাদ তত্ত্বোধিনীতে মুদ্রিত করেন।[১৯]

শুধু এই একটিমাত্র উদাহরণেই অক্ষয়কুমারের বেদ-বেদান্ত-বিরোধিতা প্রমাণিত হইতেছে না। অক্ষয়কুমার এবং তাঁহার মতানুবর্তী সভ্যগণ দেবেন্দ্র-নাথের বেদান্তবিষয়ক মত প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্রিকায় মুদ্রণ-যোগ্য প্রবন্ধ বিচারের জন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ লোককে লইয়া যে 'গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা' গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে অক্ষয়কুমারে সমর্থকের সংখ্যাই ছিল অধিক।

'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'য় একদিকে যেমন দেবেন্দ্রনাথ ডাফ সাহেব লিখিত *India & Indian Missions* গ্রন্থে বর্ণিত বেদান্তধর্মের নিন্দার প্রত্যুত্তর দিয়া বেদ ও বেদান্তকে অভ্রান্ত প্রমাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ঠিক তেমনি

আবার তাঁহাকে অক্ষয়কুমার এবং আরও অনেক প্রগতিপন্থী ব্রাহ্ম যুবকের বেদান্তবিরোধী মন্তব্যের আঘাত সহ্য করিতে হইল। এমনকি ১৮৪৭ সালের তত্ত্ববোধিনী সভার এক অধিবেশনে স্থির হয় যে, "বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য-ধর্মের পরিবর্তে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামটি ব্যবহৃত হইবে।"[20] অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের বেদান্তমতের বিরোধিতা করিলেও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার অনুগামী ছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে উমেশচন্দ্র সরকার ও তাহার নাবালিকা পত্নীকে ডাফ সাহেব বলপূর্বক খ্রীস্টান করিলে দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। "ইহা শুনিয়া আমার বড রাগ হইল ও বড দুঃখ হইল। অন্তঃপুবেব. স্ত্রীলোক পর্যন্ত খ্রীস্টান করিতে লাগিল। তবে রোস, আমি ইহার প্রতিবিধান কবিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তেব লেখনীকে চালাইলাম এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বাহিব হইল।"[21] এখানে লক্ষণীয় যে, দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমাবেব লেখনীকে ইচ্ছামাত্রই চালাইতে পারিতেন না। যে বিষযে অক্ষয়কুমাবেব মতানুকূল হইত, শুধু সেই টুকুতেই অক্ষয়কুমাব আত্মনিয়োগ কবিতেন। একটু পবেই বেদান্তধর্ম সম্পর্কে অক্ষয়কুমাবের মতামতের বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' একদা ১৯শ শতকেব মধ্যভাগে বাঙালীব যেমন রুচি তৈয়ারী করিয়াছিল, তেমনি আবার নব্য য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভূগোল ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহলী করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙালীব মনের ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্ববোধকে বুদ্ধিগোচর করিবার গুরুভার লইয়াছিলেন অক্ষয়কুমার, এবং সেই জন্যই সে যুগে ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম—সকলেই তাঁহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। মাত্র ১২শ বর্ষ কাল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন করিয়া তিনি বাঙালীর মনের প্রান্তরে যে রোশনাই জ্বালিয়াছিলেন, তাহার আলোকচ্ছটা ১৯শ শতকের মধ্যভাগে বাঙালী জীবনের বিচিত্র রহস্যকে উদ্ঘাটিত করিতে পারিয়াছিল।

॥ ৪ ॥

অক্ষয়কুমার ও ধর্মচেতনায় নবযুগ

আমরা ঈশ্বর গুপ্ত এবং মদনমোহন প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, ১৯শ শতাব্দীর যে নবজীবন-বাণী শনৈঃ শনৈঃ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা ইহাদের

মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে পদপাত করিয়াছিল। তাহা না হইলে প্রাচীন ভাবধারায় লালিত ঈশ্বর গুপ্ত দেবেন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী হইতে পারিতেন না, ব্রাহ্ম-প্রভাবান্বিত তত্ত্ববোধিনী সভায় নিত্য গতায়াত করিতেও পারিতেন না। মদনমোহন কোন কোন বিষয়ে অতিশয় প্রাচীন পন্থী হইয়াও নারীশিক্ষা প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সর্বোপরি তাঁহার ধর্মমত ছিল বিচিত্র। বোধ হয় একেশ্বরবাদ ও সংশয়বাদ—উভয়ের মধ্যে তিনি দোলায়িত হইয়াছিলেন। এই দুই জনের মধ্যে ১৯শ শতাব্দীর যুগধর্ম অস্পষ্ট আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক এবং ১৯শ শতাব্দীর যুগগুরু বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী সভা ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইলেও একেশ্বরবাদী ছিলেন কিনা সন্দেহ। বোধ করি বেন্থাম, মিল ও কোঁতের নিরীশ্বরপন্থী লোকহিতবাদকেই বিদ্যাসাগর শরণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনই একটা সংশয়াত্মক পটভূমিকায় অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব হইল। রাজা রামমোহনের লোকান্তরের পর তাঁহারা ব্রহ্মসভা অনেকটা হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। ঈশ্বরপ্রেমে মাতাল দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মমতের পুরোধা হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করিলে বেদ ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম বাঙলা দেশে যুগান্তরের সঙ্কেত বহন করিয়া আনিল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের অনুগামী হইলেও হিন্দুর আচার-আচরণকে একেবারে বর্জন করিতে পারেন নাই। তিনি ঘটা করিয়া পৌত্তলিক দুর্গাপূজা করিতেন এবং দেবেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া ঐ উপলক্ষ্যে আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেন।[২২] ক্রমেই কিশোর দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইলেন ; তিনি পিতার আয়োজিত পূজার অংশ গ্রহণ করিতেন না, এবং অন্যান্য ভ্রাতাদের সহযোগিতায় পৌত্তলিকতা-বিরোধী দল বাঁধিয়া পূজার দালানে উপস্থিত হইয়াও প্রতিমাকে প্রণাম করিতেন না।[২৩] সেই প্রথম যৌবনের কথা কথা স্মরণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌত্তলিকতার উপদেশ, সে শাস্ত্রে আমার আর শ্রদ্ধা থাকিত না। আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, আমাদের সমুদায় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র। অতএব তাহা হইতে নিরাকার নির্বিকার ঈশ্বরের তত্ত্ব পাওয়া অসম্ভব।"[২৪] এইরূপ যখন তাঁহার মনের অবস্থা, শুধুই শূন্যতাবাচক নেতিবাদী চিন্তার আলোড়ন—তখন সহসা একদিন কেমন করিয়া ঈশোপনিষদের একখানা ছিন্ন পত্র উড়িয়া আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের

হাতে পড়ে। রামমোহন-সম্পাদিত উপনিষদ গ্রন্থাবলী তাঁহাদের বাটীতে প্রচুর ছিল; তাহারই একখানা ছিন্ন পত্র উড়িয়া আসা একটা সাধারণ ব্যাপার মাত্র। কিন্তু সেই পংক্তি দুইটি—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্॥

ইহারই মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রাণের আরাম ও মনের শান্তি খুঁজিয়া পাইলেন। ঔপনিষদিক সত্যধর্ম একমুহূর্তেই তাঁহার চিত্তপটের সংশয়ান্ধকার অপসারিত করিয়া দিল। তাহার পরে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে বেদ-বেদান্ত-প্রণোদিত ব্রহ্মবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। এমনই এক ঈশ্বর-প্রেমে-আপ্লুত মুহূর্তে তিনি অক্ষয়কুমারের পরিচয় পাইলেন এবং তাঁহার গুণপণায় মুগ্ধ হইয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনাভার তাঁহার হস্তেই অর্পণ করিলেন। কিন্তু এই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে কেন্দ্র করিয়া যে ধর্মকলহের কল্লোল উত্থিত হইল, তাহার আঘাতে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দুই বিপরীত মেরুতটে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অবশ্য দীর্ঘ মতান্তরের কণ্টকিত মুহূর্তের পর অক্ষয়কুমারের ভক্তিবর্জিত যুক্তিবাদের নিকট দেবেন্দ্রনাথ নতি স্বীকার করিয়াছিলেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে অক্ষয়-কুমারের ধর্মচেতনা কিরূপ ছিল তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। তিনি আট-নয় বৎসর বয়সে মুসলমান মৌলবীর নিকট ফারসী এবং পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিলেও সেই প্রভাব তাঁহার মনে যে কোন স্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে নাই, তাহা সহজেই অনুমেয় মিল্ সাহেবের কথা স্বতন্ত্র, বিশেষতঃ তাঁহার পিতা জেম্স্ মিলের তত্ত্বাবধানে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া আটবৎসর বয়সে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমারের বাল্যে তেমন কোন মানসিক চেতনা গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। তিনি পল্লীগ্রামের সামান্য বিদ্যাই অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতায় খিদিরপুরে এক মিশনারীর নিকট কিছুকাল ইংরাজী ভাষা চর্চার সময়ে তিনি যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম অপেক্ষা খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি কিঞ্চিৎ আনুকূল্য দেখাইয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। কিন্তু যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমারের চিত্ত ধর্মসম্প্রদায়ের বিশ্বাসমার্গীয় আপ্তবাক্যের কারাগারে বন্দী থাকিতে পারে নাই। যিনি পরবর্তী

কালে হিন্দুধর্ম ও দর্শনেব বহু তত্ত্বে আস্থাহীন হইয়াছিলেন, তিনি যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে খ্রীস্টানধর্মেব প্রতিও উদাসীন হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, উনিশ-কুড়ি বৎসব বয়সেব সময় তিনি অভিনিবেশ সহকারে সংস্কৃত সাহিত্য-দর্শনাদি পাঠ কবিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়ে বীতিমত ইংবেজী অধ্যয়ন কবিয়াছলেন এবং কোঁৎ-কথিত পজিটিভ সায়েন্স অর্থাৎ গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, কবোটিতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় ত্যাগ কবিয়াও বিজ্ঞান ও গণিত চর্চায় ক্ষান্ত হন নাই—ইহাই ছিল তাঁহাব সাবাজীবনেব পাথেয় ও আহার্য। এই সময়ে তিনি ওবিয়েণ্টাল সেমিনাবীব অধ্যক্ষ হার্ডম্যান জেফ্রয সাহেবেব নিকট যুবোপেব বিভিন্ন ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন কবিয়াছিলেন। জেফ্রয় সাহেব তাঁহাকে নান ভাষা শিখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অক্ষযকুমাব তাঁহাব নিকট ভাষা ব্যতীত ধর্মনৈতিক ব্যাপাবে কিছুমাত্র আনুগত্য স্বীকাব কবেন নাই। তখন কলিকাতায় মিশনারী সম্প্রদাযেব ধর্মান্তবীকবণেব ব্যাপাবে বাঙালীর মন অতিশয উত্তেজিত হইয়াছিল; সম্ভবতঃ অক্ষয়কুমাব খ্রীস্টানধর্মেব দ্বাবা কিঞ্চিৎ প্রভাবান্বিত হইলেও যৌবনে ইহার প্রতি তাঁহাব শুধু ঔদাসীন্যই সঞ্চারিত হইয়াছিল। ববং গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মই তাঁহাকে যৌবনে অধিকতব প্রভাবান্বিত কবিয়াছিল কারণ তাঁহার পিতার মৃত্যুসংবাদে সকলে ব্যাকুল হইলেও তিনি গীতায় বর্ণিত স্থিতধী নিষ্কাম ব্যক্তির মত শোকাদি মানসিক প্রবৃত্তিব উর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বব গুপ্তেব সাহচর্যে আসিয়া তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথের সহিত পবিচিত হন। ইতিপূর্বে তিনি রামমোহনেব যুক্তিপন্থী একেশ্বরবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় রামমোহন বিষয়ে তাঁহার যে দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহিব হইয়াছিল, তাহাতেই মনে হয়, তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের দ্বাবা অনুপ্রাণিত হইয়া রামমোহনেব একেশ্ববাদেব পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথেব তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগ দিয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনা ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় চার বৎসরকাল তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতেব পূর্ণ পরিচয় পাইয়া ১৮৪৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্ম সমাজের মৌলিক কতকগুলি আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন; দেবেন্দ্রনাথেব সহিত এ বিষয়ে তাঁহার

সাত-আট বৎসর ধরিয়া তর্ক চলে। পরিশেষে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদ গ্রহণ করেন, ব্রাহ্ম সমাজও অক্ষয়কুমারের মতানুবর্তী হয়। অক্ষয়কুমার প্রধানতঃ জ্ঞানবাদী ছিলেন, এবং জ্ঞানবাদ যেমন মানুষের বুদ্ধি ছাড়া অপর কোন বস্তু বা ব্যক্তির দাসত্ব করে না, তিনিও তেমনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান দুই স্তম্ভ—বেদ ও বেদান্ত-আনুগত্য—ইহার বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম বিদ্রোহবাণী উচ্চারণ করেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে বেদান্ত ধর্মের স্বপক্ষতা করিতে নির্দেশ দিলে তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হন। তাহার পরে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণের স্বনামে লিখিত প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন, কিন্তু সম্পাদকীয় স্তম্ভে বেদ বা বেদান্তের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে কোনদিন কোন অনুকূল মন্তব্য করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ বেদ-বেদান্তকে ঈশ্বরাদিষ্ট, অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্ম সমাজে রীতিমত বেদ পঠিত হইত, বেদান্তবাগীশ ছিলেন ইহার প্রধান উদ্যোগী এবং ইঁহার নিকট দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ পাঠ করিয়াছিলেন। হিন্দুর কোন কোন আচার-আচরণের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল। স্ত্রীলোকে সহজে নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে অক্ষম বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ফুলচন্দন নৈবেদ্য প্রভৃতির সাহায্যে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার ইহার ঘোরতর বিরোধিতা করেন। এই সময় তিনি বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করেন এবং দীর্ঘকাল-স্থায়ী বিচারের দ্বারা তাহা প্রমাণ করেন।

অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক রচনা হইতে তাঁহার চিত্তের ধর্মসংশয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। যখন দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ধর্ম লইয়া মতভেদ হয়, তখন তাঁহার বয়স মাত্র একুশ বৎসর, দেবেন্দ্রনাথের বয়স চব্বিশ। অক্ষয়কুমার বেদ ও বেদান্তকে প্রাচীন মনুষ্যজাতির সভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেন।[২৬] তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বেদের জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধেও সংশয় উত্থাপন করেন এবং বেদ-বেদান্তকে 'মনুষ্যবিরচিত গ্রন্থ' বলিয়া প্রচার করেন। ফলে দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মতের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। রাজনারায়ণ বসুর মত উচ্চশিক্ষিত যুবক অক্ষয়কুমারকে সমর্থন করিবেন, ইহাই তিনি আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথের মতানুবর্তী হইয়া বেদান্তকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে অক্ষয়কুমার কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী

কালে রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে রাজনারায়ণ বলিয়াছিলেন, "আমি কিন্তু স্বভাবতই বরাবর দেবেন্দ্রবাবুর পক্ষে ছিলাম।" ইহা শুনিয়া নগেন্দ্রনাথ বলেন, "হইবারই কথা। আপনি ভক্তিপরায়ণ, আর অক্ষয়বাবু একজন জ্ঞান-পরায়ণ।"[২৭] ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত নামক পুস্তকেও ইহার উল্লেখ দেখিতেছি[২৮] "অখিল সংসারই আমাদিগের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার"[২৯]—ইহাই অক্ষয়কুমারের বাণী ও আদর্শ। এ বিষয়ে তিনি প্রসিদ্ধ নবকরোটি-বিশারদ স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী জর্জ কুম্-এর মতানুবর্তী। (পরে এবিষয়ে বিস্তারিত আকারে আলোচনা করা হইয়াছে।)

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস রচিত 'অক্ষয় চরিত' নামক গ্রন্থে একটা কৌতুককর বিবরণী আছে :

'তদনন্তর একদা উক্ত সভার কার্য্যারম্ভ হইলে মহর্ষি বলিলেন, ঈশ্বর সব শক্তিমান। অক্ষয়বাবু বলিলেন, সর্বশক্তিমান নন, বিচিত্র শক্তিমান। তিনি বলেন, কি। ঈশ্বরের মহিমা ও সব শক্তিমত্তা বিষয়ে আমরা এখনও সন্দিহান।'[৩০]

বাস্তবিক অক্ষয়কুমার বেদ-বেদান্ত সম্বন্ধে যেমন সন্দিহান হইয়াছিলেন, তেমনি ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধেও সংশয়ান্বিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মপ্রেমী দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মতানৈক্য সৃষ্টি হইবেই। লিয়োনার্দ সাহেব *History of the Brahmo Samaj* নামক গ্রন্থে স্পষ্টতই স্বীকার করিয়াছেন,

'There were conflicts of opinion between Devendranath Thakur and Akshaya kumar Datta on the question of Vedic infallibility, the latter being against the doctrine of such infallibility. Finally, truth triumphed, the Brahmo Samaj abjured the said doctrine, the Vedas as the revealed word of God'[৩১]

শুধু লিয়োনার্দ সাহেবের এই উক্তিই নহে, তৎসমসাময়িক 'ইণ্ডিয়ান মিরার' নামক সাময়িক পত্রেও অনুরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় :

"Baboo Debendranath Tagore owes to a great extent to Akshaya Baboo his deliverance from the Pantheism and error of Vedas and Upanishadas"[৩২]

অবশ্য 'ইণ্ডিয়ান মিরার'-এর একথা ঠিক নহে যে, দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি শুধু ঐ গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে ঐশী কর্তৃত্ব ত্যাগ

করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার বেদ ও বেদান্ত অপেক্ষা জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই অধিকতর আদরণীয় মনে করিতেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৭৭৩ শকের ফাল্গুন সংখ্যায় তিনি স্পষ্টতই স্বীকার করিয়াছিলেন—

"এক এক অসীমপ্রায় সৌরজগৎ যেন বিশ্বরূপ মূলগ্রন্থের এক এক পত্র স্বরূপ ; সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু যাহার অক্ষরস্বরূপ, এবং যাহার এই সমস্ত অবিনশ্বর অক্ষর, অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী মসীদ্বারা লিখিতবৎ প্রকাশ হইতেছে, তাহাই যথার্থ অবিকল্প অভ্রান্ত ও শাস্ত্র। যে দেশের যে কোন ব্যক্তি এই অতি প্রগাঢমূল গ্রন্থ শুদ্ধরূপে পাঠ ও যথার্থ অর্থ প্রতীতি করিতে পারেন, তিনিই স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া অন্যলোকের ভ্রান্তি দূর করিতে সমর্থ হয়েন। প্রকৃত জ্ঞান-উপার্জ্জনের আর অন্য উপায় নাই, যথার্থ ধর্মশিক্ষার আর দ্বিতীয় পথ নাই।"[৩৩]

ইহার ঠিক একবৎসর পূর্বে তিনি ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, "পরম কারুণিক পরমেশ্বর এই যে অখিল বিশ্বরূপ সর্বোত্তম গ্রন্থদ্বারা আপনার অনির্বচনীয় স্বরূপ ও আমাদিগের কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই ব্রাহ্মধর্মের একমাত্র মূল।"[৩৩] বলা বাহুল্য যে অক্ষয়কুমারের এই অভিনব ঈশ্বরবাদ দেবেন্দ্রনাথের প্রীতিকর হয় নাই। এমন কি, ইহার বহুকাল পরে দেবেন্দ্রনাথের জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তীও অক্ষয়কুমারের মতের প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করিয়াছিলেন।[৩৪] কিন্তু এই দীর্ঘকালস্থায়ী তর্কবিতর্কের পর দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের যুক্তিপন্থী মত স্বীকার করিয়া লইয়া বলেন, "ধর্মের মূলভূমি কোন পুস্তক হইতে পারে না।"[৩৫] পরিশেষে তিনি "বেদান্ত যে অভ্রান্ত গ্রন্থ এই মত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া স্বভাবকে ধর্ম পুস্তকরূপে প্রতিপন্ন করতঃ ব্রাহ্মধর্মকে স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া প্রচার করেন।"[৩৬] এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বসুর সাক্ষ্য চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, "দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দুইজনে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে, বেদকে আর ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা কর্তব্য নয়, যেহেতু উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ব বেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত; এই মত অক্ষয়বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ (১৮৫১ খ্রীঃ) দিবসের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।"[৩৭] দেবেন্দ্রনাথ যে অক্ষয়কুমারের প্রভাবেই বেদ ও বেদান্তকে ব্রাহ্মধর্ম হইতে বহিষ্কৃত করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অক্ষয়কুমার 'আত্মীয় সভা' নামক যে সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার উপরেও দেবেন্দ্রনাথ প্রতিকূল হইয়াছিলেন। ১৮৫২ সালে অক্টোবর মাসে

অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার ও অনঙ্গমোহন মিত্র মিলিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথের ভবনেই আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠিত করেন।[৩৮] রামমোহনের আত্মীয় সভার অনুকরণেই ইহার সৃষ্টি। প্রথম প্রথম এই সভাতে সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা হইত, কিন্তু ক্রমশঃ সভ্যগণ ব্রাহ্ম সমাজের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধেও প্রখর সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্ম সমাজে সংস্কৃত ভাষায় ঈশ্বর-উপাসনাদি হইত; ইহাতেও এই নবীন সভ্যগণ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বাংলা ভাষায় উপাসনার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিলেন।[৩৯] ১৮৫৩ সালে তাঁহারা খিদিরপুর ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিয়া সেখানে সংস্কৃত মন্ত্রের বদলে বাংলা ভাষার উপাসনা শুরু করিলেন। অক্ষয়কুমার তাহাতে মহোৎসাহে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন অক্ষয়কুমার এবং আত্মীয়সভার সদস্যগণ ঈশ্বরকে ভোটের বিষয়ে পরিণত করিলেন, সেই দিন দেবেন্দ্রনাথের ধৈর্যচ্যুতি হইল।

"ওদিকে অক্ষয়কুমার দত্ত একটা আত্মীয়সভা বাহির করিলেন, তাহাতে হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয় মীমাংসা হইত। যথা, একজন বলিলেন, ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ কিনা? যাহার যাহার আনন্দস্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য হইল।"[৪০]

হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ধারণ হাস্যকর এবং শিশুসুলভ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ঘটনার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, একদিন যেমন বিজ্ঞানচর্চা যুক্তিবাদের উপর অক্ষয়কুমার এবং তরুণ সম্প্রদায়ের অনন্য নির্ভর আস্থা ফিরাইয়া আনিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি আবার স্বাধীন ও সহজ আত্মবুদ্ধিও জাগ্রত হইতেছিল। বুদ্ধির সর্বব্যাপী আক্রমণ হইতে কাহারও মুক্তি নাই, ঈশ্বর হইতে ব্রাহ্মসমাজ পর্যন্ত সকলকেই এই বুদ্ধিবাদের দ্বারা তৌল করিয়া দেখিতে হইবে। এই ধর্মীয় আন্দোলন হইতে আমরা অক্ষয়কুমারের অতন্দ্র বুদ্ধিবাদের নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালীর চিত্ত-জাগরণ এই বুদ্ধির শাণিত পথ অবলম্বন করিয়াছিল। ধর্ম, ঈশ্বর, অধ্যাত্মচৈতন্য—সর্ববিধ নির্বিকল্প ও নির্বস্তুক চিৎসামগ্রীকেও বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতে হইবে, বিশ্লেষণ করিতে হইবে—প্রয়োজন স্থলে দীর্ঘকাল প্রচারিত তত্ত্বসমূহকেও বুদ্ধির দ্বারা খণ্ডন করিতে হইবে—ইহাই ছিল এই যুগের বাণী।

অক্ষয়কুমার তাঁহার গুরুস্থানীয় জর্জ কুম্বের *Constitution of Man* এবং *Moral Philosophy* নামক গ্রন্থদ্বয়ের দ্বারা স্বীয় ধর্মমত গঠিত করিয়াছিলেন।

সেইজন্য তিনি মানব-প্রণীত কোন ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা বিশ্বকেই বিশ্বেশ্বরের স্বরূপ ব'লিয়া গ্রহণ করিতেন। আত্মীয় সভার ঈশ্বরবিষয়ক ভোটপর্ব বিবেচনা করিলে মনে হয়—ইহা ক্রমে ক্রমে তরুণ সম্প্রদায়কে নিরীশ্বরবাদের দিকে ঠেলিয়া দিতেছিল। অক্ষয়কুমারকে সংশয়বাদী বা নিরীশ্বরবাদী রূপে দেখিলে আমরা বিস্মিত হইতাম না। কিন্তু অক্ষয়কুমার ঈশ্বর সম্বন্ধে কখনও সংশয় প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার ঈশ্বরবাদী মনের পরিচয় পাইতে হইলে নিম্নলিখিত উক্তিটুকু গ্রহণ করিতে হইবে :

"হে মানব! একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, এই বিশ্বরূপ মহোচ্চ মঞ্চ তাঁহার মহিমা কেমন ব্যক্ত করিতেছে। সুস্নিগ্ধ, সুমন্দ মারুত তাঁহার চামর ব্যজন করিতেছে। শিশির সিক্ত সরস তরুশাখা সকল উষাকালীন সুশীতল সমীরণ দ্বারা মন্দ মন্দ বিচলিত হইয়া শর শর শব্দ করতঃ তাঁহাকে স্তুতি করিতেছে।......তাঁহার সুকোমল করুণা-কমল কেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাঁহার প্রীতির সৌরভ বিশ্বের চতুঃসীমা পর্য্যন্ত কীদৃশ বিস্তৃত রহিয়াছে।"[৪১]

এখানে লক্ষণীয় যে, যখন তিনি দেবেন্দ্রনাথের সহিত বেদবেদান্ত লইয়া প্রখর তর্কে মাতিয়াছিলেন, তখনও ঈশ্বরে বিশ্বাস হারান নাই; ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার অচপল অসন্দিগ্ধ নিষ্ঠা ছিল। অক্ষয়কুমারের মতে, 'সবই শাস্ত্র,—বিজ্ঞানও শাস্ত্র, গণিতও শাস্ত্র, পুরাতত্ত্বও শাস্ত্র—বিশ্ব সংসারই শাস্ত্র। তিনি কোন বিশেষ শাস্ত্র মানিতেন না—যে শাস্ত্রে মানুষের গভীরতম অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণী আবদ্ধ আছে।"[৪২] অধ্যাত্ম শাস্ত্র, যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত অতীন্দ্রিয়,—অক্ষয়কুমারের তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু বিশ্ববস্তুর মূলে যে ভগবৎ সত্তা আছে,—সমস্ত বৈচিত্র্য, বৈসাদৃশ্য ও আপাত-বিরোধের যিনি নিদান, সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে অক্ষয়-কুমারের সংশয় ছিল না। জ্ঞানবাদ তাঁহাকে নিরীশ্বরবাদ অথবা সংশয়বাদের অতলস্পর্শী গহ্বরে নিক্ষেপ করে নাই। বিদ্যাসাগর যেমন পুরাপুরি কোঁৎপন্থী হইয়া পড়িয়াছিলেন (পরে আলোচিতব্য), হিন্দু, ব্রাহ্ম—কোন ধর্মের প্রতি তাঁহার অন্তরের নিষ্ঠা ছিল না,—অক্ষয়কুমার সেই একই আবহাওয়ায় বর্ধিত হইয়াছিলেন, বরং তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ-জাত বিজ্ঞান ও গণিতচর্চা করিয়া ভৌমনীতি-নিয়মের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; তিনি জর্জ কুম্ব্ এবং কোঁতের তত্ত্বদর্শনও জানিতেন; কিন্তু ঈশ্বরবাদ ত্যাগ করেন নাই।

অবশ্য তিনি ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনার যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে, বস্তুজগতের মূলে আছে তদ্‌ভাবাত্মক কারণসমূহ; সেই বাস্তব

কারণ হইতে বস্তুসত্তার কার্যরূপের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে। ঈশ্বর-প্রার্থনারূপ কোন নির্বস্তুক কারণ কল্পনার প্রয়োজন নাই। এমন কি, তিনি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রার্থনা উঠাইয়া দিবারও প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি একটা কৌতুক-কর সূত্র বাহির করিয়াছিলেন। একবার কলিকাতার যুবসমাজ তাঁহাকে ঈশ্বর প্রার্থনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তিনি তদুত্তরে কৃষক ও শস্যের উপমা দিয়া বীজগণিতের সরল সমীকরণের সাহায্যে ভগবৎ প্রার্থনার অনাবশ্যকতা প্রমাণ করেন। সেই বিচিত্র সমীকরণটির উদাহরণ ঃ

কৃষকের পরিশ্রম = শস্য

কৃষকের পরিশ্রম + ভগবৎ প্রার্থনা = শস্য

∴ ভগবৎ প্রার্থনা = ০

এই আধ্যাত্মিক সমীকরণের ফলে কলিকাতার তরুণ সমাজে আন্দোলন উপস্থিত হইলে তিনি সক্ষোভে বলিয়াছিলেন, "বিশুদ্ধবুদ্ধি, বিজ্ঞানবিৎ লোকের পক্ষে যাহা অতি বোধসুলভ, তাহা দেশীয় লোকদের নূতন বোধ হইল, এইটি বড় দুঃখের বিষয়!৪৩ তিনি প্রার্থনায় বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই তাঁহার ধর্মমত সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাই রাজনারায়ণ বসু তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ঃ

"The Baboo long ago abjured his belief in Brahmoism and turned an agnostic. This change in his opinion could be proved by passages in his work on Hindu Sects."৪৪

এই সত্যই উক্তি বিস্ময়কর। অক্ষয়কুমার যে সংশয়বাদী হইয়াছিলেন, তাঁহার সমগ্র রচনায় তাহার কোন প্রমাণ নাই। এমন কি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সময় তিনি যখন বালী গ্রামে শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন, তখনও তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি পরমকারুণিক ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং শেষ বয়সে তিনি নাস্তিক বা সংশয়বাদী হইয়াছিলেন, তাহা কদাপি সত্য নহে।—অন্তত তাঁহার শেষতম গ্রন্থ হইতে তাহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' দুই খণ্ড, 'ধর্মনীতি' এবং 'চারুপাঠ' তিনখণ্ড—ইহাদের কোথাও সংশয়বাদের চিহ্ন নাই। তবে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তিনি বেদ-বেদান্তকে অভ্রান্ত অপৌরুষেয় মনে করিতেন না। প্রথম যৌবনে

তিনি হিন্দুর তন্ত্র-পুরাণে আস্থা হারাইয়াছিলেন। ভূগোল বচনার জন্য তিনি পুরাণে ও তন্ত্রে যে সমস্ত ভৌগোলিক বিবরণ আছে, তাহাকে অযথার্থ, মিথ্যা ও কাল্পনিক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।[৪৫] যৌবনে তিনি পুরাণ ও তন্ত্রকে ভ্রান্ত মনে করিতেন ; পরবর্তী কালে তিনি যে বেদ-বেদান্তকেও তাহাই মনে করিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে ? রাজনারায়ণ বসু অক্ষয়কুমারের বেদবেদান্ত-বিরোধিতার জন্য কিছু ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি 'হিন্দুধর্মের সারমর্ম' এবং 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামক গ্রন্থে শাস্ত্রবাদী হিন্দুর জীবনাদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের মত ভক্ত। তাই তি'নি অক্ষয়কুমারের প্রতি কিঞ্চিৎ অকরুণ হইয়া তাঁহাকে 'এ্যাগনস্টিক' বলিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের গ্রন্থাদি পাঠ কবিয়া জর্জ কুম্বের অনুরূপ তাঁহাকেও যুক্তিবাদী আস্তিক বলিয়াই মনে হয়।

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস অক্ষয়কুমারের শেষজীবনেব ধর্মমত সম্বন্ধে আরও একটা বিচিত্র সংবাদ উপহার দিয়াছেন :

"তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু প্রার্থনার আবশ্যতা স্বীকার করিতেন না। একদা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পর্য্যটন করিয়া যখন পীড়িতাবস্থায় নৌকা করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি আরোগ্য লাভের জন্য গৃহে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণের নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। কিন্তু পৌত্তলিক ছিলেন না।"

এখানে যে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহা সত্য হইলে অক্ষয়কুমারের সমস্ত জীবন ও সাধনাই মিথ্যা হইয়া যাইবে। যিনি বেদবেদান্তবহির্ভূত বুদ্ধি-কেন্দ্রিক একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনি যে অসুস্থ হইয়া বিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। উপরন্তু নকুডচন্দ্র বিশ্বাসেব উক্তিব মধ্যে যুক্তিগত দুর্বলতা আছে। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, নারায়ণের বিগ্রহের সম্মুখে নত হইতেছেন, অথচ পৌত্তলিক ছিলেন না—যুক্তিশাস্ত্রে ইহা হাস্যকর সিদ্ধান্ত। সম্ভবত তাঁহার নারায়ণ-প্রণাম জনশ্রুতি মাত্র। উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে ইহা গ্রহণযোগ্য নহে।

তাঁহার মনোভাব কোঁৎ অনুগামী হইলে তিনি তাঁহার নব ধর্মমত প্রচার করিতে পারিতেন, এবং বেন্থাম মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজম বা কোঁতের পজিটিভিজম্-এর ন্যায় কোন একটা তত্ত্ববাদ প্রচারে ব্রতী হইতেন। তখন ব্রাহ্ম সমাজের একটা বৃহৎ অংশ তাঁহার পক্ষপাতী ছিল ; সম্ভবতঃ এবিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগর ও 'ইয়ংবেঙ্গল' দিগেরও সহায়তা লাভ করিতে পারিতেন।

তিনিও ইচ্ছা করিলে কেশবচন্দ্রের মত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আর একটি যুক্তিবাদী আস্তিক ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন জ্ঞানতাপস ; ধর্ম প্রচারণা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাই তিনি বুদ্ধিমার্গীয় আস্তিক্যবাদে সারাজীবন ধরিয়া বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালী চিত্তে যে যুক্তিবাদের জয় সূচিত হইয়াছিল, অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজ হইতে বেদ-বেদান্তের অপ্রতিহত প্রভাব তুলিয়া দিয়া সেই বুদ্ধিবাদী জগৎ চেতনাকেই ত্বরান্বিত করেন।

॥ ৫ ॥

অক্ষয়কুমারের গ্রন্থপরিচয়

অক্ষয়কুমারের জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় উক্ত জীবনীর একস্থানে লিখিয়াছেন যে, শৈশবে ভ্রাতাদের পাঠশালায় যাইতে দেখিয়া শিশু অক্ষয়কুমার কাঁদিয়া বলিতেন, "আমি লিখবো, আমি লিখবো।"[৪৬] পরবর্তী জীবনে অক্ষয়কুমার শুধুই লিখিয়া গিয়াছেন। দারুণ মস্তিষ্ক-পীড়ায় জীবন্মৃতবৎ হইয়া পড়িলেও তাঁহার রচনার বিরাম ছিল না। অক্ষয়কুমারের আর এক জীবনীকার সংবাদ দিতেছেন যে, "মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সেই অক্ষয়কুমার দত্ত অনঙ্গমোহন নামে একখানি পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা বর্তমানে বটতলার গ্রন্থাবলী হইতে কোনও অংশে উৎকৃষ্ট নহে। ইহা কামিনীকুমারের সমতুল্য—তদ্রূপ রুচির পরিচায়ক। গ্রন্থকারের আত্মীয়বর্গের নিকট ইহার একখণ্ড ছিল, সম্প্রতি নষ্ট হইয়াছে।"[৪৭] অক্ষয়কুমারের জীবনে নানা বিস্ময় রহিয়াছে ; নিতান্ত অপরিপক্ক বাল্যে আদিরসের অস্বস্থ উদ্গার বিস্ময়জনক। কালীকৃষ্ণ দাসের 'কামিনীকুমার' নামক বিশুদ্ধ কামায়ন প্রকাশিত হয় ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে, অক্ষয়কুমারের 'অনঙ্গমোহন' প্রকাশিত হয় আনুমানিক ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে।[৪৮] সুতরাং অক্ষয়কুমার যে উক্ত গ্রন্থের প্রভাবে পড়িয়া কাব্যকণ্ডূয়নে মাতিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। ঐ বৎসরেই মদনমোহনের 'রসতরঙ্গিণী' এবং ইহার দুই বৎসর পরে 'বাসবদত্তা' প্রকাশিত হয়। 'রসতরঙ্গিণী'র কটু আদিরস বালক-মনে যে বিকৃত রুচি জাগাইয়া তুলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ঐ সময়ে কলিকাতার স্থূলরুচিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিরসাত্মক কাহিনীকাব্য প্রকাশিত হইতে থাকে, বিদ্যাসুন্দরের চাহিদাও অল্প ছিল না। 'ইয়ং বেঙ্গলগণ' দেশের রুচি ফিরাইবার

জন্য যতই চেষ্টা করুন না কেন সাধারণ শিক্ষিত স্তরে আদিরসাত্মক গল্পকাহিনীব প্রচুর সমাদর ছিল। অক্ষয়কুমার বাল্যবয়সে এই আবহাওয়ায় পড়িয়া কটু কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মদনমোহন যেমন প্রথম যৌবনে 'বসতঙ্গিণী' রচনা করিয়া পরবর্তী কালে অতিশয় লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং এই কাব্য রহিত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার তেমনি বাল্য-কৈশোরে ঐ সামান্য পুস্তিকা রচনা করিয়া নিশ্চয় পরবর্তী কালে ব্রীড়া বোধ করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রথম যৌবনে তিনি কবিতা লিখিতেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তিনি ঈশ্বর গুপ্তের সহিত পরিচিত হন এবং গুপ্তকবির নির্বন্ধাতিশয্যে গদ্য রচনা আরম্ভ করেন। তাহা না হইলে তিনি যদি কাব্য রচনায় নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট হয়তো আমরা 'বসতরঙ্গিণী', 'বাসবদত্তা' ও 'কামিনীকুমার', 'জীবনতারা' জাতীয় উগ্র আদিরসাত্মক কাব্য পাইতাম। অবশ্য ইহা আমাদের অনুমান মাত্র, অক্ষয়কুমারের মত বুদ্ধিজীবী ও বৈজ্ঞানিক-বোধ-সম্পন্ন ব্যক্তি অক্ষরের সহিত অক্ষর মিলাইয়া কাব্যরচনার বিড়ম্বনা হইতে ত্বরায় মুক্তি পাইতেন। সে যাহা হউক, সম্প্রতি আমরা তাঁহার গদ্য গ্রন্থগুলির পরিচয় লইব। আমাদের আলোচনার সীমা ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত সম্প্রসারিত। অতএব এই সময়ের মধ্যে রচিত তাঁহার গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

১। ভূগোল (১৮৩১)—তত্ত্বোধিনী সভার আনুকূল্যে এই 'ভূগোল' তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য রচিত হয়। ইহার ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন, "ইদানীং দেশহিতৈষি বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্যোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃত পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এদেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদ্দ্বারা বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়।" এইজন্য তিনি নানা ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এই ভূগোল প্রকাশ করেন। অবশ্য তাঁহার পূর্বেও ভূগোল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে হিন্দু কলেজ পাঠশালার কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত 'এশিয়া দেশের ভূবৃত্তান্ত' এবং তাহারও পূর্বে ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে 'ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন' কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পীয়ার্সনের 'ভূগোল বৃত্তান্ত,' (১৮৭৩) একদা পাঠ্যপুস্তকে রূপে সমাদৃত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার এই ভূগোলে যে মানচিত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতে

ভারতবর্ষের স্থলে 'হিন্দুস্থান' এবং ভারত মহাসাগরের স্থলে 'হিন্দী মহাসাগর' লিখিয়াছিলেন। তিনি প্রথম যৌবনে এই ভূগোল শাস্ত্র আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দুর পুরাণ ও তন্ত্রে বর্ণিত ভৌগোলিক বৃত্তান্তের যাথার্থ্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া উক্ত গ্রন্থসমূহে নির্বাক অলীক কল্পনার বাহুল্য দেখিয়া হতাশ হন এবং তখন হইতেই হিন্দুর পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলেন।[৪৯]

১৯শ শতাব্দীর প্রথম হইতেই দেখা যাইবে যে, 'দিগ্‌দর্শন' মাসিক পত্রিকা হইতেই ভূগোল আলোচনা শুরু হয়, তাহার পরে দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা ধরণের ভূগোল মুদ্রিত হইয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালীর অন্তর্লোকে নূতন বিশ্বের যে ছায়াপাত হয়, তাহার প্রতি তাহার সদ্য-জাগ্রত কৌতূহল আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাই অক্ষয়কুমারও ভৌগোলিক ইতিবৃত্তের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন—যেন তিনি ক্ষুদ্র ভূগোলের মধ্যে বৃহদ্‌ বিশ্বকে নখাগ্রে ধরিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার পরেও কালিদাস মৈত্রের 'জিওগ্রাফি বা ভূগোল-বিজ্ঞাপক' (১৮৫৭) এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'প্রাকৃত ভূগোল' (১৩৭১) পাঠ্য পুস্তক-হিসাবে জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, অক্ষয়কুমার তরুণ বয়সে জ্যামিতিও অনুবাদের চেষ্টা করেন। স্কুলে তাঁহাকে চারিখণ্ড ইউক্লিড পাঠ করিতে হইয়াছিল ; তাই তিনি জ্যামিতি রচনার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, অনুবাদও করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে আচার্য কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল ভট্টাচার্যের জ্যামিতি (তিনখণ্ড) প্রকাশিত হইলে বাঙালী ছাত্রের জ্যামিতি শিখিবার সহজ পন্থা আবিষ্কৃত হইল।

২। ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভায় বক্তৃতা (১৮৪৫)—দুঃখের বিষয়, এই পুস্তকের কোন কপি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই, ব্রিটিশ মিউজিয়মে একখণ্ড আছে। হেয়ার সাহেব সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের মত গ্রহণযোগ্য, "এইরূপে এদেশের জ্ঞানবৃদ্ধির কারণ জন্য যে প্রশ্ন করা যায়, সেই প্রশ্নের উত্তরেই ভারতরাজ্যের বিদ্যারূপ বৃক্ষমূলে হেয়ার সাহেবকে বীজরূপে দৃষ্টি করা যায়। তিনি আমারদিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা লক্ষগুণ কোটিগুণ মূলবান বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন।"[৫০]

৩। বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ম—১৮৫১, ২য়—১৮৫৩)—অক্ষয়কুমার 'বাহ্যবস্তু'র দুইখণ্ড রচনা করিয়া সর্বপ্রথম গ্রন্থকার ও চিন্তাশীল লেখক রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ইতিপূর্বে তাঁহার ভূগোলখানি বিশেষ কোন খ্যাতি দিতে পারে নাই, স্কুলপাঠ্য পুস্তক তাহা পারেও না। বিশেষত স্কুল বুক সোসাইটীর কথোপকথনচ্ছলে রচিত 'ভূগোলবৃত্তান্ত' অক্ষয়কুমারের ভূগোল অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল। সুতরাং 'বাহ্যবস্তু' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার চিন্তাশীলতার খ্যাতি প্রসার লাভ করিল। স্কট্‌ল্যাণ্ডের নরকরোটী-বিশারদ জর্জ কুম্ব্-এর *The Constitution of Man* গ্রন্থ অবলম্বনে অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তু' রচিত হয়। ইহার কোথাও কোথাও প্রায় অবিকল অনুবাদ। কিন্তু ইহাতেই তিনি সর্বপ্রথম বাহ্যবস্তুর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং জগৎ-সত্তার অন্তরালে ভগবৎ-সত্তা অপেক্ষা একটা কার্যকারণ শৃঙ্খলাযুক্ত বস্তুসত্তা বিরাজ করিতেছে, এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছাইলেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছিলেন, "অক্ষয়বাবুর প্রণীত বাহ্যবস্তু ও ধর্মনীতি তাঁহার সর্বোত্তম গ্রন্থ নহে, উহা অনেক পরিমাণে ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র।"[৫১] ইহা অবশ্য সত্য কথা। আমরা এই পুস্তক দুইখানির সাহিত্যগুণ বিচার করিতেছি না। ইহাদের সাহায্যে বাঙালীর চিত্তে যেমন জগতের কার্যকারণ তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল, তেমনি অপরদিকে অনেক বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনেও এই গ্রন্থদ্বয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া স্বয়ং অক্ষয়কুমার বহুকাল আমিষ আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন; ফলে তাঁহাকে গুরুতর শিরঃপীড়া রোগে কষ্ট পাইতে হয়; শেষে তাঁহাকে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গুগ্‌লী-শামুকের ব্যঞ্জন আহার করিতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষে আমিষভোজী গুপ্তকবি পরিহাস করিয়া লিখিয়াছিলেন :

আমিষ অবিধি ব'লে যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায় শামুকের ঝোল ॥
নোদে শান্তিপুর ফিরে, ফিরিয়া হুগলী।
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগ্‌লী ॥
নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ডু মাথামুণ্ড লিখে ॥

*   *   *

ওহে ভাই যদি চাও নিজ উপকার।
অক্ষযের মতে তবে চলো নাক' আর॥
শেষে তুমি চেলা হও মন করি কথা।
আগে গিয়ে দেখে এসো গুরুজির দশা॥

অবশ্য ইহা গুপ্তকবির পরিহাস মাত্র। তিনি অক্ষয়কুমারকে বিশেষ স্নেহ করিতেন; 'সংবাদ প্রভাকরে' অক্ষয়কুমারের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমারের মস্তিষ্কের পীড়া হইলে ঈশ্বর গুপ্ত সক্ষোভে বলিয়াছিলেন, "আমি যাহাকে অগ্রে শিষ্যের পদে অভিষিক্ত করিয়া এক্ষণে গুরু বলিয়া বরণ করি......" ইত্যাদি।[৫২] আরও অনেকে তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত জীবনধারা ও আচার-আচরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থ পাঠে নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস আরম্ভ করেন; বহুলোক নিরামিষ আহার অবলম্বন করে; অনেকে মদ্যপান ত্যাগ করে।[৫৩] এই সময় নিরামিষ আহার প্রচারকল্পে *Reasons for Vegetarian Diet* নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়।[৫৪] অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তু'র দ্বিতীয়খণ্ডে মদ্যপানের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি দর্শিত হইয়াছিল; এই মত সমর্থন করিবার জন্য কয়েকখানি বাংলা পুস্তক পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়।

মদ্যপান নিবারণের জন্য কয়েকটি সভাসমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন—প্যারীচরণ সরকার প্রতিষ্ঠিত **Bengal Temperance Society,** কেশবচন্দ্রের **Temperance Association, Total Abstinence** প্রভৃতি।[৫৫]

অক্ষয়কুমার উক্ত গ্রন্থের দুইখণ্ডের পরিশিষ্টে কিছু কিছু পরিভাষার তালিকা দিয়াছেন। বহুদিন পূর্বে তিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দের উপযুক্ত পরিভাষা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজিকার দিনে ইহা অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে। নিম্নে এইরূপ অল্প কয়েকটি পরিভাষার উল্লেখ করা যাইতেছে :—

ইংরাজী	বাংলা
Self-Esteem	... আত্মাদর
Vaccination	... গোমসূর্যাধান
Love of life	... জিজীবিষা
Adhesiveness	... জুগোপিষা

* (১) মদিরা, (২) বিষবৈরী, (৩) মদ—না গরল।

ইংরাজী		বাংলা
Constructiveness	...	নির্ম্মিমিৎসা
Combativeness	...	প্রতিবিধিৎসা
Mesmirism	...	মৈস্মর তত্ত্ব
Revolution	...	রাজবিপ্লব
Individuality	...	ব্যাক্তিগ্রাহিত
Physiology	...	শারীর বিধান
Anatomy	...	শারীব স্থান
Equilibrium	...	সমসংস্থান
Stratum	...	স্তর
Polygamy	...	অধিবেদন
Mental Philosophy	...	মনোবিজ্ঞান
Machine	...	শিল্পযন্ত্র
Idiot	...	জড

তাঁহার এই পরিভাষা হয়তো যথোপযুক্ত হয় নাই। Revolutionকে সবসময় রাজবিপ্লব বলা যায় না; Love of life ঠিক জিজীবিষা নহে। তথাপি তাঁহার এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁহার পূর্বে ফেলিকস্ কেরী 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' (১৮১৯) নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে সমস্ত পরিভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা অধিকতর জড়তাগ্রস্ত।

৪। চারুপাঠ (১ম—১৮৫৩, ২য়—১৮৫৪, ৩য়—১৮৫৯)—

এই গ্রন্থত্রয় বালপাঠ্য—বিদ্যালয়ের বালক-বালিকার জন্যই রচিত; ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৯) এবং তৃতীয় ভাগ (১৮৫০) প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের 'জীবনচরিত' (১৮৪৯) এবং 'বোধোদয়' (১৮৫১) অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠে'র প্রথম দুই খণ্ডের পূর্বে রচিত হয়। কিন্তু 'কথামালা' (১৮৫৬) ও 'আখ্যান মঞ্জরী' (১৮৬৩) উহার পরে রচিত হয়। কাজেই অক্ষয়কুমার মদনমোহনের দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাবান্বিত হইতে পারেন। তাঁহার ভাষাও কিছু গুরুগম্ভীর, বিষয়বস্তুও দুরূহ। ভাষার কাঠিন্য সত্ত্বেও 'চারুপাঠে' অনেক কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। যথা—'চারুপাঠ' প্রথম ভাগ: আগ্নেয়গিরি, সিন্ধুঘোটক, বীবর, জলপ্রপাত, পৃথিবীর আকার পুরু ভুজ, পৃথিবীর পরিমাণ, উষ্ণ প্রস্রবন, দীপ মক্ষিকা, পৃথিবীর গতি, বনমানুষ।

এখানে লক্ষণীয় যে, বিচিত্র বিশ্ববস্তুর প্রতি কৌতূহল উদ্রিক্ত করিবার জন্য লেখক এমন বিষয় নির্বাচিত করিয়াছিলেন যাহা সহজেই তরুণ শিক্ষার্থীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে। দ্বিতীয় ভাগেও ঐরূপ নব নব বিষয়ের পরিচয় রহিয়াছে। কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে: বল্মীক, হিমশিলা, মুদ্রাযন্ত্র, ব্যোমযান, বর্ষণবৃক্ষ, দিগ্‌দর্শন, প্রবাল, চন্দ্র, জান ফ্রেডারিক ওবলিন, আলেয়া, ক্রবল পুষ্প, সৌরজগৎ, গ্রহ ও উপগ্রহ, ধূমকেতু, তাপমান, প্লবমানদ্বীপ (ভাসাদ্বীপ), পাদপপল্লী, মহাকূর্ম, অতিকায় হস্তী, দিগ্‌দর্শন বৃক্ষ, তুষার গ্রাম, উড্ডীয়মান, মৎস্য, পতঙ্গভুক বৃক্ষ, ভূগর্ভস্থ হ্রদ ও অন্ধমৎস্য।

'চারুপাঠ' তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে, সুতরাং আমাদের আলোচনার বাহিরে। প্রথম দুই ভাগের সূচী বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে অক্ষয়কুমার বালক-বালিকার চিত্তে বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল বিষয়ক চিত্তাকর্ষী বিশ্বব্যাপার বর্ণনা করেন। অবশ্য ইহাতে 'সন্তোষ' 'কুসংসর্গ' 'স্বদেশের' শ্রীবৃদ্ধিসাধন' 'পরিশ্রম' প্রভৃতি চিন্তাগ্রাহ্য রচনাও আছে। কিন্তু লেখক অলীক গল্পকাহিনী একেবারে বর্জন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে তিনি স্পষ্টতই হিতোপদেশ বা ঈসপের বালপাঠ্য আখ্যানের প্রতিকূলতা করিয়া লিখিয়াছিলেন, "এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে কেবল অবাস্তব উপাখ্যান অধ্যয়ন করাইতেই ভালবাসেন, বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব পদার্থের গুণাগুণ শিক্ষা করাইতে তাদৃশ অনুরক্ত নহেন। এই নিমিত্ত যে সমস্ত মনঃ-কল্পিত গল্পপাঠে কিছুমাত্র উপকার নাই, এবং অপকারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, তাহাও তাঁহাদের অভিমতক্রমে অনেকানেক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।" ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর দুইবৎসর পরে ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত তাঁহার 'হিতপ্রভাকর' নামক বালপাঠ্য গ্রন্থে হিতোপদেশের অশ্লীল গল্পগুলিও গৃহীত হইয়াছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই বিষয়ে অবহিত হইয়া 'শিশুশিক্ষা' তৃতীয় ভাগের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

৫। ধর্মনীতি (১৮৫৬)—ইহার ভূমিকায় অক্ষয়কুমার বলিয়াছেন, ইহা কোন গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে; নানা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত ইইয়াছে। প্রধানত জর্জ কুম্ব প্রণীত '*Moral Philosophy*' গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত। কুম্ব ধর্মনীতি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে,

প্রাকৃতিক বিধান পালন করাই ভগবদ্ ভক্তির পরিচায়ক এবং জাগতিক নীতি পরিত্যাগ করিলে ঈশ্বরের নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা সূচিত হয়।

জর্জ কুম্বের ন্যায় অক্ষয়কুমারও ধর্মনীতি অর্থে প্রাকৃতিক বিধান বুঝিয়াছেন; তাঁহার মতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ ও শান্তির জন্য প্রাকৃতিক নির্দেশ মানিয়া চলা উচিত; না চলিলে মানুষ তাহার স্বধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং ঈশ্বরের অপ্রীতিভাজন হয়। প্রধানত এই তত্ত্বই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। জর্জ কুম্বের সমস্ত গ্রন্থেই এই সুর ধ্বনিত হইয়াছে। সমগ্র জগৎ একটা অভ্রান্ত বিশ্ববিধানের অধীন; জড় ও অজড়, সকলেই জগৎ-পাতার অঙ্গুলি-নির্দেশে চলিতেছে, এমনই একটা জগৎ-কেন্দ্রিক ভগবদ্ চিন্তা জর্জ কুম্বের মধ্যেও ছিল, আবার তাঁহার শিষ্য অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থের দুই খণ্ড এবং 'ধর্মনীতি'তেও আছে।

৬। পদার্থ বিদ্যা (১৮৫৬)—বলা বাহুল্য যে, ইহাও ইংরাজী ভাষায় লিখিত পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে সর্বপ্রথম ইয়েটস্ কর্তৃক 'পদার্থ বিদ্যাসার' নামক বালপাঠ্য পুস্তক রচিত হয়। ইহার বাইশ বৎসর পরে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অবশ্য তাঁহারও উদ্দেশ্য ছিল, বালপাঠ্য পুস্তক রচনা। এই গ্রন্থটি ইংরাজীর অনুবাদ বা সঙ্কলন; সুতরাং মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপনের উপায় নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া নর্ম্যাল স্কুল সমূহে ইহা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হওয়ায় বিজ্ঞানের গূঢ় বস্তুজ্ঞান সম্বন্ধে অনবহিত থাকিয়াও অনেকেই এই গ্রন্থ হইতে বিজ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ে স্থূল ধরণের জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার ইহাতে যে সমস্ত পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত শ্রুতিকটু হয় নাই। যথা—কৈশিক আকর্ষণ, অন্তর্বাহ ও বহির্বাহ, বিকিরণ, আপেক্ষিক তেজ, তান্তবতা ভাস্বরতা-পাদন, সান্তরতা, বিস্তার্যতা, অনপেক্ষ গতি, আপেক্ষিক গতি, পরাবর্তিত গতি প্রভৃতি।

তাঁহার দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' (১৮৫৫) এবং 'ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫) এদেশে পাওয়া যায় নাই। প্রথমটির একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।[৫৬] তাঁহার প্রধান গ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র ১ম খণ্ড ১৮৭০ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার'

প্রকাশিত হয় ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে। তাঁহার রচিত একটি ৩৬ পৃষ্ঠার প্রবন্ধকে তাঁহার পুত্র রজনীনাথ দত্ত বিস্তারিত আকারে রচনা করিয়া ২০৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। এগুলি আমাদের নির্ধারিত সময়ের বাহিরে পড়ে বলিয়া আলোচনা করা হইল না।

রাজনারায়ণ বসুর সহিত তাঁহার জীবন-দর্শনগত আমূল পার্থক্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল না। রাজনারায়ণ যখন মেদিনীপুরে শিক্ষকতা করিতেন, তখন উভয়ের মধ্যে পত্র ব্যবহার হইত। তাহার কিয়দংশ ১৩১১ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' পত্রে (ফাল্গুন) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে অক্ষয়কুমার অন্তরের কথা বলিতে পারিয়াছেন, মাঝে মাঝে হাস্য-পরিহাসও করিয়াছেন। তাঁহার তাত্ত্বিক চিন্তার অন্তরালে যে আরও একটি সহৃদয় বন্ধুবৎসল ও কৌতুকপ্রিয় সত্তা সুগোপনে প্রবাহিত ছিল, এই পত্রগুলি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায়।

॥ ৬ ॥

অক্ষয়কুমার ও পাশ্চাত্য প্রভাব

অক্ষয়কুমার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও গণিতাদি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া অথবা তদবলম্বনে পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়া এদেশে যেমন শিক্ষা ও সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের বিস্তার সাধনে সাহায্য করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি নিজেও পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার গ্রন্থসমূহে পাশ্চাত্য প্রভাব নির্ণয় করা যাইতেছে।

১৮৪১ সনে 'ভূগোল' রচনার প্রাক্কালে তিনি ক্লিফট্ হ্যামিলটন, ইস্ট ইণ্ডিয়া গেজেট এবং মিচেল্-এর গ্রন্থাদি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে এই মানস করিয়া চন্দ্র সুধালোভে উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ ভাষায় আসক্ত হইয়া বহুক্লেশে বহু ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।"

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থের প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ স্কটল্যাণ্ডের

প্রসিদ্ধ নরকবোটী-বিশারদ জর্জ কুম্ব্ প্রণীত *Essay on the Constitution of Man and its Relation to External Object* (1828)—গ্রন্থেব উপর ভিত্তি করিয়া অক্ষয়কুমাব উক্ত দুইখণ্ড গ্রন্থ বচনা কবেন। প্রথম ভাগের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন, "শ্রীযুক্ত জর্জ কুম্ব সাহেব প্রণীত কান্সটিটিউশন আব ম্যান নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে সুন্দররূপে নির্মিত হইয়াছে। তিনি নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন যে, পবমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন কবিলে সুখেব উৎপত্তি হয় এবং লঙ্ঘন কবিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে।. ঐ গ্রন্থেব অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয় লোকেব গোচব কবা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার সার সঙ্কলনপূর্বক বাহ্যবস্তুব সহিত মানব প্রকৃতিব সম্বন্ধ বিচাব নামক এক প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে। ইহা ইংবাজী পুস্তকেব অবিকল অনুরূপ নহে। যে সকল উদাহবণ ইউবোপীয় লোকেব পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, কিন্তু এ দেশীয় লোকেব পক্ষে সেরূপ নহে, তাহা পবিত্যাগ কবিয়া তৎপরিবর্তে যে সকল উদাহরণ এ দেশীয় লোকেব পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পাবে, তাহাই লিখিত হইযাছে। এ দেশেব পবম্পরাগত কুপ্রথা সমুদায় মধ্যে মধ্যে উদাহবণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়া তাহাব দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে।"

অক্ষয়কুমাব উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগেব ভূমিকায় ব্রাহ্মসমাজেব কথাই বেশী করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ব্রাহ্মগণ, যে ধর্ম অবলম্বন কবিযাছেন, তাহাতে এই পুস্তক পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা কবা কর্তব্য।" এই গ্রন্থ বচনায তিনি কুম্ব্ প্রণীত গ্রন্থ ছাড়াও নিম্নলিখিত ইংরাজী গ্রন্থসমূহেব সাহায্য লইয়াছিলেন :

Rowler—*Physiology*

Lawrence—*Lectures in Comparative Anatomy.*

Liebig—*Organic Chemistry.*

John Smith—*Fruits Faunacea the Proper Food for Men.*

Sylvester Graham—*Lectures in the Science of Human Life.*

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, এই গ্রন্থ রচনায় তিনি মানব দেহ সম্বন্ধে অধিকতব কৌতূহলী হইয়াছিলেন। ঐ একই কাবণে তিনি জীববিজ্ঞান ও জৈব রসায়ন আলোচনা কবেন। মানবজীবন বিচার-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তাঁহাকে য়ুরোপীয় লেখকেব মানব-দেহতত্ত্ব ও জীববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ কবিতে হইয়াছিল।

'চারুপাঠ', 'পদার্থবিদ্যা' ও 'ধর্মনীতি' নামক গ্রন্থেও ইংরাজী হইতে অনেক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল। গ্রন্থগুলির বিজ্ঞপ্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে, অক্ষয়কুমার প্রধানতঃ ইংরাজী বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিদ্যা, খাদ্যতত্ত্ব প্রভৃতির উপর অধিকতর নির্ভর করিয়াছিলেন, এবং ঐ সমস্ত ইংরাজী গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিয়া, কোথাও-বা কিছু কিছু ভাব গ্রহণ করিয়া তিনি অধিকাংশ পুস্তক রচনা করেন। অক্ষয়কুমারের জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি আরও কয়েকজন বিদেশী গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন:

Abercrombie—*Intellectual Philosophy.*
George Combe—*Constitution of Man, Moral Philosophy.*
Newton—*Introduction to the Library of useful Knowledge.*
Anot—*Physics.*

অবশ্য তিনি আরও কোন্ কোন্ ইংরাজী গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা দুরূহ। আমাদের অনুমান, জীববিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত ইংরাজী গ্রন্থাদি তিনি উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' রচনায় তিনি উইলসনের গ্রন্থ ব্যতীত আর কোন্ কোন্ গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছিলেন, উক্ত গ্রন্থের পাদটীকায় তাহার উল্লেখ আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা আলোচনার অবকাশ নাই, কারণ উক্ত গ্রন্থ আমাদের নির্ধারিত সময়ের পরে রচিত ও প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়কুমার ব্যক্তিগত জীবনে ও চিন্তায় যাঁহার দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তিনি ইংরাজ লেখক নহেন, জাতিতে স্কচ্—সুবিখ্যাত জর্জ কুম্ব্। তিনি যদিও য়ুরোপে ফ্রেনলজি বা নরকরোটী বিদ্যার জন্মদাতা বলিয়া পরিচিত, তথাপি দর্শন, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি লইয়া নানা বিষয়ে গ্রন্থরচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যাইতেছে:

1. *The Scots Magazine* (1817)—ইহাতে *Phrenology* সম্বন্ধে সর্বপ্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

2. *Essays on Phrenology (1819)*—পরবর্তী সংস্করণে ইহার নাম দেওয়া হয় *A System of Phrenology.*

3. *Phrenological Journal (1823).*

4. *The Constitution of Man (1858)*

5. *Notes on the United States of North America (1841)* ৫৭

অক্ষয়কুমার শুধু কন্‌স্‌টিটিউসন অব ম্যান এবং মরাল ফিলজফির অনুবাদ করেন নাই, কুম্বের তত্ত্ববাদও তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। কুম্ব্ যেমন বিশ্বজগতের মধ্য দিয়া ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমারের ঈশ্বরবাদও প্রায় অনুরূপ। নিম্নে উভয়ের মত-সাদৃশ্যের কিঞ্চিৎ উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :

কুম্বের উক্তি—

'God intended the moral sentiments and intellect to rule the actions of man, and constructed the human mind and physical nature with a determinate relations to those faculties so that conduct in conformity to their dictates should be followed by happiness, and conduct in opposition to them should produce misery; just because, in the first instance, man would act in harmony with the scheme of creation, and in the second, in opposition to it."৫৮

অক্ষয়কুমারের উক্তি—

"জগদীশ্বর বিশ্বরাজ্য পালনার্থে যে সমস্ত সুচারুসুখাবহ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার লঙ্ঘন করিবার অব্যবহিত কাল পরেই দুঃখের সঞ্চার হয়। একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পুনর্বার নিষিদ্ধ কার্য না করি, এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহাতে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি নিয়ম সংস্থাপনার সময়েই তাহার বলাবল এককালে নিদিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার অন্যথা কাহারও সাধ্য নহে।..... জগতের নিয়ম জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা; তাহা লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই দুঃখ আছে।"৫৯

অক্ষয়কুমার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে গিয়া কুম্বের রচনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা এই উদ্ধৃতি হইতেই বুঝা যাইবে। "যে নীতিতত্ত্ব পরমেশ্বরের নিয়মানুযায়ী, তাহাই যথার্থ বিহিত।" ৬০—অক্ষয়কুমারের এই মতের পশ্চাতে কুম্বের—

"That this world is a Divine institution and that it is our duty and interest to try to discover its plan and to conform to its plans."৬১

এই উক্তির বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

অক্ষয়কুমার বেদবেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া এক শ্রেণীর ব্রাহ্মের নিকট যেমন তিনি নিরীশ্বরবাদী অথবা সংশয়বাদী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন, তেমনি কুম্ব্‌কেও স্বদেশে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধু উইলিয়াম হ্যামিলটনের সহিত তাঁহার দীর্ঘকাল ধরিয়া লিপিযুদ্ধ চলিয়াছিল। এমন কি, স্কট নামক এক ব্যক্তি তাঁহার 'কন্‌স্‌টিটিউশন

অব ম্যান' গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করিয়া *Harmony Phrenology with Scripture* নামক পুস্তিকা রচনা করেন।[৬২] ইহা তো গেল সাদৃশ্যের কথা। আর একদিকে কুম্ব্ ও অক্ষয়কুমারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও ছিল। কুম্ব্ বিজ্ঞান চর্চা করিলেও মূলতঃ ছিলেন ঈশ্বরবাদী ঃ প্রার্থনা, ভক্তি, উপাসনার মূল্য স্বীকার করিতেন। তাঁহার এই উক্তি স্মরণীয়—

"I recognise the activity of Veneration, Hope and Wonder, when addressed to the Divine Being, and excited by His word or His works as constituting."[৬৩]

অক্ষয়কুমার কখনও ইহা স্বীকার করিতেন না। এমন কি, তিনি ব্রাহ্মসমাজ হইতে ঈশ্বর-প্রার্থনাও তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, অক্ষয়কুমার জর্জ কুম্বের নিকট একটা বিষয়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন,—জগতের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। এই মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃই তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় দরিদ্র প্রজা সাধারণের পক্ষ লইয়া অত্যাচারী ভূস্বামী ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অস্ত্রধারণ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"হায়! কোন কোন দেশীয় প্রজাদের নিজ শরীরও স্বায়ত্ত নহে, তাহারা গলদ্ঘর্ম কলেবরে সমস্ত দিবস ভূস্বামীর কর্ম করিবে, উচিত বেতনের চতুর্থাংশও প্রাপ্ত হয় না।"[৬৪]

আবার নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধেও তিনি লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, "নীলকরদিগের কার্যের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কেবল প্রজাপীড়ন করিয়া স্বকার্য উদ্ধার করাই তাঁহাদের সঙ্কল্প। ....কি প্রকারে দুর্নিবার প্রতিবন্ধন মোচন হইয়া, এদেশের পরিত্রাণ সাধন হইবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।"[৬৫] একদিকে যেমন তিনি দরিদ্র কৃষকদের পক্ষ লইয়া জমিদার ও নীলকর সাহেবদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি আবার অপরদিকে বিধবা-বিবাহের সপক্ষেও তাঁহার শাণিত যুক্তি আবেগার্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল: "কোন পতি-বিহীনা পীড়িতা স্ত্রী তিথিবিশেষে পথ্যাভাবে নিতান্ত নির্জীব হইল, তথাপি কেহ কণামাত্র আহার সামগ্রী অর্পণ করিল না!—জলতৃষ্ণায় তালু ও কণ্ঠ পরিশুষ্ক হইয়া দুই চক্ষু স্থিরীকৃত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি কেহ জলবিন্দু প্রদান করিল না। এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।"[৬৬]

যেমন মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া সোৎসাহে বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিতেন, ঠিক তেমনি অক্ষয়কুমারও বিদ্যাসাগরের মানবতা-বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ইহার দুই বৎসব পরে ১৮৫৬ সনে বিধবা-বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হয়। অক্ষয়কুমারের বিধবা-বিবাহ সমর্থন বোধ হয় দেবেন্দ্রনাথ অনুমোদন করিতেন না। বিদ্যাসাগবের সহিত এই বিষয় লইয়া দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।[৬৭] কিন্তু অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীতে বিধবা-বিবাহ শুধু সমর্থনই করিতেন না, যাহা তিনি প্রায় ব্যবহার কবেন নাই, তাঁহার সেই আবেগ ও সহানুভূতিও বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিনি যে প্রধানতঃ মানববাদী ছিলেন, এবং য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান পাঠে তাঁহার সেই মানববাদ সুদৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। পজিটিভিজ্‌ম্‌-এর প্রবক্তা অগুয়েস্ত কোঁৎ স্বীয় দার্শনিক মতের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন,

"The study of the positive doctrine leads to the conclusion that man's true unity consists in living for others. The Positive Worship has for its main object the development of the feelings conducive to such a life."[৬৮]

অক্ষয়কুমার তাঁহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির দুই-একস্থলে মানবহিতবাদী কোঁতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, "ভাস্কর ও আর্যভট্ট এবং নিউটন লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্‌ভাবন করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র; গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোম্‌ত যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র।"[৬৮]

১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী কোঁতের ভাবশিষ্য হইয়াছিলেন। ১৯শ শতকের সেই মানববাদ অক্ষয়কুমারকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র দ্বিতীয় ভাগে (পৃ ৪০) তিনি বলিয়াছেন, "মানবকুলের হিতসাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা।" য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতি মানবশাস্ত্র (হিউম্যানিটিজ) পাঠে তিনিও কোঁতের অনুরূপ একটা প্রত্যয়শীল বস্তুসচেতন মানববাদে দীক্ষা গ্রহণ কবিয়াছিলেন। তাঁহাব মন ও মনন এবং চৈতন্যের উপর জ্ঞানবাদী ও মানববাদী য়ুরোপের এই প্রভাবই অক্ষয়কুমারকে আধুনিক বিশ্বের সোপানপ্রান্তে আনিয়া ফেলিয়াছে।

॥ ৭ ॥

অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর

পরিশেষে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এই প্রস্তাব সমাপ্ত করিব; বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার—দুইজনে একই সময়ে বর্তমান ছিলেন; বয়সের দিক দিয়া বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার অপেক্ষা দুই মাসের কনিষ্ঠ। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও ব্রাহ্মসমাজ মারফতে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের সহিত পরিচিত হন। বিদ্যাসাগরের মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশ 'তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা'য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইত; সেইজন্যও বটে, আবার আরও একটি কারণে অক্ষয়কুমারকে বিদ্যাসাগরের সহিত বিশেষভাবে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইত। বিদ্যাসাগর ছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রবন্ধ-নির্বাচন কমিটির অন্যতম সদস্য; কোন্ প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য, তাহা নির্ধারণের জন্য অক্ষয়কুমারকে অনেক প্রবন্ধ বিদ্যাসাগরের নিকট প্রেরণ করিতে হইত। স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়েরও রেহাই ছিল না; অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধও মুদ্রণের পূর্বে বিদ্যাসাগরের অনুমতির জন্য প্রেরিত হইত; বিদ্যাসাগর সংশোধন করিয়া দিলে তাহা তত্ত্ববোধিনীতে মুদ্রিত হইত। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ 'বাঙ্গালা সাহিত্যে' (১২৯২) ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, "কিন্তু ইঁহার (অর্থাৎ অক্ষয়কুমারের) উন্নতির মূলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্তমান। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই অক্ষয়-কুমারের প্রথম প্রথম রচনা সংশোধন করিয়া দিতেন।"[৭০] রাজনারায়ণ বসুও তাহাই বলিয়াছেন, "অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।" অবশ্য 'পুরাতন প্রসঙ্গে' আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলিয়াছেন, "কিন্তু আমার মনে হয় না যে অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দুজনের স্টাইল, ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"[৭১] কিন্তু এরূপ অনুমানের কোন হেতু নাই। কারণ স্বয়ং অক্ষয়কুমার তাঁহার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থের ভূমিকায় তাহা স্পষ্টত স্বীকার করিয়াছেন, "অবশেষে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ আনুকূল্য করিয়াছেন।"

প্রথম প্রথম অক্ষয়কুমারের রচনায় কিঞ্চিৎ জড়তা ছিল; তিনি দুরূহ আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করিতেন এবং সংস্কৃত ধাতু হইতে অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক শব্দ তৈয়ারী করিয়া লইতেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে এমনই একটা কৌতুককর বিবরণী দিয়াছেন :

"অক্ষয়বাবু যখন বাহ্য বস্তু ও তাহার সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার লিখিবার সময়ে জিগীষা, জুগোপিষা প্রভৃতি বিভীষিকাপূর্ণ শব্দের সৃষ্টি করিতেছিলেন, তখন শুনা যায় যে, কলিকাতার শিক্ষিত লোকদের বাড়ীতে ঐ সব শব্দের সঙ্গে চিড়্টামিষা প্রভৃতি শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইত।"৭২

বিদ্যাসাগরের সংশোধনে অক্ষয়কুমারের ভাষাগত জড়তা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র ভাষা বিচার করিলে দেখা যাইবে, তাঁহার ভাষা শেষ জীবনে কত সুগম ও সুপাঠ্য হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। অক্ষয়কুমারকে নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ দিবার জন্য তিনি শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

For the post of Headmaster of the Normal classes, I would recommend Babu Akshoy Kumar Dutta, the well known Editor of the Tattwabodhini Patrika. He is one of the very few of the best Bengali writers of the time. His knowledge of the English language is very respectable and he is well informed in the elements of general knowledge, and well-acquainted with the art of teaching. On the whole I do not think that we can secure the services of a better man for the post."৭৩

ইতিপূর্বে অক্ষয়কুমার কিছুদিন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার শিক্ষক হিসাবে সুখ্যাতি বিদ্যাসাগরের অজ্ঞাত ছিল না। সে যাহা হউক, বিদ্যাসাগরকেও অক্ষয়কুমার বিশেষ মান্য করিতেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে অক্ষয়কুমার মনে প্রাণে সমর্থন করিতেন, এবং দেবেন্দ্রনাথের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বিধবা বিবাহের সপক্ষে প্রবন্ধ লিখিতেন।

কিন্তু এক স্থলে তাঁহার সহিত বিদ্যাসাগরের পার্থক্য ছিল। বিদ্যাসাগর সর্বোপরি ছিলেন আবেগ-ব্যাকুল সমাজ-সংস্কারক এবং প্রধানতঃ শাস্ত্রমার্গকে যুক্তি স্বরূপ উত্থাপন করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার ছিলেন নিঃস্পৃহ জ্ঞানতাপস, য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিই তাঁহার ছিল অধিকতর নিষ্ঠা। বরং তিনি

পণ্ডিতদের শাস্ত্রমার্গকে নিন্দাই করিতেন। একস্থানে তিনি তীব্র মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন,

"সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ গ্রাহ্য নহে, এবং সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা যে বিষয় যতদূর নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার অধিক আর জানা যায় না, এই মহানর্থকর নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক এবং অত্যন্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয়।"[৭৪]

এই স্থলেই অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের প্রধান পার্থক্য। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের মধ্যে যে অংশে নিজ মতের সমর্থন পাইয়াছেন, সেই অংশকেই যুক্তি স্বরূপ উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক মন লইয়া জগৎ ও জীবনকে বিচার করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর কিয়দংশে রামমোহনপন্থী, তাই শাস্ত্রকেই যুক্তির প্রধান উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরবাদী ভক্ত ছিলেন না। কাহারও মতে তিনি সংশয়বাদী, কাহারও মতে তিনি ছিলেন বিশুদ্ধরূপে নাস্তিক্যবাদাশ্রয়ী মানব-প্রেমী * কিন্তু অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও কদাপি ঈশ্বরচৈতন্যে নিষ্ঠা ত্যাগ করেন নাই। উভয়ের মধ্যে নানা দিক দিয়া পার্থক্য থাকিলেও, হৃদ্যতাও অল্প ছিল না। অক্ষয়কুমার শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর উদ্যোগী হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে অক্ষয়কুমারের জন্য নিয়মিত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[৭৫] একই যুগে দুই জনে বর্তমান ছিলেন, উভয়েই ছিলেন প্রায় সমবয়সী। কিন্তু বিদ্যাসাগর যেমন প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও আবেগের বলে সমগ্র জাতিকে বলপূর্বক তাঁহার নির্দিষ্ট কক্ষপথে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন, অক্ষয়কুমার তাহা পারেন নাই। বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রবল পৌরুষের অধিকারী এবং কর্মযোগী; অক্ষয়কুমার ছিলেন জ্ঞানযোগী, জ্ঞানভিক্ষু। এইরূপ নানা পার্থক্য থাকিলেও দুইজনের জীবনে দুইটি বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে; বিদ্যাসাগর জ্ঞান ও প্রেমের মিলন ঘটাইতে পারিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার তাহা পারেন নাই, অথবা চেষ্টা করেন নাই। তিনি সারাজীবন শুধু জ্ঞান চর্চাই করিয়াছেন, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সে সর্বব্যাপী প্রেম অক্ষয়কুমারের মধ্যে স্তিমিতবেগ হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালী-জীবনের উপরে যে সমাজ-চেতনার প্রবল তরঙ্গ-বিক্ষোভ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, অক্ষয়কুমারও সেই তরঙ্গে বিহার করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যেই ১৯ শতকের চিত্তসঙ্কট মুক্তি

*বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

পাইয়াছিল। শুদ্ধ বুদ্ধিবাদের জয়ঘোষণা করিয়া অক্ষয়কুমার তৎকালীন নব্য বাঙালীর মনোলোকে নবভাবের বীজ বপন করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে বাঙালী সেই জন্য এই নিঃস্পৃহ জ্ঞানযোগীকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছে।

পাদটীকা

১। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত, পৃ-৪, পাদটীকা

২। রাজকুমার চক্রবর্তী - অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃ ৫ (তুলনায়, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির পুস্তক, পৃ ৪)

৩। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির পুস্তক, পৃ ৪

৪। রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, পৃ ২৪৯-৫০

৫। ঐ, পৃ ২৫৩

৬। তারকনাথ রায়—পাশ্চাত্যদর্শনের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৭০-৭১

৭। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির পুস্তক, পৃ ২১

৮। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত, তৃতীয় সং, পৃ ৬৬

৯। ঐ, পৃ ৭৫-৭৬

১০। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ২য় ভাগ, পৃ ১২

১১। শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ ১৯৯-২০০

১২। ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, পৃ ২১

১৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বর্তমান শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য, পৃ ১১-১২

১৪। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত, পৃ ৭৫-৭৬

১৫। ঐ, পৃ ৮৫

১৬। ঐ, পৃ ৭৬-৭৭

১৭। ঐ, পৃ ১৫৬-৫৭

১৮। ঐ, পৃ ৭৬

১৯। ঐ, পরিশিষ্ট, পৃ ৪২০ ২১

২০। ঐ, পরিশিষ্ট, পৃ ৪২৫

২১। ঐ, পৃ ১০৪

২২। ঐ, পৃ ৫৭

২৩। ঐ, পৃ ৫৮

২৪। ঐ, পৃ ৫৮

২৫। রাজকুমার চক্রবর্তী—অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃ ১৯
২৬। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির পুস্তক, পৃ ৮২
২৭। ঐ, পৃ ৮৪, পাদটীকা
২৮। ঐ, পৃ ১৪৭
২৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭১৭ শক, বৈশাখ
৩০। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস—অক্ষয়চরিত, পৃ ৩০
৩১। Leon ırd—*History of the Brahmo Samaj* p 90
৩২। অজিতকুমার চক্রবর্তী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ১৮০
৩৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৭৩ শক ফাল্গুন
৩৪। ঐ,— ১৭৭২, শক, ফাল্গুন
৩৪ক। অজিতকুমার চক্রবর্তী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ১৮০-৮১
৩৫। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, পৃ ১৪০
৩৬। ঐ, পৃ ১৪৭
৩৭। অজিতকুমারের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে উদ্ধৃত, পৃ ১৭৯
৩৮। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত, পৃ ৪৪৩
৩৯। ঐ, পৃ ০৫৭
৪০। ঐ, পৃ ২২০
৪১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭১৩ শক, জ্যৈষ্ঠ
৪২। অজিতকুমারের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ১৮০-৮১
৪৩। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৯৪
৪৪। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস—অক্ষয়চরিত, পৃ ৩৯-৪০
৪৫। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির ঐ গ্রন্থ, পৃ ২১৬
৪৬। ঐ, পৃ ৪, পাদটীকা
৪৭। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের ঐ, গ্রন্থ পৃ ১৪
৪৮। ঐ, পৃ ১৪
৪৯। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির ঐ গ্রন্থ পৃ ২১৬
৫০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃ ৪৬
৫১। রাজনারায়ণ বসু—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, পৃ ১৫
৫২। রাজকুমার চক্রবর্তী—অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃ ২২
৫৩। ঐ
৫৪। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির ঐ গ্রন্থ, পৃ ১২৩
৫৫। ঐ
৫৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অক্ষয়কুমার দত্ত

৫৭। Charles Gibbon—*The Life of George Combe* (*1878*)

৫৮। *Ibid*, *Vol*. 1, P. 183.

৫৯। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, প্রথম খণ্ড, উপক্রমণিকা

৬০। ঐ

৬১। Charles Gibbon—*Op Cit. Vol II P. 357*

৬২। *Ibid, P. 321*

৬৩। *Ibid, P. 6*

৬৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭২ শক, বৈশাখ-শ্রাবণ

৬৫। ঐ, ১৭৭২ শক, অগ্রহায়ণ

৬৬। ঐ, ১৭৭৬ শক, চৈত্র

৬৭। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত, পরিশিষ্ট, পৃ ৩৭৫

৬৮। Auguste Comte—*The Catechism of Positivism*, *P 271*

৬৯। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বরচিত জীবনচরিত. পরিশিষ্ট, পৃ ৪৫৭

৭০। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ—বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ ১৩৯

৭১। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম, পৃ ৫৩

৭২। অজিতকুমার চক্রবর্তী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর. পৃ ৭২৫

৭৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃ ২৬

৭৪। বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ১ম, ভূমিকা

৭৫। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির ঐ গ্রন্থ পৃ ২৩৩

——

চতুর্থ পর্ব

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী-মানসের বিচিত্র বিবর্তন

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালীর ভাব-বিপ্লব

যুগন্ধর মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর বাঙালীর মানসজীবনে যে বিদ্যুৎসঞ্চারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার উত্তেজনা এখন মন্দীভূত হইয়া আসিলেও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। রাজা রামমোহন যে বহ্নিশিখা লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর সেই জ্ঞানবর্তিকা লইয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই নির্মোহ জ্ঞানবাদের সহিত অনুস্যূত হইয়াছিল অকুণ্ঠ মানবপ্রেম,—এই মানবপ্রেমই বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচৈতন্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। রামমোহন বাঙালীর ১৯শ শতাব্দীর অনড় সমাজের উপর যুক্তি জ্ঞানের অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন; সেই প্রচণ্ড আঘাতে এই বিশাল-কায় নিদ্রিত দৈত্যটার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিলেও তাহার জীবনান্ত হয় নাই; সে যেন আঘাত সহিয়া আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর বাঙালীর সেই স্থাবর সমাজ-চৈতন্যের উপর পুনরায় যে আঘাত হানিয়াছিলেন, তাহার জন্ম ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হইলেও মূলতঃ তাহা বিশ শতকের সহিত আত্মীয়তার সূত্রে জড়িত। যাহাকে ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন, "The age of interrogation"—সেই অনন্তহীন যুগপ্রশ্ন—সৃষ্টির যৌক্তিকতা ও মূল্য সম্বন্ধে যুক্তিনিষ্ঠ অতন্দ্র বুদ্ধির প্রখর জিজ্ঞাসা-ইহা বিদ্যাসাগরের সমস্ত চেতনার মূলে দূরসন্ধানী আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু কেবল বিশুষ্ক জ্ঞানবাদ নহে, মানুষের প্রতি তাঁহার যে অকৃপণ প্রেম ছিল, তাহাই তাঁহাকে বাঙলা দেশ ও বাঙালীর সমাজে অনন্যসাধারণ মহিমা দান করিয়াছে। মানবজীবন ও সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে তিনি যে দৃঢ় প্রত্যয়ে পৌঁছাইয়াছিলেন, তাহার অন্তস্তলেও রহিয়াছে মানুষের প্রতি অপরিমেয় প্রীতি; এই মানবপ্রেমই

তাঁহার সমগ্র সত্তা, যুক্তি, দার্শনিকতা, সমাজবোধ—সমস্ত, চিত্তবৃত্তিকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। সেই প্রেমের বশেই তিনি পরাশর খুঁজিয়াছেন, শাস্ত্র মন্থন করিয়াছেন। তাঁহার এই মানবপ্রেম কিন্তু বিশেষ কোন শাস্ত্র-সংহিতার প্রভাবে আবির্ভূত হয় নাই, তাঁহার স্বভাবের মধ্যেই ইহা নিহিত ছিল। এই দিক দিয়া তিনি ১৯শ শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী মানবহিতবাদকেই জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গলিত সংস্কার-বিরোধিতা, নব সংস্কার সৃষ্টি, প্রবল পৌরুষ ও ক্ষাত্রবীর্য—সর্বোপরি জীবন সম্বন্ধে একটা উদার সহানুভূতিশীল আস্তিক্যানুভূতি—সমস্ত কিছুর মূলেই আছে ইহজীবনের প্রতি মমতাময় শ্রদ্ধা। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিলে ১৯শ শতাব্দীর বাঙলা দেশের সংস্কৃতি-সঙ্কটের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত না হইলেও, কয়েকটি এমন সূত্র পাওয়া যাইবে যে, তাহার সহিত এই শতাব্দীর জাগ্রত প্রাণ-স্পন্দনের যোগসূত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। অবশ্য আমাদের আলোচনার সীমা ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত প্রসারিত এবং এই সীমাবদ্ধ কালের মধ্যে রচিত বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী সাহায্যে তাঁহার প্রাণের বাণী, আত্মার সঙ্কট এবং ১৯শ শতাব্দীর বাঙলা দেশের সমাজবিবর্তনের ধারা বুঝিয়া লইতে হইবে।

বিদ্যাসাগরের জীবন এমনই বিচিত্র রহস্যমণ্ডিত এবং আপাতঃ বিরোধিতা-পূর্ণ যে, তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহার জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে অনেক সময় সঙ্গতি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগরের চরিত্র ও প্রতিভামুগ্ধ অনেক ভক্ত কিছু কিছু স্মৃতিকথা জাতীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিরাট প্রতিভাধর পুরুষের বিচিত্র চরিত্র নানা জনকে নানাভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল; ফলে এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে ঐকামত নাই। দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই বিদ্যাসাগরের জীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা লক্ষ্য করা যাইবে।

বিদ্যাসাগর বাল্যকালে যখন পিতা ঠাকুরদাস ও গ্রাম্য শিক্ষক কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পদব্রজে কলিকাতায় আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে মাইল ষ্টোনের উপর খোদিত ইংরাজী অঙ্কচিহ্ন দেখিয়া ইংরাজী অঙ্কপাত শিখিয়াছিলেন, এ কাহিনী বাঙলাদেশের প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু এই

সুপরিজ্ঞাত ঘটনাটি বিদ্যাসাগরের স্বরচিত 'জীবনচরিত', অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত' এবং বিহারীলাল সরকার ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখকদ্বয়ের দুইখানি বিদ্যাসাগর জীবনচরিতে ভিন্ন ভিন্ন আকারে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুপরিচিত ঘটনাও বিভিন্ন জীবনীকারদের গ্রন্থে নানাভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতি শিক্ষা সম্বন্ধেও জীবনীকারদের মধ্যে মতৈক্য নাই। স্বয়ং বিদ্যাসাগরের কথা দিয়াই আরম্ভ করা যাক :

"আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত ব্যবসায়ী ; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্যবশতঃ ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই ; ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব। এ জন্য পূর্বোক্ত পরামর্শ অর্থাৎ হিন্দুকালেজে অধ্যয়ন তাঁহার মনোনীত হইল না। তিনি বলিলেন, উপার্জনক্ষম হইয়া, আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃতশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া তিনি আমার ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে আন্তরিক অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা অনেকে পীড়াপীড়ি করিলেন, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।"

—বিদ্যাসাগর রচিত জীবনচরিত, ১৮৯৯ সন, পৃ ৫২।

অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলিতেছেন—"উপস্থিত সকলে বলিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার এই বুদ্ধিমান ছেলেটিকে ভালরূপে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে পিতৃদেব বলিলেন, ইহাকে হিন্দুকালেজে পড়িতে দিব মনে স্থির করিয়াছি। উপস্থিত সকলে বলিলেন, আপনি মাসিক ১০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন, তাহাতে হিন্দুকালেজে কেমন করিয়া অধ্যয়ন করাইবেন? এই কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন, ছেলের কালেজের মাসিক বেতন ৫৲ টাকা দিব, আর বাড়ীর খরচ ৫৲ টাকা পাঠাইব।"[১] বিহারীলাল সরকারও এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।[২] সুবলচন্দ্র মিত্রের রচিত বিদ্যাসাগরের প্রামাণিক জীবনীতেও এই তথ্য সরাসবি গৃহীত হইতেছে।[৩] এখানে দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগরের স্বলিখিত জীবনকাহিনীতে স্পষ্ট উল্লেখ

থাকিলেও সুপরিচিত ঘটনাটি অন্যান্য জীবনীকারদের দ্বারা ভিন্নরূপে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যাসাগরের জীবন ও সাধনার তাৎপর্য নানাজনের নিকট নানাভাবে প্রতিভাত হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? বিহারীলাল সরকার এবং সুবলচন্দ্র মিত্র বিরচিত বিদ্যাসাগরের জীবনী দুইখানি ইতিহাস হিসাবে প্রশংসনীয় হইলেও তাঁহারা বিদ্যাসাগরকে আপন আপন জ্ঞানবুদ্ধি ও রুচির প্রবণতা অনুসারে বিচার করিতে গিয়া মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর মত বিচার মূঢ়তার লূতাতন্তুর পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বহু বিবাহ নিরোধক প্রচার, ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন, সংস্কৃত কলেজের ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই পাঠাধিকার দান প্রভৃতি বিপ্লবাত্মক সমাজ সংস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বিহারীলাল সরকার মাঝে মাঝে বিদ্যাসাগরের এই সমস্ত অহিন্দু আচারের প্রতি তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। সুবলচন্দ্র মিত্র তো স্পষ্টই বলিয়াছেন,

"Vidyasagar was man of the age, he followed the course indicated by it. No doubt this course has brought on a greater mischief to the real Hindu, has materially injured the Hindu Religion, has propelled the Hindu society with great force in the direction of [illegible]nisation, but Vidyasagar ought not to be blamed for it. Col[illegible] who [illegible] him with such Materials knows why he did so."

লেখক অবশ্য ঈশ্বরের বিচিত্রসৃষ্টি বিদ্যাসাগরকে কিঞ্চিৎ করুণা করিয়া ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। সমস্ত ঘটনা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীকারদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার জীবন ও সাধনার মর্মবাণীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে গিয়া প্রতিকূল সংস্কারের জন্য ব্যর্থ হইয়াছেন। সঙ্কীর্ণ হিন্দুয়ানীর রুদ্ধ বাতায়ন হইতে বিদ্যাসাগরের মত বিরাট প্রতিভাকে বিচার করা যায় না, এ কথাটা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অগ্নিগর্ভ শমীশাখার মত প্রজ্বলন্ত পৌরুষদীপ্ত কর্মযোগী বিদ্যাসাগরের জীবন ও সাধনার গূঢ় বাণী বিচার করিলেই দেখা যাইবে, তিনিও ১৯শ শতকের বাংলা সাহিত্যের একটি সোপান হইয়া বাঙালীর প্রাণ ও মনের গুরুতর সঙ্কটের পদাঘাত

সহ্য করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার রচিত ও অনূদিত গ্রন্থ হইতে তাঁহার মানসিক ভাবাদর্শ, চিত্তলোকে বিভিন্ন প্রভাবের ঘাত প্রতিঘাত বিশেষ লক্ষ্য করা যাইবে না, তাহার কারণ—নিছক শিল্পসৃষ্টি বা সাহিত্যের প্রেরণা হইতে তিনি গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ হন নাই। লোকহিতব্রতী বিদ্যাসাগর নারায়ণের সেবা করিতে খুব উন্মুখ না হইলেও নরের মধ্যে নরোত্তমকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সরস্বতীর স্তবগান উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

॥ ৯ ॥

পূর্বতন ধারা

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের জন্য বাঙালা দেশ কতদূর প্রস্তুত ছিল, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ সুকঠিন চরিত্র, বজ্রবৎ পৌরুষ ও সমুদ্রবৎ অসীম করুণার সংমিশ্রণে যে অদ্ভুত মানুষটি গড়িয়া উঠিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে মনে হয়—তিনি যেন স্বয়ম্ভূ, এদেশের জলবায়ুতে এ মানুষের আবির্ভাব হইতে পারে না। তাই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এই বিচিত্র বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন।

"সেই জন্যই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধা হয়। অনেকে বিদ্যাসাগর চরিত্রে পাশ্চাত্য জাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দিগের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ; আমাদের মনুষ্যত্ব আমাদের নিকট নিষ্প্রভ, মলিন ও হীন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে যাহার সম্পূর্ণ অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল।"[৫]

এই যে অবাঙালীসুলভ চরিত্রবল এবং 'পাশ্চাত্য জাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ,' ইহার মূলে পরিবেশ, পৈত্রিক সংস্কার অথবা চরিত্রগত স্বকীয়তা—কোনটি অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিবার পূর্বে দেখা প্রয়োজন, তিনি যে ধারা অবলম্বন করিয়া কলিকাতার জাগ্রত জনচিত্তের রক্ত

শতদলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই ধারার কি স্বরূপ, এবং তাহার সহিত তাঁহার সম্পর্কই বা কিরূপ।

১৮২০ সালে বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়, সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয় ১৮২৯ সালে। তিনি বার বৎসর পাঁচ মাস এই কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষে পারঙ্গমত্ব অর্জন করেন। সামান্য ইংরাজী শিখিয়া হিন্দু ল' কমিটীর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর একুশ বৎসর বয়স্ক যুবক ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করিয়া শিক্ষায়তন ত্যাগ করেন। তাঁহার অধ্যাপকবৃন্দ—গঙ্গাধর শর্মা (ব্যাকরণ), জয়গোপাল শর্মা (কাব্য), প্রেমচন্দ্র শর্মা (অলঙ্কার), শম্ভুচন্দ্র শর্মা (বেদান্ত), জয়নারায়ণ শর্মা (ন্যায়), যোগধ্যান শর্মা (জ্যোতিষ) ও শম্ভুচন্দ্র শর্মা (ধর্মশাস্ত্র) তাঁহাকে পৃথকভাবে আর একখানি নিদর্শনপত্র দান করিয়া সানন্দে স্বীকার করেন:

"অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুক্ত কোম্পানিস্থাপিত বিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশবৎসরান্ ৫ পঞ্চমাসং শ্চোপস্থায়াধোলিখিত শাস্ত্রাণ্যধীতবান্।"

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনে কলিকাতার উপর দিয়া নানা পরিবর্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে। যখন ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু হয়, তখন বিদ্যাসাগর সাহিত্য-শ্রেণীতে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, বেণীসংহার রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত, দশকুমার চরিত, কাদম্বরী প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের মুকুটমণিস্বরূপ কাব্য ও নাটকাদি পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স তখন প্রায় ১৩ বৎসর। তাহার অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় অক্ষয়কুমার তখনও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন নাই। যে বয়সে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন, তাহার প্রায় একবৎসর পরে খিদিরপুরে অক্ষয়কুমারের ইংরাজী শিক্ষার সূচনা হয়।[৬] বিদ্যাসাগর যখন অলঙ্কার শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন তাহার একবৎসর পূর্বে নিতান্ত অপরিণত বয়সে অক্ষয়কুমার 'অনঙ্গমোহন' নামক একখানি আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করেন। অক্ষয়কুমার যখন তত্ত্ববোধিনী সভায়

যোগদান করেন (১৮৩৯ খ্রী অঃ) তখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের ছাত্র। একদিকে তত্ত্ববোধিনী সভার মারফতে শিক্ষিত বাঙালী-চিত্তে আস্তিক্যবোধের পুনর্জাগরণ, অপর দিকে সংস্কৃত কলেজের "ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়িনাং ছাত্রানাং" ইংরাজী শিক্ষার জন্য শিক্ষাবিভাগের নিকট আবেদন। সেই আবেদনকারী ছাত্রগণের সহিত বিদ্যাসাগরও নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রী অব্দে ... মে সংস্কৃত কলেজের সকল বিভাগের ছাত্রগণ ইংরাজী বিভাগ পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য (ইতিপূর্বে ইহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল) সম্পাদক জি, টি, মার্শেলের নিকট আবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন—

এইক্ষণে প্রার্থনা য অনুগ্রহপূর্বক রীত্যনুসারে আমারদিগের ইংরাজি ভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্য নির্বাহে সমর্থ হইতে পারি।'—ব্রজেন্দ্রনাথ—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ

সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সুদৃঢ় দুর্গে ফাটল ধরিল। দেবভাষা-শিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য তরুণগণ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। উনিশ বৎসরের তরুণ বিদ্যাসাগরও এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। যে বয়সে তিনি ইংরাজী শিক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়াছিলেন, প্রায় সেই বয়সে অক্ষয়কুমার রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন।[৭] ১৮৪১ সনে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার অর্থাৎ প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি উত্তমরূপে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন এবং তাঁহার বন্ধু প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পিতা) নিকট ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ একই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত হইতে ভারতপ্রেমিক ও প্রসিদ্ধ বাগ্মী জর্জ টমসনকে কলিকাতায় লইয়া আসেন (১৮৪৩)। টমসন সাহেব দক্ষিণারঞ্জন, রামগোপাল, কিশোরী চাঁদ প্রভৃতির মনে বাস্তব রাজনৈতিক চেতনা দান করিতে প্রয়াস পান। হিন্দুকলেজের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগণ টমসন সাহেবকে কেন্দ্র করিয়া 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক দ্বিভাষিক পত্রে উগ্র রাজনৈতিক উচ্ছ্বাস ছড়াইতে লাগিলেন। লর্ড এলেনবুরো হিন্দুকলেজের ইংরাজী-শিক্ষিত তরুণদের রাজনৈতিক উত্তেজনায় শঙ্কিত হইয়া এবং বাঙালীর য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান-

শিক্ষাকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "The Present System of education makes copyists and mob-orators".[৮] যখন চিৎপুরের ফৌজদারী বালাখানা অঞ্চলে রামগোপাল ঘোষ ও টমসন সাহেব ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে বাগ্মিতার গোলাবর্ষণ করিতেছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগকে বাংলা ভাষা শিখাইতেছিলেন এবং অবসর সময়ে নিজে সাংখ্য ও পুরাণ অধ্যয়ন করিতেছিলেন।[৯] 'ইয়ং বেঙ্গল'দের ধর্মহীন পার্থিব জ্ঞান ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সাধারণ বাঙালী যেন শান্তি পাইতেছিল না, উক্ত বায়বীয় উত্তেজনায় তাহারা যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হইল (১৬ই আগস্ট, ১৮৪৩)। শিক্ষিত বাঙালী নূতন পথের সন্ধান পাইল। বেদ-উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যান, জ্ঞানবিজ্ঞান, জ্যোতিষ-ভূগোল ইতিহাস সম্বন্ধে নব নব আলোক সম্পাত, বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে কৌতূহল—এক[illegible] বাঙালী একদিকে যেমন আপনার প্রাচীন ঐতিহ্যের সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিল, অন্যদিকে তেমনি জীবনের সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া বৃহদবিশ্ব সম্বন্ধে কৌতূহলী হইল।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইবার সময় (২২শে জানুয়ারি, ১৮৫১ পর্যন্ত বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবন আলোচনা করিলে উহাতে কয়েকটি বিরুদ্ধধর্মী ভাবধারা লক্ষ্য করা যাইবে। রামমোহন যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল নির্মোহ জ্ঞান, শাস্ত্র সংহিতা লোকাচার—সমস্ত কিছুকেই তিনি জ্ঞানবাদের দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। এই বুদ্ধির বশবর্তী হইয়াই তিনি একেশ্বরবাদ প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। বাঙালীর বহুযুগ সঞ্চিত লোকসংস্কারকে জ্ঞানের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিবার বিপ্লবী সাধনাই রামমোহনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাঁহার সমন্বয়কামী ও সংস্কারবাদী মন বেদান্ত, খ্রীষ্টীয় ঐক্যতত্ত্ব ও ইসলামী যুক্তিমার্গীয় একেশ্বরবাদ—ইহাদের সমন্বয়কেই জীবনধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং রাধাকান্ত দেববাহাদুর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 'ধর্মসভা'র নেতৃবৃন্দ সতীদাহ প্রথা লইয়া যতই আন্দোলন করুন না কেন, রামমোহনের বৃহত্তম কৃতিত্ব—বাঙালীর স্বাধীন ও শুভবুদ্ধির উদ্বোধন, ইহার গূঢ় অর্থ সে যুগের সমাজপতিগণ বোধহয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

অন্যত্র আমরা ডিরোজিও-শিষ্য ও হেয়ারের ভক্ত হিন্দুকলেজের বিদ্যুৎপ্রতিভাধর ছাত্রদের কথা বিবৃত করিয়াছি। রামগোপাল, রসিককৃষ্ণ,

দক্ষিণারঞ্জন প্রভৃতি তরুণ বাঙ্গালী ছাত্রগণ বিদ্যাসাগরের প্রায় সমকালে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া যে সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু তথ্য শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন; কথা প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুও তাঁহার আত্মজীবনীতে এই বিষয়ে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। এই তরুণগণ ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করিয়া জাতীয় ঐতিহ্যের মূলোচ্ছেদ করিয়া একটা কবন্ধ সংস্কৃতি সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। ইঁহাদের ভাবাদর্শের সহিত সমগ্র জাতির বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না টমসন ইঁহাদিগকে বাস্তবধর্মী রাজনীতি শিখাইতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইঁহারা আদৌ বাস্তববাদী ছিলেন না। ভাবলোকে বিচরণ করিতেন বলিয়া জাতির ধর্ম, ঐতিহ্য ও সমাজ-চেতন্যকে টমাস পেইনের *The age of Reason*-এর অবলম্বনে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। রামগোপাল ঘোষের সহিত বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট হৃদ্যতা থাকিলেও এই জাতীয় কালাপাহাড়ি মনোভাবকে বিদ্যাসাগর কোনদিনই সমর্থন করিতে পারেন নাই।

শাস্ত্রাচারের যে ধারাটিকে ভবানীচরণ প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী নেতৃবৃন্দ বালির বাঁধ বাঁধিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, বিদ্যাসাগরের পূর্বেই রামমোহন তাহাতে প্রকাণ্ড ফাটল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। চিত্তের শম্বুক বৃত্তির প্রাচীর তুলিয়া ভবানীচরণ-রাধাকান্ত দেবের দল প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে অশূদ্রপরিগ্রাহী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা হিন্দুকলেজকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখিতেন, নব্য ইংরাজীয়ানাকে বিশেষ সন্দেহ করিতেন; রামমোহনের একেশ্বর-বাদ, বৈদান্তিক মত প্রচার ও শাস্ত্রগ্রন্থের সুলভ প্রচারেও ইঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া ধর্মসভার বিদ্রোহপতাকা লইয়া বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিদ্যাসাগরের অধিষ্ঠানভূমি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙলার মনে যে সঙ্কট ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে ইন্ধন দান করিয়াছে একদিকে রামমোহনের যুক্তিবাদ ও শাস্ত্রপ্রচার, অপরদিকে হিন্দুকলেজের 'ইয়ং বেঙ্গল'গণের সমাজবিপ্লব, ধর্মসভার উভয় ব্যাপারের প্রতিকূলতা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের দ্বারকানাথ, রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, আশুতোষ দেব, খিদিরপুরের ঘোষাল পরিবারের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে নূতন প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা,

হেয়ার-ডাফ সাহেব প্রবর্তিত ইংরাজী শিক্ষা, সংস্কৃত কলেজের পুরাতন প্রণালীর স্মৃতি পুরাণ-কাব্য-দর্শন-ব্যাকরণ-অলঙ্কার পাঠনা এবং ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকরে'র পরিহাস-তরল স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রা। নূতন ও পুরাতনের এই যে দ্বন্দ্ব,—বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ হইতে কৃতবিদ্য হইয়া বাহির হইবার পূর্বেই এই যুগ সংকটের ছায়াতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একদিকে যুগ যুগ ধরিয়া বহমান রুদ্ধতোয় সংস্কৃত ভাষাবাহী প্রাচীন সংস্কার এবং রামমোহনের জ্ঞানবাদের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত অতীত ঐতিহ্যের মূল্যমান পরিবর্তন, অপর দিকে ইংরাজী ভাষার মারফতে আগন্তুক ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান। বিদ্যাসাগর এই পরস্পরবিরোধী ভাবাদর্শের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুকলেজের মধ্যে স্থানিক দূরত্ব ছিল না, কিন্তু উভয় বিদ্যায়তনের ছাত্রসমাজের ভাবাদর্শের মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান। এই ভাবাদর্শের সংঘর্ষ তরুণ বিদ্যাসাগরকে কি পরিমাণে আলোড়িত করিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইবার উপায় নাই। কিন্তু যিনি পরবর্তী কালে জাতির দীর্ঘকাল-লালিত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠিয়া বৃহত্তর মানব ধর্মের উদারতর বাণী প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যে ছাত্রাবস্থায় সমসাময়িক ভাববিপ্লবের সংঘর্ষে কিয়দংশে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিচার করিলে আমরা প্রধানতঃ তাঁহার তিনটি মানস-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারি—সংস্কারমুক্ত মন, মানবপ্রেম ও যুক্তিবাদ। মানবপ্রেমের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাদের অনুমান বিদ্যাসাগরের মানবপ্রেম হইতেই সংস্কারমুক্তি ও যুক্তিবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। হিন্দু-কলেজের তরুণ ছাত্রসম্প্রদায় হিন্দুর সংস্কার বর্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে মানবপ্রেমের তপ্ত স্পর্শ ছিল না। ইউরোপীয় জীবনধারার উত্তেজক পানীয় পান করিয়া তাহাদের চিত্ত উদ্বেজিত হইয়াছিল; তাঁহাদের সে জাগরণ নিতান্তই বহিরঙ্গ-বিলাসী চিত্তের প্রাথমিক উজ্জীবন মাত্র। জীবনের গভীরে অবস্থিত কোন গূঢ়তর এষণা তাঁহাদের জীবনধর্ম ও সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ইউরোপীয় শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারা পৈত্রিক সংস্কারকে জীর্ণ বসনের মতই ত্যাগ করিয়াছিলেন; আত্মার সংকট বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা এই তরুণদের চিত্তপটে বিশেষ কোন সংশয়ের ছায়া সঞ্চার করিতে পারে নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের চিত্ততটে যে সংস্কারমুক্তির সমুদ্রতরঙ্গ আহত হইয়াছিল, তাহার মূলে স্থানিক ও কালিক পরিবেশের প্রভাব থাকিলেও তাঁহার নিজস্ব চরিত্র-স্বাতন্ত্র্য

ও ব্যক্তিসত্তার একান্ত অভিনবত্বই তাঁহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী-জীবনে এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। পূর্বতন সমাজ-ধারা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এবং তাহাতে নিজ প্রাণধর্মের বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চার করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা দেশে যে ঐতিহ্যের পথরেখা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা যুগান্তরের পটে এখনও দীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে।

॥ ২ ॥

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থপরিচয়

সাহিত্যিক মূল্যমানের দ্বারা বিদ্যাসাগরের প্রতিভা বিচার-বিশ্লেষণ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ তিনি বিশুদ্ধ সারস্বত প্রেরণার বশে কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই। জীবনে তিনি অতিশয় বাস্তববাদী ছিলেন। বস্তুর প্রয়োজনীয়তা দিয়াই তাহার স্বরূপ নির্ধারণ করিতেন। তাই জনশিক্ষার প্রেরণাবশে তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা:—সংস্কৃত—১৭, ইংরাজী—৪, বাংলা—৩২। মোট—৫৩। ইহার মধ্যে ১৫ খানি স্কুলপাঠ্য। যিনি শুধু জনশিক্ষা প্রচারের জন্য অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা কোন্ শ্রেণীর, তাহা সহজেই অনুমেয়। কর্মযোগী বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রচারের ও সমাজ-সংস্কারের জন্য আজীবন যেমন প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ ঐ একই প্রয়োজনে লেখনী সঞ্চালন করিয়া এতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বক্ষ্যমাণ অংশে আমরা ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত রচিত তাহার গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া ইহাতে ১৯শ শতাব্দীর যুগধর্ম কি পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আলোচনা করিব।

১। **বাসুদেবচরিত (১৮৪২-৪৭)**—ইহা বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্যগ্রন্থ, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহা মুদ্রিত হয় নাই। পাণ্ডুলিপির আকারেই ছিল, অধুনা ইহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারীলাল সরকার তাঁহাদের গ্রন্থে মূল পুঁথি দৃষ্টে 'বাসুদেব-

চরিতে'র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে এই উদ্ধৃতি নির্ভুল কিনা সন্দেহ আছে। কারণ চণ্ডীচরণ যে উদ্ধৃতিটুকু মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ণচ্ছেদ ভিন্ন অন্য কোন বিরামচিহ্ন দেন নাই; কিন্তু বিহারীলাল সরকার তাঁহার গ্রন্থে (বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ১৪৬) প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বিরামচিহ্ন দিয়াছেন। কাজেই মূল পাণ্ডুলিপির অংশটি এই জীবনীগুলিতে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা বিচার্য। বিহারীলাল যে পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন তারিখ দেওয়া ছিল না। তাঁহার মতে এই পুস্তক ১৮৪২-৪৭ সনের মধ্যে অনূদিত হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের প্রয়োজনের জন্য বিদ্যাসাগর ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে 'বাসুদেবচরিত' রচনা করেন; কিন্তু কলেজ-কর্তৃপক্ষের খ্রীস্টানী সংস্কার কৃষ্ণজীবনীটি গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই এই গ্রন্থ আদৌ মুদ্রিত হয় নাই, পরে পাণ্ডুলিপি'টও হারাইয়া গিয়াছে। পরবর্তী যুগে বিদ্যাসাগর বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া 'বাসুদেবচরিত' প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া না পাওয়ায় মুদ্রণ হইয়া উঠে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই-একটি অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁহার দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং ১৩০৮ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিদ্যাসাগর-সংগৃহীত দেশীয় শব্দকোষ প্রকাশ করেন। অথচ তিনি কেন যে 'বাসুদেবচরিত' প্রকাশ করিলেন না, তাহার কারণ বুঝা যাইতেছে না। বিদ্যাসাগরের অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট হইতে জীবন-চরিতকারগণ এই পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'বাসুদেবচরিতে'র পাণ্ডুলিপিটি, যে-কোন কারণেই হউক মুদ্রাযন্ত্রের কবলিত হয় নাই। মুদ্রিত হইলে বিদ্যাসাগরের প্রথম বাংলা গদ্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যাইত। ইহার যে অংশটুকু চণ্ডীচরণ ও বিহারীলাল প্রণীত বিদ্যাসাগরের জীবনী দুইখানিতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগর প্রথম যৌবনে কৃষ্ণের ভাগবতোক্ত জীবনকাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উক্ত মহাগ্রন্থের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে এই অনুবাদ কার্যে অগ্রসর হন। ইহাকে বিশুদ্ধ অনুবাদ বলা চলে না, কারণ তিনি কোন কোন স্থলে কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছেন, কোথাও-বা মূলের প্রত্যক্ষ উক্তিগুলিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিণত করিয়া বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। একটু দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল—

"এক দিবস কৃষ্ণবলরাম ও অন্য অন্য গোপবালকেরা একত্রে মিলিয়া খেলা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে বলরাম প্রভৃতি গোপনন্দনেরা নন্দমহিষীর নিকট গিয়া কহিল, ওগো, কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে। আমরা বারণ করিলাম, শুনিল না। তখন পুত্রবৎসলা যশোদা আস্তেব্যস্তে আসিয়া কৃষ্ণের গণ্ড ধরিলেন এবং তর্জন করিয়া কহিলেন, রে দুষ্ট, তুই মাটি খাইয়াছিস! রহ, আজ আমি তোকে মাটি খাওয়া ভাল করিয়া শিখাইতেছি।"

এই অনুবাদ যে কত সরল তাহা পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত এবং শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত অধুনা প্রচলিত ভাগবতের অনুবাদ (শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কর্তৃক সংশোধিত শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুবাদ, পৃ ৬২৮) পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। আমাদের মনে হয়, বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র ভাষা স্থানে স্থানে জাড্য-আশ্রিত, 'বাসুদেবচরিতে'র মত সহজ সরল নহে।

"বাসুদেবচরিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণলীলা প্রকটিত, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ভগবদ্‌ভাবের পূর্ণ প্রকটন।"১০ পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণের চরিতাখ্যান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় নাই। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার সক্ষোভে বলিয়াছেন, দুঃখ এই, বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ ভগবানের অবতারত্ব প্রতিপাদক পুস্তক আর লেখেন নাই। চিরকাল কিছু তাঁহাকে সাহেব-সিবিলিয়ানদের জন্য পাঠ্য লিখিতে হয় নাই। প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা থাকিলে তিনি হিন্দুসন্তানের জন্য এইরূপ ইহপরকালের শিক্ষণীয় সুপাঠ্য পুস্তক লিখিতে পারিতেন। তিনি সাহেবদের জন্য এইরূপ গদ্য লেখেন নাই, হিন্দুসন্তানদের জন্যই বা লিখিয়াছেন কৈ?" ১১ সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁহার গ্রন্থেও (*Isuar Chandra Vidyasagar—story of his life and work 1907, P. 64*) বিহারীলালের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। বিদ্যাসাগরের ধর্মজীবন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিব। এখন শুধু এইমাত্র বলা যায় যে, যিনি মহাভারত অনুবাদ করিতে পরাঙ্‌মুখ হন নাই, তিনি বাসুদেবের জীবনকথা বিবৃত করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া না পাওয়াতেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনি এমন সমস্ত সামাজিক কাগজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পাঠ্য পুস্তক ও প্রচারপুস্তিকা ভিন্ন অন্য কোন পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার জন্য উৎসাহ বোধ করেন নাই। শুধু 'হিন্দুসন্তানদের জন্য ইহপরকালের শিক্ষণীয় পুস্তক' সম্বন্ধেও তাঁহার তীব্র অনুরাগ ছিল না। প্রথমতঃ শুধু হিন্দুর জন্যই পৃথক করিয়া ভাবিবার মানুষ বিদ্যাসাগর ছিলেন না; দ্বিতীয়তঃ

প্রত্যক্ষবাদী বিদ্যাসাগর মানুষের ইহকাল লইয়া এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ের দিকে মন দিতে পারেন নাই। তবে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইলে তাঁহার প্রথম যুগের গদ্যের নমুনা, এবং বাসুদেবকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহারও একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইত। জীবনীকার বলিতেছেন বটে, "বাসুদেবচরিতে শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন স্থানের ভাবমাত্র গৃহীত এবং কোন কোন স্থান অবিকল ভাষান্তরিত।"১২ কিন্তু উক্ত পাণ্ডুলিপিটি হস্তগত না হওয়ায় তিনি এই অনুবাদে যথার্থ কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। বিদ্যাসাগর প্রথম গদ্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন কেন, তাহা আলোচনার যোগ্য। বৈষ্ণবমত তাঁহাদের কুলধর্ম ছিল না; তিনি পরেও বৈষ্ণবমতের প্রতি আন্তরিক আনুকূল্য দেখান নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান ভিত্তি ভাগবতের দশম স্কন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত; বিদ্যাসাগরও সেই অংশটুকু অর্থাৎ কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না; কিন্তু কৃষ্ণজীবনের এই অংশের প্রতি যে মানবীয় রসের প্রভাব আছে, হয়তো মানবরস-রসিক বিদ্যাসাগর ভাগবতের এই স্কন্ধের প্রতি সেই জন্যই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে কেহ তাঁহার নিকট ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে কোন উপদেশ চাহিতে গেলে তিনি গীতার নিষ্কাম ধর্মকেই একমাত্র শরণ্য বলিয়া নির্দেশ দিতেন। তাঁহার উক্তি—"গীতার উপদেশ অনুসারে চলিলেই ভাল হয়—"১৩ তাঁহার পরবর্তী জীবনসাধনার সহিত সমসূত্রে গ্রথিত। কর্মযোগী বিদ্যাসাগর নাস্তিক, সংশয়বাদী—যাহাই হউন না কেন, গীতার নিষ্কাম কর্মাদর্শের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেন। কিন্তু প্রথম যৌবনের এই 'বাসুদেবচরিতে' তিনি প্রধানতঃ বৃন্দাবন রাস-রসশেখর কৃষ্ণের জীবন-লীলাকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। বোধ হয় দীর্ঘকাল 'বাসুদেবচরিত' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কোন অনুসন্ধান করেন নাই, যত্নপূর্বক রক্ষা করাও প্রয়োজন বোধ করেন নাই। জীবনে তিনি অত্যন্ত হিসাবী সংসারী ছিলেন, কোন জিনিষই অপচয় হইতে দিতেন না; সুতরাং 'বাসুদেবচরিতে'র পাণ্ডুলিপি যে তাঁহার সতর্কদৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় নাই, ইহাতেই অনুমিত হইতেছে যে পরবর্তী কালে ঐ গ্রন্থ বা ঐ জাতীয় অনুভূতি তাঁহাকে আর আকৃষ্ট করে নাই। যদি কথা উঠে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিদেশী ছাত্রদিগকে গল্পরস পরিবেশন করার উদ্দেশ্যেই

তিনি ভাগবতের দশম স্কন্ধের অ্যাখানভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি পঞ্চতন্ত্র, দশকুমারচরিত প্রভৃতির গল্পরস ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের ভাগবতী কথা অনুসরণ করিলেন কেন? আমাদের অনুমান, বৈষ্ণবধর্ম ও আদর্শের প্রতি বামমোহনের যেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, প্রথম যৌবনে সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের সেরূপ কোন প্রতিকূল মনোভাব ছিল না। যাহা হউক পাণ্ডুলিপিটি পূর্ণ আকারে উদ্ধার করা সম্ভব হইলে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে একটা স্মারক স্তম্ভেব দর্শন মিলিত।

২। বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)—'বাসুদেবচরিত' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অগ্রাহ্য হইলে বিদ্যাসাগর নিছক ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ গল্পাত্মক কাহিনী রচনা করেন। ইহা অবশ্য মৌলিক গ্রন্থ নহে, ১৮০৫ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য মুদ্রিত হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী' অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচিত হয়; প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ বলিলেই চলে, কেবল হিন্দী পুস্তকের অশ্লীল অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং ঘটনা বা বক্তব্য কোথাও কোথাও সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে বিদ্যাসাগরের নাম ছিল না—"কালেজ আফ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মেজর জি. টি. মার্শাল মহোদয়ের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অনুসারে লিখিত।" শুধু এইটুকু মাত্র পরিচয় ছিল।১৪ শিবদাস ভট্টের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ না করিয়া তিনি কেন হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার কাবণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বেতাল-পঞ্চবিংশতির দুইটি প্রামাণিক সংস্কবণ বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হইয়াছে। একটি হইল—১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে লিপজিক্ হইতে শিবদাস ভট্টের মূল সংস্কৃত ও জার্মাণ টীকাসহ প্রকাশিত **Die Vetāla Pancavimsakiā,**—১৪৮৭ খ্রীঃ অব্দে পুঁথির পাঠে অবলম্বনে সম্পাদিত হয়। ১৯৩৪ সালে **American Oriental Series**-এর চতুর্থ খণ্ডে **M. B. Emenneaw**-এর অনুবাদসহ যে বেতাল-পঞ্চবিংশতি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা জম্ভল দত্ত প্রণীত। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা হইতে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রকাশিত বেতালপঞ্চবিংশতি একদা অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর কেন শিবদাস ভট্টের সংস্কৃত পুঁথি ত্যাগ করিয়া হিন্দী অনুবাদ অবলম্বনে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনা করিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার জীবনীকার বলিয়াছেন, "এই সময় তিনি হিন্দী

ভাষায় যথেষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় স্বরূপেই বোধহয় নবার্জিত ভাষাভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয়।"১৬ হিন্দীগ্রন্থে যে সমস্ত অশ্লীলতা ছিল, অনুবাদকালে বিদ্যাসাগর তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গ্রন্থটি গ্রহণযোগ্য কিনা, কলেজ-কর্তৃপক্ষ তাহা নির্ধারণের ভার দেন রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যে কোন কারণেই হোক কৃষ্ণমোহন এই গ্রন্থের অনুমোদন করেন নাই। তখন বিদ্যাসাগর শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেবের নিকট এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করেন। মার্শম্যান ইহার প্রশংসাসূচক সুপারিশপত্র দিলে তবে কলেজ কর্তৃপক্ষ ইহা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণমোহন কেন ইহার অনুমোদন করেন নাই তাহা বুঝা যাইতেছে না। যদিও 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রথম সংস্করণের ভাষা কিঞ্চিৎ দুরূহ ছিল, কিন্তু কৃষ্ণমোহনের 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে'র তুলনায় বিদ্যাসাগরের ভাষাকে আদৌ দুরূহ বলা যায় না। কালীর কাছে বলিদান ভিন্ন ইহাতে হিন্দু সম্প্রদায় সম্বন্ধে এমন কোন কথা নাই, যাহাতে খ্রীস্টান সিভিলিয়ানগণের ধর্মমতে আঘাত লাগিতে পারে। তথাপি কৃষ্ণমোহন কেন যে এই গ্রন্থের অনুমোদন করেন নাই, তাহার কারণ জানা যাইতেছে না।

বিদ্যাসাগর অবশ্য বেতালপঞ্চবিংশতি জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য স্বীকার করিতেন না। 'বৈতাল পচ্চীসী' নামক হিন্দী গ্রন্থের যে পুনঃ সংস্করণ প্রকাশিত হয়, বিদ্যাসাগর তাহার ভূমিকায় বলিয়াছিলেন, "The work contains no traces of art or genius in its composition, but on the contrary exhibits the clumsy attempts at the wonderful, sometimes bordering on childishness, which are so general in the Legeds of a dark age."

শুধু বিদেশী কর্মচারীদিগকে গল্পরসের মধ্য দিয়া ভাষা শিখাইবার জন্যই তিনি এই মৃত্তিকাতলচারী গল্পগুলিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিম্নে মূল সংস্কৃত, হিন্দী অনুবাদ এবং বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া ইহাতে বিদ্যাসাগরের দক্ষতা বিচার করা যাইতেছে।

১। শিবদাস ভট্টের বেতালপঞ্চবিংশতিকা

অন্যদা শ্মশানে নিশীথ সময়ে রুদন্তঃ সকরুণং শব্দং রাজা শৃণোতি। রাজ্ঞোক্তম্ দ্বারে কস্তিষ্ঠতি? বীরবরেণোক্তম্ দেবাহমস্মি। রুদন্ত্যা নার্য্যাঃ শব্দং শৃণোসি? তেনোক্তম্। তস্যাঃ সমীপে গত্বা শীঘ্রমেব স্বরূপং সমানয়। ততো বীরবরো রুদন্ত্যাঃ শব্দানুযোগতঃ।

২। জন্তুল দত্ত প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতি

অথৈকদা দক্ষিণস্যাং দিশি বাত্রাবেকা স্ত্রী করুণ স্বরেণ রোদিতি। তচ্ছ্রুত্বা রাজা বদতি দৌবারিকাস্তিষ্ঠসি। বীরবরেণোক্তম্ দেবাহমস্মি। নৃপেণোক্তম বীরবর, কা রোদিতি। ত্বাং নিশ্চিত্য মাং জ্ঞাপয়। অন্তোঽয়ং গতঃ।১৭

৩। হিন্দী বৈতাল পচ্চীসী

অলকিসসঃ একরোজ কা জিক্রহৈ কি ইত্তিফাকন রাতকে বক্ত মরঘটসে বণ্ডীকে রোনে কী আবাজ আই। রাজা সুনকে পুকারা কোই হাজির হৈ? বীরবর সুনতে হী বোলা হাজির জী হুকম, রাজানে যো হুকম কিয়া জহাঁ সে উবক্ত কে রোনেকী আবাজ আতী হৈ, যহাঁ জাও, উব উসসে রোনে কা খবর পুছকর জলদ্ আও।—১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগর মুদ্রিত নব সংস্করণ।

৪। বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতি

একদিন নিশীথ সময় অকস্মাৎ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া বীরবরকে আহ্বান করিলে সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখবর্তী হইয়া কহিল, মহারাজ। কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, দক্ষিণদিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শুনা যাইতেছে, ত্বরায় ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া আমাকে সংবাদ দাও। বীরবর যে আজ্ঞা মহারাজ, বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

—বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, সাহিত্যখণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪

এই উদ্ধৃতি হইতে দেখা যাইতেছে য, বেতালপঞ্চবিংশতির বিভিন্ন সংস্করণ ও বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পাদিত পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে বিরাট কোন পার্থক্য নাই। বিদ্যাসাগর এই রোমান্টিক আখ্যানগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন আরও একটি কারণে। ইহার প্রতিটি গল্পের মধ্যে একটি সমস্যা আছে যাহা একান্তভাবে বুদ্ধিগ্রাহ্য। বেতালের প্রশ্ন ও রাজার উত্তর যুক্তিপন্থার দ্বারা চালিত হইয়াছে। যেমন—"ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ। চোর কি নিমিত্ত প্রথমে হাস্য ও পরে রোদন করিয়াছিল, বল। রাজা কহিলেন, চোর কন্যার কামনা শুনিয়া আমার মৃত্যুর সময়ে উহার অনুরাগ উপস্থিত হইল, ভগবানের কি ইচ্ছা, কিছুই বুঝা যায় না; এই আলোচনা করিয়া, প্রথমে হাস্য করিয়াছিল; অনন্তর ঐ কন্যা, আমার নিমিত্তে রাজাকে সর্বস্ব দিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি ইহার এমন কি উপকারে আসিতাম, এই অনুশোচনা করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে রোদন করিল।" এই গল্পগুলির মধ্যে এই জাতীয় একটা যুক্তি-আশ্রয়ী মন বিরাজ করিতেছে। বিদ্যাসাগর বোধ হয় ইহার প্রতি এই জন্যই আকর্ষণ বোধ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, দীর্ঘদিন ধরিয়া এই গ্রন্থটি সাধারণ বাঙালীর গল্পপাঠের পিপাসা তৃপ্ত করিয়াছিল।

৩। বাঙ্গালার ইতিহাস—২য় ভাগ (১৮৪৮)—পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা মিটাইবার জন্য বিদ্যাসাগর একখানি বাংলা ইতিহাস গ্রন্থের প্রয়োজন বোধ করিতেছিলেন। মার্শম্যানের *Outlines of the History of Bengal for the use of youths in India* গ্রন্থটির শেষাংশ অবলম্বনে (১১শ অধ্যায় হইতে ১৯শ পর্যন্ত) বিদ্যাসাগর সরল ভাষায় বাংলার ইতিহাস অনুবাদ করেন। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয়ভাগ শ্রীযুক্ত মার্শম্যান সাহেবের রচিত ইংরাজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনপূর্বক সঙ্কলিত, এই গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে।...এই পুস্তকে অতি দুবাচাব নবাব সিরাজউদ্দৌলাব সিংহাসনারোহণ অবধি চিরস্মরণীয় লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক্ মহোদয়ের অধিকাব সমাপ্তি পযন্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।"

বিদ্যাসাগর প্রায় মার্শম্যানেব অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন। মার্শম্যানেব সাম্রাজ্যবাদী ও ইসলামবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গিমাও তিনি হুবহু স্বীকার করিয়া লইয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন। অন্ধকূপ হত্যা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সংশয় উপস্থিত হয় নাই, অনুবাদেও তাহার কোন আভাস নাই। অনুবাদটি যে অতি সুললিত তাহা অবশ্য স্বীকার্য। যথা—

মার্শম্যান—"There was in the fort at this time a room, eighteen feet long by fourteen, with only one window at each end to admit air, in which turbulent soldiers used to be confined Into this small chamber, the Mahomedans thurst all the European prisoners in the hottest month of the year . Gradually one after another sank down dead on the floor; and remainder, standing on this heap of bodies, had more room to breathe in; and thus a few survived"১৮

বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদ: "তৎকালীন দুর্গের মধ্যে দীর্ঘে বার.হাত, প্রস্থে নয় হাত এরূপ এক গৃহ ছিল। বায়ু সঞ্চারের নিমিত্ত, ঐ গৃহের এক এক দিকে এক এক গবাক্ষ থাকে। ইংরেজরা কলহকারী দুর্বৃত্ত সৈনিকদিগকে এই গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। নবাবের সেনাপতি, দারুণ গ্রীষ্মকালে সমস্ত য়ুরোপীয় বন্দীদিগকে ঐ ক্ষুদ্র গৃহে নিক্ষিপ্ত করিলেন।...এক একজন করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেক পঞ্চত্ব পাইয়া ভূতলশায়ী হইল। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা শবরাশির উপর দাঁড়াইয়া নিঃশাস আকর্ষণের অনেক স্থান পাইল এবং তাহাতেই কয়েকজন জীবিত থাকিল।"১৯

এই অনুবাদ একাধারে যেমন আক্ষরিক, তেমনি পড়িতে পড়িতে ইহাকে অনুবাদ বলিয়া মনেই হয় না।

কেহ অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন অথবা অনুসরণ করিয়াছেন। মার্শম্যান সিরাজকে "A Monster of cruelty" বলিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও তাঁহাকে "নৃশংস রাক্ষস" বলিয়াছেন। নন্দকুমার সম্বন্ধে মার্শম্যান বলিয়াছেন, "There can be no doubt that Nundu Koomar was one of the most infamous characters among the natives." কিন্তু বিদ্যাসাগর আরও একটি পংক্তি যোগ করিয়া বলিয়াছেন, "নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন বটে; কিন্তু ইম্পি ও হেষ্টিংস্ তাঁহা অপেক্ষা অধিক দুরাচার ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই।"[২০] বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সিরাজকে নৃশংস দুরাচার রূপে চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার চরিতকার বিহারীলাল সরকার একটু ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বিদ্যাসাগর অনুবাদ করিতে বসিয়াছেন, অনুবাদকের কর্তব্য হইল মূলকে প্রতিপদে অনুসরণ করা, নিজস্ব মতামত দেওয়া তাঁহার কর্তব্য নহে। উপরন্তু পুস্তকখানি বালকপাঠ্য গ্রন্থরূপেই প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং এইরূপ পাঠ্য পুস্তকে বিভিন্ন মতামতের দ্বন্দ্ব থাকাও উচিত নহে। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় হয়তো পাদটীকা বা পরিশিষ্টেও এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। আমাদের মনে হয়, ১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধেও সিরাজকে স্বাদেশিকতার ভক্তি চন্দনে পূজা করা হইত না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলন বিরাট আকার ধারণ করিলে, ঐ স্বদেশপ্রেম ইতিহাসকেও রূপান্তরিত করিতে আরম্ভ করিল, বিদ্যাসাগরের জীবনীকার সেই উত্তেজিত ঐতিহাসিক ক্ষণে জীবনী রচনা করিতে বসিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি বিদ্যাসাগরের আচার আচরণের মধ্যে অহিন্দু ভাবাদর্শ লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের সময়ে—এমন কি বঙ্কিমযুগেও সকলে সিরাজকে মহা-অত্যাচারী, পাপী ও দুর্দান্ত বলিয়াই মনে করিতেন। বিদ্যাসাগরও সেই আবহাওয়ায় বর্ধিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি সিরাজকে "অতি দুরাচার নবাব" বলিয়াছেন।[২১]

এই অনুবাদে বিদ্যাসাগরের ইতিহাস রচনার স্পৃহা পরিতৃপ্ত হয় নাই।

তাঁহার ছাত্র ও অনুচর রামগতি ন্যায়রত্ন মার্শম্যানের ইতিহাসের পূর্বার্ধ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন—'বাংলার ইতিহাস' প্রথম খণ্ড। ইহার পশ্চাতেও ছিল বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণা। ভারতের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিবার জন্য তিনি অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[২২] একদা তিনি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়কে ভারতের ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার নিকট উপস্থিত অন্য সকলকে বলেন, "ভারতবর্ষের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, কেবল শরীর ভাল নয় বলিয়া আজ-কাল করিয়া বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে।"[২৩] বিদ্যাসাগর ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিলে ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ভারত ও বাঙলা দেশের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইত এবং বিদ্যাসাগর ভারত-ঐতিহ্য সম্বন্ধে, কোন্ মনোভাব পোষণ করিতেন, তাহাও বুঝা যাইত।

৪। জীবন চরিত (১৮৪৯)—বাঙালী ছাত্রের চরিত্র গঠনের জন্য বিদ্যাসাগর রবার্ট ও উইলিয়ম চেম্বার্সের *Biography* অবলম্বনে কয়েকজন অধ্যবসায়শীল বিদেশী ব্যক্তির জীবনচরিত্র সঙ্কলন করেন। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশ্যস্, লিনিয়স্, ডুবাল, জেংকিন্স্ এবং জোন্স্ —প্রধানতঃ এই কয়জন জ্ঞানতাপসের জীবনকথা চেম্বার্সের গ্রন্থ হইতে বাছিয়া লইয়া এই 'জীবনচরিত' রচিত হয়। বলা বাহুল্য, নিছক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় ও পুরুষকারের দ্বারা মানুষ তাহার ভাগ্যকে জয় করিতে পারে, নিয়তির ক্রূর নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া সর্ববিধ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার নির্দেশ ঐ আখ্যানগুলিতে আছে। বিদ্যাসাগর বাঙালী ছাত্রকে এই চারিত্রিক পৌরুষ শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য গ্রন্থটিতে শুধু বিদেশী ব্যক্তির চরিত্রকথা আছে, দেশীয় কাহারও কোন উল্লেখ নাই। এই জন্য বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল এই জীবনগ্রন্থ পাঠে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই।[২৪] অবশ্য আর এক জীবনীকার[২৫] সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন যে, "ইহাতে হিন্দুবিরোধী কোন কথা নাই।" এ কথা অবশ্য যথার্থ যে, ইহাতে ঈশ্বর-কৃপা অপেক্ষা মানুষের নিজ নিজ প্রয়াসের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু বিদ্যাসাগরকে স্বদেশীয় লোকের জীবনী লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ বিশেষ কিছু

করা সম্ভব হয় নাই।[২৬] ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর সম্ভবতঃ সংশয়বাদী ছিলেন (পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে)। কাজেই এই গ্রন্থে ঈশ্বর বিষয়ক প্রসঙ্গ নাই। তিনি স্বদেশীয় ব্যক্তির জীবনী রচনার প্রতিও বিশেষ কোন উৎসাহ বোধ করেন নাই। তাহার প্রধান কারণ, রামমোহনকে ছাড়িয়া দিলে, তাঁহার সমসাময়িক কালে বাঙালী-সমাজে এমন কোন মহত্তর মানুষের আবির্ভাব হয় নাই যাঁহার পুণ্যশ্লোক জীবনকথা বিদ্যাসাগর ছাত্রদের জীবনাদর্শরূপে সঙ্কলন করিতে পারিতেন। উপরন্তু ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের দ্বারা তিনি পাঠ্য পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছিলেন, কাজেই এই 'জীবন চরিত' গ্রন্থে কেবল বিদেশী ব্যক্তির জীবনকথা স্থান পাইয়াছে। তখন প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী বিশেষ কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর আনুকুল্যে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বালক-বালিকার জন্য যে সমস্ত গল্পগ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার গল্পরস প্রশংসনীয় হইলেও তাহাতে চরিত্রগঠনোপযোগী বিশেষ কোন আদর্শ ছিল না। এই জন্যই বিদ্যাসাগর ইংলণ্ডের দেশবরেণ্য জ্ঞানসাধকদের জীবনকথা সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

৫। বোধোদয় বা শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ (১৮৫১)—বিদ্যাসাগর শিশুশিক্ষার নিমিত্ত প্রধানতঃ চেম্বার্সের *Rudiment of Knowledge* নামক গ্রন্থ অবলম্বনে এবং আরও নানা স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বেথুন স্কুলের জন্য 'বোধোদয়' রচনা করেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'শিশুশিক্ষা' নামক বালক-পাঠ্য পুস্তিকার তিন ভাগ রচনা করেন। বিদ্যাসাগর সতীর্থ ও অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ মদনমোহনের গ্রন্থের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া চতুর্থ ভাগ প্রণয়ন করিলেন। কিন্তু বাঙলা দেশে ইহা সাধারণতঃ 'বোধোদয়' নামে পরিচিত। এই গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করিয়াই একদা বাঙালী ছাত্রের প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হইত। বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত) সমাজখণ্ডের সম্পাদক বলিয়াছেন, "তিনি নিজে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইতিহাস-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া এদেশের বালক-বালিকাদিগের জন্য রত্ন আহরণ করিয়াছিলেন।"[২৭] বাস্তবিক এ কথা অতিশয় সত্য। বিদ্যাসাগরও উক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছিলেন, "বোধোদয় নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল। পুস্তক-বিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধকরি তদপাঠে, অমূলক গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে।"[২৮] ইহাতে যেমন একাধারে ঈশ্বরতত্ত্ব আছে,

তেমনি আবার পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও গণিত সম্বন্ধেও আলোচনা স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বিহারীলাল সরকারের মতে, ইহা নাকি "হিন্দু সন্তানের সম্যক্ পাঠোপযোগী নহে। বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেক স্থলে বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা।" হিন্দুয়ানীর সঙ্কীর্ণ বাতায়ন হইতে দর্শন করিলে এই পাঠ্য পুস্তকখানির যথার্থ মূল্য বুঝা যাইবে না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণীয়। 'বোধোদয়ে'র প্রথমেই ঈশ্বর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।" এই উক্তিটি লইয়া হিন্দু ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু মতভেদ হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর সম্পাদক (তৃতীয় সংস্করণ) পাদটীকায় বলিয়াছেন যে, "১৮৪১ সালে প্রদত্ত কোন বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ এই মহাবাক্য কয়েক বৎসর পরে (১৮৫১) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক তাঁহার বোধোদয় পুস্তকে গৃহীত হয়।"[২৯] হিন্দুয়ানীর পক্ষপাতী বিহারীলাল সরকার বলিয়াছেন, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ—ইহা বালক তো বালক, কয় জন বিজ্ঞতম বৃদ্ধের বোধগম্য হয় বল দেখি ?"[৩০] কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, 'বোধোদয়ে'র প্রথম সংস্করণে ঈশ্বরবিষয়ক কোন প্রসঙ্গই ছিল না। বিদ্যাসাগর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণে ঈশ্বরবিষয়ক প্রস্তাবটি সংযোজন করিয়াছিলেন।[৩১] 'বোধোদয়ে'র প্রথমে ঈশ্বর বিষয়ক সামান্য উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে অন্য কোথাও ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। তাহার কারণ গ্রন্থটি প্রধানতঃ বিবিধ বিদ্যা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বালক-পাঠ্য পুস্তক, তাহাতে অনাবশ্যক ঈশ্বরপ্রসঙ্গ থাকিবার কথা নহে। শুধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুরোধেই তিনি দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ সংযোজনা করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা তাঁহার ধর্মমতের বিশেষ কোন প্রবণতা প্রমাণিত হয় না।

বিহারীলাল সরকার যাহাই বলুন,[৩২] একদা যে বাঙালী ছাত্রসমাজ এই গ্রন্থটি হইতে পরিদৃশ্যমান বস্তুবিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য ইহা অনুবাদমূলক, বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থ নহে; তথাপি তিনি এমন ভাবে ইহা সঙ্কলিত করিয়াছিলেন যে, ইহা বাঙালীর ঘরে ঘরে মৌলিক গ্রন্থের মতই স্থান পাইয়াছিল।

৬। সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩)

—ইহা বিদ্যাসাগরের প্রথম মৌলিক স্বাধীন রচনা। বীঠন সোসাইটী কর্তৃক

অনুরুদ্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিযাছিলেন। পরে ইহা ১৮৫৩ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কলিকাতাস্থ বীঠন সোসাইটী নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল।...আমি মানস করিয়াছিলাম, সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে এক প্রস্তাব রচনা করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিব। কিন্তু নিতান্ত অনবকাশ প্রযুক্ত এ পর্যন্ত আমি সে মানস পূর্ণ করিতে পারি নাই, এবং কিছু কালও যে পারিব, সম্যকরূপে তৎসঙ্কলনের উপযুক্ত অবকাশ পাইব, তাহারও সম্ভাবনা নাই, সেজন্য আপাতত এই প্রস্তাব যথাবস্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।"[৩৩] অত্যন্ত দ্রুততার মধ্যে এই নাতিদীর্ঘ পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল। অবশ্য তখন উইলিয়ম জোন্‌স্, কাউয়েল, উইলসন এবং ম্যাক্‌সমূলরের চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে সম্যক্ অবহিত ছিলেন। তিনি এই পুস্তিকায় অতি সংক্ষেপে ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান শাখা সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া ক্লাসিকাল যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছিলেন। নিম্নে সূচী প্রদত্ত হইল :—

সংস্কৃত ভাষা। সাহিত্য শাস্ত্র।

মহাকাব্য—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, ভট্টিকাব্য, রাঘবপাণ্ডবীয়, গীতগোবিন্দ।

খণ্ডকাব্য—অমরুশতক, শান্তিশতক, নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক, আর্যাসপ্তশতী।

চম্পূকাব্য—কাদম্বরী, দশকুমার চরিত, বাসবদত্তা।

দৃশ্যকাব্য—অভিজ্ঞান শকুন্তল, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, বীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব, রত্নাবলী, নাগানন্দ, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার।

নীতিগ্রন্থ—পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎ-সাগর।

উল্লিখিত সূচী দৃষ্টে অনুমিত হইবে যে, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের একটা প্রাথমিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ঐতিহাসিক কালপঞ্জী অপেক্ষা গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক মূল্যের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন। ইতিপূর্বে উইলিয়ম জোন্‌স্ প্রমুখ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে

কৌতূহলী হইয়া ক্ষুদ্রবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী যুবকগণও সম্ভবতঃ এই কারণেই ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষিত বাঙালীর সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাথমিক পরিচয় প্রদান করেন। ইহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত, বীঠন সোসাইটীর অধিবেশনে পাঠের জন্যই লিখিত হইয়াছিল। পরে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। তৎসত্ত্বেও বাঙালীর রচিত সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রথম ইতিহাস বলিয়া ইহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তিনি যেমন তরুণ শিক্ষার্থীর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য দুরূহ সংস্কৃত ব্যাকরণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহার জটিলতা মুক্ত করেন, সেইরূপ এই পুস্তিকায় বাঙালী তরুণদিগকে বিরাট সাহায্যে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত করিয়া তুলেন।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার কৌলীন্য নির্ণয়ে পাশ্চাত্য মনীষীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। জোন্স, ম্যাক্সম্যুলর প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষাকে ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর আত্মীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরও এই অভিমত পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইল—"সংস্কৃত ভাষা এক্ষণে আর কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত নহে। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সংস্কৃত দেবভাষা। ভারতবর্ষীয়েরা আদিকালাবধি ঐ দেবভাষায় কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্বাহ করিতেন; তদনুসারে, সংস্কৃত ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা হয়। কিন্তু ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা শব্দ-বিদ্যানুশীলন প্রভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, সংস্কৃত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা নহে; সংস্কৃত ভাষী লোকেরা পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। সেই প্রদেশ ইরাণ। তাঁহাদিগের গবেষণা দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে, অতি পূর্ব কালে, ইরাণের আদিমনিবাসী লোকেরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জর্মাণি, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছেন; এবং ঐ একভাষাই ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, ভারতবর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসের গ্রীক, ইটালিতে লাটিন, জর্মাণিতে জর্মণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল ভাষা এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে, উহাদিগের পরস্পর কোন সম্বন্ধ আছে, ইহা আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এই সমস্ত যে এক মূল ভাষার পরিণামবিশেষ মাত্র,

এবিষয়ে সংশয় হইবার কারণ নাই। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এবিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপে সে সকলের উল্লেখ করিলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষাব অদ্যাপি শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই যে, ঐ সমস্ত বিষয় ইহাতে সংক্ষেপে ও সুচারুরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে, এই নিমিত্ত ফলিতার্থ মাত্র উল্লিখিত হইল।"৩৪

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮শ শতাব্দীব শেষার্ধে এবং ১৯শ শতাব্দীব প্রথমার্ধে জোনস্, কোলব্রুক, ম্যাক্সম্যুলব প্রভৃতি পাশ্চাত্য গবেষকগণ ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী ও ভাবতবর্ষে আয আগমন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, বিদ্যাসাগবও তাহাই সমর্থন কবিয়াছেন, এই পুস্তিকায় প্রধানতঃ পাশ্চাত্য ইতিহাস রচনাব ধারা অনুসৃত হইযাছে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যেব ইতিহাসকে তিনি সন তাবিখ বা বিশেষ কোন ঐতিহাসিক আন্দোলনেব স্তব-পবম্পরাক্রমে বিন্যস্ত করেন নাই, শ্রব্যকাব্য-দৃশ্যকাব্য ইত্যাদি ভেদ অনুসাবে বিষয় সন্নিবেশ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে তিনি কোন কোন কবির উপর ঈষৎ কঠোব হইয়াছেন। শ্রীহর্ষেব 'নৈষধ চবিতে'ব বিষয়ে বলিতেছেন, "সুতবাং অনুপ্রাস বাহুল্য দ্বারা নৈষধ চরিত্রেব মাধুর্য সম্পাদক না হইয়া সাতিশয় কার্কশ্যই ঘটিয়া উঠিয়াছে।" এইরূপ আরও অনেক স্থলে তিনি অকুতোভয়ে আর্য গ্রন্থগুলিবও আলোচনা কবিয়াছেন, 'মৃচ্ছকটিকে' নাটককে সর্বপ্রাচীন বলিয়া স্বীকাব করিয়াছেন, 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশে'র অশ্লীলতাব নিন্দা করিয়াছেন, আবার মাঝে মাঝে ম্যাকসম্যুলবেব গুণগান কবিয়াছেন। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় লেখা সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা বিষয়ক কোন গ্রন্থাদি ছিল না। বিদ্যাসাগর এবিষয়ে পথ-প্রদর্শক তো বটেই, এমনকি তাঁহার বহু সিদ্ধান্ত অদ্যাপি যথার্থ বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। তিনি ইন্দোয়ুরোপীয় জাতিতত্ত্ব ও ভাষা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া প্রধানতঃ পাশ্চাত্য গবেষকদেব মতামতকেই প্রমাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি ও ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষা বিষয়ক তত্ত্বগুলি তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নিকট লাভ করিলেও সাহিত্য বিচার ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যে বিস্ময়কর বিচারবুদ্ধি, রসবোধেব পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগরেব এই পুস্তিকা প্রকাশের পর প্রায় শতবর্ষ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি বাংলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে কোন প্রামাণিক পুস্তক রচিত হয় নাই।

৭। শকুন্তলা (১৮৫৪)—কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটককে বিদ্যাসাগর ১৮৫৪ সালের গদ্য আখ্যানে রূপান্তরিত করিয়া প্রকাশ করেন। নাটকের প্রধান কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়া, তিনি কদাচিৎ পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের দ্বারা ঘটনা অনুসরণ করিয়াছেন। বোধ হয় এই গ্রন্থ রচনাকালে তিনি চার্লস্ ল্যাম্ব্ প্রণীত *Tales from Shakespeare*-এর কথা চিন্তা করিয়াছিলেন ল্যাম্বের গ্রন্থে যেমন সেক্সপীয়রের নাটক সমূহের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, শকুন্তলা নাটককে বাংলা আখ্যানে পরিণত করিতে গিয়া তিনিও তেমনি শুধু সূত্রাকারে কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন। ভাষা অতিশয় স্বচ্ছ ও মূলানুগ। একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

"মণিকার সেই মণিময় অঙ্গুরীয় রাজনামাঙ্কিত দেখিয়া ধীবরকে চোর স্থির করিয়া নগরপালের নিকট সংবাদ দিল। নগরপাল আসিয়া ধীবরকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল এবং জিজ্ঞাসিল, ওরে বেটা চোর! তুই এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি বল্। ধীবর কহিল, মহাশয়! আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল, তুই বেটা যদি চোর নহিস, এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া পাইলি? যদি চুরি করিস নাই, রাজা কি সুব্রাহ্মণ দেখিয়া তোরে দান করিয়াছে।"—শকুন্তলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এখানে লক্ষণীয় যে, মূল রচনার নাটকীয় চমৎকারিত্ব অনুবাদে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভাষাও এত লঘুভার হইয়াছে যে, সাধুভাষার ক্রিয়াপদ সত্ত্বেও উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। এই সার্থক অনুবাদে বিদ্যাসাগর দু' এক স্থলে একটু স্বাতন্ত্র্য দেখাইছেন, ইহাতে সাধ্যমত অলৌকিক ব্যাপার বর্জন করিয়াছেন; পতিগৃহে যাত্রাকালে শকুন্তলার দেবদত্ত অলঙ্কারাদির কথা তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। জীবনীকার বিহারীলাল ঈষৎ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "ঋষিশক্তি বা ব্রাহ্মণ্য মহিমা বুঝাইবার জন্য কালিদাসের এই সৃষ্টি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু সন্তানের ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে কি?"[৩৫] বলা বাহুল্য, এ আক্ষেপ হিন্দুর আক্ষেপ, সাহিত্যরসিকের নহে। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত নাটককে আখ্যানে রূপান্তরিত করিতে গিয়া আর একটা নূতন রস সৃষ্টি করিয়াছেন; আখ্যানে অলৌকিক ব্যাপার যথাসম্ভব বর্জন করা উচিত, তিনিও তাই শকুন্তলার আখ্যানে অলৌকিক প্রভাব প্রায়ই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৮। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫) ঐ দ্বিতীয় প্রস্তাব (১৮৫৫) —ইতিপূর্বে আমরা যে সমস্ত

পুস্তক পুস্তিকার নামোল্লেখ করিয়াছি, সেগুলি শিক্ষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত এবং মুখ্যতঃ অনুবাদমূলক। কিন্তু যে পুস্তিকা রচনা করিয়া তিনি দেশজোড়া খ্যাতি ও অখ্যাতির অধিকারী হন তাহা হইতেছে বিধবা বিবাহ বিষয়ক উল্লিখিত দুইখানি পুস্তিকা। বিদ্যাসাগর যে ধৃতাস্ত্র যোদ্ধৃপুরুষ, এবং একহাতে প্রাচীন শাস্ত্র আর একহাতে যুক্তির শস্ত্র লইয়া সমাজবিপ্লবী রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে যুগের বাঙালীরা প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। রামমোহনের সতীদাহ-নিরোধ-আন্দোলন যেমন দেশমধ্যে একটা প্রচণ্ড বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিল, বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে তদপেক্ষা গুরুতর প্রতিকূলতা জাগ্রত হইল। সতীদাহ-প্রথা নানা দিক দিয়া বর্বর ও অমানুষিক. উক্ত প্রথার মধ্যেই প্রতিবাদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। সংস্কারে আঘাত লাগিতে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন; শেষে শিক্ষিত জন ঐ প্রথার বর্বরতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কারণ ঐ ব্যাপারে সংস্কার ও হৃদয়াবেগ—এই দুই প্রবৃত্তির সংঘাত সৃষ্টি হইয়াছিল। পরিশেষে হৃদয়াবেগ জয়ী হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-রূপ সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব আরও গূঢ় সঞ্চারী, এ সংস্কারের মূল সমাজ-চেতনার গভীরে নিহিত এবং এই সংঘাত প্রধানতঃ লোকাচার ও যুক্তি-আশ্রয়ী শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য বিদ্যাসাগর মানুষের স্বাভাবিক সহৃদয়তাকেও উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তবু বিদ্যাসাগরের আন্দোলন প্রথম শ্রেণীর সমাজবিপ্লবের অনুরূপ। তিনি যে সংস্কারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, এখনও এই পরিবর্তনশীল সমাজের মধ্যে সেই সংস্কার অটুট আছে। সুতরাং বিদ্যাসাগরের সমাজ-আন্দোলন আরও প্রবল, তাঁহার করণীয় কর্তব্যও ছিল কঠোরতর।

শুনা যায় বিদ্যাসাগর বাল্যকালে নাকি তাঁহার এক বাল্য সঙ্গিনীর বৈধব্য যন্ত্রণা দেখিয়া বিধবা বিবাহের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন।[৩৬] বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে, আন্দোলন সৃষ্টি করিবার পূর্বে ১৮৫০ সালের আগস্ট মাসে তিনি 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামক প্রবন্ধে সর্বপ্রথম সামাজিক আন্দোলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আধুনিক দৃষ্টিকোণ হইতে বাল্যবিবাহের দোষ বিচার করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধেই তিনি হিন্দুর স্মৃতিপুরাণ সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাদান করিলে পিতামাতার গৌরীদান জন্য পুণ্যোদয় হয়; নবম বর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথিবী-দানের ফললাভ হয়; দশম বর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরম পবিত্র লোক প্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি

স্মৃতিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম-বিবেচনা-পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্য মাত্রেই বাল্যকালে পাণি পীড়নের প্রচলিত করিয়াছেন।" উক্ত প্রবন্ধে তিনি সমাজ, স্বাস্থ্য ও নীতি—তিন দিক হইতে বাল্য বিবাহের দোষত্রুটি বিচার করিয়াছেন এবং যে সমস্ত স্মৃতি-সংহিতায় বাল্যবিবাহের গুণকীর্তন আছে, তিনি সেগুলির মাহাত্ম্য স্বীকার করেন নাই। সুতরাং বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন সৃষ্টি বা তৎসম্পর্কিত পুস্তিকা রচনার পাঁচ বৎসর পূর্বেই তিনি বাঙালী হিন্দুর সমাজ-জীবন ও তাহার সংস্কাবের কথা চিন্তা করিতেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগবের পূর্বে বিধবা বিবাহ-বিষয়ে কোন আন্দোলন হইয়াছিল কিনা দেখা যাক। বিহারীলাল সবকার বিদ্যাসাগরেব জীবনচরিতে বিদ্যাসাগরেব সমকালে বা পূর্ববর্তী কালে বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত অনেকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল:

(ক) ঢাকার রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহ চালাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থকাম হন।

(খ) কোটার রাজাও অনুরূপ ভাবে ব্যর্থ হন।

(গ) বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের ১৯-২০ বৎসর পূর্বে নাগপুরের এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেন নাই।

(ঘ) বিদ্যাসাগবেব বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশের প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে এক মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ এই বিষয়ে আইন পাস করাইতে গিয়া অসমর্থ হন।

(ঙ) মতিলাল শীলও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এ ব্যাপারে বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই।[৩৭]

একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ-রূপ প্রচণ্ড সামাজিক সংস্কারে আবির্ভূত হইলেন। পটলডাঙ্গার শ্যামচরণ দাস নামক এক ব্যক্তি নিজ বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহের চেষ্টা করিয়াছিলেন; অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাহার ব্যবস্থাও দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম—কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভাস্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ। ইহারা বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা দিলেও লোকাচারের বিরুদ্ধে শ্যামাচরণ দাস দাঁড়াইতে ভরসা পাইলেন না। লোকমতের প্রতিকূলতার

ফলে উক্ত পণ্ডিতগণ লিখিতভাবে ব্যবস্থা দিয়াও শেষ পর্যন্ত পিছাইয়া পড়িলেন। প্রায় এই সময়ে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব' (১৮৫৫) প্রকাশিত হইলে দেশের মধ্যে যে প্রচণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাহার একমাত্র তুলনাস্থল হইতেছে রামমোহন প্রণোদিত সতীদাহনিরোধ আন্দোলন। বিদ্যাসাগর তাঁহার প্রথম প্রস্তাবে প্রধানতঃ পরাশর, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, আদিত্য পুরাণ, ব্যাস সংহিতা, বশিষ্ঠ সংহিতা প্রভৃতি হইতে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং বলেন, "সর্বসাধারণেব নিকট বিনয় বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া এবং বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা লিখিত হইল, তাহাব আদ্যোপান্ত বিশিষ্ট রূপে আলোচনা করিয়া দেখুন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা।"[৩৮] বিদ্যাসাগর যদিও সমগ্র জীবন ধরিয়া যুক্তি-দেবতার ভজন করিয়াছেন, তবু আলোচ্য পুস্তিকা দুইখানিতে রামমোহনের মত শাস্ত্রের সমর্থন খুঁজিয়াছেন। কারণ, "যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার কবিবেন না। যদি শাস্ত্রেব কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন।"[৩৯]

কিন্তু লোকাচাব যে শাস্ত্রপ্রমাণ অপেক্ষা শক্তিশালী, তাহা তিনি পরবর্তী কালে ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি শুধু যুক্তি ও মানবপ্রেমের উপর ভিত্তি করিয়াই অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু লোকচরিত্র বুঝিতে তাঁহার কিছু ভুল হইয়া থাকিবে। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, বাঙালী শাস্ত্রপরায়ণ জাতি, সুতরাং যদি তিনি বিধবা-বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে বাঙালী অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিধবা-বিবাহ মানিয়া লইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বেদনার সহিত লক্ষ্য করিলেন যে, বাঙালী লোকাচারের দুর্ভেদ্য দুর্গ ত্যাগ করিয়া কিছুতেই যুক্তি বা শাস্ত্রমার্গ গ্রহণ করিবে না। অনেক পণ্ডিত ও পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি তাঁহার প্রথম পুস্তিকার প্রতিবাদ করিয়া সংস্কৃত ও বাংলায় অসংখ্য পুস্তিকা রচনা করিলেন। নিম্নে এইরূপ কয়েকখানি পুস্তিকার নামোল্লেখ করা যাইতেছে—

১। বিধবা বিবাহের নিষেধক। বিচারঃ। শ্রীউমাকান্ত তর্কালঙ্কার সংশোধিতঃ। আঁটপুর নিবাসী দর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ প্রণীতঃ পুন প্রকাশিতশ্চ।

২। বিধবা বিবাহ নিষেধক প্রমাণাবলী। দ্বিতীয়া। কাশীপুর নিবাসী শ্রীশশিজীবন তর্করত্ন—শ্রীজানকীজীবন ন্যায়রত্ন সংগৃহীত। সপ্তক্ষীরা বাসী শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীনাথ রায় চতুর্ধুরিণাদেশতঃ।

৩। পৌনর্ভবখণ্ডনম্ অর্থাৎ শ্রীমদীশ্বরবিদ্যাসাগরেণ কলৌ বিধবা-বিবাহ-প্রচলিতার্থ-নিৰ্ম্মিত নিবন্ধস্য প্রত্যুত্তরম্। শ্রীমৎকালিদাস মৈত্র বিরচিতম্।

৪। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কল্পিত বিধবা-বিবাহ-ব্যবস্থার বিধবোদ্বাহ বারকঃ। শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য মতানুসারে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৈত্রেয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

৫। বিধবা বিবাহ প্রতিবাদ। শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

৬। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ বিষয়ক ভ্রমমূলক পত্রাবলীর কাশীস্থ পণ্ডিত সম্মত প্রত্যুত্তর।

৭। ধর্ম্মমর্ম্ম প্রকাশিকা সভা হইতে বিধবা-বিবাহ বাদ, প্রথম খণ্ড।

৮। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তর। শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাসদ্‌গণ কর্ত্তৃক শ্রুতি স্মৃত্যাদি প্রমাণাবলী সঙ্কলন পূর্ব্বক লিখিত।

৯। বিচিত্র স্বপ্ন বিবরণ—শ্রীপীতাম্বর কবিরত্ন বিরচিত।

১০। বিধবা-বিবাহ-নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা।

বলা বাহুল্য যে, সংস্কৃতে রচিত পুস্তিকাগুলি পণ্ডিতসমাজ ব্যতীত সাধারণ লোকের নিকট দুর্বোধ্য রহিয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর যুক্তি-তর্কের ক্ষেত্রে সর্বজন-বোধ্য লোকভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ-ভাবে জনসাধারণের চিত্তে প্রবেশ করিয়াছিল। এই ভাষা ঋজু ও লঘু; শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ পুঞ্জকে তিনি সহজভাবে অন্বয় করেন এবং স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া মানুষের সহজাত ন্যায়বুদ্ধির নিকট আবেদন করেন। কিন্তু যাঁহারা স্মৃতির বচনকে কুতর্কের দ্বারা স্বমতানুবর্তী করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সে প্রয়াস সিদ্ধ হয় নাই।

বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তিকায় আরও বিস্তারিত আকারে প্রমাণ সমূহের উৎস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের মতের অসারতা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্যের ভাষা মাঝে মাঝে ঈষৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠীয়াছিল। কারণ তাঁহার প্রতিপক্ষগণ স্বাভাবিক শিষ্টাচার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে

বর্বরোচিত আক্রমণ করিতেন, কেহবা অতিশয় স্থূল রসিকতার চেষ্টা করিতেন।

বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবে তিনি মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ধর্ম-শাস্ত্রকারদের পরিচয় দিয়া, পরাশর সংহিতাই কলিযুগে একমাত্র অবলম্বনীয় ধর্মশাস্ত্র, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পরাশরধৃত শ্লোকটি লক্ষণীয়—

কৃতে তু মানবা ধর্মা স্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিত্যাঃ কলৌ পরাশরাঃ স্মৃতাঃ॥

সুতরাং পরাশর সংহিতাকেই কলিযুগে প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া ঐ পরাশর হইতেই নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্য বিধীয়তে॥

এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণ অবলম্বনে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন: "অতএব কলিযুগে বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম, তাহা নির্বিবাদে সিদ্ধ হইল।"

কিন্তু শুধু শাস্ত্রবাক্যই নহে, নারীর প্রকৃতি ও দেহগত দুর্বলতা সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন, "কতশত বিধবারা ব্রহ্মচর্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচার-দোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিরসন ও তিনকুলের কলঙ্ক নিবারণ হইতে পারে।"

তাঁহার প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হইবামাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে উহার দুই সহস্র খণ্ড ফুরাইয়া যায়, পরে তাঁহাকে আবার প্রথম পুস্তিকার তিন সহস্র খণ্ড মুদ্রিত করিতে হয়; তাহাও অল্পকালের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যায়। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহার প্রামাণ্য বিষয় ও বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে নানা সন্দেহ প্রকাশ করিলে তিনি অচিরে (১৮৫৫) 'বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব' প্রকাশ করিলেন। ইহা প্রথম প্রস্তাব অপেক্ষা বৃহৎ, মুখ্যতঃ প্রতিবাদিগণের কুযুক্তি খণ্ডন করিবার জন্যই রচিত ও প্রচারিত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত কটূক্তি বাহির হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তাঁহার সক্ষোভ উক্তি স্মরণীয়—"সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধর্মশাস্ত্র বিচার প্রবৃত্ত হইয়া বাদীর প্রতি উপহাস বাক্য ও

কটূক্তি প্রয়োগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ।" রামমোহনও অনুরূপ কারণে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কটূক্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর পরাশর-বচন ব্যাখ্যা ও প্রমাণ করিয়াছেন এবং পরাশর কলিযুগে কেন গ্রাহ্য, সে বিষয়েও যাবতীয় প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। নারদ-সংহিতা হইতে তিনি প্রমাণ করেন যে, উক্ত সংহিতায় পুত্রবতী বিধবা-বিবাহেরও উল্লেখ রহিয়াছে (১২ বিবাদ)। সেই অংশ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক ; যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে চারি বৎসর, তৎপরে বিবাহ করিবেক। ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা জাতীয়া স্ত্রীরও অনুরূপ বিবাহ বিধান আছে।"

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর, পরাশব বচন যে প্রামাণ্য, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া নিম্নলিখিত যুক্তি-পারম্পর্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন :—

১। পরাশর বচন বিবাহিতা বিষয়ে, বাগ্‌দত্তা বিষয়ে নহে।

২। পরাশর বচন কলিযুগ বিষয়ে, যুগান্তর বিষয়ে নহে।

৩। পরাশরে বিবাহবিধি মনুবিরুদ্ধ নহে।

৪। পরাশরে বিবাহবিধি বেদবিরুদ্ধ নহে।

৫। বিধবাবিবাহবিষয়ক বচন পরাশরের, শঙ্খের (স্মৃতিকার) নহে।

৬। বিধবাবিবাহবিয়ক বচন যথার্থ পরাশরের, কৃত্রিম নিষেধক নহে।

৭। পরাশর বচন বিধবাবিবাহবিষয়ক, নিষেধক নহে।

৮। পরাশরসংহিতা কেবল কলিধর্ম নির্ণায়ক, অন্যান্য যুগের ধর্ম নির্ণায়ক নহে।

এই শাস্ত্র মার্গীয় যুক্তি আশ্রয় করিয়া তিনি দেখাইলেন যে, স্মৃতির সহিত দেশাচারের বিবাদ হইলে স্মৃতিই গ্রাহ্য। বিধবা-বিবাহ যদি দেশাচারের নিকট অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে পরাশর-প্রমাণানুসারে দেশাচারকে অগ্রাহ্য করাই উচিত। উপরন্তু তিনি দেখাইলেন, স্মৃতি-সংহিতার বিধান ছাড়িয়া দিলেও, রীতিনীতি ও আচার-আচরণ নিত্য-পরিবর্তনশীল। তৎসত্ত্বেও যাঁহারা কুৎসিত দেশাচারকেই অবলম্বন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ও দেশাচারকে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি বলেন, "ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তোর প্রভাবে

শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে; ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে।"

যাঁহারা বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে হিন্দুর ধর্ম নাশ হইবে বলিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি বিদ্যাসাগরের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ স্মরণীয়, "হা ধর্ম! তোমার মর্ম বুঝা ভার। কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান।"

যাঁহারা বালবিধবার ব্রহ্মচর্যের দোহাই দিয়া নারীজীবনের প্রকৃতি, বাসনা-কামনাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চাহিতেন, তাঁহাদের মূঢ়তার প্রতি আঘাত করিয়া বিদ্যাসাগর বলেন—"তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়. দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়।" পরিশেষে তাঁহার দ্রবীভূত হৃদয়-উত্থিত সেই ব্যথার্ত উক্তি স্মরণীয়, "যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।"

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক এই দুইখানি পুস্তিকা পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যে, রামমোহন গদ্যে যে বিতর্কমূলক রচনার প্রথম আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন' বিদ্যাসাগর তাহাকেই নিজ মত প্রচারের তীক্ষ্ণতম অস্ত্রে পরিণত করেন। প্রথমে তিনি রামমোহনের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া একপ্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন যে, যদি শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে বাঙালী শাস্ত্রবচন শিরোধার্য করিবে। প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে বহুজনের কাছে নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল, বন্ধুও শত্রুতে পরিণত হইয়াছিলেন; বহু অন্যায় কটূক্তি তিনি নীলকণ্ঠের মত অম্লানবদনে পান করিয়াছিলেন। তাই যখন দেখিলেন. শিক্ষিত অশিক্ষিত, প্রাচীন আধুনিক—সকল বাঙালীই শাস্ত্র নহে, যুক্তি নহে,—শুধু জীর্ণসংস্কারের অন্ধ দাসত্ব করিয়া থাকে, তখন তিনি আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাধাকান্ত দেববাহাদুর তাঁহার মতের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপার হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, রামমোহনের পুত্রও তাঁহাকে সমর্থন করেন নাই, সমাজবিপ্লবী

এবং 'ইয়ং বেঙ্গল'দের নেতৃস্থানীয় রামগোপাল ঘোষও নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আয়োজিত বিধবা-বিবাহ সভায় যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই জন্যই ঈশ্বরচন্দ্রের পুস্তিকার ভাষা কিছু তীব্র, কিছু খরতর হইয়া পড়িয়াছিল। জীবনে তিনি নানা স্থান হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত পাইয়াছিলেন; হৃদয়বান ছিলেন বলিয়া অল্পেই বিচলিত হইয়া পড়িতেন, মানুষের স্বার্থপরিকীর্ণ নীচতা সম্বন্ধেও সব সময়ে সতর্ক থাকিতে পারিতেন না; কারণ তিনি মানুষের চারিত্রিক মহত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলন করিতে গিয়া তাঁহার সেই বিশ্বাস টলিয়া উঠে। ইহার পর তিনি যখন বহুবিবাহ নিরোধক পুস্তিকা রচনা করেন, তখন উহার ভাষার কোন কোন স্থল হইতে তাঁহার চিত্তের প্রসন্ন সাত্ত্বিকতা লুপ্ত হইয়া যায় এবং আঘাতপ্রবণ উত্তাপ সঞ্চারিত হয়। সে যাহা হউক, আলোচ্য পুস্তিকা দুইখানিতে তিনি স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য যে ভাবে পুরাণ-স্মৃতি-সংহিতা মন্থন করিয়াছেন, যুক্তির পরম্পরাক্রমে নিজ বক্তব্য সজ্জিত করিয়াছেন, সাধারণ জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়া প্রতিপক্ষকে যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে বিতর্কমূলক রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বিদ্যাসাগর শুধু প্রচারপুস্তিকা রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে এক হাজার স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র বড়লাটের দরবারে পেশ করেন। ধর্মসভা, যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং রাধাকান্ত দেববাহাদুরের অনুচরবর্গ নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিলেন না। তাঁহারাও ১৮৫৬ সালে ১৭ই মার্চ ৩৬ হাজার ৭ শত ৬৩টি স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া বড়লাটের নিকট এক প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে ১৬ই জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইল।

৯। কথামালা (১৮৫৬)—বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ রেভাঃ টমাস জেম্‌স্ সম্পাদিত ঈসপ্‌স্ ফেবল্‌স অবলম্বনে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার উইলিয়ম গর্ডন ইয়ং-এর নির্দেশেই এই গ্রন্থ রচনা করেন। য়ুরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক গল্পগ্রন্থ ঈসপের কাহিনীকে অতিশয় সরল ভাষায় যথাসম্ভব বাঙালীর ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। শিক্ষাপ্রসারের জন্যই ইহা রচিত, সুতরাং লেখক ইহাতে সাহিত্যিক রস সঞ্চারের চেষ্টা করেন নাই। গল্পগুলি একটু নীতি-ভারমন্থর, এবং জীবনের বঞ্চনা, অকৃতজ্ঞতা, মূঢ়তা, স্বার্থপরতা—ইত্যাদির প্রতি একটু বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছে। অবশ্য ঈসপের গল্পগুলির মধ্যেই বৃহত্তর জীবন-নীতির অভাব আছে, দৈনন্দিন

জীবনই ইহাতে অধিকতব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। হয়তো বাস্তব জীবনে বিদ্যাসাগব অপ্রত্যাশিত ভাবে এত আঘাত পাইয়াছিলেন যে, ঈসপের এই গল্পগুলি তাঁহার অতিশয় প্রীতিকব হইয়াছিল। একদা তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার 'কথামালা'য় "অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক" নামক যে আখ্যান লিখিয়াছিলেন, তিনিই হইতেছন সেই বৃদ্ধ কৃষক। সক্ষোভে তিনি বলিয়াছিলেন, সন্তুষ্ট কাহাকেও করিতে পাবিলাম না। আমাব কথামালায় যে বৃদ্ধ ও ঘোটকেব গল্প আছে, আমি সেই বৃদ্ধ।"[৪০] ঐ গল্পের শেষে আছে, "আমি সকলকে সন্তুষ্ট কবিতে চেষ্টা পাইয়া কাহাকেও সন্তুষ্ট কবিতে পারিলাম না, লাভের মধ্যে ঘোড়াটি গেল।" 'কথামালা'য় সিংহ ও ইঁদুবেব গল্পের নীতিকথায় তিনি লিখিয়াছেন, "যে যত ক্ষুদ্র প্রাণী হউক না কেন, উপকৃত হইলে, কখনও না কখনও প্রত্যুপকাব কবিতে পারে।" কিন্তু তিনি নিজে বহু লোকেব অযাচিত উপকাব কবিয়াও কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রত্যুপকাব প্রাপ্ত হন নাই। সেই অকৃতজ্ঞতাব তিক্ত ইতিহাস 'কথামালা'র এই গল্পগুলিব মধ্যে লুক্কায়িত আছে কিনা কে বলিতে পারে? এই পুস্তকটি দীর্ঘকাল ধরিয়া সমগ্র বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে বালক-বালিকাদেব একমাত্র পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। ইহার বহু গল্প যুরোপীয় পাবিবেশ ও স্বাদ-গন্ধ পবিত্যাগ কবিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালী হইয়া গিয়াছে, ইহাব জন্য বিদ্যাসাগরেব পবিচ্ছন্ন অনুবাদ নিপুণতা কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে।

১০। চরিতাবলী (১৮৫৬)—স্কুলপাঠ্য এই পুস্তকে নিম্নলিখিত যুরোপীয় ব্যক্তিগণেব জীবনী আছে: ডুবাল, উইলিয়ম বস্কো, হীন, জিরম ষ্টোন, হণ্টব, সিম্‌সন, হটন, ফ্রগর্সিবি, লীডন, জেংকিন্‌স্, উইলিয়ম গিফোর্ড, উইংকল্, মন, উইলিয়াম পষ্টেল্‌স্, এড্রিয়ন, প্রিডো, ডাক্তাব এভাম, লসনসফ্, মেডকস্, লঙ্গো মণ্টেন্‌স্। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "সংক্ষেপে, সরলভাষায় কতকগুলি মহানুভবেব বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে বালকদিগেব লেখাপড়ার অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পাবে, এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্তমাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। সমগ্র বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে, এরূপ অনেক বিষয়, মধ্যে মধ্যে নিবেশিত হইত যে সে সমুদায় এতদ্দেশীয় অল্পবয়স্ক বালকদিগের অনায়াসে বোধগম্য হইত না, এবং ব্যাখ্যা করিয়া বালকদিগেব বোধগম্য করিয়া দেওয়া শিক্ষক মহাশয়দিগের পক্ষেও নিতান্ত সহজ হইত না।" এই গ্রন্থে ঈশ্বর বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ নাই। সর্বত্র ব্যক্তিব চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের প্রতি গুরুত্ব

আরোপিত হইয়াছে। আন্তরিক যত্ন থাকিলে ও পরিশ্রম করিলে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হয়[৪১]—এই গ্রন্থের অধিকাংশ চরিতকথায় এই নীতি পরিবেশিত হইয়াছে। অবশ্য তিনি দুই এক স্থলে ধর্মের কথা বলিয়াছেন বটে (যথা—"রস্কো অতিশয় ধর্মশীল লোক ছিলেন, কখনও অধর্ম পথে পদার্পণ করেন নাই")[৪২], কিন্তু ধর্ম অর্থে তিনি ন্যায়পরতা ও চারিত্রনীতিকেই নির্দেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বর্ণিত প্রত্যেকটি চরিত্র দারিদ্র্য ও অন্যান্য দুর্বিপাকের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, কেহ বিপদে পড়িয়া ঈশ্বরকে আহ্বান করেন নাই, বা বিপদমুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাও জানান নাই। বিদ্যাসাগর চাহিয়াছিলেন, বাঙলার বালক-বালিকাকে এমন কাহিনী পাঠ করিতে দেওয়া উচিত, যাহা পড়িয়া তাহাদের মধ্যে আত্মশক্তিতে আস্থা ফিরিয়া আসিবে। সেই জন্য তিনি বাছিয়া বাছিয়া এমন কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন, যাহাতে পুরুষকারের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী ও ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটীর পক্ষ হইতে যে সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই অলীক গল্পে পরিপূর্ণ এবং ছাত্রজীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। বিদ্যাসাগরের সতীর্থ ও সহকর্মী মদনমোহন তর্কালঙ্কার যখন 'শিশুশিক্ষা' পুস্তকগুলি প্রকাশ করেন, তখন তিনিও শিশুশিক্ষার উপযোগী পুস্তক প্রণয়নের কথাই ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরও 'বোধোদয়', 'জীবনচরিত', চরিতাবলী' ও 'আখ্যান-মঞ্জরী' রচনা করিয়া শিশুশিক্ষার উচ্চ আদর্শটিকেই অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী শিক্ষক ও বন্ধু আনন্দকৃষ্ণ বসু হয়তো একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন ; কারণ তিনি বিদ্যাসাগরকে ভারতীয় চরিত্র অবলম্বনে শিশুশিক্ষাপ্রদ কাহিনী রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর সম্মত হইয়াও কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় তাহাতে আর আত্মনিয়োগ করিতে পারেন নাই। আরও একটা কারণ ছিল। তিনি ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শে পুস্তক প্রণয়ন করিতেছিলেন এবং এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক হিসাবে চেম্বার্স প্রণীত পুস্তিকাগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই অবিকল ইংরাজীর অনুবাদ করিয়া অথবা ভাব অবলম্বন করিয়া তিনি শিশুশিক্ষা বিষয়ক পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছিলেন।*

* এখানে বিদ্যাসাগরের ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত রচিত পুস্তকের পরিচয় দেওয়া হইল ; ইহার পরবর্তী কালের গ্রন্থপরিচয় বর্তমান আলোচনার সীমা বহির্ভূত বলিয়া তাহার কোন উল্লেখ করা হইল না।

॥ ৩ ॥

বিদ্যাসাগরের চিত্তলোকে বিভিন্ন প্রভাব

বাঙলাদেশ, বঙ্গসমাজ, সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের যুগসঙ্কটক্ষণে বিদ্যাসাগরের চিত্ত ও চরিত্রে অনমনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তেমনি বিদ্যাসাগরও অলোকসামান্য চিত্তবলের সাহায্যে বাঙলাদেশ ও সমাজের বক্ষে চিরস্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। বাঙলাদেশের আদ্র জলবায়ুতে বর্ধিত হইয়া তিনি এই কুলিশকঠোর চরিত্রই বা কোথায় পাইলেন, আবার এত প্রেম, এত করুণাই বা কি করিয়া আসিল, তাহা এক সমস্যার কথা।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যাসাগরের চরিত্রালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "অনেকে বিদ্যাসাগর চরিত্রে পাশ্চাত্য জাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়-দিগের আমরা যতই নিন্দা করি না কেন, অনেক বিষয়ে তাহারা খাঁটি মানুষ; আমাদের মনুষ্যত্ব আমাদের নিকট নিষ্প্রভ, মলিন ও হীন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে যাহার সম্পূর্ণ অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল।"[৪৩] বিদ্যাসাগর চরিত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রসঙ্গে আমরা পরে এই উক্তির বিস্তারিত আলোচনা করিব। তাঁহার সমগ্র জীবন ও সাধনার পরিচয় লইলে এবং তাঁহার গ্রন্থাবলীর সহিত মিলাইয়া দেখিলে আমরা বিদ্যাসাগর চরিত্রে নিম্নলিখিত প্রভাবগুলি লক্ষ্য করিতে পারি:- ১। সংস্কৃত বিদ্যা ও ঐতিহ্যের প্রভাব ২। পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের প্রভাব।

১। বিদ্যাসাগর এবং সংস্কৃত বিদ্যা ও ঐতিহ্যের প্রভাব—

ঈশ্বরচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র কিন্তু প্রখর আত্মসম্মান বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অন্ততঃ আট বৎসর পর্যন্ত সেই গ্রাম্য পরিবেশে বর্ধিত হইয়াছিলেন। কাজেই পিতৃপিতামহ পর্যন্ত যে সনাতন সংস্কৃত শিক্ষাদীক্ষার ধারা বহমান ছিল, তিনি বাল্যকালে তাহারই মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। পিতামহ, পিতা ও মাতার নিকট তিনি পুরুষানুক্রমে অর্জিত প্রবল পৌরুষ ও অমেয় করুণা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করিয়াছিলেন। সংস্কৃতের প্রাথমিক পাঠ সাঙ্গ করার পর পিতা ঠাকুরদাস তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। রাজপথের এপারে সংস্কৃত কলেজ, ওপারে হিন্দু কলেজ--

দূরত্ব অল্পই ; কিন্তু উভয় বিদ্যায়তনের ছাত্রদের মনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল। হিন্দু কলেজের 'কালাপাহাড়' ছাত্রগণ হিন্দু সমাজে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া উইলসন সাহেব বলিয়াছেন,

"An impatience of restriction of Hinduism and a disregard of its ceremonies are openly avowed by many young men of respectaple birth and talents."[88]

এই ভাববিপ্লবের সম্মুখে পড়িলেও বিদ্যাসাগব বাল্য ও যৌবনে হিন্দুর পুরাণ সংহিতা, ন্যায়দর্শন, ব্যাকবণ, অলঙ্কার প্রভৃতি বহুকালাগত ঐতিহ্যের মধ্যে লালিত ও বর্ধিত হইয়াছিলেন। রামমোহন কৈশোরে হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে বর্ধিত হইয়া তাহারই বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাইয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও প্রাচীন হিন্দুসংস্কৃতির মধ্যে বর্ধিত হইলে তাহাকে অন্ধের মত অনুসরণ কবেন নাই। বাল্যকালে তিনি প্রতিমা পূজা পছন্দ করিতেন না—তাঁহার জীবনীকার চণ্ডীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চমকপ্রদ সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন।[৪৫] ইহা কতদূব যথার্থ জানা যায় না, অন্তত ইহার আর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। কিন্তু কলিকাতায় দ'য়েহাটায় ভগবতীচরণ সিংহের বাটীতে বাস করিবার কালে তিনি যে সন্ধ্যাবন্দনাদির মন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য পিতার নিকট নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ দুইখানি প্রামাণিক জীবনীতেই আছে। তাঁহাব ন্যায় তীক্ষ্ণধী শ্রুতিধব বালক উপনয়নের পর সন্ধ্যাবন্দনাদিব মন্ত্র ভুলিয়া গেল, ইহা আশ্চয বটে। তিনি প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে লালিত হইয়া নিতান্ত বাল্যকাল হইতেই ইহার অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিরূপ হইাছিলেন, ইহা সম্ভব নহে ; মনে হয় বালচপল স্বভাবের ফলে হয়তো অনভ্যাস বশতঃ মন্ত্রাদি ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন।

সংস্কৃত কলেজের তাঁহার অধীত গ্রন্থাদির তালিকা দেওয়া যাইতেছে। বাল্যে তিনি সংস্কৃত কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে সন্ধিসূত্র পাঠ করেন। এই সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন—নিমচাঁদ শিরোমণি (দর্শন), শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি (বেদান্ত), রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (স্মৃতি), ক্ষুদিরাম বিশারদ (আয়ুর্বেদ), নাথুরাম শাস্ত্রী (অলঙ্কার), জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (সাহিত্য), গঙ্গাধর তর্কবাগীশ (ব্যাকরণ), হরিপ্রসাদ তর্কালঙ্কার, হরনাথ তর্কভূষণ (ব্যাকরণ), যোগধ্যান মিশ্র (জ্যোতিষ)।—বিহারীলাল প্রণীত বিদ্যাসাগর, পৃ ৬৩।

ইঁহাদের নিকট তিনি স্মৃতি-পুরাণ-ব্যাকরণ-অলঙ্কার-সাহিত্য প্রভৃতি অতি উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার মেধা দর্শনে অধ্যাপকবৃন্দ চমৎকৃত হইতেন। কিন্তু এই সমস্ত সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাবাদর্শ তাঁহার তরুণ চিত্তে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আলোচনার যোগ্য। তাঁহার মনোজগতের পটভূমিকায় কৌলিক প্রভাব থাকা বিচিত্র নহে; "পিতৃকুল ও মাতৃকুল—দুই কুলের বিদ্যাসমাজের আওতা বা ধারা থেকে একেবারে ছিন্নমূল হয়ে যে তিনি কিছু করেছিলেন, তা মনে হয় না। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের ধারার উৎস সন্ধান করা যায়।"[৪৬] কিন্তু একটু অবহিত হইলে দেখা যাইবে যে, বিদ্যাসাগর যে সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে বর্ধিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কুলগত উত্তরাধিকার, তিনি তাঁহার আত্মজীবনীর এক স্থানে বলিয়াছেন, "আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত ব্যবসায়ী; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্য বশতঃ ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই, ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব।"[৪৭]

ঠাকুরদাস সংস্কৃত শিক্ষার কৌলিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। বিদ্যাসাগর একলব্যের মত সাধনা করিয়া এই সংস্কৃত বিদ্যাকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবন-ধারা,—শাস্ত্র নহে, যুক্তিবাদের দ্বারা চালিত হইয়াছে, তাই সংস্কৃত সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র পাঠ করিবার কালে তিনি মানুষের স্বাভাবিক বাস্তববোধ হইতে কোনদিনই ভ্রষ্ট হন নাই এবং শাস্ত্রবাক্যকে সদাসর্বদা শিরোধার্য করিতেও পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন, "যাহা বিশ্বাস্য তাহা শাস্ত্র, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে"—বিদ্যাসাগরও এই মতানুবর্তী ছিলেন। দেবভাষায় লিখিত বলিয়াই সমস্ত গ্রহণ করিতে হইবে, বিদ্যাসাগর এই জাতীয় শাস্ত্রমুখাপেক্ষিতা সমর্থন করেন নাই।

প্রথমে ধরা যাক সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক তাঁহার মতামত ও সিদ্ধান্তের কথা। বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথমে তিনিই সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা সুগমতার জন্য বহু নাটক ব্যাকরণ দর্শন প্রকাশ করিয়া শিক্ষার পথ মসৃণ করিয়া দেন। তাঁহার সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থের কয়েকখানির নাম

উল্লেখ করা যাইতেছে:—১। রঘুবংশম্ (১৮৫৩) ২। কিরাতার্জুনীয়ম্ (১৮৫৩) ৩। সর্বদর্শন সংগ্রহ (১৮৫৩-৫৮) ৪। শিশুপাল বধ (১৮৫৭)। ইহার পর প্রকাশিত হয়—কুমারসম্ভব (১৮৬১), কাদম্বরী (১৮৬২), মেঘদূত (১৮৬৯), উত্তর চরিত্র (১৮৭০), অভিজ্ঞান শকুন্তল (১৮৭১), হর্ষচরিত (১৮৮৩) প্রভৃতি।

সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন গ্রন্থাবলীর সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তিনি যেমন সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য পাঠনার রীতি দেখাইয়া দেন, তেমনি আবার প্রয়োজন স্থলে সমালোচকের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বহুস্থলে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের কোন অংশ বা কোন কবির রচনারীতির ত্রুটিকে নিন্দা করেন। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' নৈষধচরিতের অনুপ্রাস বাহুল্য নিন্দিত হইয়াছে, পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের অশ্লীলতাকেও ক্ষমা করা হয় নাই। তিনি তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগীয় ডিরেক্টার ময়েট সাহেবের নিকট সংস্কৃত কলেজে প্রদত্ত শিক্ষা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে শিশুপালবধ, কিরাতার্জুনীয়ম্, ও নৈষধচরিতের স্থানে স্থানে জুগুপ্সিত অশ্লীলতা আছে বলিয়া শিক্ষাবিধি হইতে ঐ গ্রন্থ বাতিল করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। 'ঋজুপাঠ' সঙ্কলন কালে তিনি অকুতোভয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত গ্রন্থের নানাদোষ দেখাইয়াছিলেন। 'ঋজুপাঠে'র অন্তর্গত পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান আলোচনা কালে তিনি বলিয়াছিলেন—

পঞ্চতন্ত্রের রচনা প্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ।.... কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক দীর্ঘ সমাস আছে, অনেক অসার ও অসম্বদ্ধ কথা আছে এবং কয়েকটি অশ্লীল উপাখ্যান আছে ইহাতে অধুনাতন গ্রন্থের ন্যায় রচনার মাধুর্য নাই, কথোপকথনের চাতুর্য নাই... ..। ৪৮

বাল্মীকির অমর মহাকাব্য আলোচনা কালেও বিদ্যাসাগর ভক্তির উচ্ছ্বাস ত্যাগ করিয়া সমালোচকের অপক্ষপাতী মনোভাব অবলম্বনে বলিয়াছেন, 'বাল্মীকি-কাব্যে পৌনরুক্ত, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতিবিস্তৃত বর্ণনা প্রভৃতি কতিপয় গুরুতর দোষ আছে।"[৪৯]

হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র জাতীয় রচনায় বর্ণিত অশ্লীল আখ্যানের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। য়ুরোপীয় রীতির অশ্লীলতা-বোধের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া তিনি আদিরসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মত তাঁহার

আদিরসঘটিত কোন শুচিবাতিক ছিল না। তিনি বহুবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তক এবং 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' ও 'ভাইপো সহচরস্য' নামক ছদ্মনামে প্রকাশিত দুইখানি পুস্তিকায় প্রতিপক্ষকে আক্রমণ স্থলে সর্বদা রুচির মুখ রক্ষা করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ইহার জন্য ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে 'বঙ্গদর্শনে' বিদ্যাসাগরের ভাষা প্রসঙ্গে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, ''বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা বিচারকালে ভদ্রের ব্যবহার্য্য ভাষাই প্রত্যাশা করি। ..বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ অশ্লীল উপাখ্যান স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহা অনেকে বিশ্বাস করিবেন না।" সে যাহা হউক, বিদ্যাসাগর শুধু শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থের অশ্লীলতার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, ইহা ছাড়িয়া দিলে তাহার সাহিত্য বিষয়ক রুচির উপর আদিরসাত্মক ছুঁৎমার্গের প্রভাব ছিল না। থাকিলে তিনি উদ্ভট শ্লোকের উগ্র দেহলীলাকে কখনও মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর প্রয়োজনবোধে অনেক সময় সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক গ্রন্থের নির্মম সমালোচনা করিয়াছেন, দেবভাষার প্রতি তাহার ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সুলভ অহেতুক ভক্তি ছিল না।

শুধু সাহিত্যই নহে, ন্যায়দর্শনের যে অংশ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে আসে না, যাহা পাঠে মানুষ বাস্তব বিস্মৃত হইয়া পড়ে, সেই নির্বিকল্প পরাবিদ্যার প্রতিও তাহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকা সংশোধন কালে ময়েট সাহেবকে যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতেই ষড়দর্শনের প্রতি তাহার প্রতিকূল মনোভাব ধরা পড়িয়াছে। তিনি বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদ অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য কোনদিনই স্বীকার করিতে পারেন নাই। একদা তিনি এই জাতীয় মায়াবাদী দর্শনকে ভ্রান্ত-দর্শন বলিয়া সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকা হইতে ষড়দর্শনের চর্চা তুলিয়া দিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি ব্যালেনটাইনের রিপোর্ট প্রতিবাদ করিয়া বেদান্ত ও সাংখ্যকে ভ্রান্তদর্শন বলিয়াছিলেন (ব্রজেন্দ্রনাথ—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, পৃ ১৫-১৬)। এ বিষয়ে তিনি রামমোহনের শিষ্য, রামমোহন বেদান্ত সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন, অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড আমাহার্স্টকে লিখিয়াছেন যে, বেদান্তাদি পাঠ করিয়া বঙ্গীয় যুবকগণ কর্মকুণ্ঠ ও অলস চিন্তাবিলাসী হইয়া পড়িবে। এই জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায়

অর্থব্যয় না করিয়া বরং য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। বিদ্যাসাগরও অবিকল এই মনোভাবের বশবর্তী হইয়া পাঠ্যতালিকা হইতে ষড়্দর্শন তুলিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন, "রামমোহন রায় প্রাচ্য ও পাশ্চত্য দর্শনের উভয়-দিকই ভাল বুঝিতেন; বিদ্যাসাগবের মধ্যে রামমোহনেব সেই উদার দৃষ্টির অভাব ছিল। নব্য য়ুরোপীয়েব মত বিদ্যাসাগরের দৃষ্টির পবিধি ছিল সঙ্কীর্ণ। ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা দিয়া তিনি সকল কাজের মূল্য বিচার করিতেন এবং সকল কর্মানুষ্ঠানেই জন বুল্-এর জিদ ও অদম্য উৎসাহ দেখাইতেন।[৫৫]

ব্রজেন্দ্রনাথেব এই মন্তব্য যথেষ্ট প্রমাণিক নহে, কাবণ বিদ্যাসাগরও ভারতীয় দর্শন ও য়ুরোপীয় দর্শন সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং উভয় আদর্শের গুণাগুণ বুঝিতেন। বিশপ বার্কলের *Inquiry* গ্রন্থখানি বিদ্যাসাগর পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করিতে চাহেন নাই; কাবণ বেদান্তের মায়াবাদের অনুরূপ দার্শনিক চেতনা *Inquiry*-ব মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্যালেনটাইনেব রিপোর্টের প্রতিবাদ করিয়া তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, যে কাবণে বেদান্তকে সাধারণ পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে অনিচ্ছুক, ঠিক সেই কারণেই তিনি বিশপ বার্কলের গ্রন্থ পবিত্যাগ করিতে চাহেন। বিদ্যাসাগব ছিলেন ১৯শ শতাব্দীর মানবপ্রেমিক; সুতরাং মানুষের ব্যবহারিক ও ভৌমজীবন লইয়াই তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন, অলস মস্তিষ্কচর্চা তাঁহার নিকট প্রীতিকর ছিল না। বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা কালে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, তিনি সংস্কৃত বিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করেন বটে, কিন্তু অযৌক্তিক মত ও বিশ্বাস এবং মানব-জীবনের সহিত নিঃসম্পর্কীয় তত্ত্ববাদকে কোন দিন শ্রদ্ধা করেন নাই। তাই বলিয়া তিনি ডিরোজিও-শিষ্যগণের উগ্র মতকে প্রশ্রয় দেন নাই। বিদ্যাসাগর সাধারণ শিক্ষা হইতে বেদান্তাদি মোক্ষশাস্ত্র তুলিয়া দিতে চাহিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু কাওয়েল, রোয়ার ও উড্রো সাহেব একদা সংস্কৃত কলেজ হইতে বেদান্ত ও স্মৃতি অধ্যাপনা বন্ধ কবিতে চাহিলে বিদ্যাসাগর সেই চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "কাওয়েল সাহেব কলেজে স্মৃতি ও বেদান্তের পাঠ বন্ধ করিতে চাহেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার সহিত আমার মত মিলে না...ভারতবর্ষে প্রচলিত দর্শন সমূহের মধ্যে বেদান্ত অন্যতম। ইহা অধ্যাত্ম সম্বন্ধীয়। কলেজে

ইহার অধ্যাপনা বিষয়ে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা আমি মনে করি না।"[৫১]

শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর এমন শিক্ষাবিধি প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে বাঙালী বৃহদবিশ্বের সহিত পরিচিত হইয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারিবে। তিনি বাস্তবজীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, মোক্ষশাস্ত্র নহে, য়ুরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানেরই অধিকতর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অবশ্য এই জন্য তাঁহাকে ভারত দর্শনবিরোধী বলা যায় না। জীবনকে তিনি দুই-ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন—একটি ব্যবহারিক জীবন, আর একটি মননের জীবন। মননের জীবনে বাঙালী দর্শন চর্চা করুক, ইহাতে তাঁহার আপত্তি ছিল না; কিন্তু অন্ধ কূপমণ্ডূকতা সর্বদা বর্জনীয়। তাই তিনি চাহিয়াছিলেন, বাঙালী শিক্ষার্থী শাস্ত্রসংহিতার প্রতি অতিভক্তি ত্যাগ করিয়া যুক্তিবাদের দ্বারা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রকে বিচার করুক, য়ুরোপীয় দর্শনের সহিত তুলনায় আপনার দার্শনিক ঐতিহ্যের যথার্থ স্বরূপ বুঝিয়া লউক।[৫২] তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ সংক্রান্ত রিপোর্টে বলিয়াছিলেন, "দায়তত্ত্ব, ব্যবহারতত্ত্ব এবং অন্যান্য বিষয়ক ছাব্বিশখানি গ্রন্থ অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব। ইহা রঘুনন্দন প্রণীত। প্রথমোক্ত খানি দায় সম্বন্ধে। দ্বিতীয়খানি আদালতের কার্যবিধি সম্বন্ধে। অন্য চব্বিশখানি ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত। এই শ্রেণী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের অধ্যাপনা বন্ধ হওয়া উচিত। ইহা যাজনব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদিগের শিক্ষা-উপযোগী। ওরূপ গ্রন্থাদি বিদ্যালয়ের অধীত হইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী।"[৫৩] বিদ্যাসাগরের মতামত এখানে এত স্পষ্ট হইয়াছে যে, এ বিষয়ে তিনি কোন দ্বিধার অবকাশ রাখেন নাই। স্মৃতি পুরাণ-ধর্ম-শাস্ত্র আধুনিক শিক্ষার উপযোগী নহে, তাহা যাজনব্যবসায়ী পুরোহিতের পাঠ্য। যে বিদ্যা অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা স্মৃতি-পুরাণোক্ত মোক্ষবিদ্যা নহে—তাঁহার এই সমস্ত মতামতকে শিক্ষা সংস্কারের স্মারক চিহ্ন বলিয়াই ধরিতে হইবে। ভারতীয় দর্শন, ভক্তিশাস্ত্র—সমস্ত কিছুকেই তিনি আধুনিক জীবনধারা ও উপযোগবাদের বাতায়ন হইতেই বিচার করিয়াছেন; ভারতীয় দর্শন-পুরাণ-স্মৃতি—যেখানে যুক্তিবাদের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে, সেখানে তিনি ঐ গ্রন্থকে শিরোধার্য করিয়াছেন। গণেশ উপাধ্যায়ের 'অনুমান চিন্তামণি' গ্রন্থকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন এবং বেকনের সহিত তাঁহার তুলনা

দিতেন।[৫৪] তিনি ন্যায় শাখা তুলিয়া দিয়া উহাকে দর্শন শাখার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরবাদী 'অনুমান চিন্তামণি', 'দীধিতি খণ্ডন' ও 'তত্ত্ব-বিবেক'কে শ্রদ্ধা করিলেও বরং যাহা চিন্তা উদ্রেক করে, জ্ঞান সম্বন্ধে সংশয় জাগায় (সাঙ্খ্য প্রবচন, পাতঞ্জল সূত্র, পঞ্চদশী প্রভৃতি)—তাহার উপরেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। বাঙালী যুবক মূঢ়ের মত শুধু পড়িয়া যাইবে, বিচার করিবে না, বিতর্ক করিবে না,—চিন্তার এই দীনতা তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, তিনি যদি শাস্ত্রের উপর যুক্তির স্থান নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া 'পরাশর সংহিতা' হইতে উদ্ধৃত শ্লোকটিকে প্রামাণিক এবং শাস্ত্রসঙ্গত বলিবার জন্য এত প্রয়াস পাইয়াছিলেন কেন? তাহার বিধবা-বিবাহ বিষয়ক দুইখানি পুস্তিকায় শাস্ত্রবাণীই তো একমাত্র প্রামাণ্য রূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। এমন কি, লোকাচার ও শাস্ত্রবাণীতে দ্বন্দ্ব বাধিলে তিনি লোকাচার ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রসংহিতাকেই গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য এত ব্যগ্র হইলেন কেন, তাহার কারণ সম্বন্ধে তিনি উক্ত পুস্তিকার দ্বিতীয় প্রস্তাবের ভূমিকাতেই নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার ধারণা ছিল, শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দিতে পারিলেই বাঙালী সমাজ বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লইবে। কিন্তু শাস্ত্র ও যুক্তি অপেক্ষা বাঙালী যে অর্থহীন লোকাচারের অধিকতর পক্ষপাতী, তাহা তিনি বিধবা-বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তিকা রচনা করিবার সময় বেদনার সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি রামমোহনের সহমরণ নিষেধক পুস্তিকায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ-পঞ্জী দর্শনে এই পন্থা ধরিয়াছিলেন, বাঙালী-সমাজের চিত্তপ্রবণতা কোন দিকে—তাহা লক্ষ্য করেন নাই। অথবা হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার পৌরুষ ও মানুষের স্বাভাবিক যুক্তি-ধর্মী মনের সাহায্যে তিনি স্বকার্যসাধনে সমর্থ হইবেন। কিন্তু তাহা আশানুরূপ সম্ভব হয় নাই। সে যাহা হউক, সংস্কৃত সাহিত্য, স্মৃতি পুরাণ দর্শন প্রভৃতিকে তিনি যুক্তিবাদের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বলা বাহুল্য যে, ইহা তিনি নিজস্ব প্রতিভা হইতেই পাইয়াছিলেন এবং পৈত্রিক সংস্কার হিসাবে এই দৃঢ়নিষ্ঠ পৌরুষ লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—"ইংরাজ চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি অথবা পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি।

ইহার জন্য তাঁহাকে কখন ঋণগ্রহণ বা উঞ্ছবৃত্তি স্বীকার করিতে হয় নাই।”—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (পৃঃ ৯)।

যুগধর্ম অনুসারে রামমোহন, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর—কেহই শাস্ত্রকেই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই ; রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর যুক্তির সাহায্যে শাস্ত্রবাণীকে বুঝিয়া লইয়াছিলেন, অযুক্তিআশ্রিত শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিবার মত দুঃসাহস ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালীচিত্তে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ অবলম্বন করিলেও প্রধানতঃ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ যুক্তিজ্ঞানকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন। বহু স্থলে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের নজির উত্থাপন করিলেও বিদ্যাসাগর যে ১৯শ শতাব্দীর যুক্তিবাদের অন্যতম পুরোধা, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

২। বিদ্যাসাগর ও পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের প্রভাব—বিদ্যাসাগরের জীবনীকার জীবনীরচনাকালে নিজস্ব হিন্দুভাবাপন্ন রক্ষণশীল চিন্তার দ্বারা অধিকতর পরিচালিত হইয়াছেন, কাজেই তিনি বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার, ইংরাজীভাষাশিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। উক্ত জীবনীর এক স্থলে তিনি বলিতেছেন—

একদিকে হিন্দুকলেজের উন্মাদিনী শিক্ষা অপরদিকে মিশনারী কলেজের মোহিনী মায়া। তদুপরি শক্তিশালী সাহেব মিশনরিগণের গাঢ় ঘনিষ্ঠতা। যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তাহার পর বৎসর পাদরী ডফ সাহেবের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে খ্রীষ্টানী স্কুল বিশপ্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার অপ্রতিহত ঘাতপ্রতিঘাতে হৃদয়বান, মনস্বী ও তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্রও বিচলিত হইয়াছিলেন। অবিমিশ্র সংস্কৃতশিক্ষা লাভ করিয়াও ঈশ্বরচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন, ইংরাজি না শিখিলে, বর্ত্তমান যুগে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন দুঃসাধ্য। তাই তিনিও সংস্কৃত পাঠ সমাপনান্তে কার্যাবস্থায় ইংরাজি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।”৫৫

বাস্তবিক সংস্কৃত কলেজে পাঠ কালেই বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য ভাবধারার যৌবন জলতরঙ্গের কবলে পড়িয়াছিলেন, যুগধর্ম তাঁহাকেও বিচলিত করিয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ যখন ইংরাজী শিক্ষা পুনঃ প্রবর্তনের জন্য শিক্ষা বিভাগের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল, সেই আবেদনে ঈশ্বরচন্দ্রেরও স্বাক্ষর ছিল। কিশোর বয়সেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাজী শিক্ষা ব্যতিরেকে জীবনের জীবিকা ও মনের প্রসার পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। পাঠ্যাবস্থায় তিনি য়ুরোপীয়

মতানুযায়ী ভূগোলতত্ত্বকে সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন।[৫৬] কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা করিতে গিয়া তিনি ইংরাজী ও হিন্দীভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্ত এবং আনন্দকৃষ্ণ বসু, অমৃতলাল মিত্র, শ্রীনাথ ঘোষ প্রভৃতি ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ বন্ধুদের নিকট তিনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করেন। আনন্দকৃষ্ণ বসুর নিকট তিনি সেক্‌স্‌পীয়ার পাঠ করিয়াছিলেন; সেক্‌স্‌পীয়ারে তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। বিদ্যাসাগরের ইংরাজী সাহিত্যশিক্ষার গুরুস্থানীয় আনন্দকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "তাঁহার মুখে সেক্‌স্‌পীয়রের আবৃত্তি শুনিয়া আমরা বিমোহিত হইতাম।" ইংরাজী ভাষার দৌত্যের সাহায্যে বিদ্যাসাগর য়ুরোপের দর্শন ও সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত হন।[৫৭] ভাস্করাচার্য প্রণীত লীলাবতী ও বীজগণিত অপেক্ষা তিনি য়ুরোপীয় বীজগণিতকে অধিকতর শৃঙ্খলাপূর্ণ মনে করিতেন এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যকে ইংরাজী রীতিতে বীজগণিত অধ্যাপনার নির্দেশ দিয়াছিলেন।[৫৮] তাঁহার চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজে রীতিমত ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীনাথ দাস, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। হর্শেলের জ্যোতিষ গ্রন্থও বিদ্যাসাগরের অতি প্রিয় ছিল। তিনি শিক্ষা সংস্কারের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে নিম্নলিখিত ইংরাজী পাঠ্যগ্রন্থ ও ইংরাজী হইতে অনূদিত গ্রন্থকে পাঠ্যতালিকাভুক্তির জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন :

১। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণী—চেম্বার্সের *Rudiment of Knowledge*—এবং চেম্বার্স প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ।

২। ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণী—চেম্বার্সের *Moral Class Book*.

৩। সাহিত্য শ্রেণী—চেম্বার্সের *Biographies*, টেলিমেকাস, রাসেলাস প্রভৃতি।

৪। অলঙ্কার শ্রেণী—নৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।[৫৯]

তিনি জানিতেন যে, ছাত্রদের আধুনিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য চেম্বার্সের স্কুলপাঠ্য পুস্তক অতিশয় প্রয়োজনীয়; তাই তিনি নিজেও চেম্বার্স অবলম্বনে 'বোধোদয়', 'চরিতাবলী,' ও 'জীবনচরিত' রচনা করিয়া ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের একটা আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই স্কট, সেক্‌স্‌পীয়ার, মিলটন, হাক্‌স্‌লি, টিণ্ডেল, মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি ইংরাজ কবি ও দার্শনিকের মতামত ও বচন উল্লেখ

করিতেন। মিলের লজিক-ও তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল। য়ুরোপের সমাজ আন্দোলন এবং শিক্ষাবিধি তাঁহাকেও আলোড়িত করিয়াছিল। তাঁহার জীবনীকার সমসাময়িক য়ুরোপের সমাজ ও জীবনাদর্শের ইঙ্গিত দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"যে সময়ে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডি স্বদেশের উদ্ধারসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, যে সময়ে স্যাফ্টস্‌বেরি, ব্রাইট, কবডেন প্রভৃতি মহাত্মাগণ ইংলণ্ডে লোকহিতৈষণা ব্রতে নিযুক্ত, যে সময়ে কুমারী কার্পেণ্টার ইংলণ্ডের পরিত্যক্ত যুবক যুবতী ও বালক বালিকাদিগের দুর্দশায় কাতর হইয়া লোকসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং সুকঠিন প্রতিবন্ধকতা সত্বেও, সফলকাম হইয়া বালক বালিকাদিগের জন্য সংশোধন বিদ্যালয়বিধি (Reformatory School Act) বিধিবদ্ধ করাইতেছিলেন, যখন কুমারী কব্‌ ও কুমারী নাইটেঙ্গল নারীহিত সাধনে কুমারীব্রত গ্রহণে প্রস্তুত হইতেছিলেন, যখন রুষ সম্রাট আলেকজেণ্ডার সিংহাসনারোহণের সুখের বিনিময়ে দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ মানব সন্তানকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন, যে সময়ে মানব-দেবতা লীনকনস্‌ নিজ জীবনের বিনিময়ে দাসদিগের স্বাধীনতার সনন্দপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শতপ্রকার সামাজিক নিপীড়নে নিগ্রহগ্রস্ত হইয়া বঙ্গবীর ঈশ্বরচন্দ্র ভারতীয় রমণীকুলের সুখসাধনে জীবনপণ করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"৬০

উক্ত জীবনীকার সমসাময়িক য়ুরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের যে পটভূমিকা অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা বিদ্যাসাগরের চিন্তাজগতে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। যাহাকে রাজনীতি বলে, যাহা লইয়া 'ইয়ংবেঙ্গল' গণ অতিশয় মাতামাতি করিতেন, তাহার প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি আজীবন কর্মের সাধনা করিয়া গিয়াছেন, অলস চিন্তা-বিলাস তাঁহার নিকট বিষবৎ পরিত্যাজ্য ছিল। 'ইয়ং বেঙ্গল'দের এ্যাডাম স্মিথ, মিল্‌-বার্ক-এর গ্রন্থ লব্ধ বাষ্পীভূত রাজনৈতিক অভীপ্সা এই কর্মযোগীকে কোনদিন আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। শেষ জীবনে তাঁহার চোখের সম্মুখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; 'সদাশয়' ইংরাজ সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন পেশ করিয়া সাম্বৎসরিক কংগ্রেস সম্মেলন সমাপ্ত হইত। এই সমস্ত অলস আরামকেদারা-শায়ী আন্দোলনের প্রতি তাঁহার প্রীতি না থাকাই স্বাভাবিক। কোন এক জীবনীকার বিদ্যাসাগরের কংগ্রেস-প্রতিকূলতা উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহার নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"বাবুরা কংগ্রেস করিতেছেন, আন্দোলন করিতেছেন, আস্ফালন করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, ভারত উদ্ধার করিতেছেন। দেশের সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রতিদিন মরিতেছে, তাহার দিকে কেহই দেখিতেছেন না। রাজনীতি লইয়া কি হইবে? যে দেশের লোক দলে দলে না খাইয়া প্রত্যহ যমালয়ে যাইতেছে সে দেশের আবার রাজনীতি কি?১৬"

তাঁহার অন্যান্য প্রামাণিক জীবনীতে এইরূপ কংগ্রেসের প্রতি প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গ বা রাজনীতি বিদ্বেষের উল্লেখ নাই। তিনি প্রধানতঃ ছিলেন সমাজসংস্কারক এবং সমাজবিপ্লবী। কাজেই অলস রাজনৈতিক আলোচনা বা নিরর্থক রাজনৈতিক আন্দোলনের শূন্যগর্ভ আস্ফালনের প্রতি তিনি যে বিরূপ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি ?

একদা তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এ সংবাদও বিচিত্র বটে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির জালিয়াতী অপরাধের বিচার করিতে গিয়া সমগ্র বাঙালী জাতিকে জালিয়াত বলিয়া নিন্দা করেন। বিদ্যাসাগর এই অশিষ্ট উক্তিতে এতদূর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে, প্রায় পাঁচ হাজার বাঙালীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া, সভা ডাকিয়া প্রতিবাদ করিয়া গভর্ণর জেনারেলের মারফতে বিলাতে পার্লামেণ্টে সেই প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করেন। ইহার ফলে বিচারপতি মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স্ স্টেট সেক্রেটারীর নিকট তীব্র ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছিলেন।[৬২] বিদ্যাসাগর বাঙালী জাতির মহত্ত্বর ঐতিহ্যে কতদূর বিশ্বাসী ছিলেন, এই ঘটনাই তাহার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁহার নিকট প্রীতিকর না হইলেও, বাঙালীর জাতিগত সম্মান রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি আন্দোলনেও অবতীর্ণ হইতে পারিতেন।

বিদ্যাসাগর সম্ভবতঃ কোঁতের অনুরাগী ছিলেন—অবশ্য এ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। তিনি দুই একস্থলে অন্যান্য দার্শনিকদের সহিত কোঁতের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। একদা রামকমল ভট্টাচার্য আত্মহত্যা করিলে তদনুজ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁহার দার্শনিক গুরু কোঁতের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া মনোবেদনা লঘু করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তখন (১৮৫৭) কোঁৎ লোকান্তরিত হইয়াছেন। সেই চিঠি পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসে এবং বিদ্যাসাগরের হাতে পড়ে। তিনি এ জন্য তাঁহার প্রিয় ছাত্র কৃষ্ণকমলকে ঈষৎ পরিহাসমিশ্রিত ভর্ৎসনা করেন।[৬৩] ইহাতে অবশ্য তাঁহার কোঁৎ-বিরোধিতা প্রমাণিত হয় না—তিনি শোকাবহ ব্যাপার লইয়া ভাবালুতা পছন্দ করিতেন না, এইটুকুই শুধু বুঝা যায়। মানবহিতবাদের দিক হইতে বরং তাঁহার জীবন-দর্শনের সহিত কোঁৎ-দর্শনের গভীর সাদৃশ্য আছে। কোঁৎ যেমন ঈশ্বরের স্থলে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও ঠিক তেমনি মানুষকে ভাল

বাসিয়াছিলেন। অবশ্য পার্থক্যও বড় কম নাই। কোঁৎ যেমন তত্ত্বকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর ঠিক সেরূপ নির্বিকল্প তত্ত্ববাদী ছিলেন না। কোঁৎ মানুষকেও দৈবপ্রভাবের বাতায়ন হইতেই দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট মানুষ ও ভগবানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মানুষের বাস্তব জীবন লইয়া অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন; তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি মানুষকে বুঝিতে চাহেন নাই। কোঁৎ কিয়ৎ পরিমাণে ভাববাদী, বিদ্যাসাগর জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন স্মৃতি,—যাহাই চর্চা করুন না কেন, মূলতঃ ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী; তিনি উপযোগবাদের মাপকাঠি দিয়া জীবনের মূল্য বিচার করিতেন। ম্যাক্স-মূলার রামমোহনকে 'তুলনামূলক ধর্মালোচনার জনক' আখ্যা দিয়াছেন। বিদ্যাসাগর সে আখ্যা দাবী করিতে পারেন না; গুহানিহিত ধর্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম গতি সম্বন্ধে তিনি আদৌ চিন্তিত হন নাই। ধর্মবোধ-বিরহিত মানুষ সম্বন্ধে তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। মানুষকে ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়া নারীজাতির দুঃখ দূরীকরণের জন্য পর্বতপ্রমাণ গুরুভারকেও সবলে তুচ্ছ করিয়াছিলেন; স্বগ্রামে দরিদ্র কৃষাণদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কার্মাটাড়ে সাঁওতালদের মধ্যেও প্রীতিস্নিগ্ধ বন্ধুত্ব খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, তাঁহার উপর য়ুরোপীয় চিন্তাধারা কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে রামেন্দ্রসুন্দরের একটি কথা না মানিয়া উপায় নাই—"তিনি সাধারণ বাঙালী হইতে যেমন পৃথক ছিলেন, তাঁহার চরিত্র ইউরোপীয়ের চরিত্র হইতে তেমনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল।"[৬৪] বিদ্যাসাগরের মধ্যে যেমন ব্রজেন্দ্রনাথ কথিত 'জনবুলের জিদ' ছিল, তেমনি ছিল মানবপ্রেম, যে মানবপ্রেম মানুষের সুখদুঃখে আলোড়িত হয়। নারী-শিক্ষা-বিস্তার, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, বহু-বিবাহ নিরোধের চেষ্টা, সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন, ঐ কলেজে অব্রাহ্মণের অধ্যয়নের বাধা দূরীকরণ—প্রভৃতি প্রগতিমূলক বৈপ্লবিক এষণা তিনি শুধু ইংরাজ সংস্পর্শে আসিয়াই লাভ করেন নাই, ইহা ছিল তাঁহার সহজাত জন্মসংস্কার। রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছিলেন যে, বিদ্যাসাগর যদি শুধু বীরসিংহে বাস করিতেন, কলিকাতায় কোন দিন না-ও আসিতেন, তাহা হইলেও তিনি ক্ষুদ্র বীরসিংহকে কাঁপাইয়া তুলিতেন। কথাটা অমূলক নহে। উত্তরকালে কর্মজীবনে বিদ্যাসাগর য়ুরোপীয়দের নিকট-সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করিবার

পর তিনি যথাবিধি ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা করিবার পূর্ব হইতেই তিনি জীবনের নব নব প্রতীতি সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন। প্রবল পৌরুষ ও ঋজু চরিত্র তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকাব সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, বাহ্যতঃ তিনি মোটা ধুতি চাদর ব্যবহার করিলেও য়ুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা হইতে বঞ্চিত ছিলেন না। য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও জীবনদর্শনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহাব চিত্ততলে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ধর্মকেও তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার না করিয়া বরং মানুষের প্রয়োজনের দিক হইতেই দর্শন করিতেন। হিন্দুব আচার-আচরণ সম্বন্ধে তিনি যে কিয়দংশে উদাসীন ছিলেন, তাহা মিথ্যা নহে। কিন্তু তাহার মূলে ছিল জীবনের প্রতি গভীর নিষ্ঠা, প্রত্যক্ষ জীবনের অযুত সমস্যা ও ব্যথাবেদনা লইয়া তিনি এত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে বৈদেহী পরাবিদ্যা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন নাই। এই চেতনা যে য়ুরোপীয় সংস্কারলব্ধ, তাহা মনে হয় না। জীবন-যাপনে ও অশনেবসনে তিনি বিশুদ্ধ বাঙালীই ছিলেন; শিষ্টাচারের অনুরোধ তাঁহাকে দুই একবার য়ুরোপীয় 'ধড়াচুড়া' পবিধান করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি কখনও স্বস্তিবোধ কবেন নাই, তাহা পরিত্যাগ করিয়াই শান্তি পাইতেন। জাতি-পাঁতির পার্থক্যবোধ সম্বন্ধেও তিনি যে রক্ষণশীল ছিলেন না, তাহার দুই একটি প্রমাণ আছে। একদা তিনি কোন কাযোপলক্ষে ভাটপাড়ায় গিয়াছিলেন; সেখানে তিান কায়স্থ বন্ধু অমৃতলাল মিত্রের পাত হইতে কৌতুক-বশে মাছের মুড়া কাড়াকাড়ি করিয়া খাইয়াছিলেন। তাহাব জন্য স্থানীয় সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহার উপর কিছু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।[৬৫] হিন্দুর জাতি-পংক্তি, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু তিনি কখনও নিজ জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও কদাচার করেন নাই। সেযুগে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই পরিমিত বা অপরিমিত সুরা পান করিতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কখনও মদ্যমাংস স্পর্শ করেন নাই। সমাজরীতি ও দেশাচারকেও তিনি সর্বদা যুক্তি দ্বারা বিচার করিতেন, মানব-কল্যাণের পীঠস্থান হইতে তিনি সমাজ ও দেশাচারকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহ বিষয়ক দুইখানি পুস্তিকায় তিনি যে নির্মমভাবে দেশাচারকে আক্রমণ করিয়াছেন—তাহার একমাত্র কারণ মানব-প্রেম। যুক্তিবাদ অবশ্যই আছে, কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও

প্রীতি ছিল বলিয়াই তিনি মানবকল্যাণের প্রতি উদাসীন দেশাচার ও শাস্ত্র-সংহিতাকে বর্জন করিয়াছেন। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে তিনি কিয়দংশে যুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও মানবপ্রীতি ছিল তাঁহার সহজাত জীবনধর্ম; এবিষয়ে তাঁহাকে য়ুরোপীয় তত্ত্বজ্ঞানের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয় নাই। বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী সম্পাদনাকালে ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন "এই সংস্কারক-সম্প্রদায়ের শিরোমণি রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিতান্ত প্রাচীন দেশীয় প্রথায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; পরবর্তী জীবনে ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইঁহারা উভয়ে ইংরাজী নবীশ হইয়া উঠিলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল ইঁহাদিগকে বলা চলে না। ইয়ং বেঙ্গল নামে যে তরুণ সম্প্রদায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, সমাজ সংস্কার ব্যাপারে তাঁহারাও এই রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমকক্ষতা করিতে পারেন নাই।"[৬৬] এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ইংরাজী-নবীশ না হইয়া যদি গ্রাম্যসমাজ ও টোল-চতুষ্পাঠীতে সারাজীবন অতিবাহিত করিতেন তাহা হইলেও অন্তরাগ্নির তেজে চারিদিকে বহ্ন্যুৎসব সৃষ্টি করিতে পারিতেন। তাঁহাদের সহিত ডিরোজিওর মানস-শিষ্যদের প্রধান পার্থক্য, বিদ্যসাগর-রামমোহন মৃত্তিকা-সম্ভব বহ্নিশিখা; আর 'ইয়ং বেঙ্গল'গণ গুরুর করধৃত মশাল-বর্তিকা; য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলন করিয়া তাহার আলোকেই তাঁহারা অন্তর-প্রদীপটিকে জ্বালাইয়া লইয়াছিলেন। রামমোহন-বিদ্যাসাগর কিন্তু অন্তরেব অগ্নিকুণ্ড হইতে বহ্নি চয়ন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য চিত্তলোকের প্রভাব তাঁহাদের অন্তর ও কর্মপ্রচেষ্টাকে আরও বিশালতা দান করিয়াছে।

॥ ৪ ॥

বিদ্যাসাগরের অন্তর্জীবন

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শ ও মনোজগৎ সম্বন্ধে জীবনীকারদের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার দুইজন জীবনীকার, বিহারীলাল সরকার ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহার জীবনকে বিচার করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন অগ্রজের যে জীবনী রচনা করিয়াছেন তাহাতেও অনেক অনৈক্য

পরিদৃষ্ট হয়। বিদ্যাসাগরের স্বরচিত জীবনচরিত সমগ্র জীবনের খণ্ডাংশ মাত্র; তাহা হইতে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন ও অন্তর্জীবনের প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করা যায় না। তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় যে-সমস্ত স্মৃতিকথা জাতীয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহাদের ব্যক্তিগত রুচি ও ধ্যানধারণা এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, অনেক সময় একের বিবৃতির সহিত অপরের তথ্যগত বৈষম্য ঘটিয়াছে। বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ আন্দোলন আরম্ভ করিলে যে গান প্রচারিত হইয়াছিল ('সুখে থাকুক বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে'), বিহারীলালের গ্রন্থে উল্লিখিত সেই গানটির সহিত শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থে উদ্ধৃত গানের সাদৃশ্য নাই। সুতরাং বিদ্যাসাগরের অন্তর্জীবন, ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁহার যথার্থ মনোভাব বিশ্লেষণ করা দুরূহ, সন্দেহ নাই। তথাপি যে সমস্ত উপাদান পাওয়া গিয়াছে তাহাই অবলম্বন করা হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর বাল্যে নাকি প্রতিমা পূজার তাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন না।[৬৭] উপনয়নের পর, অত্যন্ত মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি ব্রাহ্মণগণের অবশ্যকরণীয় সন্ধ্যাবন্দনাদির মন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আবার পিতার তাড়নায় তাহা একদিনেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। চিঠিপত্রাদিতেও দুর্গা, হরি প্রভৃতি দেবদেবীর নাম লিখিয়া পাঠ আরম্ভ করিতেন বটে, কিন্তু পিতা ও পিতামহীর অনুরোধ সত্ত্বেও দীক্ষা ও মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। ব্রাহ্মণের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তিনি যে রেখায় রেখায় অনুসরণ করিতেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। স্মৃতিসংহিতা মতেই শ্রাদ্ধাদি করিতেন, কিন্তু স্মার্ত আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল কি-না সন্দেহ। কেহ বিহিত ধর্মাচরণ করিলে তিনি বাধা দিতেন না, কিন্তু নিজে কোন দিন তাহা অনুশীলন করেন নাই, আবার 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মত হিন্দুয়ানীর উপর অস্ত্রাঘাতও করেন নাই।

বিদ্যাসাগরের মনোজীবনের প্রাপ্ত উপকরণ পরিদৃষ্টে মনে হয়, তিনি ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু উদাসীন, কিছু সংশয়ান্বিত ছিলেন। তাঁহার ধর্মমত সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হইলে তিনি প্রায়শঃই এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন। বুদ্ধশিষ্য আনন্দ বুদ্ধদেবকে পরলোক ঈশ্বর প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি যেমন মূল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মানুষের আধিভৌতিক দুঃখব্যাধি বিষয়ে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরের মনোভাব কিয়দংশে তদনুরূপ ছিল।

কতকগুলি প্রমাণানুসারে দেখা যায় যে, তিনি ধর্মকর্ম আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষ কোন মূল্য দিতেন না ; প্রায়ই বলিতেন, "ধর্মকর্ম সব দলবাঁধা কাণ্ড।"৬৮ বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মসভাব দলাদলিই ছিল এই তিক্ত উক্তির প্রধান লক্ষ্য। তত্ত্ববোধিনী সভা, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার গভীর সংযোগ ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অতিরেককে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন না। "অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সংস্রব ত্যাগ করিলে বিদ্যাসাগরও ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মভাব বিজড়িত দেখিয়া এবং কোন কোন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বাবুর সহিত তাঁহার ঠিকমত মিল হইতেছে না বুঝিয়া অক্ষয়কুমার দত্তের কিছুকাল পরেই তিনি তত্ত্ববোধিনীর সম্পর্ক ত্যাগ করেন।"৬৯ আদি ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীলতাও তাঁহার বিশেষ প্রীতিকর ছিল না। একদা রাজনারায়ণ বসুকে তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ; "আপনারা (অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মসমাজ) একটা গলির মধ্যে পড়েছেন, আর সেই গলির একদিকে হিন্দুরা, অন্যদিকে অত্যাগ্রগামী ব্রাহ্মেরা চাপিয়া ধরিয়াছে।"৭০ এ বিষয়ে তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তবুদ্ধি মানবপ্রেমী বলিয়া অনুমান হয়। তিনি ধর্ম অপেক্ষা কর্মেরই অধিকতর অনুরাগী ছিলেন, ঈশ্বরসেবা অপেক্ষা নর-সেবাকে জীবনের অধিকতর শ্লাঘনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সংক্ষেপে বিদ্যাসাগরের জীবনধর্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নানা দিক দিয়া তাহা অতিশয় যুক্তিসঙ্গত :

> "বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ উদার ও উচ্চপ্রাণ এবং গভীর সহৃদয়তা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তিনি সর্বদা সর্বত্র সকল লোকের সুখসাধন করিতে পারিলেই ও সকলকে সুখী দেখিতে পাইলেই পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেন, তাই চিরদিন মানবের স্বাধীন হৃদয়ের—মুক্ত ভাবের পক্ষপাতী ছিলেন। সমাজ এবং সম্প্রদায়, শাস্ত্র এবং বিধি, যখন তাহার অনুকূল তিনিও তখন তাহার পক্ষপাতী, যখন তাহারা মানবের ন্যায্য সুখের বিরোধী তিনিও তখন সে সকলের ঘোর শত্রু।"৭১

এখন আর একটা মৌলিক প্রশ্নে আসা যাক। বিদ্যাসাগর আস্তিক্যবাদী ছিলেন, না নিরীশ্বরবাদী ছিলেন? এবিষয়ে কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছান দুষ্কর। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য স্পষ্টই বলিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা বোধ হয় তোমরা জান না, যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না।.. পাশ্চাত্য সাহিত্যের

ভাববন্যায় এদেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল ; চিরকাল-পোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?"

এত সহজে কিন্তু সমস্যাটির মীমাংসা করা যায় না। বিদ্যাসাগর একেবারেই পরমেশ্বর মানিতেন না, তাহার পক্ষে দুই একটি প্রমাণ আছে বটে। একদা তিনি কাশীতে গিয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার বিগ্রহ দর্শনে যান নাই। ইহাতে স্থানীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও পাণ্ডাসম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হইলে তিনি মাতাপিতাকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননী দেবী বিরাজমান।" [৭৩] এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তিনি হিন্দুর পুরাণোক্ত দেবদেবী সম্বন্ধে নাস্তিক্যবাদী ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে উইল করিয়াছিলেন, তাহাতে নানা খাতে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেবসেবাদি বিষয়ে কোন অর্থ বরাদ্দ করেন নাই।[৭৪] তিনি নাকি তাঁহার মাতার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বলিতেন, 'আমার মা বলিতেন, যে-দেবতা আমি নিজ হাতে গড়িলাম, সে আমাকে উদ্ধার করবে কেমন ক'রে ? বাঁশ, খড়, দড়ি, মাটিতে ঠাকুর গ'ড়ে পূজা ক'রে কি ধর্ম হয় ?" ইহা কি ভগবতী দেবীর অভিমত, না বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত ?

হিন্দুর দেবদেবী সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত যে সংশয়ান্বিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি কি সত্যই নাস্তিক ছিলেন ? তাঁহার এক জীবনীকার তাঁহার উক্তি বলিয়া যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য :

"এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন, তা বেশ বুঝি। তবে ঐ পথে চলিলে নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এসকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না।"[৭৫]

একবার সেণ্ট্ লরেন্স্ নামক একখানি যাত্রীবাহী স্টিমার ডুবিয়া গেলে তিনি গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, "দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর, যে নানা দেশের নানা স্থানের অসংখ্য লোককে একত্র ডুবাইলেন ? আমি যাহা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হইয়া কেমন করিয়া ৭০০।৮০০ লোককে একত্র এক সময়ে ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বালাইয়া দিলেন ? দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ ? এই সকল দেখিলে কেহ মালিক আছেন বলিয়া সহসা বোধ হয় না।"[৭৬]

আমাদের অনুমান, একদিকে য়ুরোপীয় ঐহিক যুক্তিবাদ, আর একদিকে ব্রাহ্মসমাজ,—বিদ্যাসাগর এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় করিতে না পারিয়া বিষম চিত্ত-সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। 'বোধোদয়ের' দ্বিতীয় সংস্করণে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুরোধে পড়িয়াই তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে "নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ"—এই পংক্তিটি যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। শকুন্তলা নাটক অনুবাদ কালে অলৌকিকতা ও ঋষিমহিমা অনেকাংশে বাদ দিয়াছেন, উত্তর চরিত অবলম্বনে 'সীতার বনবাস' রচনাকালে ভবভূতি পরিকল্পিত ছায়াসীতার সহিত রামচন্দ্রের মিলনদৃশ্য অঙ্কন না করিয়া বিয়োগান্ত বেদনার মধ্যে গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন, ধর্ম ও পরলোক সম্বন্ধে তিনি প্রায়শঃই প্রত্যক্ষবাদী ও মানবপ্রেমীর ন্যায় উক্তি করিতেন, কিন্তু ঐহিকতা ও ঈশ্বরতত্ত্বের সহিত বিরোধদর্শনে মাঝে মাঝে অতিশয় সংশয়াম্বিত হইতেন। এ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তি নূতন চিন্তা উদ্রেক করিবে :—

"ঈশ্বর এবং পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাঁহার জীবনী লেখকেরা সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা বলেন নাই। তবে জগৎ ও সংসার হইতে দুঃখের অস্তিত্বটা এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিয়া সুখের এবং মঙ্গলের রাজ্য কল্পনার বলে প্রতিষ্ঠা করা বোধ করি দয়ার সাগরের পক্ষে অসাধ্য ছিল।......স্বর্গের দেবতায় তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল জানি না, কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান জীবন্ত দেবের তুষ্টির জন্য আপনার ধর্মবুদ্ধিকে পর্যন্ত বলিদান দেওয়া সময়বিশেষে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন।'[৭৭]

বিদ্যাসাগরের জীবনীকারদের মধ্যে বিহারীলাল সরকার তাঁহাকে নিরীশ্বর-বাদী বলিতে চাহেন, কিন্তু অন্য জীবনীকার, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এতদূর যাইতে প্রস্তুত নহেন। সে যুগের অনেকে ধর্ম, পরকাল, দেব-দেবী ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁহাকে নিঃস্পৃহ দেখিয়া, বিশেষতঃ হিন্দুর বহুকালাশ্রিত সংস্কারের উপর খড়্গাঘাত করিতে দেখিয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া জানিতেন। যাঁহারা ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিতেন, বিদ্যাসাগর ব্রাহ্ম সমাজ, ধর্মসভা ইয়ং বেঙ্গল—কাহারও দলভুক্ত নহেন, অথচ অতিশয় প্রগতিপরায়ণ ; জীবনচর্যায় বিশুদ্ধ বাঙালী হইয়াও কোন কোন বিষয়ে অতিশয় অগ্রগামী। কাজেই তাঁহার জীবনবাদ লইয়া কিছু মতভেদ সৃষ্টি হইবেই।

আমাদের মনে হয়, মানুষের প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই মানুষের বেদনায় পীড়িত হইয়া তিনি মাঝে মাঝে ঈশ্বর-চৈতন্যে অবিশ্বাস করিতেন। রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তি স্মরণীয়—"বিদ্যাসাগর সেই শাক্যমুনি

প্রদর্শিত বৈরাগ্য মার্গের ও কর্মমার্গের পথিক ছিলেন।...তিনি যে মার্গে চলিতেন, তাহা আর্যশাস্ত্র সম্মত ও বৌদ্ধশাস্ত্র সম্মত মানবশাস্ত্র সম্মত সনাতন ধর্ম মার্গ।" কিন্তু বিদ্যাসাগর ঠিক বৈরাগ্যমার্গের পথিক ছিলেন না; তিনি ছিলেন মূলতঃ মানবপ্রেমী এবং কর্মযোগের মধ্য দিয়াই মানবপ্রেমের সার্থকতা খুঁজিতেন। মানব-জীবনের প্রতি তাঁহার—বৈরাগ্য নহে, পরম আসক্তিই ছিল। তাই বহু-জনের নিকট যখন কেবল বঞ্চনাই লাভ কবিলেন, অকৃতজ্ঞের কৃতঘ্নতাই যখন তাঁহার নরসেবার পুরস্কার হইল, তখন তিনি গীতার নিষ্কাম নিঃস্পৃহ কর্মবাদ গ্রহণ করিয়া বলিতে পাবেন নাই, "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি," অথবা রবীন্দ্রনাথের মত "সংসাবেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা, নিজেব মনে না যেন মানি ক্ষয়"—এই আশ্বাসের বাণী উচ্চাবণ কবিয়াও তিনি শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পাবেন নাই। যিনি মানব প্রেমিক ছিলেন, তিনি বহু দুঃখকষ্টের আঘাত পাইয়া কিছুটা মানববিদ্বেষী হইয়া পড়িযাছিলেন; বিশেষতঃ নাগরিক জীবন ও আধুনিক শিক্ষাভিমানী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ববং তিনি কার্মাটাড়ে বন্য সাঁওতাল সাহ[illegible]র অনেক বেশি তৃপ্তি পাইতেন।

শেষ জীবনে তিনি এক মুসলমান বাউলেব গান শুনিতে ভালবাসিতেন। তাহার নাম অখিল উদ্দিন।[৭৯] সেই বাউল একেশ্ববাদ বিষয়ক যে গানগুলি গাহিয়া বিচিত্র কর্মজাল-জড়িত বিদ্যাসাগরকে শান্তি দিত, তাহার দুই একটি উল্লিখিত হইল :—

১। তুমি আপনি নৌকা, আপনি নদী, আপনি দাঁড়ী, আপনি মাঝি,
আপনি হও যে চড়নদার জী, আপনি হও যে পারের কাছি
আপনি হও যে হাইল বৈঠা।

২। তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা;
আপনার নামটি রাখবো কোথা,
সে নাম হৃদয়ে গাঁথা,
আমার গোঁসাঞি চাঁদ বাউলে বলে
সে নাম ভুলবো নারে প্রাণ গেলে।

৩। তুমি আপনি হও অসার, আপনি হও সার,
আপনি হও ওরে নদীর দু'ধার,
আপনি নদীর কিনার,

আমি অগাধ জলে ডুব দিতে চাই
সে নাম ভুলবো নারে প্রাণ গেলে।
আপনি তারা, আপনি সারা,
আপনি জরা, আপনি মরা,
আপনি হও যে নদীর পাড়া।
আবার আপনি হও যে শ্মশান কর্তা গো,
আপনি হও সে জলের মীন,
ও নিরঞ্জন, তোর কোথায় গো সাকিন ॥৭৮

শেষ জীবনে নানা কারণে তাঁহার চিত্তের যে ভাবান্তর হইতেছিল, অখিল উদ্দিন বাউলেব এই গানগুলিতে তাহাব আভাস পাওয়া যাইতেছে।

শেষ জীবনে বিদ্যাসাগর শিক্ষিত বাঙালীর কৃতঘ্নতার আঘাতে জর্জরিত হইয়াছিলেন, আবাব ভ্রাতাদের ব্যবহাবেও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাই তিনি বৈরাগ্য অবলম্বনেব সিদ্ধান্ত কবেন এবং তাঁহাব আত্মীয় বন্ধুজন, প্রত্যেককেই সে সিদ্ধান্ত জানাইয়া এই মর্মে-পত্র লিখিয়াছিলেন, "নানা কারণে আমাব মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আব আমাব ক্ষণকালের জন্যও কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব বাখিতে ইচ্ছা নাই।"৮০ তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল মানপ্রেব, নরসেবা। কিন্তু ক্রমাগত উপকৃত জনের নিকট হইতে আঘাত পাইয়া তাঁহাব চিত্ত তিক্ততায় ভরিয়া গিয়াছিল। সাধারণতঃ এইরূপ মানসিক অবস্থায় অনেকে ঈশ্বরাশ্রয় লাভ করিয়া জীবনের ব্যর্থতা ভুলিতে চাহেন। বিদ্যাসাগর ঈশ্বর সম্বন্ধে সুদৃঢ় আস্তিক্যবাদী ছিলেন না; কাজেই তিনি কোন অবলম্বন না পাইয়া শেষ জীবনে কটুকণ্ঠে মানুষকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিয়াছেন, "ইতর জন্তু কারা? মানুষ যাহাদিগকে ইতর জন্তু বলে, তাহারা, না মানুষ নিজে? মানুষ সকল অপকর্মই করিতে পারে; তবে সে শৃগাল, কুকুর, সিংহ, ব্যাঘ্র, গো, মেষ প্রভৃতি জীবদিগকে কেন ইতর জন্তু বলিবে?"৮১

জীবন সম্বন্ধে এই প্রতিক্রিয়া, নেতিবাদী বৈনাশিক দৃষ্টিভঙ্গী—ইহার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই হয়তো বিদ্যাসাগরের মনে শেষ জীবনে একটা অস্পষ্ট ভাগবতী চেতনা জাগিয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত তিনি এমনই একটা কর্মবহুল ও ঘটনাপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন যে, এইরূপ কোন গভীর তত্ত্বচিন্তা তাঁহার মধ্যে কোন স্থায়ী ছায়াপাত করে নাই।

১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে বিধবা-বিবাহ আইন পাসের পর তাঁহার উপর নানা দিক দিয়া নিগ্রহ শুরু হয়, এবং তিনি সমস্ত প্রতিকূল তরঙ্গের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রাম করেন ; জীবনের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি ঈশ্বরকে বাদ দিয়া মানুষের সেবাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু জীবনের প্রান্তে পৌঁছাইয়া তাঁহার স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছিল ; অযুত বঞ্চনার আঘাতে তাঁহার মানবপ্রেম টলিয়াছিল, একটা শঙ্কাতুর সংশয় তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিয়াছিল। তখনই বোধহয় প্রয়োজন হইয়াছিল অখিল উদ্দিনের ঐ গানগুলির, যাহার মধ্যে অবগাহন করিয়া তিনি সমগ্র জীবনের তিক্ততা ভুলিতে চাহিয়াছিলেন।

কেহ বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলে তিনি বলিতেন, "আমার মত কাহাকে কখনও বলি না, বলিবও না ; তবে এই কথা বলি, গঙ্গা স্নানে যদি আপনার দেহ পবিত্র মনে করেন, শিব পূজায় যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন, তাহা হইলে তাহাই আপনার ধর্ম।"[৮২] এখানে তিনি ব্যক্তিগত অভিরুচির উপরেই ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের জীবন-সঙ্কট ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীরই চিত্তসঙ্কট বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। একদিকে মানবপ্রেম আর একদিকে নীতি-নিয়মপাশে জড়িত বাঙলার সমাজ-জীবন ও সাহিত্য-মানস। রামমোহনের প্রভাব তখন ব্রাহ্মসমাজের দ্বিধান্বিত দলের মধ্যে পড়িয়া হতবল হইয়া পড়িতেছিল ; অপরদিকে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের সর্ব-বৈনাশিক মতবাদ উগ্রতর হইয়া উঠিতেছিল। এই যুগসঙ্কটে আবির্ভূত হইয়া যুবক বিদ্যাসাগর বাস্তব জীবনের এইটা মহৎ মূল্য আবিষ্কার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং পরলোক, ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি আধিমানসিক ব্যাপারগুলিকে সাধ্যমত পাশ কাটাইয়া চলিতেন।

১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাঙলা দেশে সমন্বয়ের সূত্রপাত হয়—ইহা য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান এবং ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনাব সমন্বয়। বিদ্যাসাগর এই সমন্বয়েব প্রতি বিমুখ না হইলেও, এই বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহাকে প্রধানতঃ আধুনিক শিক্ষাভিমানী এবং প্রাচীনপন্থী,—উভয় প্রকার বাঙালীর সহিত একাধিক বার সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রধান জিজ্ঞাস্য ছিল, মানবজীবনের প্রতীতিগম্য বিষয়বস্তুর মূল্য বিচার কি ভাবে করা যাইবে। পরত্রের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না, মানুষের ইহলৌকিক জীবনই ছিল তাঁহার চেতনার কেন্দ্রবিন্দু।

১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যে আস্তিক্যবোধের সমন্বয়-রেখা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইতেছিল। একদিকে ব্রাহ্মসমাজ, অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, একদিকে বঙ্কিমগোষ্ঠীর অভ্যুদয়, আর একদিকে নবীনচন্দ্রের ভাবতরল কৃষ্ণায়ন আদর্শ, একদিকে দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের ভক্তিবাদ, অপরদিকে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতি কোঁৎপন্থীদিগের লোকহিতৈষী নিরীশ্বরবাদ। এই সঙ্কট-মুহূর্তে বিদ্যাসাগরের জীবনেও নানা সমস্যা দেখা দিয়াছিল। মানুষকে শ্রদ্ধা করিয়া, ভালবাসিয়া, সেবা করিয়া তিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়াছেন; কিন্তু অন্যকে গীতোক্ত নিষ্কামধর্ম অবলম্বনেব উপদেশ দিলেও তিনি নিজে বোধ হয় তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কারণ সেই যে অনাসক্তি বা অসঙ্গ— বিদ্যাসাগরের চিত্তের ধাতুপ্রকৃতি তাহার অনুকূলে ছিল না। তাই শেষজীবনে মানুষের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস কিছু শিথিল হইয়াছিল। বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বে তাঁহার সমগ্র সত্তা কিছু বিপর্যস্ত হইয়াছিল, তাঁহাব শেষজীবনের পরিচয় লইলেই তাহা বুঝা যাইবে। তাঁহার এই চিত্তসঙ্কটের পূর্ণ পরিচয় তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে পাওয়া যাইবে না। কারণ উক্ত গ্রন্থগুলি প্রায়শঃই পাঠ্যপুস্তকের শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু তাঁহার দুই একটি উক্তি এবং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য সম্প্রদায়ের স্মৃতিকথা বা অনুরূপ গ্রন্থ হইতে তাঁহার আত্মার সঙ্কটমুহূর্তের আংশিক পরিচয় পাওয়া যাইবে। অবশ্য এই সমস্ত উক্তি বা তথ্যবিবৃতি অনেকাংশে লেখক-বিশেষের মানসিক ভাবানুষঙ্গেব রসে অনুরঞ্জিত বলিয়া ইহাকে সব সময় প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবন কর্ম ও সাধনার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরচেতনার কোন সম্পর্ক ছিল না, তাঁহার কোন বচনা বা চিঠিপত্রেরও তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না; 'দুর্গা' 'হবি' শিরোনামা দিয়া তিনি পত্র লিখিতেন বলিয়াই তাঁহাকে ঈশ্ববাদী বলা যায় না, উহা পত্রলিখনের একটা শিষ্টাচার মাত্র, তদ্দ্বারা তাঁহার মানসিক প্রবণতা প্রমাণিত হয় না।

(রামমোহন সবলে হৃদয়াবেগের উর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন, একান্তভাবে যুক্তিবাদী রামমোহনের চিত্তে কোনপ্রকার দ্বিধান্বিত সংশর ঘনায়িত হয় নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর জীবনমেরুর দুইদিকে ধাবমান, একদিকে বুদ্ধির প্রাধান্য, যুক্তির পথ,—অপর দিকে ভাবাবেগ ও মানবপ্রেম। ১৯শ শতাব্দীর সেই চিত্তসঙ্কট, ও প্রেমের দ্বন্দ্ব—তাহারই তরঙ্গাঘাতে তিনি কখনও উদ্বেল, কখনও ঘোর সংশয়বাদী।) বিদ্যাসাগরের জীবনে—এই যে নানা ঘটনার

ঘাতপ্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব-সংশয়, ইহা ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালী-মানসেরই যুগচ্ছবি।

পাদটীকা

১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর জীবন চরিত, পৃঃ ১৮

২। বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ ৪৪

৩। Subal Chandra Mitra—Isvar Chandra Vidyasagar—Story of his Life and Works. (pp. 19-20.)

৪। Ibid—p. 272

৫। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পৃ ৮; 'সাহিত্য' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

৬। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত

৭। Indian Mirror. 15th July, 1877.

৮। The Bengal Spectator, 1st November, 1843.

৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগব প্রসঙ্গ, পৃ ১৮

১০। বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, পৃ ১৪৫

১১। Subal Ch. Mitra—Op. Cit, P. 64.

১২। বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, পৃ ১৪৪

১৩। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, পৃ ৫৪১

১৪। ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকের তালিকায় বেতাল পঞ্চবিংশতির মুদ্রণ কাল—১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ

১৫। বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ ১৭৯-৮১

১৬। ১৯১৪ সালে লিপ্‌জিগ্‌ হইতে প্রকাশিত—Die Vetala Pancavimsatika হইতে উদ্ধৃত।

১৭। M. B, Emeneau সম্পাদিত জম্ভলদত্তের গ্রন্থ, পৃ ৪২

১৮। ১৮৫৬ সনের সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত

১৯। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, শিক্ষা ও বিবিধখণ্ড, পৃ ৮

২০। ঐ, পৃ ৫৯

২১। ১৮৮৫ সনের সংস্করণে সংযোজিত বিজ্ঞাপন।

২২। বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, পৃ ১৮০

২৩। চণ্ডীচরণ—বিদ্যাসাগর, পৃ ১৯১
২৪। বিহারীলাল—ঐ, পৃ. ২০৭-৮
২৫। চণ্ডীচরণ—ঐ, পৃ ১৭২
২৬। বিহারীলাল—ঐ, পৃ ২৯৮
২৭। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, সমাজখণ্ড' পৃ ।।৶০
২৮। ১৯০৭ সংস্করণ।
২৯। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্বরচিত জীবনচরিত, ৩য় সং, পৃ ৬৯
৩০। বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, পৃ ২২২
৩১। চণ্ডীচরণ—ঐ, পৃ ৫৪১
৩২। বিহারীলাল—ঐ, পৃ ২২৩
৩৩। ১৮৬৩ সনের সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত।
৩৪। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, শিক্ষা ও বিবিধখণ্ড, পৃ ৬০৭-৮
৩৫। বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, পৃ ২৪৭
৩৬। ঐ, পৃ ৩০৩
৩৭। সংবাদ প্রভাকর, ১৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৫
৩৮। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, সমাজখণ্ড, পৃ ৩৬
৩৯। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, সমাজখণ্ড, পৃ ২৪
৪০। বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, পৃ ৪৮৮
৪১। ১৯৪৫ সংবতের সংস্করণ, পৃ ৫১
৪২। ঐ, পৃ ২২
৪৩। রামেন্দ্রসুন্দর—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পৃ ৮
৪৪। H. H. Wilson—Report of the Indian Education Commission 257
৪৫। চণ্ডীচরণ—বিদ্যাসাগর, পৃ ৫৭
৪৬। বিনয় ঘোষ—যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর, মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩
৪৭। বিদ্যাসাগরের স্বরচিত জীবন চরিত, পৃ ৫২, ১৮৯১ সনের সংস্করণ
৪৮। ঋজুপাঠ, ১ম ভাগ, ১৯০৮ সংবতের সংস্করণ
৪৯। ঐ, ২য় ভাগ, বিজ্ঞাপন
৫০। ব্রজেন্দ্রনাথ—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, পৃ ২২
৫১। ঐ—ঐ, পৃ ৭৭-৮
৫২। বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, ২৪৫
৫৩—৫৯। বিহারীলাল অনূদিত।
৬০। চণ্ডীচরণ—বিদ্যাসাগর, পৃ ৫৫৮

৬১। শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য—বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ, পৃ ৯২-৯৩
৬২। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর, পৃ ২২৪
৬৩। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—পুরাতন প্রসঙ্গ
৬৪। রামেন্দ্রসুন্দর—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পৃ ১০
৬৫। ব্রজেন্দ্রনাথ—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা, পৃ ১৯
৬৬। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, সমাজখণ্ড, পৃ ৶০
৬৭। চণ্ডীচরণ—বিদ্যাসাগর, পৃ ৫৭
৬৮। বিহারীলাল—ঐ পৃ ৫৫৮
৬৯। ঐ—ঐ, পৃ ১৪৩
৭০। চণ্ডীচরণ—ঐ, পৃ ৫২৯
৭১। ঐ—ঐ, পৃ ৫৩০-৩১
৭২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ ২২৯
৭৩। বিহারীলাল—বিদ্যাসাগর, পৃ ৫২৯-৫৩০
৭৪। ঐ—ঐ, পৃ ৫৯৬-৯৭
৭৫। চণ্ডীচরণ—ঐ, পৃ ৫৪১
৭৬। ঐ—ঐ, পৃ ৫৪১
৭৭। রামেন্দ্রসুন্দর—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পৃ ১৮-১৯,
৭৮। চণ্ডীচরণ—বিদ্যাসাগর, পৃ ৫৩, পাদটীকা
৭৯। বিহারীলাল—ঐ, পৃ ৭৯
৮০ চণ্ডীচরণ—ঐ, পৃ ৪১৬-৪১৭
৮১। ঐ—ঐ পৃ ৫১৮
৮২। বিহারীলাল—ঐ, পৃ ৫২৯

চতুর্দশ অধ্যায়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্গসংস্কৃতি

বিপুলকর্মা বিদ্যাসাগবের সুমহৎ কীর্তির মধ্যে যেমন একটি হৃদয়বান মহামানবের বিচিত্র চরিত্র বিলসিত হইয়াছে, তেমনি আস্তিক্যবাদে ঘোর সংশয়ী ঈশ্বরচন্দ্রের চিত্ততটে যে সংশয়ের অলাতচক্র সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সহজে নির্বাপিত হয় নাই। বিদ্যাসাগরেব জীবনে নানা সঙ্কট ঘনঘটা সৃষ্টি করিয়াছিল; প্রত্যক্ষ প্রত্যয় ও ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা তাঁহাকে জীবন সম্বন্ধে যে ভাবে প্রত্যক্ষবাদী করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার মনোলোকে সংশয়বাদের ছায়াপাত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? জীবন-রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য-বিলাসে তাঁহার অভিরুচি ছিল না, অথচ দুর্নিরীক্ষ্য তিরস্কবণীখানি তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে মাঝে মাঝে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জীবনটাকেই সান্ত্বনাহীন বৈবাগ্যেব ধূসর ধূলিজালে এমনভাবে আবৃত কবিয়াছে যে, এই মানবপ্রেমী সাধক জীবনের উপান্ত ভূমিতে দাঁড়াইয়া ব্যর্থতার গ্লানিতে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। প্রায় সমকালে (১৮১৭) আবির্ভূত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবের জীবন ও সাহিত্য আলোচনা কবিলে ১৯শ শতকেব আব একটি মানুষের অন্তর্জীবনের বিচিত্র ইতিহাস পাওয়া যাইবে।

বিদ্যাসাগর যেমন প্রত্যক্ষ জীবনরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন, ক্ষতবিক্ষত হইয়া বেদনার বিষণ্ণতায় কিয়দংশে মানব-বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথও ঠিক অনুরূপভাবে নানাবিধ বৈষম্যেব সম্মুখীন হইয়া, বহু আঘাত সহিয়া, কখনও-বা সংশয়ের তমোগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াও জীবনের একনিষ্ঠ প্রত্যয়কে প্রাক্তন পুণ্যফলেব মত সযত্নে রক্ষা করিযাছিলেন জীবনেব দুই প্রান্তকে মিলাইয়া দেওয়া সুকঠিন সন্দেহ নাই। চাক্ষুষ ও চক্ষুরন্তরালবর্তী প্রত্যয়কে একসূত্রে গাঁথিয়া নির্দ্বন্দ্ব উপলব্ধির তটভূমি স্পর্শ করা যেমন অনুশীলন সাপেক্ষ, তেমনি বাসনা ও সংস্কারের দাক্ষিণ্য প্রয়োজন। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনা আলোচনা করিলে তাঁহার চিত্তসঙ্কট ও তাহা হইতে উত্তরণের চেষ্টার আংশিক স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। আংশিক এই জন্য যে, ১৮৫৭ সালের পবে কেশবচন্দ্রকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে দলাদলি

চলিয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ তাহার দ্বারা বিশেষ ব্যথা পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবনে নানা সঙ্কট আবির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সে চিত্তসঙ্কট বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত।

আমাদের আলোচ্য কালের সর্বশেষ সীমা ১৮৫৭ সাল। সুতরাং প্রধানতঃ এই পর্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া দেবেন্দ্রনাথ প্রণীত দুই-একখানি পুস্তিকা, উপদেশাবলী, ব্রাহ্মসমাজের সমাবর্তন বা সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা, 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি এবং সর্বোপরি তাঁহার আত্মজীবনী অবলম্বনে তাঁহার চিত্তসঙ্কটের প্রাথমিক পরিচয় লাভ করিবার চেষ্টা করা যাইবে। অবশ্য 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'য় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, যাহাতে লেখকের নাম থাকিত না। নানাজন প্রদত্ত যে সমস্ত বক্তৃতামালা ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশেই বক্তা বা লেখকের নাম নাই। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের রচনাবলীর সূচী সংগ্রহ কিছু আয়াসসাধ্য বটে। অজিতকুমার চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সমস্ত তত্ত্বোধিনী পত্রিকাগুলি ঘাঁটিলে দেবেন্দ্রনাথের নাম কদাচিৎ পাওয়া যায়— যাঁহাদের ধারণা যে তিনি অত্যন্ত কর্তৃত্বপরায়ণ ছিলেন, তাঁহাদের এটা জানা উচিত। বোধ হয় এতটা আত্মগোপনতা পৃথিবীর খুব অল্প জননায়কদের মধ্যেই দেখা গিয়াছে।"[১]

অজিতকুমারের এই মন্তব্য অতিশয় সমীচীন। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী এবং ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ও চিঠিপত্র ব্যতিরেকে তাঁহার আর কোন রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। কারণ 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত অধিকাংশ রচনায় লেখকের নাম থাকিত না। তাই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেক সময় লেখকের স্বরূপ ধরা যায় না। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধাবলী ও রচনারীতির কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে; উপরন্তু তত্ত্বোধিনীতে প্রকাশিত তাঁহার প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার রচনার সূচী সংগ্রহ করা দুরূহ নহে। কিন্তু দেবেন্দ্র-নাথের সমগ্র রচনাকে বিস্মৃতিপাশ হইতে উদ্ধার করা সহজ নহে; বিশেষতঃ তত্ত্বোধিনীর প্রথম দিকের সংখ্যায় তাঁহার বহু রচনা নাম-পরিচয়হীন অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৮৭ শকাব্দে প্রকাশিত ষটত্রিংশ সাম্বৎসরিক মাঘোৎসব উপলক্ষে এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রদত্ত বক্তৃতামালার যে সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, তাহার অনেক বক্তৃতাই দেবেন্দ্রনাথ প্রদত্ত; কিন্তু প্রথম বক্তৃতাটি (১৭৬৫ শকে

প্রদত্ত) ভিন্ন অন্য কোন বক্তৃতাতে দেবেন্দ্রনাথের নাম নাই। কেবল ভাষা ও বিষয়বস্তু বিচার করিয়া কোনটি দেবেন্দ্রনাথ প্রদত্ত, তাহা অনুমান করা যায়। আমাদের অনুমান—উক্ত সঙ্কলনের ১৭৬৫ শকাব্দে প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতা, ১৭৭২ শকাব্দের প্রথম বক্তৃতা ও ১৭৭৪ শকাব্দেব প্রথম বক্তৃতা দেবেন্দ্রনাথ প্রদত্ত। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত পুস্তক-পুস্তিকাগুলি এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করিতে পারে। নিম্নে দেবেন্দ্রনাথের প্রকাশিত পুস্তকেব তালিকা দেওয়া যাইতেছে :

১। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ, ১ম ও ২য়, (১৮৫০)

২। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ, বাংলা অনুবাদসহ (১৮৫১-৫২)

৩। আত্মতত্ত্ববিদ্যা, ১৭৭২ শক হইতে তত্ত্ববোধিনীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত, ১৭৭৪ শকে পুস্তকাকাবে মুদ্রিত।

৪। ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০, ১৮৮২)

৫। পশ্চিম প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা (১৮৬১)

৬। কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা (১৮৬২)

৭। মাসিক ব্রাহ্ম সমাজেব বক্তৃতা (১৮৬২)

৮। ব্রাহ্মধর্মেব ব্যাখ্যান : প্রথম প্রকরণ, (১৭৮৩ শক)

৯। ঐ : দ্বিতীয় প্রকবণ, (১৭৮৮ শক)

১০। ব্যাখ্যানেব পরিশিষ্ট (১৮০৭ শক)

১১। ব্রাহ্ম বিবাহপ্রণালী (১৮৬৪)

১২। ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পবীক্ষিত বৃত্তান্ত (১৭৮৬ শক)

১৩। ব্রাহ্মধর্মেব অনুষ্ঠান পত্র (১৮৬৫)

১৪। ভবানীপুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়েব উপদেশ (১৮৬৫-৬৫)

১৫। জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮১৫ শক)

১৬। পবলোক ও মুক্তি (১৮৯৫)

১৭। পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব স্বরচিত জীবনচরিত (১৮৯৮) —প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রকাশিত।

১৮। পত্রাবলী, ১৭৭২-১৮০৯ শকের মধ্যে লিখিত।

উল্লিখিত তালিকাব মধ্যে আমরা শুধু প্রথম তিনখানি পুস্তিকাকে (ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ, ঐ অনুবাদ এবং আত্মতত্ত্বচিন্তা) আলোচনার্থে গ্রহণ করিতে পারি।

কারণ ঐ গুলি ১৮৫২ সালের মধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।[১] ১৮৬০ সাল হইতে দেবেন্দ্রনাথের অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়—সুতরাং আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিত ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হইলেও ইহাতে তাঁহার ১৮ বৎসর (১৮৩৫ সালে) হইতে ৪১ বৎসর (১৮৬৯ সালে) পর্যন্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১৮৯৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ এই আত্মজীবনীর যাবতীয় গ্রন্থ-স্বত্ব প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে দান করেন এবং ইহা ১৮৯৮ সালে শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় টীকা টিপ্পনী সহ প্রকাশিত হয়। রচনাকাল ১৮১৬ শক অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দের কিছু পূর্ববর্তী হওয়া সম্ভব। এই গ্রন্থটি যে মহর্ষির প্রাচীন বয়সে রচিত হইয়াছিল তাহার একটি আনুমানিক প্রমাণ আছে। উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদকের নিবেদনে বলিয়াছেন, "কিন্তু ক্রমশ দেখিতে পাইলাম মহর্ষিদেব আত্মজীবনী লিখাইবার সময় কিছু কিছু ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং সেজন্য স্থানে স্থানে তাঁহার উক্তিতে ভুল রহিয়াছে। তাঁহাব সে বয়সে এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।"[২] তখন মহর্ষি যে অতিবৃদ্ধ, তাহা আনুমানিক হইলেও অযথার্থ নহে। সে যাহা হউক, এই গ্রন্থটি অনেক পরে রচিত বলিয়া দেবেন্দ্রনাথের গদ্যরীতি-আলোচনা হইতে এই মূল্যবান জীবনচরিত খানিকে সরাইয়া রাখিতে হইতেছে। অবশ্য ইহার রচনারীতি বা সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে আলোচনায় অবতীর্ণ না হইলেও, আমরা তাঁহার জীবনের তাৎপর্য বুঝিবার জন্য ইহা হইতে উপাদান ও প্রসঙ্গ উল্লেখ করিব।

॥ ১ ॥

বাঙালীর চিত্তজাগরণ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী শুধু একজন স্থিতধী ধর্মপ্রাণ ভক্তের পুণ্যশ্লোক জীবনকথা নহে; তাঁহাব জীবনের তটে যে ১৯শ শতাব্দীরও সমুদ্রতরঙ্গ ভীমবেগে আহত হইয়াছিল, তাহার স্বরূপ তাঁহাব জীবনী হইতেই বুঝিয়া লইতে হইবে। দেবেন্দ্রনাথ ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ব্যক্তিপুরুষ, যুগজিজ্ঞাসা তাঁহাকেও যে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বরচিত জীবনী পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। নবজীবনের প্রবাহে বিদ্যাসাগর যেমন এক অভিনব প্রতীতির উপল-কঠিন তটতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ সেই একই প্রকার ভাব-বৈচিত্র্যের

ঘূর্ণিতলে নিমজ্জিত হইলেও সজ্ঞান স্থিতপ্রজ্ঞ ভক্তিবাদের সাহায্যে জীবনের আস্তিক্যবাদী স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অংশতঃ সাদৃশ্য আছে। ভূদেব যেমন হিন্দুকলেজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির খাদ্যপানীয় আকণ্ঠ গ্রহণ করিয়াও সনাতন ভারত-ঐতিহ্যকে অগ্নি-হোত্রীর অগ্নিরক্ষার মত সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ দেবেন্দ্রনাথ রাজসিক ভোগের মধ্যে লালিত হইয়াও চিত্তশুদ্ধিজনিত অচপল প্রজ্ঞার দিব্যালোক লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্য ও ভক্তিবাদের বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে সমকালীন বাঙালী-মনের গূঢ়তর সন্ধান পাওয়া যাইবে। সেই জ্ঞান ও ভক্তি, কর্ম ও কল্পনা, জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ—এই দ্বৈততত্ত্ব দেবেন্দ্রনাথকে যেমন বিচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, জোড়াসাঁকোর হর্ম্যচূড়ে স্থির থাকিতে দেয় নাই,—ঠিক সেইরূপ বাঙালী-মানস ১৯শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে কতগুলি আপাতঃ-বিরোধী প্রত্যয়ের সম্মুখে আসিয়া চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনাবলী হইতে বাঙালী-জীবনের সেই মানসিক সঙ্কটের পরিচয় গ্রহণ করা যায়।

দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র, অতুল ধনৈশ্বর্যের দ্বিরদসৌধে লালিত দেবেন্দ্রনাথ বাল্য হইতেই চিন্তার অসহ্য দংশনে পীড়িত হইয়া সত্যসন্ধ জীবনকে ধ্যানালোকে লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাল্যকালে নয় হইতে তের বৎসর পর্যন্ত (১৮২৬-১৮৩০) দেবেন্দ্রনাথ এ্যাংলো-হিন্দুস্কুলে পাঠ করিয়াছিলেন। রাম-মোহনের এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত; তেমনি আবার ধর্মশিক্ষা, বিশেষতঃ বেদান্তানুশীলনের সুযোগও ছিল। দেবেন্দ্রনাথের বালকচিত্তে একদিকে রামমোহনের রাজসিক ছায়া, আর একদিকে বেদান্তের সাত্ত্বিক প্রভাব এমনভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল যে. উত্তর কালেও তাঁহার জীবনধারা এই দুই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন এবং তার পর বৎসর ১৮৩১ সালে দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে হিন্দুকলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন। এখানেও তিনি ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ ১৩ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার যৌবনের প্রথম পর্যায় হিন্দুকলেজেই অতিবাহিত হইয়াছিল। যে সময় দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু-কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙলা দেশের চরম সঙ্কটকাল। ১৮২৬ হইতে ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কে হিন্দুকলেজের ডিরোজিও-

কাল বলা চলিতে পারে, ১৮৩০ সালে ডিরোজিও হিন্দুকলেজ হইতে পদত্যাগ করিলেও তাঁহার চিত্তপ্রদীপের উজ্জ্বল শিখাটি তরুণ বাঙালী ছাত্রদের মনে অগ্নিপিপাসা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী অথচ হিন্দুসংস্কৃতিতে আস্থাহীন 'ইয়ং বেঙ্গল' নামক যুবকদলেব ঘূর্ণিপাকেব মধ্যে দেবেন্দ্রনাথও নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে তরঙ্গ-লীলা তাঁহাকে স্পর্শ কবে নাই। বোধ হয় রামমোহনের এ্যাংলো-হিন্দুস্কুলে তাঁহাব বাল্যকৈশোর অতিবাহিত হওয়াতে তাঁহার মনে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইয়াছিল। কৈশোরে তিনি দুর্গাপূজা ও অন্যান্য সনাতন ধর্মসংস্কৃতি মানিয়া চলিতেন। একবার দুর্গাপূজা উপলক্ষে তিনি মাণিকতলায় রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করিতেও গিয়াছিলেন। সুতরাং বাল্য-কৈশোরে একদিকে সামাজিক ও পাবিবারক প্রভাব, অপরদিকে রামমোহনের এ্যাংলো হিন্দুস্কুলেব প্রভাবে তাঁহার চিত্ততলে ভারতীয় জীবনধারা, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইয়াছিল। পারিবারিক প্রভাবের মধ্যে পিতার রাজসিক প্রভাব এবং পিতামহীর পৌবাণিক নিষ্ঠা তাঁহার বালক-মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সুতরাং এই দ্বিবিধ প্রভাবে গঠিত চিত্তবোধ লইয়া তিনি হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। সেই কাবণেই ডিরোজিও ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদের উগ্র মনোভাব তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই।

পিতামহীর মৃত্যু হইলে দেবেন্দ্রনাথের মনে সবপ্রথম বৈরাগ্যভাব জাগ্রত হয়—তখন তাঁহার বয়স আঠার। এই বৈরাগ্য অনেকটা পুরাণবর্ণিত বৈরাগ্যের অনুরূপ, বৈদিক বা বৈদান্তিক কোন তত্ত্ববাদ তখনও তাঁহাকে নূতন আলোক দান করিতে পারে নাই। তাই তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে তাঁহাব এইরূপ মানসিক অবস্থার সহিত ভাগবতের (প্রথম স্কন্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়) নারদের ঈশ্বরানুরক্তির তুলনা করিয়াছেন। পিতামহীর মৃত্যুর ফলে তাঁহাব চিত্তে বৈবাগ্যানুভূতি জাগিল; তিনি তখন বৈরাগ্যবাদী ভক্তিশাস্ত্র পাঠের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশ্য বাল্যে ও কৈশোরে রামমোহনের এ্যাংলো-হিন্দুস্কুলেও সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। অনাসক্ত মন লইয়া তিনি মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে কথঞ্চিৎ মানসিক শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। তবে তত্ত্বান্বেষণের পূর্ণ তৃপ্তি বোধ হয় তখনও সুদূরপরাহত ছিল। তাই তিনি য়ুরোপীয় দর্শনগ্রন্থ পাঠ করিয়া চিত্তের তত্ত্বক্ষুধা দূর করিতে

সচেষ্ট হইয়াছিলেন। নিরীশ্বরবাদী Hume, প্রকৃতিবাদী ফরাসী দার্শনিক Julien Offroy de la Mettrie (1709-1751), জড়বাদী দার্শনিক Baron Paul Heinrich Dietrich Von Holbach (1723-1789), John Locke (1632-1714), Robert Boyle (1627-1691) প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের অভিজ্ঞামূলক জ্ঞানবাদ হিন্দুকলেজের ডিরোজিও-শিষ্যদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।[৩] দেবেন্দ্রনাথ ভাবজীবনের সঙ্কটসমস্যা বিদূরণের জন্য যুরোপের প্রত্যক্ষবাদী ও প্রকৃতিবাদী ঐহিক জ্ঞানময় দর্শনগ্রন্থের পরিচয় লাভ করিয়াও মনের দাহ কিন্তু নিভাইতে পারেন নাই। কেবল সংশয়ান্ধকার আরও ঘনীভূত হইতেছিল। তখন তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর— ১৮৩৬ সালের কথা। এই তরুণ বয়সে বিত্তকৌলীন্যের বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্য তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি ভাগবত ও মহাভারত পাঠ করিয়া তবু কথঞ্চিৎ শান্তি পাইয়াছিলেন, কিন্তু যুরোপীয় দর্শন পাঠে তাঁহার চিত্তের বিষজ্বালা শুধু দ্বিগুণিত হইল। এই সময়ে তাঁহার মনোভাব তাঁহারই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বিশ্লেষণ করা যাইতেছে :

"প্রকৃতির অধীনতাই কি মনুষ্যের সর্বস্ব? তবে তো গিয়াছি। এই পিশাচীর পরাক্রম দুর্নিবার। অগ্নি স্পর্শমাত্র সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, যানযোগে সমুদ্রে যাও, ঘূর্ণাবর্ত তোমাকে রসাতলে দিবে, বায়ু বিষম বিপাকে ফেলিবে। এই পিশাচী প্রকৃতির হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। ইহার নিকট নতশিরে থাকাই যদি চরম কথা হয়, তবে তো গিয়াছি। আমাদের আশা কই, ভরসা কই?"[৪]

তাঁহার এই যে চিত্তসঙ্কট, ইহা একান্তভাবে তাঁহার নিজস্ব জীবন-জিজ্ঞাসা। এই সময়ে ডিরোজিও-শিষ্যগণ কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া যে সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন, জীবনের প্রত্যয়সমূহকে বাহিরের দিক হইতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে গিয়াছিলেন,—সেই একই কালে একই ভাবমণ্ডলে বর্ধিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে যে সঙ্কট ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তাহা সামাজিক বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ধর্মচেতনা নহে, তাহা ব্যক্তি-সাধনার সুদুর্গম দুর্গে অবস্থিত।

দেবেন্দ্রনাথ যখন প্রচলিত পুরাণাদি পাঠে পূর্ণ তৃপ্তি পাইলেন না, যুরোপীয় প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের মধ্যেও কিছুমাত্র আনন্দ পাইলেন না, তখন সহসা

আকস্মিকভাবে ১৮৩৮ সালে একখানা ছাপা পুঁথির ছিন্নপত্র তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল। ঈশোপনিষদের সেই প্রথম শ্লোকটি—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥

দেবেন্দ্রনাথ এই শ্লোকের মধ্যে জীবন-জিজ্ঞাসার হারানো সূত্র খুঁজিয়া পাইলেন। উপনিষদের মন্ত্রের মধ্যে তাঁহার পুনর্জন্ম হইল; তিনি ভূত-কলেবরের মধ্যে মনোময় দ্বিজত্ব লাভ করিলেন। একুশ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনে যে সঙ্কট ক্ষণে ক্ষণে উগ্র হইয়া উঠিতেছিল, আশ্চয উপায়ে তাহার সমাধান হইয়া গেল। মহর্ষি সমস্ত জগৎকে ঈশ্বরচৈতন্যের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া জীবনের দুই প্রান্তের মধ্যে সমন্বয়-সেতু রচনা করিতে সমর্থ হইলেন।

ঈশোপনিষদের প্রারম্ভিক শ্লোকটি ১৮৩৮ সালে দেবেন্দ্রনাথকে আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সান্ত্বনা দান করিল। তখন কলিকাতার সমাজ-জীবনও যে দেবেন্দ্রনাথের সহিত ঠিক রেখায় রেখায় অগ্রসর হইতেছিল, তাহা নহে। ভারতীয় জীবন ও সাধনার বহুকালসঞ্চিত সংস্কারের বিরুদ্ধে ডিরোজিও-পন্থী তরুণদের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের অস্ত্রপ্রয়োগ, কৃষ্ণমোহনের মত মনীষী ব্যক্তিরও হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের তীব্র প্রতিকূলতা, ভবানীচরণ-রাধাকান্ত দেববাহাদুরের প্রাচীন জীবনধারার পুনঃ প্রবর্তনের ব্যর্থ প্রয়াস, রামমোহনের আত্মীয় সভা ও ব্রহ্ম সভায় বৈদান্তিক জ্ঞানবাদের অনুশীলন প্রভৃতি আন্দোলন দেবেন্দ্রনাথের যৌবনকালে বাঙালীর তন্দ্রাহতচিত্তে রূঢ় আলোকসম্পাত করিয়া তাহাকে জাগ্রত জীবনের তোরণ পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের ভাবাদর্শের দ্বারা বাল্যকৈশোর ও প্রথম যৌবনে অভিভূত হইলেও এই সঙ্কটকালে তিনি যে চিত্ত-সংশয়ের আবর্তসঙ্কুল ঘূর্ণিপাকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা প্রধানতঃ আত্মার একক ক্রন্দন, বৃহৎ সত্তার সহিত আসঙ্গলাভের বাসনা মাত্র। চারিদিকে তখন যে আন্দোলনের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে, তাহা সমাজ ও ধর্মঘটিত নানা কণ্টকিত প্রশ্নের দ্বারা উগ্র হইয়া উঠিতেছিল; ব্যক্তিগত ধর্মাসক্তির সহিত তাহার বিশেষ যোগ ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের জীবনসঙ্কট ও তদানীন্তন সমাজসঙ্কট, সম্পূর্ণ না হইলেও, অনেকাংশে ভিন্ন গোত্রের বস্তু। দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত সাধনা ও ভক্তিপথের যাত্রী; যদিও তিনি তৎকালীন বাঙালীর চিত্তজাগরণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, তথাপি যে

নির্জন লোকে তিনি আত্মসমাহিত, সেই সুদূর লোক হইতে দৈববাণীর মত বলিযাছেন:

"তিনি আমার উপাস্য, আমি তাঁহার উপাসক, তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁহার ভৃত্য; তিনি আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র, এই ভাবই আমার নেতা। যাহাতে এই সত্য আমাদের ভারতবর্ষে প্রচার হয়, সকলে যাহাতে এই প্রকারে তাঁহার পূজা করে, তাঁহার মহিমা এইরূপেই যাহাতে সর্বত্র ঘোষিত হয়, আমার জীবনের লক্ষ্য তাহাই হইল।"৫

বলা বাহুল্য তাঁহার জীবনের লক্ষ্য সমগ্র ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করিলেও মূলতঃ তিনি বানুভব শান্তরসাস্পদ মুক্তির উপাসক ছিলেন। সমকালে যাঁহারা বাঙালীর সমাজ-জীবনে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সঞ্চার করিযাছিলেন, তাহাদের কেহই ব্যক্তিচিত্তাশ্রয়ী ভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নাই। রামমোহন যে বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ প্রচারের চেষ্টা করিযাছিলেন, ধর্মান্দোলনের অগ্রপথিক হইয়া বাঙালীর নিস্তরঙ্গ জীবন-জলাশয়ের তলদেশে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিযাছিলেন, তাহার পশ্চাতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যবোধই প্রাধান্য লাভ করিযাছিল। তাঁহার ধর্মান্দোলন ব্যক্তিগত সাধনভজনকে একপ্রকার ত্যাগ করিয়া গোষ্ঠীগতভাবে ঈশ্বরোপাসনাকেই প্রাধান্য দিযাছিল। কর্মযোগী রামমোহন ভাবযোগী ভক্ত ছিলেন না। 'ইয়ং বেঙ্গল'গণ ভক্তিবাদ দূরের কথা, যে-কোন ঈশ্বরচিন্তাকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিতেন। মিশনারীপ্রভাবান্বিত কৃষ্ণমোহনও রোমান ক্যাথলিক ভক্তিবাদ ত্যাগ করিযা যুক্তিনিষ্ঠ প্রটেস্টান্ট মত অবলম্বন করিযাছিলেন। ভবানীচরণ ও রাধাকান্ত দেববাহাদুর প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারের পুনরুজ্জীবন ইচ্ছা করিলেও তাহারা কেহই ভক্তিপথের পথিক ছিলেন না। সেইজন্য দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব বাঙলার ১৯শ শতাব্দীর চিত্ত-জাগরণের একটা অপূর্ব বিস্ময় হইয়া রহিয়াছে। প্রবল তরঙ্গবিক্ষোভের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও তিনি যে অবিচল শুদ্ধা ভক্তিকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ, ধর্ম তাঁহার নিকট তত্ত্ববাদ বা আলোচনা-বিতর্কের বিষয় ছিল না; তাহাকে তিনি অনুশীলনের দ্বারা জীবনের প্রত্যক্ষতম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালীন বাঙালীমানস প্রধানতঃ জ্ঞান ও কর্মের দুই প্রান্তে অভিসঞ্চরমান, দেবেন্দ্রনাথ জ্ঞান ও কর্মকে কথঞ্চিৎ হতবল করিয়া ঔপনিষদিক শুদ্ধা ভক্তিকে জীবনের পথ ও পাথেয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইস্থানে সমকালীন বঙ্গসংস্কৃতির সহিত তাঁহার তত্ত্বগত পার্থক্য। এখন আমরা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের কতিপয় ঘটনা আলোচনা করিয়া সমকালীন বঙ্গসংস্কৃতির সহিত তাঁহার চিত্তগত যোগাযোগ বিশ্লেষণের প্রয়াস পাইব।

॥ ২ ॥

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ ও দেবেন্দ্রনাথ

পুরাণোক্ত দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া উপনিষদ আদিষ্ট, 'এষাস্য পরমা গতি রেষাস্য পরমা সম্পদ, এষো'স্য পরমো লোক এষো'স্য পরম আনন্দঃ'[৬] —এই তত্ত্বের অন্তর্গূঢ় বাণী উপলব্ধি করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথকে বিষম চিত্ত-সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল। ধর্মতত্ত্বকে ব্যক্তিগত উপলব্ধির আলোকে প্রত্যক্ষ করিতে গিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার এই মানসদ্বন্দ্ব। তিনি পৌরাণিক আচার-বিচারপরায়ণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে লালিত হইয়া সেই প্রত্যয়ের মধ্যেই মানসিক অবস্থানভূমি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। পিতামহীর বৈষ্ণব উপাসনাপদ্ধতি এবং ঠাকুরবাড়ীর প্রতিমা পূজার রাজসিক উল্লাসের মধ্যেই তাঁহার বাল্যকৈশোর অতিবাহিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র, ১১-১২ বৎসর বয়স্ক দেবেন্দ্রনাথ একদা সামাজিক রীতি রক্ষার নিমিত্ত রামমোহনকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন,—বোধ হয় ১৮২৮-২৯ সালের ঘটনা। তখনও তিনি পৌরাণিক ঈশ্বরবাদ ও পারিবারিক উপাসনা-পদ্ধতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছিলেন। নিমন্ত্রণের উত্তরে রামমোহন বলিয়াছিলেন, "বেরাদর! আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে বল।"[৭] এখানে দেখা যাইতেছে যে, রামমোহন প্রকাশ্যেই প্রতিমা উপাসনা স্বীকার করিতেন না। সেই সময় রামমোহনের এ উক্তির তাৎপর্য বোধ হয় বালক দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। পরবর্তীকালে একুশ বৎসর বয়সে, ১৮৩৮ সালে, তিনি রামমোহনের ঐ উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন, "রামমোহন রায় যেমন কোন প্রতিমা পূজায় ও পৌত্তলিকতায় যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না। কোন প্রতিমাকে পূজা করিব না, কোন প্রতিমাকে প্রণাম করিব না, কোন পৌত্তলিক পূজায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না।"[৮] তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে লইয়া অপৌত্তলিক ধর্মোপাসনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। প্রায় এই সময়েই ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি তাঁহার হস্তগত হইল। ক্রমে ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য উপনিষৎ পাঠ করিলেন (আত্মজীবনী, পৃঃ ৬২)। ঔপনিষদিক আলোকে

চিত্ত পরিমার্জিত হইল ; ভ্রাতৃগণের সহযোগিতায় কিন্তু গুরুজনের অজ্ঞাতসারে তিনি 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহার দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তত্ত্বরঞ্জিনী সভার নাম পরিবর্তন করিয়া 'তত্ত্ববোধিনী সভা' রাখিলেন (৬ই অক্টোবর, ১৮৩৯)।

রামমোহনের তিরোধানের পর তাঁহার বেদান্ত ও উপনিষদ গ্রন্থাদি সম্ভবতঃ হতাদর হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটির অর্থ উদ্ধারের জন্য দেবেন্দ্রনাথ অনেকের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাহার অর্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন নাই ; অবশেষে ব্রহ্মসভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দেবেন্দ্রনাথকে শ্লোকার্থ বুঝাইয়া দেন। রামমোহনের ব্রহ্মসভায় বেদান্ত-উপনিষদাদি পাঠ ও আলোচনা হইত ; কিন্তু শিক্ষিত জনের মধ্যে, এমনকি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও উপনিষদের বিশেষ প্রচলন ছিল না। তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার দিনে দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং কঠোপনিষদের ২।৬ শ্লোকটি পাঠ করেন। তৎপূর্বেই তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট প্রধান উপনিষদ পাঠ করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানের (১৮৪২ সাল) বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, উৎসব আরম্ভে বেদপাঠ হইয়াছিল। "সম্মুখেই বেদী। তাহার দুই পার্শ্বে দশ দশ জন করিয়া দুই শ্রেণীতে বিশজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের গাত্রে লালরঙের বনাত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদীতে বসিলেন, দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণেরা একস্বরে বেদ পড়িতে লাগিলেন।"[৯] দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের দ্বারা বেদপাঠ একটা আনুষ্ঠানিক শিষ্টাচার মাত্র। একদা ব্রাহ্ম সমাজে গিয়াও দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, একজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ উপনিষদ পাঠ করিতেছেন। অন্যত্র তিনি বলিতেছেন, "ব্রাহ্ম সমাজ যখন আমি প্রথম দেখিতে যাই (১৮৪২), তখন দেখিলাম যে, একটি নিভৃত গৃহে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত।"[১০] রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন বেদী হইতে অযোধ্যাপতি রামের অবতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ বোধহয় কিছু বিষণ্ন হন এবং প্রকাশ্যে বেদ-পাঠের ব্যবস্থা করেন, অবতারবাদ ব্যাখ্যানও বন্ধ করিয়া দেন। বেদপাঠ যে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে তখনও তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন। তিনি উপনিষদকে অন্তরের ধ্যানাসনে স্থাপন করিলেও বেদ সম্বন্ধে কোন প্রতিকূলতা করেন নাই ; বরং ব্রাহ্মসমাজে বেদপাঠের আশু প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া ১৮৪৩ সালে বেদপাঠার্থী দুইজন ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া বেদ

অধ্যয়নের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[১১] কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনের উপর বেদ ও বেদান্তের প্রভাব হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে ২১এ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ এবং আরও বিশ জন—শ্রীধর ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র নন্দী, লালা হাজারীলাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র রায়, লোকনাথ রায় প্রভৃতি অনুরাগী ব্যক্তিরা আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হইলেন। সেদিন গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিয়া কর্ম আরব্ধ হইয়াছিল এবং সকলেই একটি প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া তদনুসারে চলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞাপত্র দেবেন্দ্রনাথ রচনা করেন। তাহার কয়েকটি ধারার উল্লেখ করা যাইতেছে:—

১। বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

২। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা সর্বব্যাপী আনন্দস্বরূপকে পরমেশ্বর রূপে প্রতিমাদি কোন ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। প্রণব-ব্যাহৃতি-গায়ত্রীর অবলম্বন দ্বারা এবং তত্ত্বজ্ঞানের আবৃত্তিদ্বারা, পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

৪। রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন প্রতিদিবস সূর্যোদয় পরে, মধ্যাহ্ন কালের মধ্যে, কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্বক ধারণ না করিয়া পবিত্র মনে পরব্রহ্মের স্বরূপ ভাবনাপূর্বক, ন্যূনসংখ্যা দশবার প্রণব-ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী জপ করিব। ইত্যাদি ইত্যাদি[১২]

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মধর্মের নামোল্লেখ না করিয়া 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের' কথা বলা হইয়াছে এবং প্রণব-ব্যাহৃতি-গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বেদান্ত ও গায়ত্রীর প্রতি দেবেন্দ্রনাথের দীর্ঘকাল আসক্তি ছিল; কি করিয়া তিনি এই দুই বস্তু ত্যাগ করিয়া উপনিষদকেই একমাত্র শরণ্য রূপে গ্রহণ করিলেন, তাহা পরে আলোচনা করা যাইতেছে। এখন এইটুকু লক্ষণীয় যে, ব্রাহ্মধর্ম অথবা 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' গ্রহণের দিন বেদ পঠিত হয় নাই। ১৮৩৫ সাল ২০ এ ডিসেম্বর গোরিটির বাগানে পলতার

পরপারে ব্রাহ্মদের যে আনন্দ সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে ব্রহ্মের জয়ধ্বান এবং মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করা হইলেও[১৩] বেদ পঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। উনত্রিশ বৎসর বয়সে ১৮৪৬ সালে মহর্ষির বেদবিদ্যা সম্বন্ধে কৌতূহল উপস্থিত হইল। তাহাব কারণ সহজেই অনুমেয়। উপনিষদ বেদের সারভাগ। রামমোহনের প্রচেষ্টায় ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য উপনিষদ অনূদিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ আবও কতকগুলি উপনিষদ সংগ্রহ কবিয়াছিলেন।[১৪] তখন তিনি উপনিষদের আকরভূমি বৈদিক সংহিতা ও কর্মকাণ্ড জানিবাব জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু স্মৃতি-সংহিতার অত্যধিক প্রভাবে বাঙলা দেশ হইতে বেদবিদ্যা প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছিল। ইতিপূর্বে দেবেন্দ্রনাথ বেদশিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিয়া অধ্যয়ন করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, এই সময়ে বেদচর্চাব প্রধান কেন্দ্র কাশীধামে ছাত্র পাঠাইয়া বেদবিদ্যা আয়ত্ত কবিবার জন্য তিনি ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালে আনন্দচন্দ্র, তাবকনাথ, বাণেশ্বর এবং বমানাথ নামক চারিজন ছাত্রকে কাশীধামে প্রেবণ কবেন। এই সমস্ত ব্যাপাবে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিযা দেবেন্দ্রনাথ বেদ ও উপনিষদের প্রধান পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত হইলেন। তিনি বলিতেছেন, "আমরা উপনিষদের উপদেশে জানিলাম, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকবণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ—এই সকলি অশ্রেষ্ট বিদ্যা; আব যাহার দ্বারা পরব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ট বিদ্যা।...যখন আমরা ইহা বুঝিলাম যে, বেদের মধ্যে দুই বিদ্যা আছে, পরা বিদ্যা এবং অপবা বিদ্যা তখন অপরা বিদ্যাব বিষয় কি, এবং পরা বিদ্যাবই বা বিষয় কি, তাহা বিস্তাররূপে জানিবাব জন্য বেদের অনুসন্ধানে উৎসুক হইলাম। আমি স্বয়ং কাশী যাইতে প্রস্তুত হইলাম।"[১৫] এই সময় তিনি তিরিশ বৎসরের যুবক মাত্র (১৮৪৭)। এখন স্বয়ং কাশীতে গিয়া বেদের কর্মকাণ্ড ও উপনিষদ অংশেব সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে মানস করিলেন। যখন তিনি ছাত্রদিগকে কাশী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন বোধ হয় বেদের অপরা বিদ্যা সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত হন নাই। কিন্তু একবৎসর পরেই যখন তিনি কাশীধামে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বৈদিক বিশ্বাস টলিয়া উঠিয়াছিল। অপরা বিদ্যা অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানকাণ্ডকে গ্রহণ করিবার ঔৎসুক্য এই সময় তাঁহার মনের মধ্যে অস্ফুটাকারে জাগ্রত হয়। কাশীতে উপনীত হইয়া বৈদিক

ব্রাহ্মণদের বেদ বিষয়ে অজ্ঞতা দেখিয়া তিনি বেদের কর্মকাণ্ড এবং যাগযজ্ঞের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত—"অতএব কর্মকাণ্ডের পোষক যে বেদ, তাহার দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল।"[১৬] ১৮৩৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ বেদ পরিত্যাগ কবিলেন অর্থাৎ বেদেব যে অংশে অপরাবিদ্যাব কথা আছে, তাহা ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিকূল বলিয়া তিনি বেদ পরিত্যাগ করিলেন। অবশ্য এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে অক্ষয়কুমারের বিশেষ প্রভাব ছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর অভিজ্ঞালব্ধ প্রত্যয়কেই মানবজীবনের নিয়ামক শক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং প্রাকৃত জ্ঞানই ঈশ্বরতত্ত্ব—এইরূপ জড় প্রকৃতিবাদেরও আংশিক সমর্থন করিতেন। তিনিই ব্রাহ্মসমাজে সর্বপ্রথম বেদবেদান্তেব আত্যন্তিক অনুরক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন ; দেবেন্দ্রনাথেব সহিত অক্ষয়কুমারের এই বিষয় লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া তর্কবিতর্ক ও আলাপ আলোচনা চলিয়াছিল। এই গ্রন্থের তৃতীয় পবেব পঞ্চম অধ্যায়ে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার" নামক অনুচ্ছেদে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। পরিশেষে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের মত বহুলাংশে স্বীকার করিয়া বেদেব অভ্রান্ততা ও অপৌরুষেয়ত্ব পরিত্যাগ করেন। তথাপি তিনি বেদ-সংহিতাব প্রতি চিরদিন কৌতূহলী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মতত্ত্বে বেদকে স্বীকার না করিলেও, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "ইহা কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের বেদ ও উপনিষদকে আমি একেবারে পরিত্যাগ করিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের আর কোন সংস্রব রহিল না।...বেদরূপ কল্পতরুর অগ্রশাখার ফল এই ব্রাহ্মধর্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ এবং উপনিষদের শিরোভাগ ব্রাহ্মী উপনিষদ, ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ।"[১৭] বেদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক আকর্ষণের স্পষ্ট প্রমাণ—তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (১৭৬৯-১৭৯৩ শক) ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আত্মজিজ্ঞাসার উত্তাপে এবং অক্ষয়কুমারের বেদ-বেদান্ত বিরোধিতার ফলে দেবেন্দ্রনাথের উক্ত গ্রন্থের প্রতি দুর্বলতা ধীরে ধীরে লোপ পাইল, ক্রমে তিনি কাম্যকর্মসঙ্কুল বৈদিক উপাসনা ও আচার-আচরণকে একেবারে ত্যাগ করিলেন। ১৮৪৭ সালের পর তিনি আর কখনও বেদের কর্মফল-সম্পৃক্ত সাধনপ্রণালীকে গ্রহণ করেন নাই বটে ; তবে বাঙলা দেশে আধুনিক কালে বেদ চর্চার পুনঃপ্রবর্তনে তাঁহার উদ্যোগ স্মরণীয়। ১৮৪৭ সালের পর অবশ্য বেদ-বেদান্তের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস

শিথিল হইয়াছিল; কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য ও ঐতিহ্য পুনর্বিচারের জন্য তিনি বেদের অনুশীলন, অনুবাদ ও টীকা রচনা করিতে কখনও পরাঙ্‌মুখ হন নাই।

বহুদেববাদী বেদসংহিতাব সহিত দেবেন্দ্রনাথের অন্তরের সাধর্ম্য স্থাপিত হয় নাই, হওয়া সম্ভবও ছিল না। ১৭৬১ শকাব্দের ২১এ আশ্বিন তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য, "আমাদিগেব সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যাব প্রচাব। উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম; বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্তে আমাদের আস্থা ছিল না।"[১৮] মহর্ষির এই উক্তিতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য অর্থাৎ মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই, তিনি যেখানে বেদান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে উপনিষদকেই নির্দেশ করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বিতীয় সাংবাৎসরিক অধিবেশনে (১৮৪১) তিনি তাঁহার বক্তৃতাব একস্থানে বলিয়াছেন, "বেদান্তের প্রচার অভাবে, ঈশ্বব নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, সর্বগত, বাক্যমনের অতীত, ইহা যে আমাদের শাস্ত্রের মর্ম তাহা তাহাবা জানিতে পারে না।"[১৯] এখানেও বেদান্ত বলিতে উপনিষদকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম প্রতিজ্ঞাতেই "বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম"[২০]—এই উক্তি রহিয়াছে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "বেদ, বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমাব যে মুখ্য সঙ্কল্প ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।"[২১] সুতরাং ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবার কালে তাঁহার বেদ-বেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে বেদান্ত-আনুগত্য বদলাইয়া ফেলা হয়। ১৮৫০ সালে তাঁহার 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' নামক যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতেই মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের প্রতি বিরাগ সূচিত হইয়াছিল। ১৭৭২ শকাব্দে ১১ই মাঘ সাংবাৎসরিক বক্তৃতাতে অক্ষয়কুমার দত্ত ঘোষণা করেন, "বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত।"[২২] কাশী হইতে প্রত্যাগত হইবার পর ১৮৪৭ সাল হইতেই দেবেন্দ্রনাথ বেদবেদান্ত পরিত্যাগ করেন। প্রায় এই সময় হইতেই তাঁহার সহিত অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি নবীন সদস্যদের মত-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়; অক্ষয়কুমারও

রাখালদাস হালদার বেদ-বেদান্তকে ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না, মহর্ষি-সঙ্কলিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থকেও ইঁহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। কাজেই দেবেন্দ্রনাথ বেদ ও বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের প্রতি ক্রমেই আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছিলেন। ১৮৫৪ সালেও দেবেন্দ্রনাথ বেদ ও বেদান্তে বিশ্বাস্ করিতেন। আলেকজেণ্ডার ডাফ্ *India and India's Missions* নামক গ্রন্থে অপৌত্তলিক হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ আরম্ভ করেন। ইহারই প্রতিবাদে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনীতে *Vedantic Doctrines Vindicated* নামক দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করেন। তাহা ১৮৪৫ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—

"What we consider as revelations is contained in the Vaids alone, and the last parts of our holy scripture treating of the final dispensation of Hinduism from that is called the Va'dant."

এখানে লক্ষ্য করা যাইবে যে, তিনি বেদসমূহকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়াছেন এবং বেদান্তকেই একমাত্র শরণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কাশী হইতে ফিরিবার পর যেমন বেদ ত্যাগ করিলেন, তেমনি বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যকেও গ্রহণ করিলেন না। মনে হয়, অক্ষয়কুমারের সহিত আলাপ-আলোচনার পূর্বাহ্নে তাঁহার মনে বেদ ও বেদান্তের প্রতি কিছু সংশয়, কিছু জিজ্ঞাসা উদিত হইয়াছিল। ১৮৪৬ সালেও তিনি নিষ্ঠার সহিত বলিয়াছেন, "যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কবিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে, আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল"[২৩]—বলা বাহুল্য, এখানে বেদান্ত বলিতে উপনিষদকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি বেদান্ত ও উপনিষদের সহিত তাঁহার ও ব্রাহ্ম সমাজের সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন। এখানে তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত হইতেছে:

"আমরা ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম। বেদান্ত দর্শনকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না; যেহেতুক, তাহাতে শঙ্করাচার্য জীব আর ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে। যদি উপাস্য-উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে? অতএব বেদান্ত দর্শনের মতে আমরা

মত দিতে পারিলাম না। আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী।"[২৪]

সেইজন্য দেবেন্দ্রনাথ শঙ্করাচার্যকৃত ঔপনিষদিক ভাষ্য পরিত্যাগ করিয়া আবার নূতন করিয়া উপনিষদের বৃত্তি[২৫] লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি বৃত্তি রচনা করেন সংস্কৃতে, এবং তাহার বঙ্গানুবাদসহ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ করিতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ শাঙ্কর ভাষ্যসহ বেদান্ত পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু উপনিষদকেও পূর্ণ আকারে গ্রহণ করিলেন না; শুধু পৃথগ্ বৃত্তি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, স্বমতের পরিপোষক কয়েকটি নির্বাচিত ঔপনিষদিক শ্লোক সঙ্কলন করিয়া 'ব্রাহ্মী উপনিষদ' রচনা করিলেন।

ঈশোপনিষদের ছিন্নপত্রে একটি শ্লোকের অর্থ উপলব্ধি করিয়া দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ঈশ, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য উপনিষদ পাঠ করেন এবং অন্যান্য পণ্ডিতের সাহায্যে প্রশ্ন, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ আনুপূর্বিক পাঠ করেন।[২৬] বলা বাহুল্য উপনিষদের মধ্যেই তিনি তাঁহার শান্ত ভক্তি-মূলক ঈশ্বরবাদ খুঁজিয়া পাইলেন। উপনিষদ গ্রন্থ মায়াবাদের মত পরিদৃশ্যমান জগৎ-প্রতীতিকে উহ্য করিয়া দেন নাই, পিপ্পলী শাখায় উপবিষ্ট দুইটি সুপর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। সেইজন্য দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদকেই প্রাণের আরাম বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এখানে লক্ষণীয় যে, বাল্যকৈশোরে তিনি যে প্রচলিত সংস্কারের মধ্যে লালিত হইয়াছিলেন, তাহার সহিত তাহার কিছুমাত্র বিরোধ ঘটে নাই; তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি মায়াবাদী বেদান্তভাষ্য পরিত্যাগ করিয়া উপনিষদের শান্তরসাস্পদ ভক্তিবাদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ১৮৪৮ সালের দিকে উপনিষদের সর্বাঙ্গীণ স্বীকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তে কিছু দ্বিধা, কিছু সংশয় সৃষ্টি হইল। অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া-বেদ-বেদান্তের বিরুদ্ধতা অবলম্বন করিলেন। অক্ষয়কুমারের প্রভাব তাঁহার উপরে কিছু ক্রিয়াশীল হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অক্ষয়কুমারের প্রভাব না ঘটিলেও দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে উপনিষদগুলির কোন কোন অংশের প্রতি সন্দেহ জাগিতই। আসলে তিনি নিজেই উপনিষদের মধ্যে পূর্ণ তৃপ্তি পাইতেছিলেন না। তিনি দেখিলেন যে, তিনি পণ্ডিতমহাশয়দের সাহায্যে এগারখানি উপনিষদ পাঠ করিলেও, দেশের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য প্রায়

১৪৭ খানি উপনিষদ প্রচলিত রহিয়াছে, যাহার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। বৈষ্ণব গোপালতাপনী উপনিষদ, গোপীচন্দনোপনিষদ, শৈব স্কন্দোপনিষদ, শাক্ত সুন্দরীতাপনী উপনিষদ, দেবী উপনিষদ, কৌলোপনিষদ,—এমন কি আল্লোপনিষদও প্রচলিত ছিল।[২৭] তখন উপনিষদের প্রতি তাঁহার অচপল ভক্তি কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইল। সুতরাং শুধু অক্ষয়কুমারের প্রভাবেই তিনি বেদান্তাদির প্রতি বিমুখ হইলেন, তাহা পুরাপুরি সত্য নহে—তাঁহার অন্তরের প্রেরণাও এই ব্যাপারে অল্প প্রভাব বিস্তার করে নাই। তিনি যে একাদশ উপনিষদকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া তাহার মধ্যেও ফাটল আবিষ্কার করিয়া বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অদ্বৈতবাদের ঘোর বিরোধী দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, বৃহদারণ্যকের শ্লোকে (১।৪।১) 'সো'হমস্মি' এবং ছান্দোগ্যে (৬।৮।—১৭) 'তত্ত্বমসি'—অদ্বৈত প্রতিপাদ্য এই দুই উক্তি রহিয়াছে। তাই ১৮৪৮ সালে তাঁহার চিত্তে সর্বপ্রথম নৈরাশ্যের মেঘ সঞ্চারিত হইল। ১৮৪৩ সালে যে-দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের উপর ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার পাঁচ বৎসর পরে (১৮৪৮) সেই তিনিই বলিতে বাধ্য হইলেন, "প্রথমে বেদ ধরিলাম, সেখানে ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলাম না। তাহার পরে প্রামাণ্য একাদশ উপনিষদ ধরিলাম; কি দুর্ভাগ্য, সেখানেও ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছি না।... ...এই উপনিষদ তো আমাদের সকল অভাব দূর করিতে পারে না, হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না।"[২৮] তিনি দেখিলেন যে, উপনিষদেরও সমস্ত অংশের সহিত তাঁহার অন্তরের মিল হইতেছে না। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫।১০।৩-৬ শ্লোক এবং মুণ্ডকোপনিষদের ৩।২।৭ শ্লোকে যে নির্বাণমুক্তির কথা আছে, তাহাকে তিনি "ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ" বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।[২৯] পরিশেষে তাঁহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইল—"সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর, হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।"[৩০] এই স্থলেই তাঁহার সহিত রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক পার্থক্য; রামমোহন শাস্ত্রমার্গকে বুদ্ধির দ্বারা মার্জিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; ভক্তির সহিত শাস্ত্রের মিল আছে কি নাই, তাহার জন্য তিনি কিছুমাত্র চিন্তিত হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও শাস্ত্রকে, বিশেষতঃ পৌরাণিক যুগের গ্রন্থোক্ত বিষয়কে যুক্তিবাদের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া,

গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা বুদ্ধির নিকট গ্রহণীয় করিয়াছিলেন। রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ যুক্তি-আশ্রয়ী। অপরদিকে দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ ভক্তিবাদী—উচ্ছ্বসিত ভক্তি নহে, শান্ত-সংযত অপ্রমত্ত ভক্তি। যাহা তাঁহার যুক্তি-আশ্রয়ী ভক্তিবাদকে পরিতুষ্ট করিতে পারে নাই, তাহাকে তিনি বর্জন করিয়াছেন। যে উপনিষদ তাঁহার আত্মার খাদ্যপানীয়, প্রয়োজনস্থলে তাহাকেও তিনি কখনও গ্রহণ, কখনও বা অংশবিশেষকে বর্জন করিয়াছেন। ১৯শ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদ যে তাহাকেও স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা এই ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। তিনি 'ভক্তিরহৈতুকী' ত্যাগ করিয়া যুক্তিপন্থী বিশ্লেষণের সাহায্যে উপনিষদকে গ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষদের যে যে শ্লোক তাঁহার চিত্তকে পরিতুষ্ট করিত, তিনি সেইগুলিকেই মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ সালে মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া উপনিষদের কোন কোন শ্লোক বলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার নির্দেশ মত লিখিয়া লইলেন। "এই প্রকারে আমি উপনিষদের মুখে ঈশ্বর প্রসাদে, ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি আমার হৃদয় হইতে বাহির করিলাম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ হইয়া গেল।"[৩১] ইহাই 'ব্রাহ্মী উপনিষদ'। এই নির্বাচিত মন্ত্রগুলি 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে ১৮৪৮ সালের শেষভাগে রচিত এবং ১৮৪৯-৫০ সালে প্রকাশিত হয়; উহার সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫১-৫২ সালে। ১৮৬১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ইহার তাৎপর্য প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহাকেই অজিতকুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন, "উপনিষদের সেই ব্রহ্মতত্ত্বের বীজ্‌ম্ অংশ লইয়া যে ধর্ম গড়িয়া উঠিল, তাহারই নাম হইল ব্রাহ্মধর্ম।"[৩১]

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমত প্রবর্তনের বিকাশধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি যে ব্রাহ্মধর্ম স্থাপন ও বর্ধন করেন, তাহা মূলতঃ উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিলেও তিনি উপনিষদ গ্রন্থকেই একমাত্র প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার এই উক্তিটি দীপবর্তিকাস্বরূপ গণ্য হইতে পারে—"দেখিলাম যে, আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাঁহার পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়েতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি।"

দেবেন্দ্রনাথ গ্রন্থ অপেক্ষা হৃদয়ের উপরই যে অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন, তাহাতে ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীর চিত্তবৈশিষ্ট্যই জয়ী হইয়াছে। গ্রন্থ নহে, ঋষিপ্রোক্ত আপ্তবাক্য নহে—ব্যক্তির শুদ্ধ বুদ্ধি ও পবিত্র হৃদয়ই ধর্মের অধিষ্ঠান

ভূমি—দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবিবর্তনের মধ্যেই সমকালীন বাঙলা দেশের এই বৈশিষ্ট্যটি দৃষ্টিগোচর হইবে। কাজেই দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্মধর্মের পরিকল্পনা করেন, উপনিষদই তাহার একমাত্র ভিত্তিভূমি নহে। যেখানে তিনি অন্তরবাসী শুভ্র নিরঞ্জন ভক্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, সেখানেই প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন। তাই তিনি মহানির্বাণতন্ত্রের কয়েকটি শ্লোক গ্রহণ করিয়াছেন, অমৃতসরে শিখ সম্প্রদায়ের—

গগনমৈ থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকা-মণ্ডল জনক মোতী।
ধূপ মলযানিলো পবন চমরো করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি॥

এই গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং প্রায়ই হাফেজের ঈশ্বরপ্রেম বিষয়ক বয়েৎ আবৃত্তি করিতেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি নব্য ব্রাহ্মদের বিরোধ স্মরণীয়। অক্ষয়কুমার প্রধানতঃ যুক্তিবাদী বিজ্ঞানসাধক। বেদবেদান্ত উপনিষদের আনুগত্যের প্রতি তিনি কোনদিন আকৃষ্ট হন নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই তিনি শাস্ত্র বলিয়া মানিতেন, বিশ্ব-প্রকৃতিকেই ভগবৎ স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদনে তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথের মতান্তর ঘটিত। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমিক ও জ্ঞানপ্রেমিকের মধ্যে চিত্তগত সাহচর্য ঘটিতে পারে না। অক্ষয়কুমারের সহিত দেবেন্দ্রনাথেরও মানসিক সাহচর্য ঘটে নাই। তাই রাজনারায়ণ বসুর ভক্তিভাব-ব্যাকুল মনের সহিত দেবেন্দ্রনাথ অধিকতর আত্মীয়তা বোধ করিতেন। অক্ষয়কুমারের বেদবেদান্তের প্রতিকূলতার ফলেই তিনি বেদ-বদান্তের তাৎপর্য সম্বন্ধে উৎসুক হইয়া কাশীতে ছাত্র পাঠাইয়া এবং স্বয়ং নিজে গিয়া বেদের কর্মকাণ্ডের অন্তঃসারশূন্যতা দর্শনে বেদের গ্রহণোপযোগিতা সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাব অবলম্বন করেন। ১৮৪৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে একটি বিজ্ঞাপন দেখা যায়ঃ

"১৭৬৮ শকের নিয়মপত্রের প্রথম সংখ্যক নিয়মে যে 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' এই বাক্য আছে, তাহার পরিবর্তে ব্রাহ্মধর্ম এই শব্দ হর। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হইয়াছিল।"

১৭৬৮ শকে অর্থাৎ ১৮৪৬ সাল হইতেই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বেদান্ত উপনিষদের আনুগত্য লইয়া কিছু বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী সভাও দেবেন্দ্রনাথের ভক্তি-রসাশ্রিত চিত্তকে সব সময় সন্তুষ্টি দান করিতে পারিত না, ঐ পত্রিকায় তাঁহার মনোমত প্রবন্ধাদি সব সময়ে প্রকাশিত হইত না। 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'র যে গ্রন্থাধ্যক্ষ পরিষদ ছিল, তাহার সদস্যগণ অনেক সময় দেবেন্দ্রনাথের মতামত গ্রাহ্য করিতেন না। এমনকি, তত্ত্ববোধিনীতে দেবেন্দ্র-নাথের বেদান্তবিষয়ক যে সমস্ত মত প্রকাশিত হইত, অক্ষয়কুমার দত্ত স্বয়ং তাহার প্রতিবাদ করিতেন। শেষ পর্যন্ত অক্ষয়কুমার পক্ষীয়দেরই জয় হইল। দেবেন্দ্রনাথ বেদান্ত পরিত্যাগ করিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষগণের সহিতও তাঁহার মত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রাজনারায়ণ বসুর ভক্তিভাবপূর্ণ প্রবন্ধ গ্রন্থাধ্যক্ষগণ প্রকাশের অনুমতি দেন নাই। সেই জন্য দুঃখ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,

'এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন, তাঁহারই পরিতৃপ্ত হইলেন, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।"৩৪

এখানেও দেখা যাইতেছে, তাঁহার অন্তরশায়ী আস্তিক্যবাদী ভক্তির সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার কতিপয় সদস্যের মিল হইতেছিল না। বরং তিনি তত্ত্ব-বোধিনী সভা হইতে ধর্মপ্রচারে বাধা পাইতেছিলেন। তাই ১৮৫৯ সালে মে মাসে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা তুলিয়া দিলেন। একদিকে যেমন তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাধ্যক্ষ সভার সহিত তাঁহার মতবৈষম্য হইতেছিল, আর একদিকে তেমনি রাখালদাস হালদার, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির চেষ্টায় স্থাপিত আত্মীয় সভায় নাস্তিকতা প্রচার দর্শনে তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন। এই আত্মীয় সভা যদিও রামমোহনের আত্মীয় সভার আদর্শে স্থাপিত হয়, এবং স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ইহার সভাপতি ছিলেন, তথাপি এই সভার তরুণ সদস্যগণের সহিত তাঁহার অন্তরের আর মিল হইতেছিল না। এই সভায় তরুণদল ভোটের সাহায্যে ঈশ্বর-স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "একজন বলিলেন, ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ কি না। যাহার আনন্দস্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্ধারিত হইল।"৩৫ আত্মীয়

সভার এইরূপ লঘুচিত্ততায় দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। এই আত্মীয় সভা সামাজিক আলোচনা অপেক্ষা ধর্মালোচনা লইয়া অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথ-সঙ্কলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থকে বিশেষ প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন না, সংস্কৃতে রচিত উপনিষদের মন্ত্র পাঠেও আত্মীয় সভার সদস্যদের (রাখালদাস, হালদার, অনঙ্গমোহন মিত্র, কানাইলাল পাইন প্রভৃতি) আপত্তি ছিল। ১৮৫৫ সালে রাখালদাস হালদার 'ব্রাহ্মদিগের বর্তমান আন্তরিক অবস্থা বিষয়ক পর্যালোচনা' নামক একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া দেবেন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন। হালদার মহাশয় সংস্কৃত মন্ত্র বর্জন করিবার প্রস্তাব করিয়া লিখিলেন—"ব্রাহ্মেরা সংস্কৃতে শ্রুতিপাঠ ও ব্রাহ্মধর্ম পাঠের পরিবর্তে বঙ্গভাষায় পরমেশ্বরের সংক্ষেপে উপাসনা করিবেন।"৩৬ ব্রাহ্মধর্মের মূলতত্ত্ব লইয়া ইঁহারা আপত্তি তুলিলেন। "ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে এবং ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বর সর্বব্যাপী বলিয়া উক্ত হয়েন। অক্ষয়বাবু এবং কানাইবাবু প্রমুখ ব্রাহ্মেরা বলিলেন যে, 'সর্বব্যাপী কথা'র পরিবর্তে 'সর্বত্র বিদ্যমান' শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। আমরা শুনিয়াছি যে, তাঁহারা 'সর্বশক্তিমান' শব্দের পরিবর্তে 'বিচিত্র শক্তিমান' শব্দ ব্যবহার করিবার জন্য জেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"৩৭ এইভাবে ব্রাহ্মধর্মের মৌলিক তত্ত্ব লইয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত অক্ষয়কুমার প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মদের মতান্তরের সূচনা হয়। ইহাকে মহর্ষি পরিহাস করিয়া "ব্রহ্মগোল" আখ্যা দিয়াছিলেন। নিজ অনুচরবর্গ যখন তাঁহার প্রতিকূলতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি নিরতিশয় ব্যথা পাইলেন। তাই আত্মজীবনীর একস্থানে তিনি বলিয়াছেন,

"এখন যাঁহারা আমার অঙ্গ স্বরূপ, যাঁহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মভাব দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের মত সায় পাই না।"৩৮

মানসিক উদ্বেগে বিষণ্ণচিত্তে মহর্ষি এই সময়ে হিমালয় পরিভ্রমণে যাত্রা করেন, এবং নির্জন শৈলসানুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া অন্তরের সত্যকে আরও স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করেন; প্রকৃতির মৌন সাম্রাজ্য, সাধারণ মানুষের স্নিগ্ধ সাহচর্য আর উপনিষদ-হাফেজ কণ্ঠে ধারণ করিয়া মহর্ষি ১৮৫৭ সালের দিকে পুনরায় মানসিক প্রশান্তি খুঁজিয়া পাইলেন। প্রায় এক বৎসর কাল হিমালয়ের সাত্ত্বিক সঙ্গ-লাভের পর ১৮৫৮ সালে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর। তাহার পরেও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার ভাব ও আদর্শগত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা বর্তমান আলোচনার পক্ষে

অপ্রাসঙ্গিক। তবে একথা সর্বথা স্বীকার্য যে, দেবেন্দ্রনাথ জীবনের যে কোন অবস্থায় অন্তরের শুদ্ধা ভক্তিকে অটুট রাখিতে পারিতেন। উপনিষদের অমৃত-অশোক মন্ত্র আর হাফেজের ভক্তিরসোজ্জ্বল বয়েৎ সমূহ তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিল। স্বরচিত জীবনচরিতের সর্বশেষে পংক্তিতে "ওঁ নমস্তে' স্তু ব্রহ্মণ্। নমস্তে "স্তু" বলিযা যে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সমগ্র জীবন ও সাধনার নিয়ামক শক্তি। নানা গণ্ডগোল, আত্মীয়-বিরোধ, স্বমতাবলম্বীদের প্রতিকূলতা ইত্যাকার শত সহস্র মানসিক বিক্ষেপও তাঁহার ব্রহ্মাসক্ত হৃদয়কে কোনদিন তামসিকতার দ্বারা আক্রমণ করিতে পারে নাই।

॥ ৩ ॥

বিবিধ সামাজিক আন্দোলনে দেবেন্দ্রনাথ

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী তাঁহার আত্মচেতনার ক্রমিক অগ্রগতির ইতিহাসে আলোকোজ্জ্বল, একচল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহাকে যে সমস্ত গভীর চিত্ত-সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে, তাহার আনুপূর্বিক বিবরণ ইহাতে পাওয়া যাইবে। এই আত্মজীবনী এবং ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত তাঁহার পুস্তিকাগুলি পাঠে মনে হইতে পারে যে, তিনি ব্যক্তিগত সাধনাসাপেক্ষ ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্য জগৎ ও জনতার ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করিতেন। মনে হইতে পারে, মহর্ষি গ্রন্থাদিতে যে আত্মার সঙ্কটের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয়। কিন্তু ঐ আত্মজীবনীতেও এমন কিছু কিছু বর্ণনা আছে, যাহাতে অনুমিত হয় যে, তিনি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আন্দোলনের সহিত মাঝে মাঝে একাত্মতা উপলব্ধি করিতেন। ১৯শ শতাব্দীর নানা সামাজিক আন্দোলন ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিকেও মাঝে মাঝে বিচলিত করিয়া তুলিত, তখন তিনি সাত্ত্বিক নিরাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্মোদ্যমের রাজসিক উল্লাসে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন। কিন্তু যে-কোন সামাজিক বা অন্যবিধ আন্দোলনে তিনি সর্বদা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আস্তিক্যবাদী অনুশাসনের নির্দেশে চালিত হইতেন। বাল্যে রামমোহনের এ্যাংলো-হিন্দুস্কুলে অধ্যয়নের সময় তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন, কাজেই হিন্দুকলেজের যুগবিপ্লবের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত হইলেও তিনি অন্তরস্থিত সাত্ত্বিকতা হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন নাই।

দেবেন্দ্রনাথ যখন হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিলেন (১৮৩১), তখন তরুণ ছাত্রমহলে ডিরোজিওর বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছে। ডিরোজিও কর্তৃপক্ষের আদেশে ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাহারই কয়েক মাস পরে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজে ভর্তি হন। তিনি ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ শিক্ষাধীনে না আসিলেও যে উত্তেজক আবহাওয়ার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইতিপূর্বে ডিরোজিও তাঁহার ছাত্রগণকে লইয়া এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, ঐতিহ্য—যাহা কিছু এদেশীয়, তাহারই প্রতি যেন এই সমিতির সদস্যদেব মজ্জাগত আক্রোশ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ছাত্রজীবনে এই পরিষদের সংস্পর্শে আসিয়া থাকিবেন। কিন্তু ঐ প্রকার উগ্র মনোভাবের দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবান্বিত হন নাই। পিতা দ্বারকানাথ প্রথম বয়সে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন, পরে কিছু আচাবভ্রষ্ট হইলেও রামমোহনের ধর্মাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পিতামহীও প্রধানতঃ বৈষ্ণব মতানুবর্তিনী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে আসিবার পথে প্রতিদিন ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্তিকে প্রণাম করিয়া আসিতেন, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রসাদ প্রার্থনা করিতেন।[৩৯] সুতরাং বাহিরের দিক হইতে কোন অভিনব আন্দোলন তাঁহাকে পারিবারিক ধর্মাদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ 'ইয়ং বেঙ্গল'গণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে 'কমঠবৃত্তি' অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কলিকাতার নানা সভা-সমিতির সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ছিল। ১৮৩২ সালে রামমোহনের এ্যাংলো-হিন্দুস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রগণ মিলিত হইয়া 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' নামক সভা স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ইহার সম্পাদক এবং রমাপ্রসাদ রায় ইহার সভাপতি হইলেন। বঙ্গভাষার অনুশীলনই হইল এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথম দিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বলেন,

"এই সভা স্থাপনাকারীদিগের অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়া ও তাঁহারদিগের সরলতা কহা উচিত কার্য যেহেতুক ইহা চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা হইতে পারিবেক একণে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা আলোচনার্থ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তত্তৎ সভার দ্বারা উক্ত ভাষায় অনেক বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব মহাশয়েরা বিবেচনা করুন গৌড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার্থ এই সভা সংস্থাপিত হইলে সভ্যগণেরা ক্রমশঃ উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন"[৪০]

দেবেন্দ্রনাথ যেমন বাংলা ভাষা আলোচনার প্রস্তাব করিলেন, তেমনি সভাপতি রমাপ্রসাদ রায়ও তাহাতে সম্মতি দিয়া বলিলেন, "বঙ্গভাষায় ভিন্ন এ সভাতে কোন কথোপকথন হইবেক না।" প্রথম দিন বক্তৃতাদির পর বঙ্গভাষা অনুশীলনের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হইল বটে, কিন্তু আর একটি প্রস্তাব লইয়া কিছু মতান্তরের উত্তাপ সৃষ্টি হইল। এই সভার অন্যতম সভ্য শ্যামাচরণ গুপ্ত ইহাতে 'ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করা কর্তব্য'—এই প্রস্তাব উত্থাপন করাতে সদস্যদের মধ্যে কিছু মতভেদ সৃষ্টি হয়। বোধ হয় ডিরোজিরও এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশনের দৃষ্টান্ত ইঁহাদিগকে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে কিছু সন্ত্রস্ত করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, মাত্র পনের বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ এই সভার সম্পাদকতা করেন এবং বাংলা ভাষা অনুশীলনের জন্য সচেষ্ট হন।

এই প্রসঙ্গে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেবেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে ইহার সহিত কিছুকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৩৮ সালে ডিরোজিও-শিষ্যগণ রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণের দল "Society for the Acquistion of General knowledge" অর্থাৎ 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' স্থাপন করেন। সর্বপ্রকার জ্ঞানার্জনই হইল এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। হিন্দু কলেজের ধর্মহীন শিক্ষা ও ডিরোজিওর বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের প্রভাবে তৎশিষ্য সম্প্রদায় ধর্মকে বাদ দিয়া বিশ্বজ্ঞান অর্জনের জন্য এই সভা স্থাপন করেন। এই সভার মধ্যে এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের উগ্রতা হ্রাস পাইলেও ধর্ম বিষয়ক কোন আলোচনা হইত না। প্রায় দুইশত যুবক ইহার সদস্য হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও কিছুকাল এই সভার সহিত জড়িত ছিলেন। তখন তিনি একবিংশ বর্ষের নবীন যুবক। তখনই তাঁহার মনে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল। একদিকে যেমন ভ্রাতাদের লইয়া তিনি পৌত্তলিকতা-বিরোধী দল বাঁধিতেছেন,[৪১] আবার অন্যদিকে তাঁহার অন্তরের মধ্যে নৈরাশ্যের ছায়াপাত হইতেছে। এই সময়েই তিনি ঈশোপনিষদের খণ্ডিত পত্রে 'ঈশাবাস্যমিদংসর্বং' শ্লোকটি কুড়াইয়া পান। উদ্বেজিত মানসিক অবস্থার মধ্যে তিনি 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় যোগদান করেন। কিন্তু যেখানে ঈশ্বর বিষয়ক কোন আলোচনা হইত না, সেখানে তিনি কোন শান্তি পাইবেন না, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

দেবেন্দ্রনাথ অতি অল্পকালের মধ্যেই এই সভার সংস্রব বর্জন করেন। অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করিলে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকার অনেক সভ্য এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনে যাহা কিছু ভারতীয় তাহারই উপর শানিত অস্ত্রাঘাত করা হইত, অবশ্য সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ঐ পরিমাণে ভারতায় সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ ছিল না। ববং সভ্যগণ স্বদেশের কল্যাণের বিষয় সমূহই আলোচনা করিতেন। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় ধর্মের ঠাঁই ছিল না, কাজেই দেবেন্দ্রনাথ অচিরে এই সভাব সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ সমসাময়িক সমাজ জীবন, শিক্ষা ও নানা আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার (১৮৪০) সাহায্যে তিনি বালক পাঠার্থীর জন্য নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে বাংলা ভাষায় ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষাদান করা হইত; বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মতত্ত্বও ইহার প্রধান পাঠ্যসূচী নির্বাচিত হইয়াছিল। হিন্দু কলেজের বাংলা পাঠশালাতে কোনরূপ ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হইত না; যে শিক্ষা প্রদত্ত হইত, তাহা অনেকটা ফিরিঙ্গী ধরনের; জাতির গভীরতর প্রাণসত্তার সহিত তাহার কিছুমাত্র যোগ ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের এ্যাংলো-হিন্দুস্কুলের আদর্শে এমন পাঠশালা স্থাপনের চেষ্টা করেন যাহাতে সমাজ ও ধর্মের সহিত নবীন পাঠার্থীর অন্তরের মিল থাকিতে পারে। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করাতে এই পাঠশালা শিক্ষিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা ভাষার সাহায্যে সমস্ত বিষয় অধীত হইত বলিয়া এই শ্রেণীর শিক্ষা-প্রণালী সরকারী শিক্ষাকমিটীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অত্যন্ত সাফল্যের সহিত বাঁশবেড়িয়াতেও ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য কারঠাকুর কোম্পানী দেউলিয়া হইলে দেবেন্দ্রনাথ বাঁশবেড়িয়ার বিদ্যালয় তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। বারাকপুর ও নদীয়ার সুখসাগরে যে পাঠশালা স্থাপিত হয়, তাহার সহিতও দেবেন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দেবেন্দ্রনাথ শুধু ব্রহ্মরসেই নিমগ্ন ছিলেন না, বালক-বালিকার শিক্ষার জন্যও চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পাঠশালা স্থাপন করিয়া কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিয়াছিলেন। এই পাঠশালার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—বঙ্গভাষানু-

শীলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মের অনুশীলন। তিনি যে শুধু ভাবযোগী ছিলেন না, পরন্তু কর্মযোগেও তাঁহার অতন্দ্র নিষ্ঠা ছিল, এই বিদ্যালয়গুলির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় বা **Hindu Charitable Institution** প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাঠ করিলে ব্রহ্মভাবনিমগ্ন সাত্ত্বিক দেবেন্দ্রনাথের আর এক মূর্তি লক্ষ্য করা যাইবে। তাহা হইতেছে কর্মযোগী দেবেন্দ্রনাথের যোদ্ধৃরূপ।

আলেকজেণ্ডার ডাফ সাহেবকে রামমোহন স্কুল প্রতিষ্ঠায় প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন; তিনি হেদুয়া পুষ্করিণীর নিকট স্কুল স্থাপনা করিয়া হিন্দু ছাত্রদিগকে খ্রীস্টান করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার চরমে উঠিল ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে। দেবেন্দ্রনাথের অফিসের হাউস-সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকারের অনুজ উমেশচন্দ্র সরকার ডাফ সাহেবের স্কুলে পড়িত। ডাফ সাহেব উমেশ সরকার এবং তাহার নাবালিকা পত্নীকে প্ররোচিত করিয়া উভয়কে খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত করেন এবং লুকাইয়া রাখেন। আইনের আশ্রয় লইয়াও ইহার প্রতিকার করা সম্ভব হয় নাই। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের তত্ত্বরসে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিলেও এই অনাচার শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। অক্ষয়-কুমারের সাহায্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ইহার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ঐ বৎসর 'জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় অক্ষয়কুমারের রচিত যে প্রতিবাদ-প্রবন্ধ বাহির হইল, তাহার ভাষা অক্ষয়কুমারের, কিন্তু চিন্তাধারা দেবেন্দ্রনাথের। একটু উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যাইতেছে:

"অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্যন্ত স্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না? আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ-নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এদেশে যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দুসমাজ চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল।"

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর কলিকাতায় মিশনারী সম্প্রদায় ও তাঁহাদের শিক্ষায়তনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ হইল। দেবেন্দ্রনাথ লোকের বাড়ী গিয়া হিন্দুর বিভিন্ন দলকে একত্র করিলেন; ধর্মসভা ও ব্রাহ্মসভার দলাদলি

মিটিয়া গেল। মিশনারীদের বিদ্যালয়ের অনুরূপ হিন্দুছাত্রদিগের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প গৃহীত হইল। ইহাই 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়'। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ইহার সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ও হরিমোহন সেন ইহার যুগ্ম সম্পাদক হইলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইহার প্রথম প্রধান শিক্ষক। "সেই অবধি খৃষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"[৪২]

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ যেরূপ সংগঠনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় ভক্ত মানুষের পক্ষে বিস্ময়কর বটে। হিন্দুধর্মের উপর আঘাত আসিলে তিনিও যে তাহাকে প্রতিঘাত করিতে পারিতেন, হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাহাই প্রমাণিত হইল। তাঁহারই অক্লান্ত প্রয়াসে সর্বপ্রথম হিন্দুদের বিভিন্ন শাখা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়া সকলেই জাতীয় স্বার্থ এবং ঐতিহ্য রক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ এইভাবে কলিকাতায় হিন্দুসমাজের আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়া মিশনারীদের প্রবল শত্রুতাকে হীনবল করিয়া দিয়াছিলেন। আরও একবার তিনি মিশনারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। য়ুরোপ-আমেরিকা পরিভ্রমণ করিতে গিয়া রাম-মোহনের বন্ধু আলেকজাণ্ডার ডাফ ভারতবর্ষকে কলঙ্কিত করিয়া প্রচার করেন এবং *India and India's Missions* নামক পুস্তকে হিন্দুধর্ম ও বেদান্তের কুৎসা প্রচার করে। ইহার প্রতিবাদ কল্পে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় **'Vedantic doctrines Vindicated'** নামক প্রবন্ধে ইহার বিস্তারিতভাবে উত্তর দিয়াছিলেন। সেই উত্তরে ডাফ সাহেব কিছু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৮৪৫); সুতরাং মিশনারীদের আক্রমণ হইতে কলিকাতার তরুণ সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ যে কতদূর ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু বাঙলার নবযুগ গঠনে ইহার প্রভাব অল্প নহে। তত্ত্ব-বোধিনী সভা ও ইহার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' দীর্ঘকাল ধরিয়া ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালীকে নূতন সমন্বয়ের পথ দেখাইয়াছে। সমকালীন ধর্মসভা, নব্যবঙ্গদের সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, বেথুন সোসাইটী, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতি সভাসমিতি বাঙালীর

মনোলোকে নব নব প্রত্যয়ের বীজ বপন করিয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচার এবং বেদ-বেদান্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা করিয়া আলেকজাণ্ডার ডাফ এবং তৎশিষ্যানুশিষ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি খ্রীস্টানী ভাবাপন্ন ও খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির অভারতীয় আদর্শ এবং 'ইয়ং বেঙ্গল'দের স্ব-সংস্কৃতিতে আস্থাহীন মনোভাব – ইহার বিষয়ক্রিয়া হইতে দেবেন্দ্র-নাথ ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষার চেষ্টা করেন। শুধু ফিরিঙ্গী আদর্শের ভ্রষ্টাচারই নহে, রাধাকান্ত দেববাহাদুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির জীর্ণ পৌরাণিক ঐতিহ্যের কণ্টক-আবরণী ভেদ করিয়া আর্য ধর্মতত্ত্ব ও ভাবতীয় ঐতিহ্যের বহুকালাশ্রিত বাণীকে পুনরুদ্ধাবেব প্রয়াসে মহর্ষিদেব জীবনপণ করেন। আর একদিকে অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি তরুণ ব্রাহ্মদের যুক্তিবাদের প্রতি আত্যন্তিক আসক্তি—যাহা য়ুবোপীয় জ্ঞানবাদের দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে শোধনের ছলে দেশীয় সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করিতেছিল, দেবেন্দ্রনাথ এই উৎকেন্দ্রিকতাকে স্থিতধী কবিবার জন্য স্বজন-বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এই তত্ত্ববোধিনী সভার সাহায্যে তিনি বাঙালীর কর্মচঞ্চল রাজসিক উৎসাহ ও তামসিক মূঢ়তা—উভয়কেই সাত্ত্বিক স্থিতপ্রজ্ঞার আলোকে উজ্জ্বলতর কবিবার জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারেও কুন্ঠিত হন নাই। বিশেষতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির স্মাবকলিপি হইয়া বিরাজ করিতেছে। যদিও দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে "সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারের বাহন" করিতে চাহিয়া-ছিলেন, তথাপি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, জীবনী, শাস্ত্রানুবাদ, সমাজনীতি ও রাজনীতি বিষয়েও মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। বিশেষতঃ লোকহিতকর বহু আন্দোলনের সহিত এই পত্রিকা দীর্ঘকাল যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিল। এই পত্রিকার মারফতে তিনি শিক্ষার জাতীয়-করণ, মিশনারীদের উগ্র জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লোকমত সংগ্রহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের পক্ষে আন্দোলন, সুরাপানের দোষোদ্‌ঘাটন, নীলকর সাহেবদের অমানুষিক বর্বরতা প্রকাশ করিয়া দেওয়া, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক প্রভৃতি বিবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করিতে সচেষ্ট হন। সুতরাং শুধু ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারেই তত্ত্ববোধিনীর সমস্ত চেষ্টা ব্যয়িত হইয়া যায় নাই।

'বঙ্গদর্শনে'র পূর্বে একমাত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কেই সর্বশ্রেণীর বাঙালীর মনের বাহক বলা যায়। অনেকেরই ধারণা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শুধু ধর্মতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিত। কিন্তু পুরাতন তত্ত্ববোধিনীর ফাইল দেখিলেই ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইবে। অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় এই পত্রিকা শিক্ষিত ও স্বদেশপ্রেমিক বাঙালীব মুখপত্র হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু ধর্ম বা দর্শন নহে, বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহাতে যে সমস্ত-মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যেব সম্পদরূপে পরিগণিত হইতে পারে। তন্মধ্যে বিদ্যাসাগরের মহাভারতের অনুবাদ, অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়েব বিস্তারিত এবং যথাযথ বর্ণনা প্রভৃতি রচনা তথ্যভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধ হিসাবে বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে যেমন একদিকে তত্ত্বনিষ্ঠ, তেমনি অপরদিকে সমাজনিষ্ঠ মুখপত্ররূপে পরিণত করেন। গুহাহিত ধর্মতত্ত্বেব গভীরে আত্মনিমগ্ন থাকিয়াও তিনি বাঙালীর সমাজ-জীবন সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না—ইহাই পরম বিস্ময়েব ব্যাপার।

আরও একটি বিষয়ের প্রতি আমাদেব বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী ও ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত ব্যাখা-ব্যাখ্যান পড়িয়া তাঁহার চারিত্রিক স্বরূপেব পূর্ণাঙ্গ চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয় না। একদা তিনিও যে রাজনৈতিক আন্দোলনেব সহিত যুক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার পরবর্তীকালের ধর্মজীবনের ছায়াতলে প্রায় হারাইয়া গিয়াছে। তথাপি পুরাতন সংবাদপত্রাদি অনুসন্ধান করিলে দেবেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের বিস্ময়কর দৃশ্য প্রকাশিত হইবে। রামমোহন যেমন ভারতের জাতি ও শ্রেণীগত বৈষম্য বিদূরণের জন্য বেদান্তের একেশ্বরবাদ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথও তেমনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের পটভূমিকায় অনুরূপ একটি স্বাদেশিক প্রেরণা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ১৮২৬ সালে মাত্র বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মনে সেই বৃহত্তর ভারত গড়িবার স্বাদেশিক প্রেরণা জাগ্রত হইয়াছিল:

"যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে,—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।"[৪৩]

ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভের জন্য একধর্মপ্রতিপাদক এমন এক ঈশ্বরতত্ত্ব প্রয়োজন, যাহার দ্বারা ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্য সমূহ দূরীভূত হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার অন্তর্গূঢ় কামনা। নিঃসঙ্গ ধর্মসাধনার রসতত্ত্বই যে তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তাহা তাঁহার আত্মজীবনীর উক্ত উল্লেখ হইতেই স্পষ্ট হইবে। ইহা ছাড়িয়া দিলেও, সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যে তাঁহার কত গভীর যোগ ছিল, কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই তাহার স্বরূপ বুঝা যাইবে।

দেবেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে প্রধানতঃ ধর্মতত্ত্ব লইয়া অধিকতর ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহাকে কতিপয় আত্মীয়বন্ধুর সহায়তায় ব্রাহ্মমত প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিতে হইয়াছিল। একটু অধিক বয়সে তিনি ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিন্ত হইয়া দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন,—শুধু যোগাযোগ নহে, অন্যতম প্রধান কর্ণধার হইয়াছিলেন।

১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত দুইটি রাজনৈতিক সংস্থার সম্পাদকের গুরুভার গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ দেশের নানা আন্দোলনের উত্তাপ নিজের অন্তরেও সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। The National Association বা দেশহিতার্থী সভা (১৮৫১) এবং The British Indian Association বা ভারতবর্ষীয় সভার (১৮৫১) তিনি ছিলেন প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক। ১৮৫১ সালে দি ন্যাশনাল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির সহযোগিতায় এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র স্বদেশী ও বিদেশী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই সভা যে মূলতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তাহা ইহার প্রথম প্রস্তাব উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া এই সভা প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন—

"It is resolved that a Society be formed under the designation of the "National Association" for the purpose of adopting measure which may contribute to the welfare of the country. The society to be composed of members of all classes of the subjects of the empire, without any distinction of creed, caste or colour. That by the help of this Association we may be able to assert our legal rights by legitimate means, it is resolved to apply for any amendments or reform, as the case may be, either to the Local Government or to the authorities in England "[88]

এই প্রস্তাবে দেখা যাইতেছে যে, ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই যে রাষ্ট্রিক আন্দোলন প্রাধান্য পাইতেছিল, তাঁহার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। অবশ্য এই সভা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ইহার দেড় মাসের মধ্যে গঠিত হইল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫২)। দেবেন্দ্রনাথ ইহারও সম্পাদক হইলেন। পরবর্তীকালে এই সভা বাঙালীর রাজনৈতিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ঐ মাসের ২৯ তারিখে ইহার অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করা যাইতেছে :

"***Resolved that a Society be formed for a period of not less than three years under the denomination of the British Indian Association, and that the object of this Association shall be to promote the improvement and efficiency of the British Indian Government by every legitimate means in its power, and thereby to advance the common interests of Great Britain and India and ameliorate the condition of the native inhabitants of the subject territory. "৪৫

দেবেন্দ্রনাথ দুই বৎসরের অধিক কাল এই সভার সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিবিধ জনকল্যাণমূলক কাযের সহিত আন্তরিক যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ সালে ব্ল্যাক এ্যাক্‌ট্‌স্‌ বা 'কালাকানুনে'র বিরুদ্ধে য়ুরোপীয় অধিবাসিগণ অন্যায়ভাবে আন্দোলন সৃষ্টি করিলে শিক্ষিত বাঙালীরা 'কালা-কানুন' বিরোধী য়ুরোপীয়দের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তদানীন্তন ভারত সরকারের আইনসচিব জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বীঠন শাসন কার্যের সুবিধার জন্য য়ুরোপীয় অধিবাসী-দিগকেও মফঃস্বল আদালতের অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন। 'কালাধলার' পার্থক্য ঘুচিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় শেতাঙ্গ সম্প্রদায় এই প্রস্তাবিত আইন এবং উক্ত আইনের খসড়া রচয়িতা বীঠনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেন এবং এই প্রস্তাবিত আইনকে সক্রোধে 'ব্ল্যাক এ্যাক্‌ট্‌স্‌' নামে অভিহিত করেন। ১৮৪৯ সাল হইতেই শিক্ষিত বাঙালীরা য়ুরোপীয় ব্যক্তিগণের এই অন্যায় আচরণের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইতেছিলেন। উক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ প্রস্তাবে সেই উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথও সে উত্তাপ হইতে রক্ষা পান নাই। তাঁহার সম্পাদনায় এই সভা চৌকিদারী ব্যবস্থা, লাখেরাজ ভূমি সম্পর্কীয় বিলিব্যবস্থা প্রভৃতি গঠনমূলক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। এই সভার সম্পাদক থাকিবার সময়ে দেবেন্দ্রনাথ আরও একটি মূল্যবান কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

তিনি ভারতের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকেও এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন এবং একযোগে কাজ করিবার জন্য নানা স্থানে নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে পত্র দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতৃবৃন্দকে একটা বৃহদ্ব্যাপারে আহ্বান করিবার ইহাই বোধ হয় প্রথম প্রচেষ্টা।

এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসাধনার মধ্যে নিমজ্জিত হইলেন; ইহার পর আর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করেন নাই। অবশ্য তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন; এই সভার নেতৃবৃন্দকে নিজ আবাসে মাঝে মাঝে আহ্বান করিতেন। সে যাহা হউক, ১৯শ শতাব্দীর জনকল্লোল দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মনিষ্ঠ নিরাসক্ত চিত্তেও যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাই লক্ষণীয়। ১৯শ শতাব্দীর সেই চিত্তের সর্বাঙ্গীণ জাগরণ—তাহা দেবেন্দ্রনাথকেও কতদূর কর্মচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা উল্লিখিত দুইটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা বিবেচনা করিলেই অনুমিত হইবে।

॥ ৪ ॥

দেবেন্দ্রনাথের প্রথম যুগের বাংলা গদ্য

দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত জীবনচরিত বাংলা গদ্যসাহিত্যে স্মরণীয় গ্রন্থরূপে বিরাজ করিতেছে। ইহা পাঠ করিলেই দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যাইবে। বক্তব্যের শুচিস্নিগ্ধতা, দুরূহ বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ের এমন অকুণ্ঠ অভিপ্রকাশ—সর্বোপরি ভাষার একটা সংযত অথচ বর্ণাঢ্য সাবলীল পরিচ্ছন্ন প্রবাহ তাঁহার আত্মজীবনী গ্রন্থখানিকে জীবনচরিতে-দুর্বল বাংলা সাহিত্যকে নানা দিক দিয়া ঐশ্বর্যবান্ করিয়াছে। সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মের ত্রিবেণীধারাকে তিনি আপনার ব্যক্তিচিত্তের মধ্যে স্থাপন করিয়া এমন একটি দীর্ঘকাল-স্থায়ী সারস্বত শিল্প সৃষ্টি করিয়াছেন যে, এই নিরুপম গ্রন্থখানিকে অযুত প্রশংসার মাল্যচন্দনে ভূষিত করিলেও অতিশয়োক্তি হইবে না। তিনি বার্ধক্যের প্রান্তে পৌছিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; ১৮১৬ শকে (১৮৯৪ খ্রীঃ অঃ) প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে ইহার গ্রন্থ স্বত্বাধিকার দান করেন। অনুমান ইহার কিছু পূর্বে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হইয়া থাকিবে। সুতরাং ইহা আমাদের আলোচ্য সীমার বহির্ভূত এবং তাই

এই স্থলে এই গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য বা ভাষাবৈশিষ্ট্য আলোচিত হইল না। তবে তাঁহার জীবন-ধর্মের নিগূঢ় পরিচয় জানিবার জন্য ইহা হইতে অনেক প্রসঙ্গ গৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে।

কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন অনেক পূর্ব হইতে। রামমোহন যখন বাংলা গদ্যে শাস্ত্রজ্ঞান প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন সে বিষয়ে তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ নিশ্চয় অনুকূলতা করিতেন এবং রামমোহন-অনূদিত বা ব্যাখ্যাত শাস্ত্র গ্রন্থসমূহকে তিনি সানন্দে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের সময়েই বাংলায় অনূদিত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ ঠাকুর পরিবারে গৃহীত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ এই শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠকালে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আট-নয় বৎসর বয়সে তাঁহাকে রামমোহনের এ্যাংলো-হিন্দুস্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইলে তিনি এই বিদ্যালয়ে উত্তমরূপে বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।[৪৭] এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের সহিত মিলিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ১৮৩০ সালে এ্যাংলোইণ্ডিয়ান হিন্দু এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি বিতর্ক সভা স্থাপন করেন। এখানেও ধর্ম ভিন্ন নানাপ্রকার আলোচনা হইত এবং বাংলা ভাষার মারফতে বিতর্ক চলিত। বাংলা ভাষার প্রতি মহর্ষির আজীবন অনুরাগ ছিল; তাহার প্রমাণ, ১৮৩২ সালে দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে এবং এ্যাংলো-হিন্দুস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের সহযোগিতায় 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' নামক এক পরিষদ স্থাপিত হয়; তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র পনের বৎসর। ঐ সভায় ১৭৫৪ শকের ১৭ই পৌষের (১৮৩২) বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথ মাতৃভাষা বাংলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।[৪৮]

পনের বৎসর বয়সেই দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা প্রচার ও ব্যবহারের জন্য কত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা এই ঘটনা হইতেই বুঝা যাইতেছে। তিনি ১৭৬০ শকে (১৮৩৮) উত্তমরূপে বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।[৪৯] কিশোর কাল হইতেই বাংলা ভাষায় তাঁহার এইরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় ইংরাজী ভাষায় সহিত বাংলা ভাষাতেও আলোচনা হইত, তত্ত্ববোধিনী সভাতে কেবলমাত্র বাংলাতেই আলোচনা চলিত। নব্যবঙ্গীয় যুবকগণ অবশ্য ইংরাজী ভাষার অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন; দেবেন্দ্রনাথের

তত্ত্ববোধিনী সভা এবং রাধাকান্ত দেববাহাদুর ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মসভায় কেবল বাংলা ভাষাতেই আলোচনা হইত।

দেবেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা ১৮৪৩ সাল হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহার পূর্বেও তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে আলোচনা করিতেন, তাহাতে বাংলা ভাষাতেই ভাষণ দিতেন বা বক্তৃতা-ব্যাখ্যান করিতেন। ১৮৩৯ সালে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার (তখন তত্ত্বরঞ্জিনী সভা) উদ্বোধন দিবসে কঠোপনিষদের ২।৬ শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেন,

"প্রমাদী ও ধনমদে মূঢ় নির্বোধের নিকটে পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশ পায় না, এই লোকই আছে, পরলোক নাই—যাহারা এ প্রকার মনে করে, তাহারাই পুনঃ পুন আমার বশে (অর্থাৎ মৃত্যুর বশে) আইসে।"৫০

বলা বাহুল্য দেবেন্দ্রনাথ এই উক্তি উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার স্বরচিত জীবন-চরিতে, উক্ত ঘটনার (১৮৩৯) প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পরে, আত্মজীবনের আনুমানিক রচনা সমাপ্তিকাল—১৮৯৪ খ্রীঃ অঃ। কাজেই ১৮৩৯ সালে তিনি অবিকল এই ভাষাই ব্যবহার করিয়াছিলেন কিনা বুঝা যাইতেছে না। অবশ্য তিনি এই ব্যাখান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আমার ব্যাখ্যান সকলেই পবিত্রভাবে শুদ্ধভাবে শ্রবণ করিলেন। এই আমার প্রথম ব্যাখ্যান।"৫১ তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যানের অবিকল উদ্ধৃতি উল্লেখ করা গেল না বলিয়া তাঁহার বাইশ বৎসর বয়সের রচনা কিরূপ ছিল, বুঝা যাইতেছে না। তবে তাহা যে সরল ও মূলানুগ হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

১৮৪১ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বিতীয় সাংবাৎসরিক অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বলেন,

"এই ক্ষণে ইংলণ্ডীয় ভাষার আলোচনায় বিদ্যার বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, এতদ্দেশস্থ লোকের মনের অন্ধকারও অনেক দূরীকৃত হইয়াছে। এই ক্ষণে মূর্খ লোকদিগের ন্যায় কাষ্ঠ লোষ্ট্রেতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া তাহাতে পূজা করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। বেদান্তের প্রচার অভাবে, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, সর্বগত, বাক্য মনের অতীত, ইহা যে আমাদের শাস্ত্রের মর্ম, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। সুতরাং আপনার ধর্মে এ প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান না পাইয়া অন্য ধর্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্রে তাহা অনুসন্ধান করিতে যায়। তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় আছে যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কেবল সাকার উপাসনা, অতএব এ প্রকার শাস্ত্র হইতে তাহাদিগের যে শাস্ত্র উত্তম বোধ হয়, সেই শাস্ত্র মান্য করে। কিন্তু যদি

এই বেদান্ত ধর্ম প্রচার থাকে, তবে আমারদিগের অন্য ধর্ম কদাপি প্রবৃত্তি হয় না। আমরা এই প্রকার আমারদিগের হিন্দু ধর্ম রক্ষায় যত্ন পাইতেছি।"

এখানে তিনি প্রধানতঃ 'ইয়ং বেঙ্গল'দিগের প্রতি কিছু তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন, এবং বেদান্ত ধর্মই যে একেশ্বরবাদী শ্রেষ্ঠধর্ম, যে সম্বন্ধেও ইঙ্গিত দিয়াছেন। কিন্তু ভাষায় এই যৌক্তিকতা ও সংযম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ১৮৯৮ সালে দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি এই গ্রন্থের ২ সংখ্যক পরিশিষ্টে কয়েকটি বক্তৃতা অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতাকে আমরা ১৮৪১ সালে প্রদত্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি; এবং সেই জন্যই মহর্ষির প্রথমদিকের রচনার প্রতি আমাদের বিস্মিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। ভাষা যে কত স্বচ্ছ অথচ গুরুত্বপূর্ণ, ঋজুগতি অথচ তরঙ্গায়িত হইতে পারে, ইহাই তাহার সার্থক দৃষ্টান্ত।

মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যান সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে। এক্ষণে তাঁহার আর এক প্রকার বিচিত্র গদ্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্য সৃষ্টির অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন নাই; তিনি মূলতঃ ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ তত্ত্ববাদী এবং শান্তরসাস্পদ ভক্ত। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার গদ্যের মধ্যে সহৃদয় রসিকচিত্তের স্পর্শও পাওয়া যায়। হিমাচলের শৈলসানুতলে ভ্রমণকালে তিনি নির্জন হিমশীলাতলে মৌন অরণ্য-প্রকৃতির যে বিশাল স্তব্ধতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আত্মজীবনীতে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। ১৮১৫ শকে প্রকাশিত 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' নামক একটি পুস্তিকায় তিনি যেরূপ সরল ভাষায় বিশ্বতত্ত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার একমাত্র উদাহরণস্থল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞান-রহস্য' এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সমূহ। বর্তমান ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ আমাদের আলোচিত কালের সীমা বহির্ভূত হইলেও তাঁহার এই স্নিগ্ধ রচনার একটু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে:

"এই পৃথিবী অতিপূর্বে একটি সুপ্রকাণ্ড অগ্নিগোলক ছিল। জীবজন্তু ওষধি প্রভৃতির চিহ্নমাত্র দেখা যাইত না। ক্রমে পৃথিবীর গাত্রে আচ্ছাদন পড়িল। ভিতরে প্রচণ্ড অগ্নি উত্তপ্ত দ্রবধাতু; বাহিরে অগ্নিময় অপেক্ষাকৃত কঠিন আবরণ। সূর্যও তখন ঘোর বাষ্পময় মেঘে আবৃত। অগ্নির উত্তাপে পৃথিবী হইতে বারংবার মেঘ উত্থিত হইয়া পুনরায় জলরূপে পড়িতে লাগিল। এই সময়ে পৃথিবীর মধ্যে অতি গোলমাল চলিতেছিল।"

অবশ্য এই পুস্তিকা ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং ইহার তিন চার বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থোক্ত বিষয় উপদেশচ্ছলে বিবৃত হয়। তাঁহার পত্রাবলী ১৭৭২ শক হইতে ১৮০৯ শকেব মধ্যে লিখিত হইয়াছিল (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত)। বাজনাবায়ণ বসুকে লিখিত মহর্ষির কয়েকখানি পত্রে যথার্থ পত্রসাহিত্যের সরসতা ও পরিচ্ছন্নতা দেখা যায়। মহর্ষি নিতান্তই কাজের কথার জন্য পত্রের অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাব কিছু কিছু পত্র প্রয়োজনেব সীমা ছাড়াইয়া সাহিত্যেব সীমায় পৌঁছাইয়াছে। বাজনাবায়ণ বসুকে লিখিত পাঁচ সংখ্যক পত্রখানিব কিয়দংশ উদাহবণ স্বরূপ উল্লিখিত হইতে পাবে :

"তোমার ৪ আষাঢের পত্র প্রাপ্ত হইলাম। আহা! এই ক্ষুদ্র পত্রের মধ্যে কি মনের তৃপ্তিব কথাই লিখিযাছ। যেমন নব মধুমক্ষিকা মধুপদার্থকে না জানিয়াও মধুগর্ভ পুষ্প প্রতি ধাবমান হইয়া তাহা হইতে মধু পান করে, তদ্রূপ মন নিরতিশয় মহৎ পুরুষকে না জানিযাও প্রবৃত্তিগত অনুরাগ সহকারে তাঁহাব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়।"—১৭৭৭ শকাব্দে লিখিত।

তাঁহাব স্বচ্ছ হৃদয়েব শুভ্র নিবঞ্জন ছায়া যেন এই পত্রেব মধ্যে ধবা পড়িয়াছে। ইতিপূর্বে তাঁহাব যে গ্রন্থতালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৫০-১৮৫২ সালের মধ্যে তাঁহাব তিনখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় :—

(ক) ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ, ১ম ও ২য় (১৮৫০)

(খ) ঐ অনুবাদসহ (১৮৫১-৫২)

(গ) আত্মতত্ত্ববিদ্যা (১৮৫২)

ইহাব মধ্যে দ্বিতীয় পুস্তিকা (খ) প্রথম পুস্তিকাব (ক) মূল ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হয়। 'আত্মতত্ত্ব বিদ্যা'ও প্রথম পুস্তিকার ব্যাখ্যান বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ইহা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৭৭২ শকাব্দ হইতে ধাবাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রথম পুস্তিকা 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' (১ম ও ২য়) মহর্ষির ধ্যানলব্ধ জীবনবেদ; পরবর্তীকালে ইহা ব্রাহ্মধর্মেব উপনিষদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। মহর্ষি এই পুস্তিকাকে 'ব্রাহ্মী উপনিষদ' বলিয়াছেন। মূলতঃ উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়া এবং উপনিষদ হইতে বিশেষ বিশেষ শ্লোক সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তিকা সঙ্কলিত হয় (১৮৫০); তাহাব প্রায় একবৎসব পবে এই পুস্তিকাই বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশিত হয় (১৮৫১-৫২)। এই পুস্তিকার ঐতিহাসিক মূল্য অশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার পূর্বে ব্রাহ্মদেব বিশেষ কোন ধর্মগ্রন্থ ছিল না, তাঁহারা

উপাসনাস্থলে কোন একখানি উপনিষদ হইতে অংশবিশেষ পাঠ করিতেন বা তাহার অনুবাদ অনুসারে বাংলায় প্রার্থনা করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়া ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেও উপনিষদের সমস্ত শ্লোক গ্রহণ করেন নাই। স্বমতানুবর্তী অংশসমূহ বা শ্লোকগুলি প্রথমে সঙ্কলন করেন। প্রথমে তিনি রামমোহন-উদ্ধৃত গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারাই ব্রহ্ম উপাসনার প্রথা প্রচলিত করেন। কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র সকলে আয়ত্ত করিতে পারিতেছিল না দেখিয়া তিনি গভীরভাবে আত্মনিষ্ঠ হইয়া চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ বীজাকারে মন্ত্রদর্শন করিলেন। তাহাই 'ব্রাহ্মবীজ' (আত্মজীবনী, পৃ ১৭৫)। ১৭৭০ শকে (১৮৪৮) যখন এই মন্ত্র তাঁহার মনোলোকে আবির্ভূত হইল, তখন তিনি এই বীজমন্ত্রটি এক টুকরা কাগজে লিখিয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। ইহার একবৎসর পরে ১৮৪৯ খ্রী: অব্দে উহা বাহির করিয়া তিনি একটু সংশোধন করিলেন এবং ১৭৭১ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র শিরোদেশে 'ব্রাহ্মবীজে'র চতুর্থ মন্ত্র "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"—মুদ্রিত করাইলেন। ১৭৭৯ শকের বৈশাখ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে সম্পূর্ণ বীজমন্ত্রটি প্রকাশিত হইল :—

"ব্রহ্ম বা এসমিদমগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ, তদিদং সর্ব মসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়ব মেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্তৃ সর্বাশ্রয়ং সর্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণ মপ্রতিমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

এই বীজমন্ত্র ব্রাহ্মসমাজের সকলেই গ্রহণ করিলেন; নানা মতকলহ সত্ত্বেও ইহার পরিবর্তন হয় নাই।

'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' (১ম ও ২য়) ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের উপনিষদ—ইহাকে মহর্ষি 'ব্রাহ্মী উপনিষদ' বলিয়াছেন। তিনি আজীবন উপনিষদের শুভ্ররসে লালিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু নৈষ্ঠিক ভক্তের মত একাদশ উপনিষদের সমস্ত উক্তিকেই আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি এমন সমস্ত উক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন যে, তাহার সহিত তাঁহার অন্তরস্থিত ধ্রুব প্রত্যয়ের মিল হইতেছিল। ১৮৪৮ সালে তাহার অন্তঃকরণে চিন্তার উদয় হইল—যদি সমস্ত উপনিষদের যাবতীয় মন্ত্রকে অবিকল গ্রহণ করা না যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মগণ কোন্ গ্রন্থকে তত্ত্ববাদের ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিবেন? আত্মস্থ হইয়া

চিন্তা করিতে করিতে উপনিষদের বিশেষ বিশেষ মন্ত্র তাঁহার দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল।[৫৩] মহর্ষি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (১৷১) 'মন্ত্র ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি' বলিয়া আরম্ভ করিলেন, এবং তাহার পরে তৈত্তিরীয় (৩৷১, ৩৷৬) বৃহদারণ্যক (১৷২৷১), ছান্দোগ্য (৬৷২৷১), বৃহদারণ্যক (৪৷৪৷২৫) তৈত্তিরীয় (২৷৬), মুণ্ডক (২৷১৷৩), কঠ (৬৷৩) উপনিষদের বিশেষ বিশেষ মন্ত্র বলিতে লাগিলেন এবং উপসংহারে বৃহদারণ্যক (২৷৫৷১০, ২৷৫৷১৯, ২৷৫৷২০) ও শ্বেতাশ্বতর (৩৷৮৷১) হইতে মন্ত্র উল্লেখ করিয়া মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' সঙ্কলন করিলেন।[৫৫] তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে রামমোহনের মত তিনি সমস্ত উপনিষদকেই ব্রাহ্মধর্মের আকরগ্রন্থ-রূপে গ্রহণ করেন নাই। একটা আবিষ্ট মুহূর্তে উপনিষদের যে যে মন্ত্রগুলি তাঁহার মানসনয়নে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল, কেবল সেই মন্ত্রগুলিকেই তিনি 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে' স্থান দেন। এইরূপে তিনি যে সমস্ত মন্ত্র লাভ করিলেন, সে সম্বন্ধে তাহার উক্তি স্মরণীয় :

"ইহা আমার দুর্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নহে, ইহা মোহবাক্যও নহে। ইহা আমার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁহারই প্রেরিত সত্য। যিনি সত্যের প্রাণ, যিনি সত্যের আলোক, তাঁহা হইতেই এই জীবন্ত সত্যসকল আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে।"[৫৪]

কাজেই 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' যেমন উপনিষদের অবিকল শ্লোকসংগ্রহ ও অনুবাদ নহে, তেমনি আবার সঙ্কলন-কর্তার সজ্ঞান এবং সচেষ্ট বুদ্ধির অনুশীলন জনিত যুক্তি-গ্রাহ্য কোন দার্শনিক তত্ত্বও নহে। দেবেন্দ্রনাথ অন্তরে যে যে মন্ত্রগুলিকে সজীব বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রগুলিকেই 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে' স্থান দিয়াছিলেন।

'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডকে ব্রাহ্মধর্মের 'শ্রুতি' এবং দ্বিতীয় খণ্ডকে 'স্মৃতি' বলা যাইতে পারে। প্রথম খণ্ডটি ১৬শ অধ্যায় বিভক্ত হইয়াছে। এই ১৬শ অধ্যায়েই ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বাংশজ্ঞাপক মন্ত্রসমূহ সঙ্কলিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডও ১৬শ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম 'ব্রাহ্মধর্মের উপনিষদ,' দ্বিতীয় খণ্ড 'অনুশাসন' নামে পরিচিত। এই দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রাহ্মদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, নীতি-উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশে মহাভারত, গীতা, মনুসংহিতা, মহানির্বাণতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের চর্যাসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। পরবৎসর এই দুই খণ্ড গ্রন্থ মূল অনুবাদসহ প্রকাশিত হইল। এত

দিন পরে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মধর্মের দর্শনভূমি রচিত হইল। একই গ্রন্থের মধ্যে তত্ত্বাংশ ও স্মৃতি-অংশ সংনিবেশিত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ধর্মপ্রবক্তার সূক্ষ্ম প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে লেখক নানা স্মৃতি ও পুরাণ গ্রন্থ হইতে সঞ্জীবন ও সদাচারমূলক শ্লোক সমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থকে তদনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এখানেও তাঁহার অসাম্প্রদায়িক মনের পরিচয়টাই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের অনুবাদ হইতে একটু উল্লেখ করা যাইতেছে :

মূল—অশব্দস্পর্শরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যং গান্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচার্য্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।

অনুবাদ—যাঁহাতে শব্দ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, যাঁহার কোন ক্ষয় নাই, যিনি অনাদি, অনন্ত ও সর্বপ্রকার মহৎ পদার্থ হইতে মহৎ এবং নিত্য ও নির্বিকার, তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয়।[৫৫]

এখানে দেখা যাইবে যে, ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা গদ্য কিরূপ সাবলীল গতি অবলম্বন করিয়াছে। রামমোহনের উপনিষদের অনুবাদ এবং দেবেন্দ্রনাথেব অনুবাদ মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, রামমোহনের বিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা গদ্য কিরূপ শুচিস্নিগ্ধতা লাভ করিয়াছে। রামমোহন আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গিয়া ভাষাকে অতিশয় কৃত্রিম ও জড়তাপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের অনুবাদের ভাষা মূলানুগ হইয়াও কৃত্রিম বা আড়ষ্ট হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথের ভাষার গঠনশিল্প ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বেই একটা শিল্পরূপ লাভ করিয়াছিল। তাই তাঁহার প্রথম যুগের বাংলা গদ্যে,—কি স্বাধীন রচনা, কি অনুবাদ, কি ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যান, কোনটিতেই কোনরূপ অস্পষ্টতা বা জড়তা নাই। তাঁহার অধিকাংশ রচনা ধর্মসংক্রান্ত বলিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের রূপ ও রীতির যথার্থ বিশ্লেষণ হয় নাই। নিছক ধর্মবিষয়ক হইলেও এই পুস্তিকাগুলির ভাষার মধ্যে যে শিল্পরূপ ফুটিয়াছে, তাহার সাহিত্যিক মূল্য স্বীকার করিতেই হইবে

১৭৭৭ শকে (১৮৫২) 'আত্মতত্ত্ব বিদ্যা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলেও ১৭৭২ শকাব্দ হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ইহার ব্যাখ্যান প্রকাশিত হয়। এই ব্যাখ্যানগুলিকে নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৭৪ শকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাতেও ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে' (১ম খণ্ড) যে সমস্ত মন্ত্র

উল্লিখিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাহার চুম্বক মিলিতেছে—উভয় পুস্তিকার মধ্যে বিলক্ষণ ভাবসাদৃশ্য আছে। তবে আলোচ্য পুস্তিকা অনুবাদ নহে, স্বাধীন রচনা। তাই ইহার ভাষা-ভঙ্গিমা ও বাক্যগঠন বহুলাংশে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দচারী। যথা—

"হায়! চতুর্দিকে বাহ্যবস্তু দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া, সর্বদাই বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া লোকসকল বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি কিছুই হইলাম না, কেবল সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি বাহ্যবস্তু সকলেই বস্তু হইল। এ বিবেচনা নাই যে, আমি যদি না থাকিতাম, তবে কোথায় বা সূর্য কোথায় বা চন্দ্র, কোথায় বা গ্রহনক্ষত্র, কোথায় বা এই জগত!"

লক্ষ্য করিতে হইবে, এই রচনা ১৮৪৯-৫০ সালের অন্তর্ভুক্ত; তখনও বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) অথবা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৭-৫৮) রচিত হয় নাই। ভাষার মধ্যে এই যে সুরমাধুরী, ছন্দের দোলন (Cadence) এবং সর্বোপরি সুকঠিন তত্ত্বের এমন সহজ আত্মপ্রকাশ—সমকালীন গদ্য রচনায় প্রায় দুর্লভ বলিলেই হয়। দেবেন্দ্রনাথ বাংলা গদ্য রচনায় অধিক সময় নিয়োগ করিতে পারিলে তত্ত্ব-মূলক গদ্যসাহিত্যের নূতন পথরেখা নির্দেশ করিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিত বাংলা জীবনী-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। যদিও ইহা প্রধানতঃ মহর্ষির ধর্মজীবনের ইতিবৃত্ত, তথাপি ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালীর চিত্তসঙ্কটের ঐতিহাসিক মূল্য হিসাবে ইহা অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা ১৮৫৭ সালের অনেক পরে রচিত বলিয়া এই আলোচনায় ইহার বিস্তারিত বিশ্লেষণ পরিত্যাগ করা হইল।

দেবেন্দ্রনাথের প্রথম যৌবন ও উত্তর যৌবনের (১৮১৭-১৮৫৭) জীবনকথা, সাধনা ও ভাবাদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনধর্মের যে মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহাতে শুধু একটি ব্যক্তি-মানসের জীবনসঙ্কট নহে, ১৯শ শতাব্দীর সমগ্র বাঙালী জীবনেরই আত্মার বিচিত্র দ্বন্দ্ব প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। সেই জ্ঞান ও প্রেম, ধ্যান ও কর্মের দ্বন্দ্ব; যে দ্বন্দ্ব রামমোহনের প্রকাণ্ড পৌরুষের আঘাতে স্তিমিত হইয়াছিল, বিদ্যাসাগরের মধ্যে তীব্র প্রদাহ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই দেবেন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে প্রশ্নাতুর সংশয় এবং উত্তর-যৌবনে স্থায়ী অপ্রমত্ত ভক্তিরসে পরিণত হয়। সে ভক্তি অহেতুকী পুরাণানুরক্তি নহে, তাহার সহিত সজ্ঞান চিদ্‌বৃত্তির স্পর্শ রহিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ

স্বীয় জীবন-সাধনায় জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন এবং নির্দ্বন্দ্ব অনুভূতিব তুঙ্গশীর্ষে সমাসীন হইয়াও মর্ত্য জীবনের সহিত নিবিড়তর যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। পাবিবারিক দুর্ঘটনায় তিনি গীতোক্ত নিষ্কাম মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মিশনাবীদের সঙ্কীর্ণ ধর্মচেতনাব আক্রমণ হইতে বাঙালী সমাজকে বক্ষা কবিবার জন্য যোদ্ধবেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবাব অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি অনুচবদেব সহিত মতানৈক্য ঘটিলেও তিনি চিত্তেব স্থিতধী অবস্থা সর্বদা বক্ষা কবিতে পাবিয়াছিলেন। ১৯শ শতাব্দীব কল্লোলমুখব সমুদ্রোচ্ছ্বাসেব মধ্যে তিনি গ্রানাইট শিলাব উপবে প্রতিষ্ঠিত শ্যামাভ দ্বীপেব মহিমা লইয়া বিবাজ কবিতেছেন।

পাদটীকা

১। অজিতকুমার চক্রবর্তী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ১৮৮

২। সতীশ চক্রবর্তী সম্পাদিত—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ।/০

৩। ঐ ঐ, ১০ সংখ্যক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

৪। ঐ ঐ পৃ ৪৯

৫। ঐ ঐ পৃ ৭৫

৬। বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৩২

৭। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ৩য় সং, পৃ ৫৭

৮। ঐ পৃ ৫৮

৯। ঐ পৃ ৬৮

১০। ঐ পৃ ৮০

১১। ঐ পৃ ৮১

১২। ঐ পৃ ৩৭১-৭২

১৩। ঐ পৃ ৮৬-৮৭

১৪। ঐ পৃ ১০৮

১৫। ঐ পৃ ১৩২

১৬। ঐ পৃ ১৪০

১৭। ঐ পৃ ১৪২

১৮। ঐ পৃ ১৮০

১৯। ঐ পৃ ৬৫

২০। ঐ পৃ ৬৯

২১। ঐ পৃ ৩৭০

২২। ঐ পৃ ৭৬-৭৭

২৩। রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী, পৃ ৬৫-৬৮

২৪। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পৃ ১০৭

২৫। ঐ পৃ ৭৭

২৬। ঐ পৃ ঐ

২৭। ঐ পৃ ৬০-৬২

২৮। ঐ পৃ ১৬ ৫৬৬

২৯। ঐ পৃ ১৬৬-৬৭

৩০। ঐ পৃ ১৭২

৩১। ঐ পৃ ১৬৮

৩২। ঐ পৃ ১৭৮

৩৩। অজিতকুমার চক্রবর্তী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ২০৮

৩৪। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পৃ ১৬৭

৩৫। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত—পত্রাবলী, পৃ ১০ ১১

৩৬। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃ ২২০

৩৭। ঐ পৃ ৪৫৮

৩৮। ১৮৩৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত প্রবন্ধ।

৩৯। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, পৃ ২২০

৪০। ঐ পরিশিষ্ট, পৃ ৩১১

৪১। ব্রজেন্দ্রনাথ—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ ১২৪-২৫

৪২। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পৃ ৫৮

৪৩। ঐ পৃ ১০৬

৪৪। ঐ পৃ ১০৭

৪৫। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ৫৮-৫৯

৪৬। *Friend of India*, 27th Nov., 1851.

৪৭। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, পৃ ৬০, পাদটীকা

৪৮। যোগেশচন্দ্রের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৬

৪৯। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ ১২০

৫০। নববার্ষিকী, পৃ ২২১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত।

৫১। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, পৃ ৬৩

৫২। ঐ ঐ

৫৩। ঐ পৃ ১৭৪-৭৫

৫৪। ঐ পৃ ৫৩

৫৫। ঐ পৃ ১৭৯

৫৬। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ, ১৭৭৪ শক, পৃ ৩২

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিদ্যাসাগরের সমকালীন

বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর সমাজ-জীবনে যে প্রবল বিপ্লবের সূচনা হয়, তাহা শুধু সামাজিক আন্দোলনের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে নাই,—বাংলা সাহিত্যেও নানা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অবশ্য বিদ্যাসাগরীয় পর্বের বাংলা সাহিত্যে সারস্বত শিল্পসৃষ্টির সজ্ঞান বা সক্রিয় প্রচেষ্টা লক্ষ্যগোচর হয়না—সম্ভবও নহে। কারণ রামমোহনের সময় হইতেই বাঙালীর মনে সমাজ ও ধর্মাচার ঘটিত রীতি ও প্রকরণ লইয়া যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সাত্ত্বিক রসসৃষ্টির অনুকূল নহে। একদিকে সমাজ ও আচার-আচরণকে কেন্দ্র করিয়া অযুত কৃত্যের প্রাচুর্য, অপরদিকে যুরোপ হইতে সদ্যোপ্রাপ্ত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাবিদ্ধ চৈতন্যের দিব্যদাহ—ফলে অপ্রয়োজনের আনন্দ বা রসকেবলা বাণীমূর্তি রচনা অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ আন্দোলন বা সমাজ-চৈতন্যের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্য নামধেয় অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। শিল্প-বিচারের তুলাদণ্ডে স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগরের সমকালীন সাহিত্যের (১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিলে হয়তো তাহাদের সারস্বত মূল্য নিরর্থক মনে হইবে। কিন্তু সেই সমস্ত প্রয়োজনের-খাতিরে-গড়িয়া-ওঠা পুস্তক-পুস্তিকার প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বাঙালী-মানসের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কার্যকরী হইয়াছে; কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও-বা পরোক্ষ ভাবে সুদৃঢ় প্রভাবও বিস্তার করিয়াছে। যে সমস্ত স্বাদেশিক ও বৈদেশিক প্রভাব বাঙালীর সমসাময়িক ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, বিদ্যাসাগরের ছত্রছায়াতলে যে সমস্ত অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ রচিত হইতেছিল, তাহাতে তাহার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য আমাদের আলোচনার সীমা ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত প্রসারিত বলিয়া, তৎপরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্য বিদ্যাসাগরের দ্বারা কতদূর প্রভাবান্বিত

হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইতেছে না। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের ফলে বাঙালীর সমাজ-জীবনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তাহার সূচনা তাঁহার পূর্ব হইতেই হইয়াছে এবং সেই নবজীবনের বিদ্যুৎ-প্রভাব বিদ্যাসাগরের কিছু পূর্ব হইতেই বাংলা ভাষায় রচিত ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদিতে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। প্রাক্-বিদ্যাসাগরীয় যুগে মিশনারী চালিত বিদ্যালয় এবং হিন্দুদের পাঠশালায় যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক অধীত হইত, সর্বপ্রথম তাহাতেই নবজীবনের প্রভাব সূচিত হয়; স্কুলবুক সোসাইটী, ভার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটী, গার্হস্থ্য পুস্তক ভাণ্ডার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে ক্ষুদ্র পুস্তকগুলিতেই এই প্রভাব স্পষ্টতর হইয়াছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' যে সমস্ত মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহাতেও এই নবজীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত পুস্তক অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার দুই চারিখানির নামোল্লেখ করা যাইতেছে :—সত্য ইতিহাস সার, পশ্বাবলী, ভূমিপরিমাণ বিদ্যা, বঙ্গদেশের ইতিহাস, স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী, লর্ড ক্লাইভ,[১] রবিনসন ক্রুশোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, পাল এবং বর্জিনির জীবনবৃত্তান্ত, শিল্পিক দর্শন, শিবাজী চরিত্র, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, নূরজাহান রাজ্ঞীর জীবনবৃত্তান্ত, জাহানারার চরিত্র, জীব রহস্য[২], পীয়ার্স সাহেবের ভূগোল বৃত্তান্ত ইত্যাদি। পরে ইহার বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বাঙালী বালকের শিক্ষা ও অন্তঃপুরিকাদের মনোরঞ্জনের জন্য কী বিপুল প্রয়াস করা হইয়াছিল। এগুলি নিতান্তই বালপাঠ্য পুস্তিকামাত্র; তবু এই তালিকা দৃষ্টে সহজেই অনুমেয় যে, বিদ্যাসাগরের কিছু পূর্ব হইতেই শিক্ষা প্রচারের জন্য বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছিল। নিম্নে এই যুগের সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়া তাহাদের অন্তরালে অবস্থিত বাঙালী-মানসের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। ইতিহাসাশ্রিত রচনা, নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, আখ্যান, কাব্য-কবিতা—প্রধানতঃ এই কয় শাখায় প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের শ্রেণীভুক্ত করিয়া আলোচনা করা হইবে।

॥ ১ ॥

ইতিহাসাশ্রিত রচনা

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পর্ব হইতেই ইতিহাসের প্রতি বাঙালী লেখক ও পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, বোধহয় জাতির প্রথম আত্মজাগরণ কালে অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি ও কৌতূহল ধাবিত হয়। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অনেকটাই ইতিহাসাশ্রিত রচনা; অবশ্য ভূগোলকেও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। দেশ লইয়া ভূগোল, কাল লইয়া ইতিহাস, আর দেশকালের সহিত সম্পৃক্ত মানুষ লইয়া সমাজেতিহাস। তাই ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরাজী ভাষায় রচিত ভূগোল বিজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া বাংলা ভাষায় প্রচুর ভূগোল ও ইতিহাসে রচিত হইয়াছে। এই কালের মধ্যে রচিত (১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) ইতিহাস ও ভূগোলের সংক্ষিপ্ত তালিকা পাঠ করিলেই বাঙালীর ইতিহাস-চেতনার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যা কল্পদ্রুমে'র প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভে এই গ্রন্থমালার যে চুম্বক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার তালিকাঃ

(a) Ancient History—Egypt, Babylon, Greece, Rome and India.

(b) Modern History—Europe, England, India, America etc.

কৃষ্ণমোহন 'বিদ্যা কল্পদ্রুমের' প্রথম সংখ্যা হইতেই 'রোমক রাজ্যের পুরাবৃত্ত' প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ কাণ্ডে 'পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস সার' নামক অধ্যায়ে তিনি সামিটিকস্-ইজিপ্ত হইতে শুরু করিয়া হিবদতস, সাইরস, সক্রেতিস, হানিবলের যুদ্ধ যাত্রা, থ্রাসিমিনীর যুদ্ধ প্রভৃতি প্রাচীন মিশর ও রোমীয় ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বিবৃত করেন। ৬ষ্ঠ কাণ্ডেও মিশর বিষয়ক রচনা সংযোজিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থমালার প্রথম ও চতুর্থ কাণ্ডে (১৮৪৬) রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত এবং ষষ্ঠ কাণ্ডে (১৮৪৭) ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়। কৃষ্ণমোহন 'বিদ্যা কল্পদ্রুমে'র প্রথমকাণ্ডের সূচনায় ইংরাজীতে যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আধুনিক য়ুরোপ, ইংলণ্ড, ভারত ও আমেরিকার ইতিহাস রচনা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রাচীন মিশর

ও রোম ব্যতীত আধুনিক ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ পান নাই। তিনি যদি আধুনিক ইতিহাস, বিশেষতঃ আধুনিক ভারত-ইতিহাসের খসড়া প্রণয়নে প্রস্তুত হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বাঙলার ইতিহাসের সার্থক বিবরণ পাওয়া যাইত। কারণ কৃষ্ণমোহন ঐতিহাসিক চেতনা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। ইতিহাস, কিংবদন্তী ও অতিরঞ্জনেব সংমিশ্রণে রচিত প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহাসিক গল্পকে যে প্রকৃত ইতিহাস বলা যায় না, তাহা তিনিও স্বীকার করিয়াছিলেন :

"আমাদের ঘোর দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অর্থাৎ পুরাণ ইতিহাসাদি গ্রন্থ সকলি উক্ত হোমরের ইলিয়দের ন্যায় কবিতাতে রচিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের বিবরণে অনেক প্রকার সন্দেহ জন্মে।"—বিদ্যা কল্পদ্রুম, ১ম খণ্ড, সূচনা,৩৩ পৃ

আধুনিক ঐতিহাসিক পদ্ধতি সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহন যে সচেতন ছিলেন, এই উক্তি হইতেই তাহা অনুমিত হইতেছে।

শুধু কৃষ্ণমোহন নহেন, তৎকালীন অন্যান্য লেখকও বিদেশী ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর দত্তের 'সাহনামা' (১৮৪৭), গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাকের দ্বারা পদ্যে অনূদিত 'পারস্য ইতিহাস' (১৮৪৮), ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রীকদেশীয় ইতিহাস' (১৮৩৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্কুলবুক সোসাইটী প্রকাশিত 'ইতিহাস সার' (১৮৫৩) গ্রন্থেও ভারতের বাহিরের ইতিহাসের উল্লেখ রহিয়াছে। অবশ্য 'পাবস্য ইতিহাস' শ্রেণীর গ্রন্থের নাম সম্পর্কে ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে। আরবী ফারসী গল্পের সহিত কিছু কিছু ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা বা চরিত্রের উল্লেখ করিয়া ঐ জাতীয় রূপকথা-ধর্মী রচনাগুলি অনূদিত হইয়া কখনও বা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া প্রকাশিত হইত। উহাদিগকে আরব্য উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা কর্তব্য। কৃষ্ণমোহনের রোম ও মিশরের ইতিহাসের মধ্যেই কেবল যথার্থ ইতিহাসের পরিচয় আছে। অবশ্য রেভাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানতঃ ইউট্রোপিয়সের রোমীয় ইতিহাসকেই একপ্রকার অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি : "Freely translated from Eutropious and interspersed with additional matter from various sources."

এই সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে গ্রীস ও রোমের ইতিহাসের অন্তর্গত বীরপুরুষদের কাহিনী গল্পের আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা এইটুকু স্পষ্ট

হইতেছে যে, ১৯শ শতকের প্রথমার্ধে য়ুরোপের সহিত পরিচয় স্থাপনের পর বাঙালী প্রতীচ্য দেশকে জানিবার আগ্রহে ঐ দেশীয় গ্রন্থাদি অনুবাদ বা পাঠে অগ্রসর হয়। এই সময় হইতে জাতির মানসিক ভূগোলের সীমা বর্ধিত হইল, বিশ্ব সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত হইল, ভাবনা চিন্তার বলয়রেখা ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতে লাগিল। যে দেশের সঙ্গে বাঙালীর কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না, তাহার প্রতি সে যুগের লেখক ও পাঠকদের কৌতূহল সঞ্চারিত হইল। অবশ্য অধিকাংশ স্থলে ইংরাজী গ্রন্থের সহায়তায় বা অনুবাদের সাহায্যে এই বাংলা গ্রন্থসমূহে বিদেশী ইতিহাসের ঘটনাকে সংক্ষেপে বিবৃত করা হইত।

মার্শম্যান-কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস ও বাঙলা দেশের ইতিহাস দীর্ঘকাল বাঙলাদেশে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থরূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে [illegible]র ইতিহাস সম্বন্ধেও অনেকে কৌতূহলী হইলেন। কেহ অনুবাদ, কেহ বা [illegible] গ্রন্থের সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে [illegible]। নীলমণি বসাক ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আবির্ভাবের পূর্বে বিদেশের [illegible]পাঠ করিয়া বাঙালীকে ইতিহাস পাঠের স্পৃহা মিটাইতে হইত। নিম্নে এইরূপ [illegible]য়েকখানি পুস্তকের নামোল্লেখ করা যাইতেছে :—

১। ফেলিক্স্ কেরী—ব্রিটন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় (১৮১৯)। ডাঃ গোল্ড স্মিথ রচিত *An Abridgement of the History of England*-এর অনুবাদ।

২। জন ক্লার্ক মার্শম্যান—পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ—অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি খৃষ্টীয়ান শকের আরম্ভ পর্যন্ত (১৮৩৩)। ইহা 'ইতিবৃত্ত সার' নামেও পরিচিত।

৩। জন ডি. পীয়ার্সন—প্রাচীন ইতিহাসের সমুচ্চয় (১৮৩০)। ইহার ইংরাজী অংশ পিয়ার্সনের রচনা। বাংলা অংশ কাহার অনুবাদ, জানা যাইতেছে না। ইহার অধ্যায় ভাগ—(ক) প্রথম ভাগ—মিশর দেশীয় লোকের বিবরণ, (খ) দ্বিতীয় ভাগ—আশর ও বাবেল রাজ্যের বিবরণ, (গ) তৃতীয় ভাগ—মীড ও পারসী লোকের বিবরণ, (ঘ) চতুর্থ ভাগ—গ্রীক লোকের বিবরণ, (ঙ) পঞ্চম ভাগ—রুমরাজ্যের বিবরণ।

৪। স্কুলবুক সোসাইটী প্রকাশিত—সত্য ইতিহাস সার (১৮৫৩) গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাসের কয়েকজন বীরপুরুষের গল্প।

৫। ঐ সোসাইটী প্রকাশিত ও ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত—গ্রীকদেশের ইতিহাস (১৮৩৩)। ডাঃ গোল্ড্স্মিথের গ্রন্থের অনুবাদ।

উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থ ইংরাজী হইতে অনূদিত এবং বালপাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থকারগণ বাঙালী ছাত্রদিগকে বিদেশের, বিশেষতঃ গ্রীস ও রোমের ইতিহাস সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অবহিত কবিবার জন্য ডাঃ গোল্ড্স্মিথ এবং অন্যান্য ইংরাজ লেখকের ইতিহাসগ্রন্থ অবলম্বনে গ্রীস, রোম ও ব্রিটেনের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের অনূদিত 'গ্রীকদেশেব ইতিহাস' (১৮৩৩) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ লেখক বাঙালী ছিলেন বলিয়া ডাঃ গোল্ড্স্মিথেব গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে স্বতঃস্ফূর্ত সরলতা প্রায় সর্বত্র রক্ষা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে ভাষা এত স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে যে গ্রন্থটিকে মৌলিক বলিয়া মনে হয়। মার্শম্যানের 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ' একই বৎসবে (১৮৩৩) প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাহা হইতে, ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায়—"কেবল সাহেব-সাহেব গন্ধ নির্গত হয়।" অবশ্য ক্ষেত্রমোহন প্রধানতঃ কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীব নির্দেশে এই অনুবাদ কার্যে অগ্রসব হন বলিয়া ভূমিকায় ভারতীয় ও য়ুবোপীয় ইতিহাস বচনাব মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"এতদ্দেশে যে ২ প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ আছে, তাহাতে গ্রন্থকর্তারা অনেক অসম্ভব বর্ণনা করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত সমূলক ইতিহাস প্রায় পাওয়া যায় না, সুতরাং সত্য ইতিহাস পাঠে লোকেদের যে অশেষ উপকার হইতে পারে তাহা এতদ্দেশীয়দের প্রায় হয় না।"

প্রথম যুগে য়ুরোপীয় ইতিহাসের সন তারিখের যাথার্থ্য দেখিয়া স্বদেশের কিংবদন্তীমূলক ইতিকথা সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই কথাই জাগিয়াছিল। তখন তাঁহারা মনে করিতেন, ভারতের ইতিহাস কল্পনা ও অবিশ্বাস্য ঘটনার দ্বারা ভারাক্রান্ত; সেই সমস্ত জঞ্জাল হইতে সত্য ঘটনা উদ্ধার করা অতিশয় দুরূহ। তাই গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডেব প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর কৌতূহল সঞ্চারিত হয়। বাঙালীর জগৎ-প্রতীতির ভৌগোলিক বন্ধন ঘুচিতেছে, তাহা এই ক্ষুদ্র অনুবাদ গ্রন্থগুলির হিসাব লইলেই বুঝা যাইবে।

বাঙালীর নিজস্ব ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালী লেখকগণ বহুদিন নীরব ছিলেন। মার্শম্যান সাহেবের গ্রন্থই ছিল তখন একমাত্র দেশীয় ইতিহাস এবং তাহার বঙ্গানুবাদ

প্রায় সমস্ত স্কুলের পাঠ্য পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাঙালী লেখক স্বদেশীয় ইতিহাস সম্বন্ধে যে একেবারেই উদাসীন ছিলেন, তাহা মনে হয় না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পর্বে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী' প্রভৃতিতে সর্বপ্রথম বাঙালীর ইতিহাস চেতনার স্পষ্ট ছায়া লক্ষ্য করা যাইবে। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত অধিকাংশ ইতিহাস মিশনারী সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে রচিত অথবা অনূদিত, তাঁহারা য়ুরোপ ও ইংলণ্ডের ইতিহাসের উপর গুরুত্ব দিবেন—ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বিদ্যা কল্পদ্রুম' নামক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে রোম ও মিশরের ইতিহাস লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, ভারত বা বাঙলার ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ পান নাই। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তিনি ভারতের ইতিহাসের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে চাহিয়াছিলেন; ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় মিশনারীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিয়াছেন:

"এতদ্দেশীয় লোকেরা বিবেচনা না করিয়া প্রাচীন কথাতে এমত অসঙ্গত শ্রদ্ধা করে যে, কোন প্রসিদ্ধ ঋষির বাক্যানুযায়ী না হইলে নূতন মত কিম্বা বচন তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য করে এবং পুরাবৃত্ত ও কল্পিত গল্প সত্য ও অসত্য বর্ণনা সকলি এক পদার্থ জ্ঞান করে...।"৩

এই সময়ে ফারসী ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে বিশ্বেশ্বর দত্তের 'সাহানামা' (১৮৪৭) এবং গিরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাকের পদ্যে অনূদিত 'পারস্য ইতিহাস' (১৮৪৮) প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য ইহাতে ইতিহাসের অংশ যৎসামান্য, ইসলামী গল্পরসের আকর্ষণেই সে যুগের লেখক ও পাঠক আরব্য উপন্যাসের অনুরূপ কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন; তাই ইহাদিগকে কদাচিৎ ইতিহাস বলা যায়।

১৯শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে স্কুলবুক সোসাইটী, ভার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটী, বেঙ্গল ফ্যামিলী লাইব্রেরী (গার্হস্থ্য পুস্তক ভাণ্ডার) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ঐতিহাসিক চরিত্রবিষয়ক কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তিকা রচিত হয়। নিম্নে এইরূপ কয়েকখানির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে:—

১। অদ্ভুত ইতিহাস—(১৮৫৭) তৈমুরলঙ্গের বৃত্তান্ত—পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

২। লর্ড ক্লাইব, (১৮৫২),—মেকলে প্রণীত ***Life of Lord Clive*** অবলম্বনে হরচন্দ্র দত্ত অনূদিত।

৩। অদ্ভুত ইতিহাস—সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়, (১৮৫৭), কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী প্রকাশিত।

৪। জঙ্গিস খাঁর বৃত্তান্ত—(১৮৫৭), স্কুলবুক সোসাইটী প্রকাশিত।

৫। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, (১৮৫৩)—হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার। রামরাম বসুর গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত।

৬। নুরজাহান রাজ্ঞীর জীবনচরিত (১৮৫৮),—মধুসূদন মুখোপাধ্যায় অনূদিত।

৭। শিবাজীর চরিত্র,—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত; ১৮৬০ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত, কিন্তু 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' পূর্বেই মুদ্রিত।

উল্লিখিত পুস্তক-পুস্তিকাগুলির সাহিত্যধর্ম বিচার্য নহে; কারণ তাহাদের সেরূপ কোন লোকলোভন ভূমিকাও ছিল না। বালকদের শিক্ষাদানের জন্যই এই পুস্তকগুলি রচিত অথবা অনূদিত হইয়াছিল। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর অন্যতম প্রধান লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সরল বাংলায় এই জাতীয় পুস্তক রচনা করিয়া যেমন একদিকে তৎকালীন পাঠশালা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ ইতিহাসের প্রতি, বিশেষতঃ স্বদেশীয় ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। স্বাদেশিক ইতিহাস-চেতনা বাঙালীর প্রাণজাগৃতির প্রাথমিক পরিচয় বহন করিতেছে। শুধু গ্রীস, রোম, মিশর ও পারসিক ইতিহাস্ পাঠ করিয়া বাঙালী তৃপ্তি পাইতেছিল না। কৃষ্ণমোহন তাঁহার স্বদেশের মৃত্তিকা ও মানুষের প্রতি কৌতূহল সঞ্চারিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ প্রাচীন য়ুরোপ ও প্রাচীন মিশরের ইতিহাস লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিলেন; উপরন্তু আমাদের প্রাচীন ইতিহাসাশ্রিত কাব্য ও পুরাণকে তিনি ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাঁহার অনুমান, সংস্কৃতে লিখিত পুরাণ বা ইতিহাসাশ্রিত কাব্যে যেটুকু ইতিহাসের অস্তিত্ব আছে, তাহা অতিরঞ্জন-দোষ-দূষিত হইয়া ঐতিহাসিক সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছে।[৪] যাঁহারা স্কুলবুক সোসাইটী বা ভার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটীর মুখপাত্র হইয়া বাংলা গদ্যে গ্রন্থ

রচনা করিতেন, তাঁহাদের রচনা কিয়দংশে বিদেশীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত, উপরন্তু নিছক স্কুলপাঠ্য তালিকার সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যতীত এই পুস্তকগুলি ইতিহাস বা সাহিত্য কোন দিক দিয়াই উচ্চ মূল্য দাবী করিতে পারে না। উক্ত তালিকার মধ্যে একমাত্র হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (রামরাম বসুর গ্রন্থ অবলম্বনে) বাঙালী বীরের চরিতকথাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই গ্রন্থগুলির সারস্বত মূল্য যৎকিঞ্চিৎ হইলেও ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতেই বাঙালী বালক বালিকার চিত্ত আকৃষ্ট করিবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন আখ্যান-আখ্যায়িকা প্রকাশ করিতেছিলেন, ঠিক তেমনি বিষয়-গৌরবহীন এই ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি নবীন পাঠার্থীর মনে বাস্তব কৌতূহল সৃষ্টি করিতেছিল।

এই পর্বের মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলালই বাঙালীর চিত্তে যথাযথ ইতিহাস-চেতনার সঞ্চার করেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকাটি নানাদিক দিয়া ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালী-মানসের দিগ্‌দর্শনী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া রাজেন্দ্রলাল এই পত্রিকার সাহায্যে বাঙালী পাঠকের মনে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অপার বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত হোমাপক্ষী, টোকন পক্ষী, নেকড়িয়া বাঘ প্রভৃতি প্রবন্ধে জীবজন্তু পশুপক্ষীর সচিত্র বর্ণনা দিয়াছেন; আবার পৃথিবীর নানা বিষয়েও কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। কামস্কাট্‌কা এবং পারস্যদেশের ভৌগোলিক বিবরণও রাজেন্দ্রলালের লেখনী স্পর্শে রসবস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল যে ১৯শ শতাব্দীর প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ শুধু ভৌগোলিক ও জীববিজ্ঞানের প্রবন্ধের মধ্যেই নিহিত নাই। তিনিই সর্বপ্রথম পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া ভারত-ইতিহাস ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' সচিত্র শিল্প ইতিহাস (১৭৭৩ শক, ১ম খণ্ড), সচিত্র রাজপুত্র ইতিহাস, (রাজাবারা দেশের মানচিত্রসহ, ঐ, ২য় সংখ্যা), রাজা চন্দ্রগুপ্তের বিবরণ (ঐ, ২য় সংখ্যা,) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (৩য় সংখ্যা) প্রভৃতি বিষয়ে এমন সমস্ত ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাহাতে প্রধানতঃ ভারতীয় দৃষ্টিকোণ হইতেই ইতিহাস বিচার করা হইয়াছে। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ১৭৭৩ শক ৪র্থ সংখ্যায় অশোকের বিষয় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে রাজেন্দ্রলাল ব্রাহ্মী

অক্ষরের প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়া অশোক অনুশাসন ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী কালে এইরূপ কয়েকটি প্রবন্ধ তাঁহার দুইখানি পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছিল :—(ক) শিবাজীর চরিত্র—ইহা গার্হস্থ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় (১৮৬০)। (খ) মেবার রাজেতিবৃত্ত—বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় (১৮৬১)। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত "রাজপুত্র ইতিহাসে"র কিঞ্চিৎ বর্ধিত পুনর্মুদ্রণ।

ইতিপূর্বে য়ুরোপীয় লেখকগণ যে প্রকার ভারতীয় ইতিহাস রচনা করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে বিমাতাসুলভ মমতাহীন নিরুৎসুক দৃষ্টিভঙ্গীর নিষ্প্রাণতা অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু জাতির আত্মচেতনার মূলকথা যে ঐতিহাসিক আত্মবীক্ষণের মধ্যে নিহিত আছে, তাহা রাজেন্দ্রলাল শিখ ও রাজপুত জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান প্রসঙ্গে অনুধাবন করিয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দ হইতেই রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নিবন্ধগুলি ক্রমান্বয়ে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত হইতে থাকে। পরবর্তীকালে তিনি তাঁহার প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনায় যে নির্মোহ বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসান্ধৎসার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার প্রথম চিহ্ন এই আলোচনাগুলিতে দেখা যাইতেছে। মিল্ বা মার্শম্যান-খনিত পথ ত্যাগ করিয়া ইতিহাস রচনার যে পথে তিনি যাত্রা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্ব-খাত, এবং বাঙালীর আত্মসাক্ষাৎকারের প্রশস্ত পথের প্রান্তেই তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে।

রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক চেতনা একক ও নিঃসঙ্গ নহে, তাহার প্রমাণ মিলিল নীলমণি বসাকের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৫৭) প্রকাশিত হইলে। নীলমণি বসাকের উক্ত গ্রন্থ তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়: ১ম ভাগ—হিন্দুযুগ, ২য় ভাগ—মুসলমানদিগের রাজ্য ৩য় ভাগ—মোগল রাজদিগের রাজ্যকাল।[৫] আলোচ্য ইতিহাসখানি নানা দিক দিয়া বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং বাঙালীর ইতিহাস-সাহিত্যের অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃতির যোগ্য। রাজেন্দ্রলাল ইতিহাস রচনার যে মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া নীলমণি বসাক আবির্ভূত হইলেন। ইতিহাসের পটভূমিকায় বাঙালীর আত্মজাগরণ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এই ইতিহাসখানির মূল্য যে অসাধারণ, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যদিও স্কুলপাঠ্য পুস্তক হিসাবেই ইহা প্রচারিত হইয়াছিল, তবু ইতিহাসের তথ্যনির্ণয় ও সিদ্ধান্ত স্থাপনে

লেখক যে মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাকে বাঙালীর জাগ্রত মনোভাব-দ্যোতক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত গ্রন্থের প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে লেখক বলিতেছেন—

"এই দেশের যে পুরাবৃত্ত আছে, তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গালা ভাষাতে এরূ পুরাবৃত্ত প্রায় নাই। এই ভাষাতে যে দুই একখানা পুস্তক দেখা যায়, তাহা ইংরাজী হইতে ভাষান্তরিত, তাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং তাহা এমত নীরস যে, কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং পাঠ করিলেও তৃপ্তিবোধ হয় না। অধিকন্তু এই সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠের উপযোগী নহে, এই জন্য তাহা কোন পাঠশালাতে পঠিত হয় না, সুতরাং বালকেরা ভারতবর্ষের ভালমন্দ কিছুই জানিতে পারে না, এবং ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালকের এমত সংস্কার জন্মে যে এদেশের ধর্মকর্ম সকলি মিথ্যা, এবং হিন্দুরা পূর্বকালে অতি মূঢ় ছিলেন, অপর বালকেরা অন্য দেশের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে, কিন্তু জন্মভূমির কোন বিবরণ বলিতে পারে না"

প্রথমখণ্ডের বিজ্ঞাপনের এইটুকু পাঠ করিলেই লেখকের মনোভাব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ভারত-ইতিহাসকে যে পঠভূমিকায় স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন নীলমণি বসাকের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহা আভাসে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার উক্তি, "অপর বালকেরা অন্যদেশের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে, কিন্তু জন্মভূমির কোন বিবরণ বলিতে পারে না"—১৮৫৭ সালে ইহা বিস্ময়কর বৈকি। জন্মভূমির বিবরণ সংগ্রহের জন্য নীলমণি বসাক বহু তথ্য দিয়াছেন, কদাচিৎ কিংবদন্তীকেও ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সর্বদা ভারতীয় গৌরববোধের পটভূমিকায় ভারতীয় ইতিহাসকে উপস্থাপনা করিয়াছেন। বসাক মহাশয়ের এই গ্রন্থ রচনার প্রায় আঠার বৎসর পরে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,

"সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস নাই। গ্রীণলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি ছিল, যেখানে নৈষধচরিত গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথশিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই; মার্শম্যান ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি, সে কেবল সাধপূরণ মাত্র।"৬

রবীন্দ্রনাথ নীলমণি বসাকের বহু পরে ১৩০৯ সনের 'বঙ্গদর্শনে'র ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধে ঠিক অনুরূপ ভাবেই বলিয়াছেন,

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপেছেলেয়, ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায়, কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে—পাঠান মোগল পর্তুগীজ ফরাসী ইংরাজ—সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।"[৭]

১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা সাহিত্যে ও বঙ্গসংস্কৃতির দুই যুগন্ধর পুরুষের অন্তরে ভারতবর্ষ ও বাঙালীর ইতিহাস সম্পর্কে যে ভাবনা-চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাহার অনেক পূর্বেই নীলমণি বসাকের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থে সেই ইতিহাস ও স্বাজাত্যবোধ সংমিশ্রণে যথার্থ ইতিহাসচেতনার আবির্ভাব হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমানযুগের ধর্ম, কর্ম, শীল-সাধনা, বাস্তব-জীবন—এক কথায় ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ পরিচয়-মূলক এমন একখানি ইতিহাস যে ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহাই বিস্ময়াবহ ব্যাপার। আলোচ্য গ্রন্থটির সাহায্যে ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালী নিজ হারানো অতীত খুঁজিয়া পাইয়াছিল, বৃহদ্ ভারতবর্ষের সহিত যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল—এইজন্য আধুনিক কালের বাঙালীও নীলমণি বসাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন। ইহার ভাষা যেরূপ মার্জিত ও তীক্ষ্ণ এবং তথ্য সন্নিবেশে লেখক যে রূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এখনও প্রশংসনীয় বিবেচিত হইবে।

এই যুগে নিছক স্কুলপাঠ্য পুস্তকরূপে যে ইতিহাস গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়, তাহাদের অধিকাংশই ইংরাজ রচিত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ মাত্র। হরচন্দ্র দত্ত ১৮৫২ সনে ম্যাকলের *Life of Lord Clive* অবলম্বনে 'লর্ড ক্লাইব' প্রকাশ করেন। কেন তিনি বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

"It is impossible to extirpate a nation's own tongue, one that has identified itself, as it were, with the people. The voice of history confirms this fact. In England, Germany, Spain, Italy and India, strenuous but unsuccessful efforts were once made to effect this purpose ; but they failed. Again, the resources of the Bengali language are unbounded. It possesses great power and sweetness, and .the activity of the native press testifies to the fact, that it is favourite tongue of the great Mass of readers in the country. But much of the literature thus provided for the people is confessedly pernicious in its character. These and like consideration have induced the translator to take into hand the translation of Macau'ay's celebrated paper on Clive." (p. iv).

লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল সন্দেহ নাই এবং স্কুলপাঠ্য হিসাবে অনূদিত হইলেও ইতিহাস হিসাবে ইহার কিছু মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। তবে অনুবাদগ্রন্থ হিসাবেই ইহার যা কিছু গৌরব, ইহা তাঁহার মৌলিক রচনা নহে।

এই সময়ে ইতিহাস নামাঙ্কিত যে সমস্ত বালপাঠ্য পুস্তক-পুস্তিকা (যথা—স্কুলবুক সোসাইটী প্রকাশিত 'মনোরঞ্জনেতিহাস,' 'সত্য ইতিহাস সার,' 'গ্রীক দেশের ইতিহাস', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস—দুই বালম', বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত', 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়'[৮]) প্রকাশিত হয়, সেগুলির সাহিত্য-মূল্য বিচায নহে; ইহারা হয় ইংরাজীর অনুবাদ, আব না হয় ইংরাজী গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। যদিও গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর, তথাপি বাঙালী বালকের চিত্তে এই পুস্তকগুলির সাহায্যে দেশ ও কালের ইতিহাস নীহারিকাবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। গ্রীস রোমের ইতিহাস বাদ দিলেও ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্র ও কাহিনীব প্রতি বালক-বালিকার চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছিল, ইহাই এই পুস্তিকাগুলির একমাত্র কৃতিত্ব। অবশ্য নীলমণি বসাকের মত স্বাধীনভাবে জাতীয় গৌরবের পটভূমিকায় ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা এই গ্রন্থগুলিতে লক্ষ্য করা যায় না; কারণ এগুলি প্রধানতঃ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনূদিত হইয়া ইংরাজ প্রভাবান্বিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহাতে ভারতীয় ইতিহাসের বীরত্বব্যঞ্জক বা গৌরবোদ্দ্যোতক কাহিনীগুলি বিশেষ স্থান পায় নাই। তবে এইটুকু অবশ্য লক্ষণীয় যে, ভারতের ইতিহাসের প্রতি লেখকদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে ঐগুলিব প্রচার বৃদ্ধি পাইতেছিল। উনিশ শতকের আত্মচেতনা যে বাঙলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়াও স্ফুটতর হইতে চাহিয়াছিল—ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

ইতিপূর্বে আমরা যেরূপ ইতিহাস গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছি, ঠিক সেইরূপ ভূগোল গ্রন্থেরও উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম আত্মপরিচয়ের জন্য যেমন আত্মগৌরববোধক প্রাচীন ইতিহাস পাঠ প্রয়োজন, সেইরূপ দেশের মৃত্তিকার সহিত পরিচয় স্থাপনও অবশ্য কর্তব্য। বাঙলা দেশের ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও তাহার ঈষৎ পূর্ব হইতেই বালপাঠ্য ভূগোলগ্রন্থের সাড়া পড়িয়া যায়। শুধু দেশের মাটির পরিচয় নহে, বিদেশের বিচিত্র বর্ণনা পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেবল জম্বুদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, প্লক্ষ দ্বীপ প্রভৃতি কাল্পনিক দেশের বর্ণনাই নহে,—যে ভূগোল কঠিন ভূস্তরকে অবলম্বন করিয়াছে, সেই

মৃত্তিকালোকের ভূবৃত্তান্তের প্রতি আমাদের দেশের লেখকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রকেই এ বিষয়ে অগ্রণীর আসন দেওয়া যাইতে পারে। 'বিদ্যা কল্পদ্রুমে'র অষ্টম কাণ্ডে কৃষ্ণমোহন 'ভূগোল বৃত্তান্ত' প্রকাশ করেন। এশিয়া ও য়ুরোপের প্রামাণিক বৃত্তান্ত লইয়া রচিত এই 'ভূগোল বৃত্তান্ত'টি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। মরে সাহেবের Encyclopaedia of Geography, মলেট বার্ণ্-এর Geography—প্রভৃতি ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনেই কৃষ্ণমোহন এই ভূগোলটি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বাঙালীর চিত্তলোকের সঙ্কীর্ণতা যে এই সমস্ত ভূগোল গ্রন্থের দ্বারা কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী প্রকাশিত 'ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন' (প্রথম সং—১৮২৪, দ্বিতীয় সং—১৮২৭), অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভূগোল' (১৮৪১), পীয়ার্স-এর 'ভূগোল বৃত্তান্ত' (১৮৪১), গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'ভূগোলসার (১৮৫৩), তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভূগোল প্রবেশ', 'ভূগোল-বিন্যাসার', বামনারায়ণ বিদ্যারত্ন প্রণীত 'ভূগোল' (১৮৫৬), কালিদাস মৈত্র প্রণীত 'জিওগ্রাফী বা ভূগোল-বিজ্ঞাপক' (১৮৫৭), এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'প্রাকৃত ভূগোল' (১৮৫৪ সালে প্রকাশিত) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল ও অক্ষয়কুমারের ভূগোলগ্রন্থ দুইটি শুধু পাঠ্যপুস্তকরূপেই আদৃত হয় নাই, ইহাদের মধ্য দিয়া বাঙালী সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার নূতন পরিচয় পাইল, বিচিত্র জগৎ সম্বন্ধে অবহিত হইল এবং ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বৃহদ্ বিশ্বের সহিত আপন আপন ভৌগোলিক সংস্থানের যোগসূত্রটি আবিষ্কার করিতে পারিল। অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ধারাবাহিক ভাবে বিশ্বের ভৌগোলিক বিষয় উদ্ঘাটিত করিয়া বাঙালীর মনোজীবনের কূপমণ্ডূকতা অনেক পরিমাণে বিদূরিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলিকে আমরা সারস্বত তীর্থে স্থান দিতে চাহিনা বটে, কিন্তু তরুণমতি বালক-বালিকাগণ ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই, বাঙলাদেশের বাহিরে যে বৃহত্তর বিশ্ব রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়াছিল এবং ইহাতে তাহাদের মনের ভৌগোলিক চেতনা সম্প্রসারিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

॥ ২ ॥

নানাবিধ তত্ত্বমূলক আলোচনা

১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক বহু স্কুলপাঠ্য পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, যাহারা হয়তো সাহিত্যিক মূল্য দাবী করিতে পারে না। তবে বাঙালীর প্রথম আত্মবীক্ষার যুগে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক এই গ্রন্থগুলির মূল্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যাইতেছে :

১। মার্শম্যান—জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় (১৮১৯)

২। ফেলিকস্ কেরী—বিদ্যাহারাবলি (১৮২১-২২)

—পীয়ার্সন সম্পাদিত সংস্করণ—(১৮৩৪)

—ওয়েঙ্গার সম্পাদিত সংস্করণ—(১৮৫২)

৩। পীয়ার্সন—ভূগোল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন (১৯২৪)

৪। ইয়েট্স্—পদার্থবিদ্যা (১৮২৪)

৫। ঐ —পদার্থবিদ্যাসার (১৮২৫)

৬। ম্যাক্—কিমিয়া বিদ্যাসার (১৮৩৪)

উল্লিখিত পুস্তিকাগুলি ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে রচিত এবং শ্রীরামপুরের মিশনারীগণই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। য়ুরোপীয় লেখকগণ বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে গিয়া বিজ্ঞান বিষয়ক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পারিভাষিক শব্দের জটিলতার জন্য বক্তব্য বিষয়কে কোথাও হৃদ্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই। ফেলিক্স কেরীর 'বিদ্যাহারাবলি' হইতে একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

"অপর ঐ গলাগ্রকাকুদের লুণ্ঠমান পর্দার উভয় পার্শ্বেস্থিত অতি বৃহদ্ গুটিকা নামে মাংস গ্রন্থিদ্বয়েতে সর্বদা আর্দ্রভাবে থাকে ঐ মাংসগ্রন্থিদ্বয় বাদাম বীজাকৃতি প্রযুক্ত কোনো২ ব্যবচ্ছেদকেরা তাহারদিগের বাদাম গুটিকা সংজ্ঞা করিয়াছেন।"

জন ম্যাকের 'কিমিয়া বিদ্যাসার' হইতে একটু উদাহরণ—

"হৈদ্রজানের দ্বিতীযাক্সিদ। সামুদ্রিক অম্লবিশিষ্ট জলের মধ্যে বারিসের পারমাক্সিদ রাখা গেলে তাহা কতক অক্সিজান হারাইয়া অক্সিদ হয় এবং তদাবস্থাতে উক্ত অম্লেতে লীন হয় এবং উপযুক্ত উপায় উপস্থিত হইলে ঐ হারান অক্সিজেন জলের হৈদ্রজানেতে লীন হইলে তাহাতে জলের দ্বিতীয়াক্সিদ জন্মে।"

প্রকাশভঙ্গিমার জড়তা ও পরিভাষাগত অনভ্যস্ততার জন্য ফেলিক্স্ কেরী ও জন ম্যাকের সাধু প্রচেষ্টাও আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়। মিশনারী-প্রভাবান্বিত বালক-বালিকা বিদ্যালয় ভিন্ন সাধারণের মধ্যে দুরূহ ভাষায় রচিত এই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলির বিশেষ প্রচার ছিল না। তবে ইহার কিছু পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহার মূল্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রবন্ধগুলি পরে গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'শিল্পিক দর্শন' (১৮৬০) নামে মুদ্রিত হয়। ঢাকাই বস্ত্র, চর্ম পরিষ্কার করণের প্রথা, রেশম, কাগজ, লবণ, নীল, তামাক, লৌহ প্রভৃতি বিভিন্ন কৃষি ও শিল্পজাত-খনিজদ্রব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ ১৭৭৩ শকাব্দের চৈত্রমাস হইতে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত হইতে থাকে। 'শিল্পিক দর্শনে 'রাজেন্দ্রলাল শুধু বাঙলার শিল্পজাত দ্রব্যের সচিত্র বর্ণনা দেন নাই, বাঙলার শিল্প বাণিজ্যের অবনতির কারণও নির্দেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থটি পাঠ কবিলে দেখা যাইবে যে, রাজেন্দ্রলালের চিত্তে বাঙালী জাতির শিল্পগত অবনতির আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল।

ভার্ণাকুলার লিটারেচব সোসাইটী প্রকাশিত 'জীবরহস্য' (১ম ও ২য়) স্কুলবুক সোসাইটী প্রকাশিত 'পক্ষীর বিবরণ', 'জ্যোতির্বিদ্যা' প্রভৃতি বালপাঠ্য পুস্তক এবং ল'সন সম্পাদিত 'পশ্বাবলী' পুস্তকগুলিব শুধু নামোল্লেখ করা যাইতেছে। বিস্তারিত পরিচয় উপস্থিত প্রসঙ্গে অবান্তর। বালক-বালিকাদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য সরল বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তিকাগুলি বচিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষানুবাদ প্রচাব সমিতি, স্কুলবুক সোসাইটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে এই জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে বালক-বালিকাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জ্ঞানবৃদ্ধির প্রচেষ্টা অনেকটা সার্থক হইয়াছিল। তবে এগুলি নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের বচনা এবং বয়স্ক-মনে ইহাদের প্রভাব কতটুকু সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহাও বিবেচ্য।

একদিকে যেমন শিক্ষাবিষয়ক জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তিকাগুলি বালক বালিকাদের মনে জগৎ ও জীবনরহস্য সম্বন্ধে কৌতূহল সঞ্চারিত করিতেছিল, ঠিক তেমনি ধর্মান্দোলন লইয়াও কিছু কিছু পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া বাঙালীর সমাজ-সত্তাটিকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। নীলরত্ন হালদারেব 'সর্বামোদ তরঙ্গিণী' (১২৫৮), কৃষ্ণচৈতন্য বসুর 'জ্ঞানরত্নাকর' (১৮৫৮), শ্যামানাথ শর্মার 'চারু মীমাংসা' (১৮৫১-৫২), নারায়ণ চট্টরাজের 'কলিকুতূহলা' (১৮৫৩) এবং বীরভদ্র গোস্বামী রচিত ও কানাইলাল শীল প্রকাশিত 'বৃহৎ পাষণ্ডদলন' (১৭৭৭

শক) নামক ধর্মকলহাকীর্ণ পুস্তিকাগুলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাম-মোহনের তিরোধানের পর দীর্ঘকাল ধরিয়া একেশ্বরবাদী ব্রহ্ম সভার কোন ক্রিয়াকলাপ ছিল না, ফলে তাহার বিরোধী রক্ষণশীল হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণও কিছু স্তিমিতবেগ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যখন আবার নবোদ্যমে বেদান্তাশ্রিত ব্রহ্ম-প্রতিপাদক ধর্মপ্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন, তখন আবার বাঙালী হিন্দুর ধর্ম সচেতন অনুভূতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল।

নীলরত্ন হালদারের 'সর্বামোদতরঙ্গিণী' (১২৫৮) সমকালীন ধর্মান্দোলনের সমস্ত উত্তাপটুকু বহন করিতেছে। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, "ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান এই চারি জাতির স্ব স্ব ধর্ম বিচারছলে সর্বধর্মের মর্ম এক পরমেশ্বরোপাসনা ইহাই শাস্ত্রোক্তি ও সদযুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইল।" লেখক সরল পয়ারে ধর্মসম্প্রদায়ের যে কৌতূহলজনক বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে সামান্য উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যাইতেছে :

হিন্দুর আকৃতি ও ধর্মবিকৃতি

গলায় মালিকা শিখা মাথায়।
ললাট ফলকে তিলক তায়॥
ত্রিকচ্ছ বিধানে বসন পরে।
উত্তরিয় বস্ত্র অঙ্গেতে ধরে॥
মনুর ধর্মোক্ত নাম মানব।
শ্রুতিস্মৃতি মতে বিধান সব॥

খৃষ্টান আকৃতি ও ধর্মবিকৃতি

মাথায় টুপী পায়েতে বুট।
মুখেতে সদাই শোভে চুরুট॥
কাটাচুল কাটা কুর্তিপরা।
করেতে আবার বেত্র ধরা॥
রবিবারে যারা গির্জায় যান।
তাঁরাই খৃষ্ট মতে খৃষ্টান॥

নাস্তিক

নহে তো হিন্দু নহে যবন।
ইহুদীও নহে দেখি কেমন॥
না ভজে খৃষ্ট না ভজে গুরু।
আপনি বাঞ্ছা কল্পতরু॥

না মানে ধর্ম স্বেচ্ছাচারী।
বিকৃত বসন ভূষণ ধারী॥
তাহারা নামেতে হয় নাস্তিক।
দেখিলে ডরায় যত আস্তিক॥

লেখকের রচনার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিহাসের অবকাশ থাকিলেও তিনি যে দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ উক্ত পুস্তকেই রহিয়াছে। তিনি সর্বধর্মের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত যেমন দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি 'বঙ্গদূত' সম্পাদক নীলরত্ন হালদারও ১৮৫১ সালে এই গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া সর্ব-ধর্মের সমন্বয়ই সমস্ত ধর্মের মূলকথা—ব্রহ্মবাদ, এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত কৃষ্ণচৈতন্য বসুর 'জ্ঞানরত্নাকরে' ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রহ্মবাদের বিস্তারিত পরিচয় রহিয়াছে। একদিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হইতেছিল, সর্বধর্মের মূলীভূত প্রেরণা ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা চলিতেছিল এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল, ঠিক তেমনি আবার অপর-দিকে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে কটু ভাষায় আক্রমণ করাও হইতেছিল। নারায়ণ চট্টরাজ ১২৬০ সালে 'কলিকুতূহল' নামক পুস্তিকায় "বর্তমান কলিযুগের প্রারম্ভাবধি অদ্য পর্যন্ত লোক সকলের যেরূপ আচার ব্যবহার হইয়াছে তাহা সংশোধনার্থ পরিহাসচ্ছলে অনুবাদ পুরঃসর" আদিরসাত্মক অতিরঞ্জনের সহিত নানা কাহিনী সালঙ্কারে ব্যাখ্যা করেন। এই পুস্তিকায় বৌদ্ধ, কৌলধর্মাবলম্বী তান্ত্রিক, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতিকে অতি কঠোর ভাষায় আক্রমণ করা হইয়াছে। মাঝে মাঝে বক্তব্য অতিশয় গ্রাম্য ইতরতার পঙ্ককুণ্ডে পতিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের কিছু পূর্বে হইতেই যে, একটা যুক্তিপূর্ণ ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার প্রতি শিক্ষিত জনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছিল, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে বেণীমাধব ঘোষ সংগৃহীত ১৭৭৮ শকাব্দে প্রকাশিত 'জ্ঞানচন্দ্রাংশু' নামক পুস্তিকায়। ইহাতে একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক উপনিষদ, তন্ত্র ও গীতা হইতে প্রচুর শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বেদের কর্মকাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ডের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে; ইহাতেও ব্রাহ্মসমাজ ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাওয়া যাইতেছে।

এই সময়ে ধর্মান্দোলন লইয়া যে দুইটি পরস্পরবিরোধী মতের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। একদিকে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব, আর একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল 'ধর্মসভা' ও ভবানীচরণ-রাধাকান্ত দেববাহাদুরের দল। এই কলহ-সমুদ্র মন্থনে বিষের অংশ ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মতত্ত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের ভাগ্যেই জুটিয়াছিল সর্বাধিক। তথাপি ইহা ক্রমেই স্পষ্ট হইতে লাগিল যে, ধর্মান্দোলনে ঔপনিষদিক তত্ত্ব, ব্রহ্মবাদ ও বেদের জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছিল।

একদিকে যেমন ধর্মকলহ অবলম্বনে ক্ষুদ্রবৃহৎ পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশিত হইতেছিল, তেমনি আবাব সমাজ-সংস্কারেও সাহিত্যের আহ্বান আসিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে অসংখ্য পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল।[৯] আবার নারীশিক্ষা লইয়াও কিছু কিছু পুস্তিকা প্রকাশিত হইতেছিল। ১৮৫৭ সালে দ্বারকানাথ রায়ের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধান' প্রকাশিত হয়। ১৯শ শতাব্দীব মধ্যভাগে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে কতদূর সচেতন হইয়াছিলেন তাহা এই পুস্তিকাটি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। ইহার পূর্বে স্ত্রীশিক্ষাব পক্ষে এমন প্রবল যুক্তি একমাত্র মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'য় একবার উত্থাপন করিয়াছিলেন।[১০] দ্বারকানাথ বোধ হয় এই গ্রন্থ রচনায় বিদ্যাসাগরের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটুকু উল্লেখযোগ্য :

> "হা বঙ্গদেশীয় বন্ধুগণ! তোমরা আর কতকাল দেশাচারের দাস হইয়া মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিবে। একবার এ অকিঞ্চনের অনুরোধে চৈতন্যচক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ। তোমাদিগের জননী জন্মভূমি অবলাজাতির অজ্ঞানতারূপ প্রচণ্ড অনলে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। দারুণ দেশাচার কি তোমাদের এতই প্রিয়তম যে, সর্বনাশ হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না?"[১১]

বিদ্যাসাগবেব রচনারীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব এখানে স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। দেশাচারের বিরুদ্ধে লেখকের এই অস্ত্রধারণ—বিদ্যাসাগরকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই জনচিত্ত যে নবজীবনোল্লাসে সচকিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাঙালীর সমাজসত্তা ও মানবধর্মকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছিলেন। ফলে একদিকে যেমন সমাজসংস্কারক, বিশেষতঃ দেশাচারের বিরুদ্ধে

একদল সমাজসেবী যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ঠিক তেমনি নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ-নিবন্ধের প্রতিও লেখক ও পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলালই সর্বপ্রথম মননশীল নিবন্ধ রচনার প্রশংসনীয় আদর্শ স্থাপন করেন। অবশ্য তাঁহার কিছু পূর্বে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যা-কল্পদ্রুমের' মধ্যে চিন্তাভূয়িষ্ঠ 'প্রবন্ধ রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উৎকট ভাষার জন্য তাহা স্কুলপাঠ্য গ্রন্থরূপেই সমাদৃত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক নানা আলোচনা প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল মুখ্যতঃ বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের উদ্যোগে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে বয়স্ক মনের উপযোগী বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাস বিষয়ে যে সমস্ত সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহার সহিত পরবর্তী 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার তুলনা চলিতে পারে। অবশ্য 'বঙ্গদর্শন' আরও পরিণত মনের চিন্তা-প্রসূত প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পত্র এবং নব্য বাঙলার বাণীবাহক। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকাকে অতটা গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কিন্তু একদিক দিয়া রাজেন্দ্রলাল এই পত্রিকাকে স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সাহিত্য-বিচারের প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত বটে, কিন্তু সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যবিচারের প্রথম সূচনা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' ১৮৫৩ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাহার ঠিক দুই বৎসর পূর্বে ১৮৫১ সাল হইতে রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কয়েকটি সমালোচনার উল্লেখ করা যাইতেছে :

১। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও কাব্য-পরিচয় (১৭৭৩ শকাব্দ, ৫ম সংখ্যা)।

২। শকুন্তলা নাটকের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত, (১৭৭৪ শক, ১৩শ খণ্ড)

৩। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের মর্ম, (১৭৭৪ শক, ১৫শ খণ্ড)

৪। কাদম্বরী গ্রন্থের সার সংগ্রহ, (১৭৭৪ শক, ১৬শ খণ্ড)

৫। রত্নাবলীর নাটকের সংক্ষেপ ইতিহাস, ঐ

৬। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনা, (১৭৭৫ শক, ভাদ্র)

৭। কাদম্বরী গ্রন্থের সার সংগ্রহ, ঐ

৮। কাদম্বরী গ্রন্থের সার সংগ্রহ, (১৭৭৫ শক, আশ্বিন)

এই প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইলে দেখা যাইবে রাজেন্দ্রলাল বিদ্যাসাগরের কিছু পূর্বেই সংস্কৃত সাহিত্যের যথাযথ মূল্য বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদিকে য়ুরোপীয় রীতিতে কবি-মানস বিশ্লেষণের চেষ্টা, অপরদিকে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত—বাংলা সাহিত্যের উভয় প্রকার আলোচনা-পদ্ধতিই রাজেন্দ্রলালের আবিষ্কার। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাজেন্দ্রলাল বাঙালীর আত্মপরিচয়ের নূতন পথ খনন করিয়া দিয়াছিলেন। উত্তরকালে তিনি প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন; তাহাতে ভারতের বৌদ্ধযুগ আলোকিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি সাহিত্য সমালোচনার যে নূতন আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা মধ্যপথেই ক্ষান্ত হয়। কেবল রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে' সেই ধারার প্রবহমানতা কিয়দংশে রক্ষা করেন।

এই যুগের চিন্তামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের পরিচয় লইলে দেখা যাইবে যে, বাঙালী জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার নূতন পথ অনুসন্ধান করিতেছিল। তখনও সামাজিক আদর্শ ও ভাববিপ্লব বাঙলার মানস-দিগন্তকে নূতন প্রত্যাশার আলোকে আলোকিত করিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগরও প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শকে আধুনিক ভারতের জীবন ও জীবিকার একমাত্র নিদান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। তিনিও শিক্ষার আদর্শ ও জীবন-প্রণালীকে বিচার করিয়াছিলেন। কিয়দংশে জ্ঞানবাদী য়ুরোপের ভাবধারার দ্বারা য়ূরোপীয় জীবন-ধারার সহিত ভারতীয় জীবনাদর্শের সুষ্ঠু সমন্বয় করিয়া বাঙালীর সমাজ-জীবনের স্থিতধী মূর্তি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তাহা ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে আরব্ধ হয় নাই। ১৮৫৬ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব' নামক যে ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি রচনা করিয়াছিলেন, নানা দিক দিয়া তাহাকে সমকালীন মননশীল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মারক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া ভূদেব তৎকালীন শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, যাঁহাদের হস্তে বালক-বালিকার প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের শিক্ষাদানের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। কাজেই শিক্ষা ক্রমশঃ কুশিক্ষার অতলস্পর্শী গভীরে তলাইয়া যাইতেছে। তাহারই প্রতিবিধান কল্পে তিনি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি রচনা করেন। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "পুস্তকখানি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, অতএব ইহাতে শিক্ষাশাস্ত্রের প্রথম প্রস্তাবনা মাত্রই হইতে পারে।" তাঁহার এই উক্তি অতিশয় যথার্থ। পাঠশালার গুরুমহাশয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বল্পশিক্ষিত শিক্ষক সম্প্রদায়ের জন্য এই পুস্তিকা রচিত হইলেও বাঙালীর শিক্ষাসঙ্কট সম্বন্ধে তিনি যে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভূমিকাতেই তিনি পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন :

"এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বঙ্গীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। ইহার প্রথমে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষকবর্গের কর্ত্তব্যতা তথা কি প্রকার শিক্ষা এই ক্ষণে এতদ্দেশীয় বালকদিগের প্রতি বিহিত হয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আছে।"

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বেই কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী, কলিকাতা স্কুল সোসাইটী, হিন্দুকলেজের পাঠশালা বিভাগ প্রভৃতির চেষ্টায় বালক বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পাঠশালার উপযোগী কিছু কিছু পুস্তকও মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষাদানের ভার অর্পিত হইয়াছিল জীবন ও জীবিকায় ব্যর্থকাম কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ গুরুমহাশয়দের উপর। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উপাদানগত প্রাচুর্য সত্ত্বেও অপাত্রে শিক্ষাভার অর্পিত হওয়ায় শিক্ষা খঞ্জত্বের অভিশাপ বহন করিয়া চলিতেছিল। ভূদেব এই সমস্যাটির যথাযথ মূল্য নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন :

"বহুকালাবধি ভিন্নজাতীয় রাজাদিগের এতদ্দেশীয় বিদ্যার প্রতি বিরাগ থাকাতে ঐ সকল বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা-কার্য অতি অকর্মণ্য লোকদের হস্তগত হইয়াছে। পদার্থবিদ্যা দর্শনবিদ্যা প্রভৃতি প্রধান বিদ্যার কথা দূরে থাকুক, উহারা মাতৃজাতির বঙ্গভাষা শিক্ষা করাইতেও অক্ষম, আর তাঁহারা যে অঙ্কবিদ্যার গৌরব করিয়া থাকেন, তাহাও কদাচিৎ কড়িকষার উর্ধ্বে উঠে না। কোন দরিদ্র কায়স্থ সন্তান মুহুরিগিরি গোমস্তাগিরি প্রভৃতি সর্বকার্য অশক্ত হইলেও পরিশেষে একটি পাঠশালা খুলিয়া গুরুমহাশয় হইয়া বসেন। কে না জানেন যে, দীনহীন ব্রাহ্মণ কুমারদিগের যজমান যাজন প্রভৃতি জীবনোপায় কোথাও কিছু না জুটিলেই অবশেষে তাঁহারা গুরু মহাশয়ের বৃত্তি অবলম্বন করেন?"[১২]

উল্লিখিত অংশে ভূদেব প্রাথমিক শিক্ষার ত্রুটিটুকু সংক্ষেপে কিন্তু স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য গ্রন্থাদি নির্বাচন ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া মহত্তর কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষালয়ের শিক্ষক-নিয়োগ সমস্যাটিকে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিবার অবকাশ পান নাই। ভূদেব কিন্তু শিক্ষাসমস্যার গভীর কেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তিকায় তিনি য়ুরোপীয় ও ভারতীয় জীবনধারা ও শিক্ষাপ্রণালীর বৈষম্য সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতা প্রতিফলিত হইয়াছে। একটু উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে :

"এতদ্দেশীয় লোক স্বভাবতঃই তীক্ষ্ণবুদ্ধি। ইঁহারা অনায়াসেই পরচিত্তজ্ঞ হইতে পারেন। ইংরাজ, মুসলমান এবং হিন্দু এই তিনি জাতীয় বালকের মধ্যে হিন্দুজাতীয় শিশুদিগকে দর্শন-শাস্ত্রের তথ্য স্বল্পতর প্রযত্নে বুঝাইতে পারা যায়। অস্মদ্দেশীয় লোকেরা নির্ণীতন্যায়, এবং বেদান্ত দর্শনাদি শাস্ত্রে বুদ্ধিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু ইহাদিগের প্রকটিত ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাসগ্রন্থ কিছুই উত্তম নাই। শিক্ষার মুখ্য তাৎপর্য এই যে, ইহা দুর্বল মনোবৃত্তি সকলকে বলবান করিবে এবং যাহারা স্বভাবতঃ বলবান্, তাহাদিগকে তদবস্থ রাখিবে। অতএব এই দেশীয় লোকেরা অন্তরিন্দ্রিয় স্বভাবতঃ অধিক অন্তর্মুখ; যাহাতে তাহা কার্যোপযোগী উভয়মুখ হয়, শিক্ষাপ্রণালী এমত করা নিতান্ত আবশ্যক।"১৩

এই উদ্ধৃতি হইতেই ভূদেব-পরিকল্পিত নবশিক্ষার সমন্বয়ীরূপের আভাস পাওয়া যাইবে। বিদ্যাসাগর য়ুরোপীয় জ্ঞানকাণ্ড ও বিদ্যার ব্যবহারিকতার দ্বারা অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ভূদেবও ভারতীয় শিক্ষা-ঐতিহ্যে "ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস গ্রন্থ কিছুই উত্তম নাই" বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারতের অন্তর্মুখী শিক্ষা ও য়ুরোপের বহির্মুখী শিক্ষার মিলনের মধ্যেই বাঙালীর শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ নিহিত রহিয়াছে—ইহাই তাঁহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ভূদেবের এই অভিমত নানা দিক দিয়া অতিশয় অর্থবহ। দ্বিমুখী মানস-ঐতিহ্য—য়ুরোপের অপরাবিদ্যা ও ভারতের পরাবিদ্যার যুগপৎ অনুশীলনই সমগ্র শিক্ষাধারাকে নব সার্থকতার পথে পরিচালনা করিবে, ভূদেব এই রূপ শিক্ষা-সমন্বয়েরই ইঙ্গিত দিয়াছেন। পরবর্তীকালে তিনি 'পারিবারিক প্রবন্ধ, ও 'সামাজিক প্রবন্ধে' যে সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করেন, আলোচ্য ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাহার ক্ষীণতম আভাস রহিয়াছে।

বিদ্যাসাগরের সমকালে বাঙালীর চিন্তা-জগতে যে অভূতপূর্ব আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মতত্ত্ব লইয়া

কলহ ও মতবৈষম্য, জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলী এবং সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক ক্ষুদ্রবৃহৎ পুস্তিকা অজস্র সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল ; তাহাদের ক্ষণকালীন মূল্যটাই সেদিনের জনসাধারণের নিকট অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। নানাবিধ আন্দোলন বিষয়ক এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রায় অধিকাংশই আজ লোকস্মৃতির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ, তাহাদের মধ্যে এমন কোন সারস্বত মূল্য ছিল না যাহা তাহাদিগকে মহাকালের বুকে অম্লান করিয়া রাখিতে পারে। তবে এইটুকু অনুধাবন করা যাইতে পারে যে, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আবির্ভাবের ফলে বাঙ্গালী আত্মত্রাণের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। এই সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে তাহারই অস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

॥ ৩ ॥

আখ্যান

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গল্পরসের তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য পদ্যে ও গদ্যে ক্ষুদ্রবৃহৎ অনেকগুলি আখ্যান প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দশকে কলিকাতায় বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের পর হইতেই ফারসী ও সংস্কৃত আদিরসাত্মক গল্পকে কখনও পয়ার-ত্রিপদীতে, কখনও বা চম্পূকাব্যের ন্যায় গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত করিয়া সাহিত্য-গৌরবহীন রিবংসামিশ্রিত আখ্যান প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত হইতেছিল। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' ও 'পৌলবর্জিনী' ('অবোধবন্ধু' পত্রিকায়, প্রকাশিত), প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শীকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৬২) প্রকাশিত হইলে বাঙালী পাঠক সাহিত্যরসাশ্রিত আখ্যানের স্বাদ বুঝিতে পারিল। বলিতে গেলে ইঁহারাই বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনী সূচনা করেন। কিন্তু ইঁহাদের আবির্ভাবের পূর্বেও আখ্যানরসে ধারা নানা উপকথা জাতীয় রচনার খাতে বহমান ছিল। তৎকালীন সাময়িক পত্রে—'সমাচার চন্দ্রিকা' 'সম্বাদকৌমুদী', 'সংবাদ প্রভাকর', 'বঙ্গদূত' প্রভৃতিতেও বহু নক্শা জাতীয় স্যাটায়ারধর্মী কাহিনী কখনও সংবাদের আবরণে, কখনও বা সম্পূর্ণ কল্পনার আশ্রয়ে প্রকাশিত হইত। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য়

ভবানীচরণ "শৌকীন বাবু" প্রভৃতি যে সমস্ত কৌতুক ও ব্যঙ্গরসাশ্রিত সংবাদ পরিবেশন করিতেন, তাহার সংবাদরূপ অপেক্ষা গল্পরূপ অধিকতর লক্ষণীয়।

এই সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য যে সমস্ত নীতিকথা জাতীয় পুস্তিকা প্রকাশ করিতেন, তাহাতেও গল্পরসের অব্যাহত ধারা বহমান থাকিত, অবশ্য শর্করামণ্ডিত তিক্ত বটিকার মত, নীতিই ছিল তাহার মুখ্য উপাদান। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি প্রধানতঃ আখ্যানকেন্দ্রিক :—

ররিন্‌সন ক্রুশোর ভ্রমণবৃত্তান্ত, পাল এবং বর্জিনীর জীবনবৃত্তান্ত, বৃহৎকথা ১ম ও ২য়, হংসরূপী রাজপুত্রদের বিষয়, ছোট কৈলাস বড় কৈলাস, চকমকির বাক্স ও অপূর্ব রাজবস্ত্র, মৎস্যনারীর উপাখ্যান, চীনদেশীয় বুলবুল পাখীর গল্প, বায়ুচতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা, অহল্য হড্ডিকার বৃত্তান্ত, কুৎসিত হংসশাবক ও খর্বকায়ার বিবরণ, সুশীলার উপাখ্যান, (১ম, ২য় ও ৩য়), বিচার, নবনীতি-সার।[১৪]

এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত 'বৃহৎ কথা' সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় অনূদিত। অনুবাদক আনন্দ শর্মা ভূমিকায় বলিয়াছেন, "অশ্লীল ও অলৌকিক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নীতিবিষয়ক মনোহর গল্প সকল গ্রহণ করা গিয়াছে।" এই জাতীয় সমস্ত আখ্যায়িকাতেই আদিরসাত্মক বর্ণনা যথাসম্ভব বর্জিত হইয়াছে। 'পাল এবং বর্জিনীর জীবনবৃত্তান্তে' প্রেমের আখ্যানটিও বালসুলভ রূপকথার অনুরূপ হইয়াছে। এই তালিকায় একমাত্র 'বৃহৎ কথা' ব্যতীত আর সমস্তই ইংরাজীর অনুবাদ বা ছায়াবলম্বনে রচিত। 'বিচার' পুস্তিকাটিতে পাঠশালার ছাত্রগণ অপরাধ করিলে কিরূপে তাহার বিচার করিতে হইবে, গল্পচ্ছলে তাহাই বিবৃত হইয়াছে—ইহা কোন ইংরাজী আখ্যানের ছায়াবলম্বনে রচিত নহে।

ইংরাজী আখ্যানের বিচিত্র গল্পরসের সাহায্যে বালকবালিকা ও অন্তঃপুর-চারিণীদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য এই যে আয়োজন, ইহার মধ্যে সাহিত্যরস আশা করা যায় না। এই জাতীয় অনুবাদ বা স্বাধীন রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। তিনি সরলভাষায় এই পুস্তিকাগুলি রচনা করিয়া যেমন একদিকে গল্পরস সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি আবার মানব-জীবনের স্থূল নীতির প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালী পুরাতন নীতিবোধ ত্যাগ করিয়া মানবজীবনের উদারতর পটভূমিকায় আবির্ভূত

হইতেছিল। এই বিদেশী রীতির পুস্তকগুলি বাঙালীর মনোধর্মের সহিত সামঞ্জস্য লাভ না করিলেও জীবন-চর্যার নীতি হিসাবে এগুলি কিশোরমনে স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছিল। বেঙ্গল ফ্যামিলি লাইব্রেরীর গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'মনোহর উপাখ্যান', 'নবনীতি কথা' অর্থাৎ ঈসপ্‌স ফেবল্‌স্, (১ম—১৮৫৫, ২য়—১৮৫৫, ৩য়—১৮৫৬), 'দশকুমার চরিত' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। গল্পরস এগুলির মুখ্য আকর্ষণ হইলেও রচনাকার বা অনুবাদকগণ নীতিগত উপদেশের সাহায্যে তরুণমতি বালকদের চিত্তোৎকর্ষের জন্য ইংরাজী শিশুশিক্ষা-শ্রেণীর গ্রন্থ অবলম্বনে এই আখ্যায়িকাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। গল্পচ্ছলে নীতিকথা প্রকাশক পুস্তিকারূপে প্রেমচাঁদ রায়ের 'জ্ঞানার্ণব' (১৮৪২), মধুসূদন তর্কালঙ্কারের 'জ্ঞানসুধাকর' (১৮৫৫), গোপাললাল মিত্রের 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' (১৮৩৮—প্রথম সংস্করণ, ১৮৪৪—দ্বিতীয় সং) প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এগুলি প্রধানতঃ সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণে, কখনও-বা অবিকল অনুবাদের আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রকাশিত পুস্তকগুলি শুধু বালক-বালিকার পাঠ্যরূপে রচিত হইত না, সাধারণ শিক্ষিত লোক অথবা অন্তঃপুরচারিণী মহিলারাও ইহা হইতে কিয়ৎপরিমাণে আনন্দ পাইতেন।

একদিকে যেমন ঈসপস্‌ ফেবল্‌স্‌ বা তজ্জাতীয় য়ুরোপীয় আখ্যায়িকা ও নীতিবোধক গল্পগ্রন্থের প্রাচুর্য বৃদ্ধি পাইতেছিল, ঠিক তেমনি আবার অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের কথা বা উপকথার অন্তর্ভুক্ত অথবা মৌলিক নীতিমূলক গল্প গ্রন্থের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইতিপূর্বে 'বৃহৎ কথা' ও 'দশকুমার চরিতে'র উল্লেখ করা হইয়াছে। হিন্দুনারীর জীবনাদর্শকে প্রাধান্য দিবার জন্য রচিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'পতিব্রতোপাখ্যান' (১৮৫৩) এবং নীলমণি বসাকের 'নবনারী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ভারতীয় হিন্দুনারীর আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। শুধু য়ুরোপীয় জীবনাদর্শের ছাঁচে নহে, পুরাণ ও মহাকাব্যে ভারতীয় হিন্দুনারীর যে আদর্শ চরিত্র আছে, তাহাও নারীজীবনের পুনর্গঠনে বিশেষ মূল্যবান। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছিল বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের সমকালে। তাই এই লেখকগণ প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু-আদর্শের মধ্যে সর্বকালীন নারী-আদর্শ খুঁজিয়াছিলেন।

নীতিমার্গীয় আখ্যানের কথা উপরে উল্লেখ করা হইল। এখন বিশুদ্ধ গল্পরসের কাহিনীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাক। নিছক গল্পরসের জন্য তদানীন্তন লেখকগণ সংস্কৃত, আরবী-ফারসী ও ইংরাজী—ত্রিবিধ কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসাদ কবিরাজের ছন্দে রূপান্তরিত 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮৫২), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৫২) এবং লালমোহন গুহ ও ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ অনূদিত (টীকাসহ) 'মেঘদূতে'র নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যনাট্যের অনুবাদের স্বচনা পূর্বেই হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম রসিকের দৃষ্টিকোণ হইতে সংস্কৃত রোমান্সগুলির দেবভাষার আবরণ উন্মোচন করিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই আদর্শের অনুসরণে ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'বত্রিশ সিংহাসন', 'মেঘদূত' প্রভৃতির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদাশ্রয়ী রচনাগুলির প্রধান বক্তব্য হইল মানবজীবনের বিচিত্র রহস্য। 'বত্রিশ সিংহাসন', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বা 'দশকুমার চরিতে'র মধ্যে মানবজীবন-কেন্দ্রিক যে গল্পরস আছে, তাহা একদা বাঙালীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল।

শুধু সংস্কৃত গ্রন্থই নহে ইতিপূর্বে আমরা বিশ্বেশ্বর দত্ত প্রণীত 'সাহানামা', নীলমণি বসাকের 'আরব্য উপন্যাস' এবং গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাকের 'পারস্য ইতিহাসে'র উল্লেখ করিয়াছি। এগুলির মধ্যে গল্পরসের বৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কোন উচ্চতর নৈতিক আদর্শ নাই। যে গল্পরস আছে, তাহাও মাঝে মাঝে আদিরসের গুহাপথে ধাবিত হইয়াছে। তবে গল্পগুলির রচনাকৌশল যতই বালসুলভ হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু কাহিনী-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

গল্পরসের মধ্যে সবিশেষ বৈচিত্র্য আনিয়াছিল ইংরাজী হইতে অনূদিত পুস্তকগুলি। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত পাল্লা দিয়া লেখকগণ ইংরাজী গল্প বা নাটকের কাহিনী অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েট অবলম্বনে গুরুদাস হাজরা ১৮৪৮ সালে 'রোমিও এবং জুলিয়েটের মনোহর উপাখ্যান' রচনা করেন। বলা বাহুল্য লেখক ল্যাম্ব্-প্রণীত *Tales from Shakespeare* অবলম্বনে এই কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের সার্থকতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন :

"অধুনা বহুসংখ্যক ইংরাজী গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ পূর্বক প্রকাশ হওয়াতে কলিকাতা মহানগরস্থ এবং অন্য ২ স্থানস্থ যে মহোদয়গণ দেশীয় সাধুভাষায় সর্বদা আলোচনা এবং তদ্বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া থাকেন বিশেষতঃ তদনেকাংশে ব্যক্তি যাঁহার প্রচলিত ইংলণ্ডীয় ভাষা জ্ঞাত নহেন, তত্তাবতের জ্ঞানোপার্জনের উত্তম উপায় হইয়াছে। তাঁহারা ইংরাজী ভাষা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত থাকিয়াও অনায়াসে উক্ত গ্রন্থসমুদায়ের অর্থ এবং ভাবগ্রহণ করতঃ প্রশংসিত রূপে সুশিক্ষিত এবং পারদর্শী হইতেছেন। অধিকন্তু তদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রীতিনীতি ব্যবহার ও নানা মনোরমা ইতিহাস সকল অবগত হওয়াতে তাহাদিগের অন্তঃকরণ জ্ঞান আলোকে পরিপূর্ণ হইতেছে।"

এখানে লক্ষণীয় যে, এই জাতীয় গ্রন্থানুবাদে "জ্ঞানোপার্জনের উত্তম উপায় হইয়াছে" বলিয়া অনুবাদক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা 'ভিন্ন ২ দেশীয় রীতিনীতি ব্যবহার ও নানা মনোরম্য ইতিহাস সকল অবগত হওয়াতে" জনসাধারণ ইংরাজী ভাষা না জানিয়াও নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে, ইহাতে লেখকের সংশয় নাই। এই আখ্যানগুলি শুধু গল্পপিপাসু পাঠকের জন্য নহে, ইহার দ্বারা বাঙালীসমাজ বিভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অবহিত হইতেছে, বিশুদ্ধ সাহিত্যরস অপেক্ষা রীতিনীতি ও শিক্ষার দিকেই অনুবাদক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতির প্রাণচেতনায় যে উদ্দাম বন্যাপ্রবাহ নামিয়া আসে, তাহার আঘাত বাঙালীর জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইয়াছিল। শিক্ষাপ্রচার, বিশ্বের নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙালী স্বসমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে সচেতন হইতেছিল। তাই যাঁহারা ইংরাজী হইতে আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন, তাঁহারাও বিশুদ্ধ সারস্বত আনন্দ অপেক্ষা সমাজগঠন ও শিক্ষাপ্রচারের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

বালক-বালিকা ও অন্তঃপুরিকাদের জন্য যে সমস্ত ইংরাজী আখ্যায়িকার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে 'রবিন্‌সন ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত' এবং 'পাল এবং বর্জিনীর জীবনবৃত্তান্ত' নামক পুস্তিকাতে যে অদৃষ্টপূর্ব দেশ, মানব ও সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বাঙালীর মনোলোকের সঙ্কীর্ণতা অনেকাংশ হ্রাস পাইতেছিল। 'অবোধবন্ধু পত্রিকা'য় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের অনূদিত 'পৌল ও বর্জিনী'র সমুদ্রমধ্যবর্তী দ্বীপবাসী বালক বালিকার বাল্যপ্রেম ও বিরহের লীলা পাঠ করিয়া বালক রবীন্দ্রনাথের হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া

গিয়াছিল। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের কর্তৃত্বে যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে বাঙালীর রোমান্স্প্রিয় কল্পনা তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। রবিনসন্ ক্রুশোর নিঃসঙ্গ সামুদ্রিক জীবন ও পল-ভার্জিনীর রমণীয় দ্বৈপায়ন জীবনের স্বচ্ছন্দ কাহিনীও বাঙালীর সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক দৃষ্টি ও অনুভূতিকে বহুলাংশে সম্প্রসারিত করিয়াছিল, তাহা অনুমান করিতে বাধা নাই।

এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর তর্করত্ন অনূদিত 'রাসেলাসে'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডঃ জনসনের এই নীতিবাচক উপন্যাসখানিতে আবিসিনিয়ার রাজকুমার রাসেলাসের জীবন-সঙ্কটের কথা বিবৃত হইয়াছে। মানুষের জীবনে সুখের আদর্শ কোথায়, ইহাতে তাহাই রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। রাজকুমার রাসেলাসের বিচিত্র জীবনকথা ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে কালীকৃষ্ণ দেব পাদ্রী জে. এম. টার্নারের নির্দেশে অনুবাদ করেন। তাহার প্রায় চব্বিশ বৎসর পরে ১৮৫৭ সালে তারাশঙ্কর 'রাসেলাসে'র আর এক অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি ইতিপূর্বে ১৮৫৫ সালে বাণভট্টের 'কাদম্বরী' নামক গদ্য রোমান্সকে সরলভাষায় ও সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া রোমান্স্-ধর্মী সংস্কৃত গদ্য-আখ্যায়িকার প্রতি পাঠকের কৌতূহলী চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। নানা বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগরের অনুগামী ও ভক্তশিষ্য ছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রভাবে তারাশঙ্কর 'কাদম্বরী' এবং সম্ভবতঃ 'রাসেলাস' অনুবাদে অগ্রসর হন। তাঁহার গদ্যরচনা সহজ ও সরস, 'রাসেলাসে'র নীতিমার্গীয় কাহিনীটিও বেশ সুখপাঠ্য। কালীকৃষ্ণ দেবের অনুবাদ অপেক্ষা তারাশঙ্করের অনুবাদের ভাষা হৃদ্যতর; তবে তাঁহার অনুবাদ অধিকাংশ স্থলেই ভাবানুবাদের পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। 'কাদম্বরী'তে তিনি যে রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই কাহিনীতেও সেই একই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। গ্রন্থটির পরিচ্ছন্ন রচনারীতি অনেক সময়ে বিদ্যাসাগরের অনুরূপ। যে নীতিমার্গের কেন্দ্র হইতে ডঃ জনসন এই উপন্যাসে রাজকুমার রাসেলাসের জীবনসঙ্কট বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য অনুধাবনযোগ্য। রাসেলাস "the soft vicissitudes of pleasure & repose" ত্যাগ করিয়া অনন্ত সুখের সন্ধানে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; পরে বুঝিয়াছিলেন, নিঃসঙ্গতায় সুখ নাই, একক অরণ্যজীবনেও সুখ নাই, "He that lives well in the world, is better than he that lives well in a monastery." ডঃ জনসনের ইহাই হইল মানব-জীবন সম্বন্ধে সার সিদ্ধান্ত। তারাশঙ্কর তাহার অনুবাদ করিয়াছেন—"যিনি

সন্ন্যাসধর্ম আশ্রয় করিয়া নিরন্তর ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক সুন্দর রূপে চলিতে পারেন, তাঁহা অপেক্ষা তিনি সংসারে থাকিয়া ন্যায়পথে সুন্দররূপে সংসার যাত্রা নির্বাহ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয়।”

এই যে সন্ন্যাসজীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া গার্হস্থ্য জীবনের মহত্তর মূল্য-স্বীকার—১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী-জীবনে এই নূতন ভাবধারাটি সাহিত্যের মারফতে আবির্ভূত হইয়াছিল। গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠা, নির্বিকল্প সন্নাসজীবনকে বরং অনাদরে দূরে সরাইয়া দৈনন্দিন জীবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ—'রাসেলাস' আখ্যানের ইহাই মৌলিকতা। বিদ্যাসাগর ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় প্রধানতঃ পার্থিব জীবনকেই স্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ও ধর্মসভার আন্দোলন সত্ত্বেও শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে যে আবেকপ্রকার চিন্তার উদয় হইতেছিল, তাহা তারাশঙ্করের 'রাসেলাস' পাঠেই অনুভূত হইবে। তিনি বিশুদ্ধ গল্পরসের প্রেরণায় 'কাদম্বরী' গদ্যকাব্যকে ঈষৎ সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'বাসেলাস' উপাখ্যানের মধ্যে জ্ঞানোপার্জন ও সুখানুসন্ধিৎসু সঙ্কট-মুহূর্তের ইঙ্গিত রহিয়াছে, সর্বোপরি মানুষের ঐহিক জীবনের মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে—তাই ইহাতে ১৯শ শতকের প্রথমার্ধে বাঙ্গালীর চিত্ত-জাগরণের কিছু কিছু বহিরঙ্গগত আভাস মিলিবে।

তারাশঙ্কর সংস্কৃত কলেজে তের বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের স্নেহলাভ করিয়াছিলেন। ফলে একদিকে যেমন তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, তেমিন আবার বিদ্যাসাগরের প্রভাবের ফলে আধুনিক জীবনপ্রবাহ সম্বন্ধেও সম্যকরূপে অবহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' (১৮৫০) প্রগতিশীল আধুনিক মনোভাব বহন করিতেছে। প্রধানতঃ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও স্মৃতি-সংহিতা হইতেই তিনি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্র, ঐ কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ এবং নদীয়া জেলার স্কুলসমূহের সহকারী পরিদর্শক তারাশঙ্কর তর্করত্ন এই আধুনিক যুগধর্মটিকে সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৫২ সালে তিনি 'পশ্বাবলী' গ্রন্থটিকে (১৮২২ সালে ল'সন কর্তৃক সঙ্কলিত এবং পীয়ার্স কর্তৃক বাংলায় অনূদিত) একেবারে নূতনভাবে প্রকাশ করেন। জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত এই গ্রন্থটি যে তাঁহার

দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, ইহাতেও তাঁহার আধুনিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সমস্ত গ্রন্থ ১৮৫৭ সালের পরে প্রকাশিত হয়। তাঁহার 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' ১৮৫৮ সালের পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার গদ্যরচনায় যে নূতন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অবোধ বন্ধু' পত্রিকায়[১৫] তাঁহার 'পৌল ভর্জিনী' নামক ফরাসী উপন্যাসের যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল,, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। ফরাসী ঔপন্যাসিক Bernardin de St. Pierre ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে *Paul et Virginie* প্রকাশ করেন। ১৮৫৬ সালে উহাই বাংলায় 'পাল এবং বার্জিনিয়া' নামে অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ ইহার আর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন—'পাল এবং বর্জিনীব জীবনবৃত্তান্ত'। গ্রন্থটি অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল; কারণ ইহার মধ্যে কাদম্বরীর মত মানবহৃদয়ের চিরন্তন বেদনা-মাধুরীপূর্ণ নিষ্কলুষ বোমান্টিক প্রেমেব বর্ণনা আছে। পল এবং ভার্জিনী নামক দুইটি বালক-বালিকার মরিশাস্ দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ, বাল্য প্রেম, পবিশেষে প্রেমের জন্য উভয়েরই প্রাণদান—এই রোমান্টিক কাহিনী একদা জনসাধারণের গল্পরসের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। যে দ্বীপ ও সমুদ্র-সৈকতের বিচিত্র বর্ণনা ইহারা নিসর্গমাধুরী বৃদ্ধি করিয়াছিল তাহা পাঠ কারিরা বাঙালীর ভৌগোলিক চেতনা একটা নূতন দেশের পরিচয় লাভ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সম্প্রসারিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমলের এই অনুবাদ পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করিয়াছেন:

"এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতী পৌলবর্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীর কম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা!"

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্র নিসর্গবর্ণনার জন্য 'পৌল বর্জিনী'র প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সে সরসতা কৃষ্ণকমলের লেখনীপ্রসূত। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের 'পাল এবং বর্জিনিয়া'র মধ্যে তাহা আশা করা যায় না। বিশেষতঃ শেষোক্ত পুস্তিকাখানি বালক-বালিকা ও অন্তঃপুরিকাদের

জন্য রচিত ; কাজেই ভাষাকে সাহিত্যিক গুণান্বিত না করিয়া সরল ও সহজবোধ্য করিতে হইয়াছে।

এই সমস্ত পাশ্চাত্য কাহিনীর মধ্যদিয়া বাঙালী প্রথম বৃহত্তর বিশ্বের বিচিত্র পরিচয় লাভ করিল। কৃষ্ণকমলের 'পৌলবর্জিনী'র সমুদ্রমধ্যবর্তী দ্বীপের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে বালক রবীন্দ্রনাথ যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে যুগের বালকবালিকারাও রামনারায়ণের উক্ত অনুবাদ পাঠ করিয়া হয়তো অনুরূপ বিস্ময়বোধ করিত। তদানীন্তন বাংলা গদ্যে য়ুরোপের ঐতিহাসিক জীবন যেমন গ্রীস-রোমের প্রাচীন ইতিহাস এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে সংগৃহীত হইত, তেমনি পাশ্চাত্য আখ্যানের মধ্য হইতে বিচিত্র সৌন্দযে পরিপূর্ণ একটা নূতন দেশ ও জীবনধারাব অস্পষ্ট তরঙ্গধ্বনি ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালীর চিত্ততটে আহত হইয়াছিল। এই কাহিনীগুলির এইখানেই সার্থকতা। 'রাসেলাসে'র আবিসিনিয়ার পার্বত্য মরু-অঞ্চল এবং পৌল বর্জিনীর মরিসাস্ দ্বীপের সৌন্দর্য-স্নিগ্ধ বর্ণনা নিশ্চয় বাঙালীব চিত্তে নূতন দেশ, জনপদ ও মানবজীবন সম্বন্ধে কৌতূহল সঞ্চার করিয়াছিল।

এইবার আমরা আর একপ্রকার আখ্যান আলোচনা করিব, যাহা বিশুদ্ধরূপে দেশীয় ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯শ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে কলিকাতায় বাংলা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'রতিমঞ্জরী' জাতীয় কিছু আখ্যান কখনও গদ্যে, কখনও পদ্যে, কখনও বা গদ্যে-পদ্যে সংমিশ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রীয় ফেনিল আসবমত্ততা ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, এমন কি তাহার পরেও বর্তমান ছিল। একদিকে যেমন য়ুরোপীয় আখ্যান বাঙালীর হৃদয়ে নূতন ভাব-সংবেগ সৃষ্টি করিতেছিল, ঠিক তেমনি আবার উগ্র আদিরসাত্মক গ্রাম্যরুচি-পরিপুষ্ট একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইতেছিল। 'কামিনীকুমার' (কালীকৃষ্ণদাস), জীবনযামিনী' (১৭৭৮ শক—কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, বনোয়ারিলাল রায় দ্বারা সংশোধিত), 'জীবনতারা' (রসিক রায়), 'অবলা প্রবলা' (১৮৫৬—কালীকুমার মুখোপাধ্যায়) ও 'রমণীনাটক' (১৮৪৮—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়) উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, এগুলির অধিকাংশই অক্ষম পয়ারে রচিত, কোন কোনটিতে কিছু কিছু গদ্য পংক্তিও আছে। অতি স্থূল গ্রাম্য রুচি, শিথিল কাহিনী ও আদিরসের কুৎসিত কাহিনী এই পুস্তিকাগুলিকে ভদ্ররুচির অপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। আদিরসাত্মক বর্ণনা

আছে বলিয়া আমরা ইহাদিগকে সারস্বত মন্দিরের 'হরিজন' বলিতেছি না। ইহাতে আদিরস কটু মত্ততায় পরিণত হইয়াছে, শৃঙ্গাবলীলা প্রায়শঃই অশুচি ও পৈশাচিক উল্লোলে প্রগল্ভ হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি 'কলিকুতূহলা' নামক ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত পুস্তকেও অস্বাভাবিক যৌনাচাবেব ব্রীডাহীন নিকৃষ্ঠ বর্ণনা রহিয়াছে। 'বিদ্যাসুন্দর' অনধিকারীর হস্তে পডিয়া কতদূর অসুন্দর হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা এই কয়খানি পুস্তিকাব দুইচাবি পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে। সমাজের একটি স্তবে যেমন স্কুলবুক সোসাইটী, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রভৃতি জনহিতকব প্রতিষ্ঠানেব চেষ্টায় য়ুবোপীয় ও সংস্কৃত আখ্যানেব ক্ষুদ্রবৃহৎ অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছিল, তেমনি আবার সমাজের আব এক স্তবে কুৎসিত কামাচাবের বর্ণনা গোপনে জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছিল। যাঁহাবা এই আখ্যানগুলি বচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ কিছু সাহিত্যিক গুণের অধিকাবী ছিলেন। সেইজন্য একদা এগুলির প্রচুব চাহিদা ছিল। লঙ্‌সাহেব ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত মুদ্রিত বাংলা পুস্তকেব যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই জাতীয় অসংখ্য পুস্তিকার উল্লেখ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সমাজেব উপরিতলে যেমন আধুনিক মনোভাব প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, ঠিক তেমনি শিক্ষিতজনের আগোচবে এইরূপ একটা সুড়ঙ্গ-পথ-বাহী গোপন আদিবসেব জুগুপ্‌সিত ধারা প্রবহমান ছিল। কিন্তু ১৮৫০ সালের পর বাংলা সাহিত্য মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবের ফলে এইরূপ সাহিত্যগৌরবহীন আদিরসেব উত্তাপ ধীরে ধীরে প্রশমিত হইল এবং ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পর আখ্যানরসের ধারা ভিন্নতর খাতে প্রবাহিত হইল—'চন্দ্রকান্ত', 'কামিনী কুমার', 'জীবনতারা' প্রভৃতি অসংখ্য জঞ্জাল লোকরুচি হইতে বহিষ্কৃত হইল।

এই জাতীয় পুস্তিকাগুলির জন্য শুধু 'বিদ্যাসুন্দর'কেই দায়ী করিলে চলিবে না। এই যুগে যে সমস্ত ইসলামী কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আদিরসের স্থূল বর্ণনা কিছু অল্প ছিল না। নীলমণি বসাকের 'আরব্য উপন্যাস' (১৮৪৯), গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পারস্য ইতিহাস' (১৮৪৮), 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সম্পাদক অনূদিত 'আরবীয়োপাখ্যান' (১৭৭০ শক), গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'আনবার শোহেলি' (১২৬১) প্রভৃতি[১৬] ইসলামী কাহিনী গদ্যে পদ্যে রচিত হইয়া স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল।

ইহাদের রুচির উৎকর্ষ অনুসন্ধান করিতে গেলে বিফল মনোরথ হইতে হইবে। অবৈধ প্রণয়, ভ্রষ্টা নারী, যৌনব্যভিচার—প্রধানতঃ এই জাতীয় কাহিনী সমাজের একশ্রেণীব অলস বিলাস-জর্জর ধনী যুবকের মধ্যে রোগীর কুপথ্য-প্রীতির মত রসনালোভন হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮২৩ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'সমাচার দর্শন' পত্রিকায় এক পত্রপ্রেরক বলিয়াছিলেন যে, ধনী যুবকগণ 'বিদ্যা-সুন্দর' ও 'রতিমঞ্জরী' জাতীর আদিরসাত্মক গ্রন্থই পাঠ করিত এবং শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করা দূরেব কথা, ঘৃণাভরে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিত।[১৭]

'যথার্থবাদিনঃ' নামক এক ছদ্মবেশী পত্রপ্রেরক তৎকালীন কলিকাতার ভদ্ররুচি সম্বন্ধে উল্লিখিত পত্রে যাহা বলিয়াছিলেন, ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহার কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল সন্দেহ নাই; এই সময়ে নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল,—অবশ্য তন্মধ্যে স্কুলপাঠ্য ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতিব চাহিদাই ছিল সর্বাধিক। তথাপি সাধারণের পাঠোপযোগী কিছু কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছিল। কালিদাস মৈত্রের 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ' (১৮৫৫), ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার অনূদিত 'উদ্ভিদ-বিদ্যা' (১৯৫৪), হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কৃষিদর্শন' প্রথম ভাগ (১২৬৬) রেভাঃ ব্যাচিলার-এর 'চিকিৎসা-সার' (১৮৫৪), উইলিয়ম ইয়েট্‌স-এব 'পদার্থ বিদ্যাসার' প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি ১৯শ শতাব্দীব মধ্যভাগে বা তাহার পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইসলামী প্রভাবান্বিত আরব্যরজনী জাতীয় আদিরসাত্মক গল্পের ছায়াতলে উগ্র প্রেমলীলা বিষয়ক কিছু কিছু চম্পূ আখ্যান একদা বেশ জনপ্রিয় হইযাছিল। 'জীবনতারা', 'জীবনযামিনী', প্রভৃতিতে অশ্লীল উপাখ্যান আছে বটে, কিন্তু পরস্ত্রী-লাম্পট্যের বর্ণনা নাই। 'রমণী নাটক' নামক গদ্যেপদ্যে মিশ্রিত অশ্লীল আখ্যানে কিন্তু বিবাহিত রমণীর পরপুরুষে আসক্তি উত্তেজক আদিরসের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই জাতীয় রচনার প্রবাহ বহুদিন অব্যাহত ছিল—অবশ্য কিছু প্রচ্ছন্নভাবে। ১২৭৮ সালে প্রকাশিত কালীপ্রসাদ কবিরাজের 'চন্দ্রকান্ত' নামক আখ্যানেও অতিশয় অশ্লীল বর্ণনা আছে। এই প্রকার অসামাজিক আদিরসের উগ্রতা ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে মুদ্রিত গ্রন্থে ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসে।

আখ্যানকেন্দ্রিক আদিরস কিভাবে প্রশমিত হইল, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শীকদার সম্পাদিত 'মাসিক

পত্রিকা' (১৮৫৪) নামক পত্রিকার মূল্যবান প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে। আলোচ্য পত্রিকাখানি আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র ; বাহ্যতঃ নিতান্তই তুচ্ছ মাসিক পত্র বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহাতে আখ্যানরসের যে নূতনধারা প্রকাশিত হয়, তাহাই বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই সময়ে য়ুরোপীয় এবং প্রাচ্য অর্থাৎ ইসলামী ও সংস্কৃত আখ্যানগুলিকে গদ্যে অথবা পয়ারে বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হইতেছিল, সেই কাহিনীগুলির সহিত বাঙালীর রোমান্স্প্রিয় ও গল্পবুভুক্ষু হৃদয়ের যোগাযোগ হইয়াছিল বটে, কিন্তু 'রাসেলাসে'র আবিসিনিয়ার রুক্ষপর্বতের বর্ণনা, 'পল ও ভর্জিনী'র মরিশাস দ্বীপের সমুদ্র সমীরকম্পিত নারিকেলের বন, রবিনসন ক্রুশোর সমুদ্রদ্বীপের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, 'দশকুমার চরিতে'র রাজপুত্রদের বীরোচিত প্রেমলীলা, 'কাদম্বরী'র সৌন্দর্যসম্ভোগ এবং 'বৃহৎকথা'র গল্পরসের যে বর্ণাঢ্য লীলা-প্রাচুর্য রহিয়াছে, ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই তাহা বাঙালী-মানসের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতেই বাস্তব জীবনসমস্যার প্রতি লেখক ও পাঠক উভয়েই কৌতূহলী হইলেন। 'রমণী নাটক', 'জীবনতারা', প্রভৃতি আখ্যানে বর্ণিত নরনারী-চরিত্র রুচিবিগর্হিত হইলেও, বাস্তব জীবন হইতেই উত্থিত হইয়াছে।

বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া 'মাসিক পত্রিকা'য় আখ্যান প্রকাশিত হইত। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে যে আখ্যান প্রাধান্য পাইতেছিল, তাহা 'মাসিক পত্রিকা'র কয়েক সংখ্যা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। "শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবীর দ্বিতীয় বিবাহ করিবার আপত্তি ঘুচিয়া যায়" (মাসিক পত্রিকা, ১০৬২, ১০ম সংখ্যা)—এই আখ্যান হইতে একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :

"গোকুলমণি পীড়িত হইলে ব্রজনাথ কখন তাহার কাছছাড়া হইতেন না, সর্বদা নিকটে থাকিতেন, বিছানায় বসিয়া স্নেহপূর্বক কথাবার্তা কহিতেন, আপনি হাতে করিয়া ঔষধ খাওয়াইতেন, এক ঘণ্টার মধ্যে দশবার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া দেখিতেন গোকুলমণি কেমন আছে। গোকুলমণি আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিত —দিদি, আরাম থাকিলে আমার যেমন সুখ, পীড়া হইলেও তেমনি সুখ। কিছুমাত্র ব্যারাম হইলেই কর্তা আমার প্রতি কত যত্ন করেন, তাহাতে আমার গা জুড়ায়, পীড়ার যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই। কখন কখন সাধ যায়, যেন আমি চিরকাল পীড়িত থাকি, তাহা হইলে কর্তা চিরকাল আমার কাছে থাকিবেন, তাঁহার হাস্যবদন দর্শনে আমার মন বড় প্রফুল্ল থাকে, ক্ষুধা তৃষ্ণা সকলি ভুলিয়া যাই।"[১৮]

এখানে ভাষার মধ্যে একটা প্রীতিনিষিক্ত স্পর্শ পাওয়া যাইতেছে। 'মাসিক পত্রিকা' বাঙালী-জীবনের মধ্যস্থলে নামিয়া আসিয়াছিল; কাহিনীগুলির অধিকাংশই নারীজীবনকে কেন্দ্র করিয়া রচিত; বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। যদিচ এই আখ্যানগুলি কিয়দংশে প্রচার-ধর্মী, তথাপি তাহাতে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের বাস্তব স্বাদ পাওয়া যাইতেছে।

'মাসিক পত্রিকা'য় কতদূর সরল ও মৌখিক ভাষা ব্যবহৃত হইত তাহার আর একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে:

"রাজার সম্মুখে মেয়ে মানুষটি উপস্থিত হইয়া বলেন—মহারাজ, রাজপুত্রের নিকট আমার একখানি দরখাস্ত আছে। রাজা উত্তর দেন,—সে তো বেশ কথা, রাজপুত্রের নিকটে আসিয়া দরখাস্ত দাও। এই কথা বলিয়া মেয়ে মানুষটিকে রাজপুত্রের নিকট লইয়া যান। তখন রাজপুত্র দোলায় ঘুমুচ্ছিলেন। তিনি রাজার জ্যেষ্ঠ সন্তান, তাঁহার বয়েস সাত আট মাস হইবেক। মেয়ে মানুষটি রাজপুত্রের হাতে দরখাস্ত দেন। দরখাস্তখানি রাজা লইয়া ডাকিয়া পড়েন। পরে ক্ষণকাল চুপ মেরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলেন, মা, আমি তো তোমার দরখাস্ত পড়িয়া শুনাইলাম, রাজপুত্র কোন উত্তর দিচ্ছেন না, তাহাতেই বোধ করি, তিনি কোন আপত্তি করছেন না, তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন, মা তোমার ছেলেকে সিপাহি হইতে হবে না। এই কথা শুনিয়া বিধবা মেয়ে মানুষটি আহ্লাদ চিত্তে ঘরে গমন করেন।"[১৯]

এই উদ্ধৃতি হইতেই বোধগম্য হইবে, 'মাসিক পত্রিকা'র সম্পাদকদ্বয় (প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শীকদার) বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায় আখ্যান-বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রধানতঃ প্যারীচাঁদের চেষ্টার ফলেই বাঙালীর মুখের ভাষা ও ঘরের কথা আখ্যান ও কাহিনীকে একটা সুদূর-প্রসারী তাৎপর্য দান করিল। 'মাসিক পত্রিকা'র ১ম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা (১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫) হইতে ধারাবাহিকভাবে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উপন্যাসখানির সাহায্যে বাঙালী দৈনন্দিন জীবনের অপরূপ মাধুরী উপলব্ধি করিতে পারিল। রোমান্টিক আখ্যান ও বাললোভন রূপকথার জলাভূমি পার হইয়া সর্বপ্রথম উপন্যাসের আবির্ভাব হইল—'আলালের ঘরের দুলালে' তাহার সার্থক সূচনা। উপন্যাসের লক্ষণ মিলাইয়া এই নক্সা জাতীয় আখ্যানটিকে কিছুতেই সার্থক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে না; কিন্তু প্যারীচাঁদ রোমান্স-আশ্রিত বাংলা আখ্যানকে বাস্তব জীবনের অতি পরিচিত পরিবেশের উপর

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার বৃহত্তম গৌরব। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকেই এই বৈশিষ্ট্যটি নূতন মহিমা লাভ করিতেছিল। প্যারীচাঁদের 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশের সময় ইহা অভিনব ব্যাপার ছিল সন্দেহ নাই। 'আলালের ঘরের দুলালে'র এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ বলিয়াছেন,—"আর তাঁহার দ্বিতীয় কীর্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না।"[২০]

সংস্কৃত ইংরাজী ও ফারসী আখ্যানের মধ্যে বাঙালী পাঠক জীবনের যে প্রত্যয় ও উপলব্ধি খুঁজিতেছিল, তাহাতে সৌন্দর্যলোকের আভাস ছিল, কিন্তু বস্তু-জগতের সহিত তাহার যোগসূত্রটি নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। প্যারীচাঁদ ও রাধানাথের এই পত্রিকা সে পথ পরিত্যাগ করিয়া আখ্যানের অভিনব ধারার সন্ধান দিল, সেই ঘরের সামগ্রী সারস্বত কাহিনীর উপাদান হইল। মর্ত্যজীবনের এই সাহিত্যিক রূপ, যাহা পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসে এক অভূতপূর্ব জীবন-মহিমা স্বীকার করিয়াছিল, ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে প্যারীচাঁদ তাহার সূচনা করেন; মাত্র এক আনা মূল্যের শীর্ণকায় ও খর্ব তনু 'মাসিক পত্রিকা' সেই দুরূহ শিল্পাদর্শের প্রথম স্রষ্টা। পরবর্তী কালে একদিকে ইংরাজী ও সংস্কৃত রোমান্সের ধারা এবং তাহার সহিত সমান্তরাল রেখায় দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে। *শেষোক্ত ধারাটির প্রথম সূত্রপাত যে 'মাসিক পত্রিকা'য়, তাহা অবশ্য স্বীকার্য।

---

*আলালের পূর্বে ক্যাথেরাইন মুলেন্স নাম্নী এক খ্রীস্টান মহিলা ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' নামক একখানি উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ করেন। ইহাতে সরল ভাষায় দেশীয় খ্রীস্টান পরিবারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হইলেও খ্রীস্টানী ব্যাপার বলিয়া বাঙালী সমাজে প্রচার লাভ করে নাই।

॥ ৪ ॥

কাব্য-কবিতা

১৯শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে ১৮৩০ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল, দীর্ঘ আটাশ বৎসর ধরিয়া ঈশ্বর গুপ্তের যুগ চলিয়াছিল। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' তিনি বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনকে অজস্র পয়ারের বিচিত্র তরঙ্গোল্লাস দান করিয়াছিলেন; গ্রহসনাথ সূর্যের মত তাহার চারিদিকে একটা ভক্তগোষ্ঠীও গড়িয়া উঠিয়াছিল। কলেজীয় তরুণ ছাত্রগণ তাঁহার নিকট বিশেষ উৎসাহ লাভ করিতেন। পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যের ভগীরথ মধুসূদন যে বন্যাপ্রবাহ আনিলেন, তাহার উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভের আঘাতে রঙ্গলাল মনোমোহন কোন্ শূন্যে মিলাইয়া গেলেন। 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধে'র যোদ্ধৃবর্গও বুদ্বুদের আকারে বিলুপ্ত হইয়া গেলেন। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'ললিতা তথা মানস' নামক আখ্যান-কাব্যদ্বয় সামান্য উত্তেজনা সঞ্চার করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তরুণ দ্বারকানাথ অধিকারীর স্বদেশ প্রেম-মূলক কবিতাসংগ্রহের ('সুধীরঞ্জন') কয়েকছত্র লোকমুখে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহাও হারাইয়া গেল। কেবল দীনবন্ধুর 'দ্বাদশ কবিতা' ও 'সুরধুনী'র মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কিছু প্রভাব বর্তমান ছিল। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালী জাতি ও বাঙলা দেশের দৈনন্দিন জীবন লইয়া যে সমস্ত তরল পয়ার রচনা করিয়াছিলেন, একমাত্র দীনবন্ধু এবং কিছু পরে হেমচন্দ্র এই ধারা বহন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবের বাহিরেও কিছু কিছু কাব্যানুশীলন চলিতেছিল। ইতিপূর্বে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যসম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবের বাহিরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার যে ভারতচন্দ্রীয় আদিরস সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন (বাসবদত্তা), তাহারও বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন দেখা যাক, ঈশ্বরগুপ্তের ভাব-মণ্ডলের বাহিরে কোন্ জাতীয় কাব্যানুশীলন চলিতেছিল।

ইতিপূর্বে আমরা আখ্যানের আলোচনা প্রসঙ্গে আদিরসাত্মক কাব্য-কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছি। এই অকিঞ্চিৎকর কাহিনীগুলিতে অসামাজিক কামাচার ব্রীড়াশূন্য ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; ভারতচন্দ্রীয় উত্তপ্ততা হইতে সদ্যোজাত মদনমোহনের জনপ্রিয়তা দেখিয়া কবিযশঃ-প্রার্থী নিম্নাধিকারিগণ এই আদিরসের ফেনিল মত্ততায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। অসামাজিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত

কামবিকারকে একটা দুর্বল আখ্যানের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া একাধারে গল্পরস ও কামরস, উভয়ের জুগুপ্‌সিত রসায়ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই জাতীয় আখ্যানকাব্য দীর্ঘকাল লোকরুচিকে পরিতুষ্ট করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই কবিগণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, উগ্র আদিরসাত্মক কাহিনী বয়ন করা—পয়ার ত্রিপদী নিতান্তই বাহকের কর্তব্য করিয়াছে। কিন্তু এই সময়ে আদিরসাত্মক কাহিনীর পাশে পুরাতন কাব্যধারাও বহিয়া চলিতেছিল। ১৭৭২ শকে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ কিয়ৎপরিমাণে শিবায়ন ধারা অনুসরণ করিয়া 'সঙ্গীত গৌরীশঙ্কর' রচনা করেন। তিনি মূল কাব্যটি সংস্কৃত শ্লোকে রচনা করেন, এবং তাহাকে সরল পয়ারে অনুবাদ করিয়া মূল সংস্কৃত সহ প্রকাশ করেন। দেবদেবীমাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্যখানি গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরের ছাঁচে রচিত; হরপার্বতীর মিলন-বিহার বর্ণনা করিতে গিয়া আমাদের দুঃসাহসিক কবি মল্লিনাথের মত 'পিত্রোঃ সম্ভোগবর্ণনমত্যন্তমনুচিতম্' বলিয়া পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করেন নাই তিনি গ্রন্থটির নাম দিয়াছিলেন 'হর পার্বতীর বারাণসী বিহার বর্ণনময় গ্রন্থবিশেষঃ।' যদিও কাব্যটি আদিরসাত্মক, তথাপি দেবদেবীলীলা বলিয়াই কবি আদিরসের উল্লাস যথাসম্ভব পরিহার করিয়াছেন। ১৯শ শতাব্দীতেও প্রাচীন বাংলা কাব্যধারা যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই, 'সঙ্গীত গৌরীশঙ্কর'ই তাহার প্রমাণ।

১২৬৫ সনের অগ্রহায়ণ মাসে হরিমোহন কর্মকার 'কুমারসম্ভব' কাব্যের প্রথম সাত সর্গ অনুবাদ করেন; অবশিষ্ট সর্গ সম্ভবতঃ অশ্লীল বলিয়া অনূদিত হয় নাই। বিজ্ঞাপনে অনুবাদক বলিতেছেন, "ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, কোন গ্রন্থাদির অবিকল অনুবাদ করিলে সুরস হয় না। অতএব মূল গ্রন্থের উপাখ্যান ভাগ মাত্র অবলম্বন করিয়া নানাবিধ ছন্দোবন্ধে এই কাব্য রচনা করা গেল। ইহাতে কালিদাসের যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ভাবে আছে, তৎসমুদায় পরিগৃহীত হইয়াছে এবং আমার সাধ্যানুসারে কতিপয় নূতন-ভাব রচিত হইয়াছে"

প্রাচীন রীতিতে কাব্য রচনা বা সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ—প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ সূচনা করিতেছে। তাই 'সঙ্গীত গৌরীশঙ্করে' অন্নদামঙ্গলের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে, হরিমোহনও কুমারসম্ভবের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার অনেক পূর্বে বাংলা ১২৩৪ অব্দে রামচন্দ্র দ্বিজ 'নলদময়ন্তী উপাক্ষণ অর্থাৎ শ্রীযুক্ত নলরাজার কলি কত্রিক অক্ষয়ক্রীড়া দ্বারা রাজ্যচ্যুত' (কলিকাতা মহেন্দ্রলাল প্রেসে ছাপা হইল, নম্বর ২৭, শাঁখারি টোলা) নামক ক্ষুদ্রকাব্যে সরল

পয়ারত্রিপদীতে নলদময়ন্তীর আখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। হরিমোহন কর্মকারের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের বিজ্ঞাপনে দ্বারকানাথ রায় কৃত 'রামরসামৃত' 'রসরাজ-মোহমুদ্গর', 'বিল্বমঙ্গল', 'লয়লা মজনু', 'কলিচরিত', 'আনন্দবিলাস' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের তালিকা আছে। আমাদের অনুমান এগুলিও প্রাচীন রীতিতে রচিত পুরাতন ধরণের কাহিনীকাব্য।

কালীপ্রসন্ন কবিরাজ ১৮৫২ সালে পয়ার ত্রিপদীতে 'বত্রিশসিংহাসন' অনুবাদ করেন; ইহার দুই বৎসর পূর্বে ১৮৫০ সালে লালমোহন গুহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ 'মেঘদূতে'র সটীক গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। প্রাচীন কাব্যনাট্যের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ রামগতি কবিরত্ন ভট্টাচার্য ১৮৫৩ সালে মূল সংস্কৃতসহ 'মহানাটকে'র পয়ার অনুবাদ মুদ্রিত করেন। এই সময়ে একদিকে যেমন তীব্র রিরংসাতপ্ত আদিরসাত্মক কাহিনী প্রকাশিত হইতেছিল, ঠিক তেমনি আবার তাহার প্রতিষেধক সংস্কৃত কাব্যনাট্যাদিরও অনুবাদ মুদ্রিত হইতেছিল। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিতজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছিল; বিদ্যাসাগর বীঠন সোসাইটিতে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) পাঠ করিবার অল্পকাল পরে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতি অনেকে অনুকূল হইলেন। আবার ১৮৫৪ সালে ঐ বীঠন সোসাইটীতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও কৈলাসচন্দ্র বসু বাংলা সাহিত্যকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিলে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তদুত্তরে 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫৫) পাঠ করেন এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া বাংলা সাহিত্যের পক্ষ সমর্থন করেন। কাজেই এই শতাব্দীর মধ্যভাগে সংস্কৃত ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রতিও নব্যশিক্ষিত বাঙালীর শ্রদ্ধার দৃষ্টি ফিরিতেছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

ইংরাজী হইতে অনূদিত কাব্য-কবিতার মধ্যে কালীকৃষ্ণ দেবের গ্রে সাহেব প্রণীত ফেব্‌ল্‌স্ এর অনুবাদ 'হিতসংগ্রহ' (১৭৫৭ শক) এবং এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত রঙ্গলালের 'ভেকমূষিক যুদ্ধ' (১৮৫৮)—এই দুইখানির নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। কালীকৃষ্ণের ভাষা অতিশয় নীরস; পয়ার ছন্দে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল না। তিনি 'অনুষ্ঠান পত্রিকা'য় বলিয়াছেন, "অনুবাদকের স্বল্প বুদ্ধ্যনুসারে এবং পণ্ডিত সহকারে নিরন্তর বহুতর যত্নে গ্রে সাহেব প্রণীত

কবিতার যথার্থ ভাবোদ্ধার করণক বঙ্গভাষানুরোধে পয়ার প্রবন্ধে অনুষ্টুপ ছন্দে আদ্যন্তবর্ণের সংযোগ বিয়োগ বিরহে এবং ন্যূনাতিরিক্ত প্রসক্তি পঙ্‌ক্তিরাহিত্যে মূল গ্রন্থাভাসসহ ঐক্যমত প্রকটিত হইল।" এই নীতিকবিতার কাব্যমূল্য অকিঞ্চিৎকব, কিন্তু ইংরাজী নীতি কবিতাব দিকে বাঙালী অনুবাদকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, ইহা স্মরণযোগ্য।

একখানি কাব্যসঙ্কলনেব উল্লেখ করিয়া কাব্যপ্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে। ১৮৫২ সালে মহেন্দ্রনাথ রায় 'কুসুমাবলী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার কাব্যসমূহের সার সংগ্রহ দুইখণ্ড' প্রকাশ কবেন। ইহাই হইতেছে অনাধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম ও সার্থক সঙ্কলন। প্রথমখণ্ডে 'অন্নদামঙ্গলে'র কিয়দংশ, মানসিংহ এবং বিদ্যাসুন্দরেব অশ্লীলতাবর্জিত অংশ এবং 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী'র কিযদংশ সঙ্কলিত হয়। একই বৎসরে প্রকাশিত দ্বিতীয়খণ্ডে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর, মদনমোহনেব বাসবদত্তা এবং অদ্ভুত রামায়ণের নির্বাচিত অংশ স্থান পাইয়াছে। নানা দিক দিয়া এই কাব্যসঙ্কলন বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভূমিকায় সঙ্কলক মহেন্দ্রনাথ রায় লিখিয়াছেন—

"বিশেষ দেবী অনুকম্পা না হইলে কবিত্বশক্তি জন্মান কোনমতে সম্ভব নহে। তৎপ্রমাণ এই যে অধুনা অনেকেই পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে রচনা করিয়া থাকেন।...কিন্তু যদিচ ভারত প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধ রচনা বিশেষ মাধুর্য বিশিষ্ট হইযা অতিমাত্রায় জনকমনীয় হইয়াছে, তথাপি পুস্তক কোনরূপেই ছাত্রপুঞ্জের পাঠোপযোগী নহে। যেহেতু স্থানে স্থানে বিবিধ অশ্লীল বাক্য ও কদর্য ভাষা ব্যবহার হওয়াতে তাহা ভদ্রসমীপে উচ্চার্যও নহে। অতএব এই দোষসমূহ নিবারণার্থে প্রচুর প্রযত্নদ্বারা ঐ সকল অপকৃষ্টভাব ও বীভৎস বর্ণনাদি পরিত্যাগ করিয়া উক্ত কবিদিগের সারভাগমাত্র সঙ্কলন পূর্বক এই গ্রন্থ প্রস্তুত করা গেল।"

প্রধানতঃ অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ছাত্রপুঞ্জের পাঠোপযোগী সঙ্কলন প্রকাশ করিলেও শিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি কোন্‌দিকে ফিরিতেছিল, তাহা অনুমান করা যাইতেছে। অশ্লীল আখ্যান-উপাখ্যান অর্ধশিক্ষিত স্তরে যথেষ্ট জনলোভন হইলেও ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই সাহিত্যিক রস ও রুচির আমূল পরিবর্তন হইতেছিল। উপরন্তু সাধারণ পাঠকসমাজে কোন্ কোন্ কাব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহাও বুঝা যাইতেছে। ১৮৫৪ সালে রঙ্গলাল 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' নামক যে বক্তৃতা মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কবি ও কাব্য হিসাবে কবিকঙ্কণ চণ্ডী, রাজমালা

ভারতচন্দ্র, কীর্তিবাস ('কৃত্তিবাস' নহে), চৈতন্যচরিতামৃত, কাশীরামের ভারত-পাঁচালী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই বক্তৃতা মুদ্রণের দুইবৎসর পূর্বেই মহেন্দ্রনাথ রায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অংশ বিশেষের সহিত শিক্ষিত বাঙালীর পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও কৈলাসচন্দ্র বসু নবলব্ধ ইংরাজী সাহিত্যপাঠের রুচি লইয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দোষ কীর্তন করিলেও শিক্ষিত বাঙালীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি যে ধীরে ধীরে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, মহেন্দ্রনাথের উক্ত কাব্যসঙ্কলনের দুইখণ্ড পাঠ করিলেই সেই সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না।

১। হরচন্দ্র দত্ত অনূদিত লর্ড ক্লাইভ (১৮৫২) গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকা হইতে সঙ্কলিত।

২। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'শিবাজীর চরিত্র অর্থাৎ যবনপ্রমর্দক মহারাষ্ট্রীয় বীর প্রধানের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৬২) গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকা হইতে সঙ্কলিত।

৩। বিদ্যাকল্পদ্রুম, প্রথম কাণ্ড, পৃ ৮০

৪। কৃষ্ণমোহনের উক্তি: "আমাদের ঘোর দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অর্থাৎ পুরাণ ইতিহাসাদি গ্রন্থ সকলি উক্ত হোমরের ইলিয়দের ন্যায় কবিতাতে রচিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের বিবরণে অনেক প্রকার সন্দেহ জন্মে।"

৫। তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে।

৬। বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ড।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইতিহাস, পৃ ১

৮। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত 'নীতিকথা'র প্রথম ভাগের শেষে প্রদত্ত তালিকা হইতে গৃহীত।

৯। এই গ্রন্থের "বিদ্যাসাগর" অধ্যায়ে 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব' আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ সমস্ত গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

১০। এই গ্রন্থের "মদনমোহন তর্কালঙ্কার" নামক অধ্যায়ে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় (১৭৭২ শক, আশ্বিন) প্রকাশিত মদনমোহনের 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

১১। দ্বারকানাথ রায়—স্ত্রীশিক্ষা বিধান, পৃ ১৮

১২। ভূদেব মুখোপাধ্যায়—শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব, পৃ ৪-৫

১৩। ঐ — ঐ পৃ ১৬-১৭

১৪। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 'বৃহৎ কথা'র প্রথম খণ্ডের শেষে প্রদত্ত তালিকা হইতে সঙ্কলিত।

১৫। অবোধ বন্ধু—পৌষ-চৈত্র, ১২৭৫, ১২৭৬

১৬। উপদেশমূলক হইলেও ইহাতে কিছু কিছু আদিরসাত্মক গল্প আছে।

১৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ ৫৭-৫৮

১৮। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শীকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা', মে, ১৮৫৪

১৯। ঐ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬

২০। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লুপ্ত রত্নোদ্ধার ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

সমকালীন নাট্যসাহিত্য

নাটকাভিনয় ও নাট্য সাহিত্য জাতি ও সংস্কৃতির প্রাণ প্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। নাটক সর্বদা অভিনয়ের অপেক্ষা রাখে বলিয়া ইহাকে একটা মিশ্র শিল্প বলা যায়। নাট্যকার রঙ্গমঞ্চ, অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং সহৃদয় 'সামাজিক'—ইহাদের পরস্পর-নির্ভর সহযোগিতার ফলেই নাটক সাহিত্য ও শিল্প হিসাবে একটা স্থায়ী মূল্য পাইয়া থাকে, অবশ্য আধুনিক কালে অভিনয়ের উদ্দেশ্য ভিন্নও পাশ্চাত্যদেশে কিছু কিছু পঠিতব্য নাটক রচিত হইয়েছে। তাহাতে প্রায়শঃই চিন্তাগ্রাহ্য বা বিতর্কমূলক কোন তত্ত্বের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়,—মানুষের তত্ত্বান্বেষী চিত্তের নিকট তাহার যাহা কিছু আবেদন। কাজেই অভিনয়গুণ তাহার প্রাধান বৈশিষ্ট্য নহে। তথাপি পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া বক্তব্যকে প্রাণস্পর্শী করিবার জন্য ঐ জাতীয় নাটকে সুবিস্তারিত ভাবে মঞ্চনির্দেশ অথবা দৃশ্যবর্ণনা ও পাত্র-পাত্রীর কায়িক ও বাচিক অভিনয়-কৌশলের প্রচুর নির্দেশ থাকে। পাঠক ঐ জাতীয় নাটক পাঠ করিবার কালে ঐ বর্ণনাগুলি মনে মনে কল্পনা করিয়া লন এবং তাঁহার মনের মধ্যেই একটা মানসিক রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়—যেখানে নাটকে বর্ণিত পাত্রপাত্রী স্ব-স্ব ভূমিকা অভিনয় করিয়া যায়। য়ুরোপে এই তত্ত্বান্বেষী নাটক বা 'থীসিস ড্রামা' প্রধানতঃ পাঠের জন্য রচিত হইলেও পাঠক-পাঠিকা তাহার মঞ্চ নির্দেশ পড়িবার সময়ে কল্পনাবলে মনে মনে একটা রঙ্গমঞ্চ গড়িয়া তোলেন। উদাহরণ স্বরূপ বার্ণার্ড শয়ের 'গেটিং ম্যারেড্' নামক তত্ত্বপ্রধান নাটকের মঞ্চ নির্দেশ উল্লেখ করা যাইতে পারে। নাটকের প্রারম্ভেই নাট্যকার কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী ঘটনা-সংস্থানের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই একটু কল্পনাপ্রবণ পাঠক সহজেই মনে মনে একটা প্রেক্ষাগার গড়িয়া তুলিতে পারেন। তথাপি আধুনিক কালে শ'য়ের অতিশয় তত্ত্বপ্রধান নাটকও (যথা, ব্যাক্ টু মেথুসেলা, ম্যান এণ্ড সুপার ম্যান প্রভৃতি)

ইংরাপে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছে। সে যাহা হউক, নাট্যাভিনয় নাট্যসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

বাংলা নাটকের আদিপর্ব (১৭৯৫-১৮৫৭) পর্যন্ত নাট্য গ্রন্থগুলি আলোচনা করিয়া আমরা বাঙালীর নাট্য সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ের নাটকগুলির স্বরূপ ও তাহাদের সহিত বাঙালী মনের সম্পর্ক বিশ্লেষণের চেষ্টা পাইব। বলা বাহুল্য এই পর্বে বাংলা নাটক এমন একটা আদিম স্তরে ছিল যে, তাহার মধ্যে শিল্প ও সাহিত্যগত উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য বিকশিত হইতে পারে নাই। তথাপি ঐতিহাসিক কালপর্যায়ের অনুরোধে বাংলা নাটকের এই অপরিণত রূপ আলোচনা করা যাইতেছে।

॥ ১ ॥

লেবেডেফের আবির্ভাব

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাথমিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রধানতঃ ইংরাজী নাটকের অভিনয় দেখিয়াই তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১৭৯৫ সালে ডোমতলা লেনে রুশীয় পরিব্রাজক হেরাসিম লেবেডেফ তাঁহার সদ্যোপ্রতিষ্ঠিত নিউ থিয়েটারে বাঙালী নট-নটীর দ্বারা দুইখানি গীতি-নৃত্যবহুল নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন—ঐতিহাসিক সংবাদ হিসাবে ইহার মূল্য অসাধারণ। লেবেডেফ ইংলণ্ডে গিয়া ১৮০১ সালে *A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects*—নামক ব্যাকরণের ভূমিকায় এই অভিনয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও কম মূল্যবান নয়। তাঁহার ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের নির্দেশে চালিত হইয়া তিনি দুইখানি ইংরাজী নাটক বাংলায় অনুবাদ করিয়া অভিনয় করেন। বলাবাহুল্য তাহা অতিশয় স্থূলধরণের এবং সম্ভবতঃ আদিরসাত্মক প্রহসন, কোন গভীর রসের নাটক নহে। কেন লেবেডেফ পরিহাস-মিশ্রিত নাটক নির্বাচন করিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগের কলিকাতার সাধারণ দর্শকের রুচির পরিচয় পাওয়া যাইবে। লেবেডেফ উক্ত ব্যাকরণের ভূমিকায় বলিতেছেন,

'After these researches, I translated two English dramatic pieces, namely, the Disguise and Love is the Best Doctor, into the Bengali

language, and having observed that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense, however purely expressed—I therefore fixed on those plays, and which are most pleasantly filled up with a group of watchmen, chokey-dars; savoyards, canera, thieves, Ghoonia, lawyers, gumosta; and amongst the resta corps of petty plunderers"১

লেবেডেফ ইংরাজী নাটক হইতে বোধহয় শুধু কাহিনীটুকু লইয়াছিলেন এবং তৎকালীন বাঙালীর রুচি অনুসারে চৌকিদার, পাহারওয়ালা, চোর, ঘুনিয়া, উকিল, গোমস্তা, ডাকাত প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি করিয়া জীবনের লঘু দিকটাকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বোধহয় বাঙালী সমাজের সহিত পরিচিত ছিলেন; তাঁহার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অতি সহজেই ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগেব স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ বাঙালীর রুচি অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। কোন গভীর বিষয় অপেক্ষা পরিহাসতরল জীবনের বাস্তব বর্ণনাই তৎকালীন বাঙালীর নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় মনে হইত। তাই তিনি অনুবাদের পর যখন কয়েকজন পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদেব নিকট ঐ অনুবাদ পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন উক্ত পণ্ডিতগণ নাটকের কোন্ অংশের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতেছিলেন, তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি ঐ ব্যাকরণের ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন:

"When my translation was finished; I invited several Pundits, who perused the work very attentively; and I then had the opportunity of observing those sentences which appeared to them most pleasing; and which most excited emotion; and I presume, I do not much flatter, when I affirm that by this translation the spirit of both the comic and serious scenes were much heightened.... "২

লেবেডেফ 'Serious Scenes' বলিতে বোধ হয় করুণ রসকেই বুঝাইয়াছেন। আমাদের অনুমান, হাস্যরস ও করুণরসের উপর ভিত্তি করিয়া লেবেডেফ ইংরাজী নাটক অনুবাদ বা ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ যখন করুণ ও হাস্যরসাত্মক অংশ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলেন, তখন নাটকের সাফল্য সম্বন্ধে, লেবেডেফ নিঃসংশয় হইলেন। ১৭৯৫ সালে ২৭এ নভেম্বর প্রথম অভিনয় হয়। ৫ই নভেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে যে বিজ্ঞাপন বাহির হয় তাহার প্রতিলিপি দেওয়া যাইতেছে।

Mr. LEBEDEFF'S
New Theatre in the Doomtullah,
Decorated in the Bengalle Style
will be opened shortly, with a play called
The Disguise,
The characters to be supported by performers of both Sexes
To commence with Vocal and Instrumental
Music, called
The Indian Serenede.

To those Musical Instruments which are held in esteem by the Bengallees, will be added European. The words of the much admired Poet Sree Bharot Chandra Ray, are set to Music

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশেব কিছুদিন পরে, ১৭৯৫ সালে ২৬এ নভেম্বর তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে দেখা যায় যে, ২৫নং ডোমতলায় বেঙ্গলী থিয়েটারে ২৭এ নভেম্বর শুক্রবার ৮ ঘটিকায় 'দি ডিস্‌গাইজ' নামক মিলনান্ত নাটক অভিনীত হইয়াছিল। টিকিটের মূল্য যথাক্রমে, বক্স ও পিট—সিক্কা আট টাকা এবং গ্যালারী—সিক্কা চার টাকা। লেবেডেফের দ্বিতীয় নাটক 'লাভ ইজ দি বেস্ট্ ডক্টর' অভিনীত হয় ১৭৯৬ সালেব ২১শে মার্চ। এই দুই অভিনয়ে প্রচুর জন সমাগম হইয়াছিল।

অভিনয় সাফল্যে উল্লাসিত হইয়া ১৭৯৬ সালের ২৪এ মার্চ ক্যালকাটা গেজেটে দর্শকদেব ধন্যবাদ দিয়া লেবেডেফ এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন।

BENGALLY THEATRE

Mr. LEBEDEFF respectfully acknowledges the very distinguished Patronage, the Ladies and Gentlemen of this settlement Subscribers to his Second BENGALLY PLAY honoured him with, and begs leave to assure them, he has

the most grateful sense of the very liberal support afforded him on this occasion and interests they will be pleased to accept his warmest thanks. March 24, 1796.

প্রথম অভিনয়ে বোধ হয় অত্যন্ত জনসমাগম হইয়াছিল, যে জন্য লেবেডেফ দ্বিতীয় অভিনয়ে মাত্র দুইশত দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; এবং বক্স, পিট ও গ্যালারির পৃথক শ্রেণী তুলিয়া দিয়া প্রতি আসনের মূল্য ধরিয়াছিলেন এক মোহর। দ্বিতীয় অভিনয়ের টিকিটের মূল্য অত্যধিক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। লেবেডেফ সর্বোপরি ছিলেন পরিব্রাজক ; তিনি কিছুকাল পরেই লণ্ডনে চলিয়া যান এবং লণ্ডন হইতে ১৮০১ সালে *A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* প্রকাশ করেন। তাঁহার বেঙ্গলী থিয়েটার মাত্র দুইটি অভিনয় করিয়া বন্ধ হইয় গেল।

উপরে ক্যালকাটা গেজেট হইতে বিজ্ঞাপনের যে প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে এবং স্বয়ং লেবেডেফ তাঁহাব হিন্দুস্থানী ব্যাকরণের ভূমিকায় এই অভিনয় ও অভিনীত নাটক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাইতেছি। প্রথমতঃ, নাটক দুইখানি হুবহু অনুবাদ নহে, ভাবানুবাদ মাত্র। কারণ তাহা না হইলে চৌকিদার, গোমস্তা প্রভৃতি স্থানীয় চরিত্র অঙ্কনের সুবিধা হইত না। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' হইতে কোন কোন গান সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তৃতীয়তঃ, 'দি ইণ্ডিয়ান সেরেনেড' নামক ঐকতান সঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতের ব্যবস্থা। বাঙলা দেশে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র এবং কিছু কিছু য়ুরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে এই ইণ্ডিয়ান সেরেনেড গঠিত হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, ইহাতে স্ত্রীভূমিকাগুলি স্ত্রীলোক দ্বারাই অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয়ের ঠিক চল্লিশ বৎসর পরে ১৮৩৫ সালে অক্টোবর মাসে নবীনচন্দ্র বসুর বাটীতে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ে স্ত্রীভূমিকাগুলি সর্বপ্রথম স্ত্রীলোকের দ্বারাই অভিনীত হয়। বিদ্যার ভূমিকায় রাধামণি, রাণী ও মালিনীর ভূমিকায় জয়দুর্গা এবং বিদ্যার সখীর ভূমিকায় রাজকুমারীর অভিনয় সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।[৪] লেবেডেফ ইহার অনেক পূর্বে এই দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই অভিনয়ের দর্শক কাহারা, তাহা অনুমানের বিষয়। দ্বিতীয় অভিনয়-সাফল্যের পর লেবেডেফ "The Ladies and Gentlemen of this settle-

ment subscribers" প্রভৃতিকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। এখানে কলিকাতা-প্রবাসী য়ুরোপীয় নরনারীর কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু বাঙালী দর্শকও ছিল এবং তাহাদের রুচির দিকে চাহিয়াই লেবেডেফ পরিহাসতরল নাটক নির্বাচন করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের কবিতায় সুর বসাইয়া গান রচনা করিয়াছিলেন এবং দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সংযোগে দি ইণ্ডিয়ান সেরেনেডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন বিজ্ঞাপনে বা উক্ত ব্যাকরণের ভূমিকায় বাঙালী দর্শক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই।

লেবেডেফ আশ্চর্য লোক-চরিত্রজ্ঞ ছিলেন, তৎকালীন সাধারণ বাঙালী দর্শকের শিল্পরুচির স্থূলতাটুকু ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন। এই স্থূলতা সম্ভবতঃ তৎকালীন কালীয়দমন যাত্রার সঙ্, মেথর-মেথরানী, কালুয়া-ভুলুয়া প্রভৃতি রঙ্গচরিত্র হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে যুগের যাত্রাভিনয়ে যে করুণ রস ও ভক্তির সংমিশ্রণ থাকিত, এই বিদেশী পর্যটক তাহার মূল্য সম্ভবতঃ বুঝিতে পারেন নাই। ফলে বাঙালীর চিত্তধাতুর মূল স্বরূপ—ভক্তি ও করুণরসের সংমিশ্রণ অনুধাবনও করিতে পারেন নাই। সে যুগের যাত্রাভিনয়ে কিছু কিছু লঘু ধরণের সঙ্ থাকিত, কিন্তু তাহা ছিল কতকটা 'ড্রামাটিক রিলিফ' জাতীয় ব্যাপার। করুণ রস ও ভক্তির সংমিশ্রণে যে জাতীয় কৃষ্ণযাত্রা জনরুচির উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রবণতা লেবেডেফ বুঝিতে পারেন নাই—এদেশে স্বল্পকাল অবস্থান করিয়া কোন বিদেশীর পক্ষে তাহা সম্ভবও নহে।

লেবেডেফ উক্ত নাটক প্রযোজনাকালে বাঙালীর লঘুচিত্ততার দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছিলেন। শুধু বাঙালীর রুচি নহে, সে যুগে কলিকাতায় যে সমস্ত ইংরাজী নাট্যশালা ছিল, তাহাতেও অধিকাংশ সময়ে রঙ্গব্যঙ্গমূলক প্রহসন অভিনীত হইত। লালবাজারের প্লে হাউস (১৭৫৩ সালের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত), ক্যালকাটা থিয়েটার (১৭৭৬), হার্মনিক্যান ট্যাভার্ণ, মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটার (১৭৮৮) প্রভৃতি বিশুদ্ধ ইংরাজী প্রেক্ষাগারে সামাজিক রঙ্গনাট্যই সমধিক অভিনীত হইত। ক্যালকাটা থিয়েটারে *Beaux* নামক কমেডি এবং *Lathe* নামক প্রহসন এবং *Musical Lady. Polly Honeycomb, Tit for Tat* প্রভৃতি রঙ্গনাট্য একাধিকবার অভিনীত হইয়াছিল। শ্রীমতী ব্রিস্টো অতিশয় নিপুণ অভিনেত্রী ছিলেন; তিনিও নিজ নামাঙ্কিত থিয়েটারে বহু প্রহসন অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি কোলম্যান প্রণীত *Polly Honeycomb* নামক প্রহসন

অভিনয় করিয়া অতিশয় সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৮শ শতাব্দীর শেষাংশে কলিকাতার ইংরাজ-সমাজও প্রহসনের রঙ্গব্যঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছিল।[৫] তৎকালীন বাঙালী দর্শকের মধ্যেও রুচির স্থূলতা দেখা দিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? যাহা হউক, লেবেডেফের এই নাটিকাভিনয় সম্বন্ধে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই সম্পর্কে আর কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে।

॥ ২ ॥

এ যুগের লোকাভিনয় ও বাঙালী সমাজ

ইহার পর আমাদিগকে একেবারে ১৮৩৫ সালে আসিতে হইবে। লেবেডেফের পর এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। ১৮২৬ সালে আর একবার ইংরাজী আদর্শে বাঙালীব নাট্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। বোধহয় যাঁহারা ইংরাজ সমাজের ইংরাজী নাটকের অভিনয় দেখিতে যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যেই এইরূপ একটি ধারণার উদয় হয়। কিন্তু প্রস্তাবটি বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। শিক্ষিত বাঙালী ও অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ সাঁসুচি থিয়েটারের ইংরাজী নাটকের অভিনয় দেখিয়া রুচির তৃষ্ণা মিটাইতেন। জনসাধারণ সন্তুষ্ট থাকিত যাত্রাভিনয়ে। কালীয়দমন যাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, প্রভাস মিলন, অক্রূর সংবাদ, নিমাই সন্ন্যাস, নলদময়ন্তী যাত্রা প্রভৃতি বহুকালাগত যাত্রাভিনয় জনপ্রিয় হইয়াছিল, এবং পরমা, প্রেমচাঁদ, শিশুরাম, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাগণ ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত আপনাদের প্রভাব অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণভক্তি, অদৃষ্টলীলা, আদিরস-করুণারস প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করিয়া গীতিপ্রধান যাত্রাভিনয় দীর্ঘকাল বাঙালীর রুচির উপর আধিপত্য করিয়াছিল। এমন কি নবশিক্ষিত ব্যক্তিগণও 'এ্যামেচার যাত্রা' বা সখের যাত্রার দল খুলিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রধানতঃ বিদ্যাসুন্দর জাতীয় আদিরসাত্মক যাত্রাভিনয় করিতেন। বেলতলা, ভবানীপুর, আঁড়িয়াদহ প্রভৃতি অঞ্চলের সখের যাত্রাদল ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে (১৮২২) জনরুচির উপর কিছু প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তবে অধিকাংশ স্থলে কৃষ্ণযাত্রার প্রাধান্য

হ্রাস পায় এবং 'বিদ্যাসুন্দর' 'কলিরাজার যাত্রা' (১৮২১ সালে রচিত ও প্রকাশিত) প্রভৃতি রঙ্গব্যঙ্গ ও আদিরসাত্মক যাত্রাভিনয় প্রচলিত হয়। কিন্তু ক্রমেই রুচি শুদ্ধ হইতে থাকে এবং ভবানীপুরের 'নলদময়ন্তী পালা' (১৮২২) ও জোড়াসাঁকোর রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'নন্দবিদায় যাত্রা' (১৮৪৯) প্রসিদ্ধি অর্জন করে ; রুচিব দিক হইতে পূর্বতন আদিরসাত্মক গীতাভিনয় হইতে এগুলি বোধ হয় পৃথক ধরণের ছিল। ১৮২২ সালে 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদক ভবানীপুরের ভদ্ররুচির যাত্রাভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন। বোধ হয় ভবানীপুর অঞ্চলেই সর্বপ্রথম শিক্ষিত সম্প্রদায় যাত্রাভিনয়ের মধ্যে একটা উচ্চতব আদর্শের সুর এবং সুষ্ঠুতর কলাকৌশলেব সূত্রপাত কবেন। 'সমাচার দর্পণ' এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "ঐ যাত্রাতে নলরাজাব সং* ও দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকাব বাগরাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য এবং গ্রন্থমত পরস্পর কথোপকথন এ অতি চমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তব টাকা চাঁদা কবিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন…।"[৭]

এখানে দেখা যাইতেছে যে, ঐ অভিনয়ে নৃত্যগীতেব সহিত "গ্রন্থমত পরস্পব কথোপকথন" অতিশয় কৌতূহলজনক হইয়াছিল। কারণ ইতিপূর্বে যাত্রাভিনয়ে সঙ্গীতের ভাগ অধিক থাকিত, গদ্যময় উক্তি-প্রত্যুক্তি গানগুলির যোগসূত্র রক্ষা করিত মাত্র, কিন্তু ভবানীপুরের নলদময়ন্তী যাত্রায় সম্ভবতঃ গদ্য উক্তির বাহুল্য ছিল। কারণ 'সমাচার দর্পণে'র সংবাদদাতার নিকট ঐ কথোপকথন-অভিনয় চমৎকার ব্যাপাব মনে হইয়াছিল। উক্ত সংবাদদাতা সম্ভবতঃ সমসাময়িক যাত্রায় গদ্য উক্তির অপ্রতুলতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তিনি এই যাত্রার পাত্র-পাত্রীর গদ্যে কথোপকথনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তবে এই কথোপকথন নিশ্চয় সাধুভাষার ধারা অনুসরণ করিয়াছিল। কারণ তাহার পরেও ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত কোন কোন নাটকের সংলাপে সাধু ভাষা অনুসৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে যে সমস্ত সঙ্গীত-প্রধান যাত্রা জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহার লঘুস্বরে গীত গানগুলিতে কলিকাতার চলতি বুলি ব্যবহৃত হইত। যেমন কৈলাসচন্দ্র বারুইয়ের যাত্রার দলে গেয় প্রভাতের বর্ণনা—

গা তোলরে নিশা অবসান, প্রাণ।
বাঁশবনে ডাকে কাক,

* 'সং—অর্থাৎ নাটকীয় চরিত্র।

মালী কাটে কপি শাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান ॥৮

অথবা, গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার গান—

যাদু এমন কথা কেন বল্লি,
ভোরের বেলা সুখের স্বপন এমন সময় জাগালি।

কিংবা,

ছেঁড়া চুলে বকুলফুলে খোঁপা বেঁধেছ
প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ ?৯

ভবনীপুরের সখের যাত্রার দল নিশ্চয় সাধুগন্ধের ছাঁদে সংলাপ রচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাত্রাভিনয়ে ভদ্ররুচি আর তৃপ্তি পাইতেছিল না। এই সমাজের প্রতিভূস্বরূপ ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৮৮ সালে ২৮ এ জুন 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন, "এতদ্দেশে পূর্বাকালে নাটকের ন্যায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রায় আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমোদপ্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না...।"

সুতরাং "প্রমোদপ্রমত্ত ইতরলোকের রুচির মধ্যেই" যাত্রা গণ্ডীবদ্ধ হইয়া রহিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও যাত্রার প্রতি বিরাগ ভুলিতে পারেন নাই। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' (১৮৫৯ সাল) তিনি যাত্রা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে।" তিনি ক্রোধের বশে যাত্রাকে 'নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ' বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা, নাটকই অনধিকারীর হাতে পড়িয়া যাত্রাভিনয়ে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার মতে, যে পর্যন্ত নাটক আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না করে, সে পর্যন্ত দেশের চিত্ত বিনোদন ব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না। পরবর্তীকালে তারাচরণ শীকদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ও হরচন্দ্র ঘোষ,—যাঁহারা সর্বপ্রথম বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাত করেন, তাঁহারাও যাত্রার উপর আঘাত হানিয়াছিলেন। ১২৫৮ সনে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'কীর্তিবিলাস' নাটকের ভূমিকায় যাত্রাভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা করেন নাই। তাঁহার মতে, "অনেকেই অবগত আছেন যে, বঙ্গদেশে যাত্রা নামে একপ্রকার অভিনয় সাধারণ জনগণের মনোনীত হইয়াছে, বাস্তবিক ইহা মন্দ নহে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা এই অভিনয় ক্রমশঃ

অপকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহাব হেতু এই যে, যাত্রার গীত ও পয়ার রচকেরা অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞ ব্যক্তি, সুতবাং সমস্ত বিরস হইয়া উঠে।"

তাবাচরণ শীকদারও ১৮৫২ সালে 'ভদ্রার্জুন' নাটকের ভূমিকায় যাত্রাভিনয়ের প্রতি বক্র কটাক্ষপাত কবিয়া লিখিয়াছিলেন, "এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপেব বিষয় এই যে, এ দেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসাবে সম্পন্ন হয় না। কাবণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীতদ্বাবা ব্যক্ত কবে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি কবিয়া থাকে।"

১৮৫৮ সালে প্রকাশিত রামনাবায়ণেব অনূদিত নাটক 'রত্নাবলী'র ভূমিকায়ও নাট্যকাব সব্যঙ্গে বলিয়াছিলেন, "যদিচ যাত্রাব প্রতি আমাদিগেরও অসীম অশ্রদ্ধা আছে, তথাপি এককালে সঙ্গীত মাত্র উচ্ছেদ কবা অভিমত কখনই নহে।"

উল্লিখিত তিনটি উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইতেছে যে. ১৯শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে য়ুবোপীয় বাতিব নাট্যাভিনয়েব সূচনা হইলে শিক্ষিত রুচি হইতে সঙ্গীতবহুল যাত্রাভিনয় ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইয়া পড়িল। রামনারায়ণের ন্যায় কিয়দংশে বক্ষণশীল নাট্যকারও যাত্রাভিনয়েব প্রতি 'অসীম অশ্রদ্ধা' প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতাব নাগরিক রুচি কোন্ পবিবর্তনেব মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহা হইতেই তাহা অনুমান কবা যাইবে।

এই গীতাভিনয়েব মধ্যে স্পষ্টতঃ তিনটি স্তর লক্ষ্য কবা যাইবে। ১৮শ শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধ পযন্ত যে গীতাভিনয়েব ধাবা বহিয়া আসিয়াছে তাহা প্রধানতঃ পৌবাণিক—বিশেষতঃ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। ইহার মধ্যে কালীয়দমন পালা এমন জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, সমস্ত যাত্রাই এই সময়ে 'কালীয় দমন যাত্রা' নামে অভিহিত হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহাতে চণ্ডী-লীলা প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী স্থান লাভ কবিল। বাঙালী সে যুগে গীতিপ্রধান ভক্তি ও করুণ রসাশ্রিত বৈষ্ণব ও শাক্ত পৌবাণিক কাহিনীব গীতাভিনয় দর্শনে সন্তুষ্ট ছিল। ক্রমে বিদ্যাসুন্দরের প্রভাবেব তবঙ্গ কলিকাতায় প্রবেশ কবিল। আদিরসেব পঙ্কোন্মত্ততা নাগরিক কলিকাতাব রসরুচিকে নিয়ন্ত্রিত কবিতে লাগিল। ক্রমে আদিরসের সহিত সামাজিক বঙ্গ-ব্যঙ্গও প্রবেশ কবিল। 'কলিবাজাব যাত্রা'র অনুরূপ গীতাভিনয়ে

সামাজিক আচার-আচরণের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীক্ষ্ণতম অস্ত্র বর্ষিত হইতে লাগিল। ইহাই সমসাময়িক যাত্রাভিনয়ের দ্বিতীয় স্তর।

সম্ভবতঃ ১৮শ শতাব্দীর একেবারে শেষে এবং ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই জাতীয় আদিরসাত্মক এবং লঘু পরিহাস-চঞ্চল গীতাভিনয়ের প্রচলন হইয়াছিল। কিন্তু ভবানীপুরের মার্জিতরুচি ভদ্রসম্প্রদায় যে সখের দল খুলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা নলদময়ন্তী পালার সূচনা করিয়া যাত্রার বিষয়বস্তু ও রচনা-রীতির নূতনত্ব সাধিত করিলেন। তাঁহারাই সর্বপ্রথম কৃষ্ণলীলা বা মলিন আদিরসাত্মক কাহিনী বর্জন করিয়া নলদময়ন্তীর নিয়তি-তাড়িত দুঃখ বেদনা ও পুনর্মিলনের কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং গদ্যসংলাপ সংযোজনা করিলেন। গ্রীক নাট্যকার ঈস্‌কাইলাস্ যেমন দ্বিতীয় চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গ্রীক নাটককে সত্যকারের দ্বন্দ্বসঙ্কুল নাট্যে রূপায়িত করেন, ভবানীপুরের যাত্রার দলের মৌলিকতাও প্রায় অনুরূপ ভাবে বাংলা যাত্রাভিনয়ের গতি পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের যাত্রাভিনয়ের অভিনবত্ব নবজাগ্রত জনচিত্তকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারিল না। হিন্দুকলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণ তখন ইংরাজী নাটকাভিনয় দেখিতেছিলেন। তাঁহারা ইংরাজী নাটক পাঠ করিয়া য়ুরোপীয় নাট্যরস সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন; নাট্যাভিনয়ের ক্ষুধা জাগিয়াছে, কিন্তু ক্ষুধার অন্ন নাই। তখন তাঁহারা বিদেশের খাদ্যভাণ্ডার হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া কোনপ্রকারে নাট্যক্ষুধার আংশিক তৃপ্তি করিলেন।

॥ ৩ ॥

ইংরাজী নাট্যাভিনয় ও বাঙালী যুবক

১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজী নাটকের অভিনয় করিবার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর হিন্দু থিয়েটার স্থাপন করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, গঙ্গানারায়ণ সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ ও তারাচাঁদ চক্রবর্তীকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইল। 'সমাচার দর্পণে'র বিবরণ অনুসারে দেখা যায় যে, "ঐ নর্তনশালা ইংলণ্ডীয়েরদের রীত্যনুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে, সে সকলি ইংলণ্ডীয় ভাষায়।"[৪৩] প্রসন্নকুমার সম্ভবতঃ সাঁসুচি থিয়েটারে ইংরাজী নাটকের অভিনয় দর্শনে উদ্বুদ্ধ হইয়া

বেলিয়াঘাটার শুঁড়া অঞ্চলে তাঁহার বাগানবাড়ীতে বাঙালীর রঙ্গশালা স্থাপন করেন—ইহাই হিন্দু থিয়েটার। এখানে শেক্‌সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের কিয়দংশ, উইলসন অনূদিত ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' (অভিনয় তারিখ—২৬এ ডিসেম্বর, ১৮৩১) এবং 'নাথিং সুপারফ্লুয়াস' (অভিনয় কাল—১৮৩২) নামক প্রহসনের অভিনয় সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। হিন্দু থিয়েটার স্থাপিত হওয়ার অনেক পূর্বে ১৭৮৯ সালে ১৫ই অক্টোবর ক্যালকাটা গেজেটে ক্যালকাটা থিয়েটারের এক বিজ্ঞপ্তি বাহির হয়। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, কোন একজন ইংরাজ অনুবাদক শকুন্তলা নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন; তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল—*The Indian Drama of Sukuntolla or "The Fetal Ring"* এই ক্যালকাটা থিয়েটারে এই অনুবাদ অভিনীত হইয়াছিল—বলা বাহুল্য য়ুরোপীয় সজ্জনমণ্ডলীর সম্মুখে।[১৩]

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শুঁড়াস্থিত হিন্দু থিয়েটার অল্পকালের মধ্যে বন্ধ হইয়া গেলেও ইংরাজী নাটকে অভিনয়ের ধারা স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ডেভিড হেয়ার একাডেমির ছাত্রগণের দ্বারা 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' (১৮৫৩), ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে 'ওথেলো' (১৮৫৩) 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' (১৮৫৪), চতুর্থ হেনরী (১৮৫৫), মেরিডিথ পার্কারের 'আমাটোর' এবং প্যারী-মোহন বসুর জোড়াসাঁকো থিয়েটারে 'জুলিয়াস সিজার' (১৮৫৪) অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ইংরাজী নাটকের অভিনয় শিক্ষিত বাঙালী সমাজে কিরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহা দুই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই জানা যাইবে।

বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ইংরাজী নাটকে এমন সু-অভিনয় করিতেন যে, সাঁসুচি থিয়েটারে তাঁহাকে ওথেলোর ভূমিকা অভিনয় করিতে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল এবং তিনি দুইবার ঐ ভূমিকা অভিনয় করিয়া এদেশীয় এবং বিদেশীয় দর্শকগণের অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজ মহিলাও নাটকে বাঙালী অভিনেতার সহভূমিকায় অভিনয় করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। শ্রীমতী গ্রীগ্ (Mrs. Greig) নাম্নী এক পারিদর্শিনী অভিনেত্রী ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' নাটকে পোরশিয়ার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন (১৮৫৪)। ইংরাজ অভিনয়শিক্ষক এবং অভিনেত্রীও বাঙালী তরুণদিগকে

ইংরাজী নাটকাভিনয় শিক্ষা দিতেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও কলিকাতা মাদ্রাসার শিক্ষক মিঃ ক্লিঙ্গার ঐ ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে বাঙ্গালী ছাত্রসম্প্রদায়কে অভিনয়-কলা শিক্ষা দিতেন। প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী ও নর্তকী শ্রীমতী এলিসও কিছুকাল এই তরুণদিগকে অভিনয় শিক্ষা দিয়াছিলেন।

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালী যুবকগণ ইংরাজী অভিনয়ের দ্বারা অভিনয় পিপাসা মিটাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮৫৪ সালেও ইংরাজী অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। প্রায় একই সময়ে বোম্বাই শহরে গ্রাণ্টরোড থিয়েটারে দেশীয় ভাষায় অভিনয় হইতেছিল। কিন্তু কলিকাতায় এক শ্রেণীর ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় তখনও ইংরাজী অভিনয়-সমুদ্রে পাড়ি জমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা দেশীয় ভাষায় অভিনয় করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সমস্ত উপদেশ-অনুরোধ যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তে প্রবেশ করিয়াছিল, এমন মনে হয় না।

অবশ্য ইংরাজী নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ভাষায় অভিনয়ের কিছু চেষ্টা চলিতেছিল। শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাটীতে বৎসরে চার-পাঁচ বার বাংলা নাটক অভিনীত হইত। বোধ হয় এই নাট্যশালা ১৮৩৩ সালে স্থাপিত হয়। কিন্তু অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে ১৮৩৫ সালে। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। ১৮৩৩-১৮৩৫ সালের মধ্যে আর কোন নাটক অভিনীত হইয়াছিল কিনা জানা যাইতেছে না। এই অভিনয়ের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এই নাট্যশালায় স্ত্রী-ভূমিকাগুলি স্ত্রীলোকের দ্বারাই অভিনীত হইত,—এই সংবাদও মূল্যবান।[১৪]

১৮৫৭ সালে নন্দকুমার রায় রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' আশুতোষ দেবের বাটীতে মহা সমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। অবশ্য ইহার পূর্বেও নাটক নামধারী কতিপয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। যথা—

১। আত্মতত্ত্ব কৌমুদী (অর্থাৎ প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ—১৮২২)

২। হাস্যার্ণব (১৮২২)

৩। কৌতুক সর্বস্ব (১৮৩৮—রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার)

৪। অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৪৮—তারক ভট্টাচার্য)

৫। রত্নাবলী (১৯৪৯—নীলমণি পাল)[১৫]

এই রচনাগুলি কদাচিৎ নাট্যসাহিত্যের শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। এই

মাত্র শুধু অনুধাবন করা যায় যে, ইংরাজী নাটকাভিনয়ের মোহ বাঙালীর অনেকাংশে দূর হইয়াছে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারে ইংরাজী নাটক অভিনীত হইয়াছিল। তখনই নিশ্চয় অভিনেতৃবর্গ ও দর্শকবৃন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, নাটকাভিনয়ে দেশীয় বিষয়বস্তু এবং দেশীয় ভাষা ব্যবহৃত না হইলে অভিনয় কখনও প্রাণস্পর্শী হইতে পারে না। তাই ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ অভিনীত হইতে আরম্ভ করে। বাঙালী দীর্ঘকাল "পরধন লোভে মত্ত" হইয়া ভ্রমণ করিবার পর নাট্যসাহিত্যের যথার্থ পথ খুঁজিয়া পাইল।

॥ ৪ ॥

নাটকের নূতন আদর্শ

১৮৫২ হইতে ১৮৫৭, মোট পাঁচবৎসরে যে কয়খানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অবলম্বনে বাংলা নাট্যসাহিত্যের নূতন আদর্শটি বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। ১৮৫৭ সালে যথার্থ যুরোপীয় নাট্যরীতিতে শকুন্তলার অভিনয় হইয়াছিল। উদারপন্থী 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবং প্রাচীনপন্থী 'সমাচার চন্দ্রিকা' —উভয় পত্রে এই অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। এতদিন বাঙালী যথার্থ নাটক আবিষ্কার করিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই অভিনয়কে স্বাগত জানাইয়া লিখিলেন,

'We had well nigh forgotten that we ever had such a thing as a theatre, when an invitation card surprised us with the fact that another Bangallee stage had risen like a Phoenix upon the ashes of its predecessor. The announcement had the further attraction that the play announced was a genuine Bangallee one."[১৬]

এই অভিনয় প্রসঙ্গে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন,

"নাট্যদিগের এই প্রথম চেষ্টা ইহাতে তাহারা যেরূপ নিপুণতার সহিত নাট্যক্রীড়া সম্পাদন করিয়াছেন তাহারদিগের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। পরন্তু কালগতিকে এক্ষণকার ছাত্রদিগের ইংরাজী নাটকের প্রতি যাদৃশী শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তাহার কণামাত্রও কি সংস্কৃত কি বাঙ্গালা কোন নাটকের প্রতি নাই।......ইয়ং বাঙ্গাল বাবু সাহেবেরা নিশ্চয় করিয়াছেন, আমারদিগের বাঙ্গালীর কোন শাস্ত্রাদিতে পারমার্থিক রস ঘটিত কিছুই নাই, যাহা আছে ইংরেজীতেই

আছে। ডুমুরের মধ্যস্থ কীটের পক্ষে ডুমুরই ব্রহ্মাণ্ড তদ্রূপ ইয়ং ব্যাঙ্গল বাবুদিগের ইংরেজীই সর্ব্ববিদ্যা অতএব বিশিষ্ট শিষ্ট হিন্দু সন্তানেরা যদ্যপি কিঞ্চিৎ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সংস্কৃতশাস্ত্রের অন্তর্গত নাটকাদি অনুপম শাস্ত্র দৃষ্টি করেন তাহার কি পর্যন্ত রসমাধুর্য্য আস্বাদে আশ্চর্য্য হইবেন......।".১৭

সুতরাং 'শকুন্তলা' অভিনয়কে সকলেই বাঙালীর নিজস্ব অভিনয় মনে করিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন; ইংরাজী-অভিনয়-নিগড় হইতে বাঙালী মুক্তি পাইতেছিল বলিয়া এই যুগের বাঙালীর চিত্তে স্বদেশী ভাষা ও নাট্যকলার প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হইতেছিল। ১৮৫২-৫৭ সালের মধ্যে রচিত নাটক ও নাট্যকারের নামোল্লেখ করা যাইতেছে :—

১। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত—কীর্তিবিলাস (১৮৫২)
২। তারাচরণ শীকদার—ভদ্রার্জুন (১৮৫২)
৩। হরচন্দ্র ঘোষ—ভানুমতী চিত্তবিলাস (১৮৫৩)
৪। রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪)
—বেণীসংহার (১৮৫৬)
৫। কালীপ্রসন্ন সিংহ—বাবু নাটক (১৮৫৪)
৬। নন্দকুমার রায়—অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৫৫)
৭। উমেশচন্দ্র মিত্র—বিধবা-বিবাহ (১৮৫৬)
৮। রাধামাধব মিত্র—বিধবা মনোরঞ্জন (১৮৫৬)
৯। উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়—বিধবোদ্বাহ (১৮৫৬)
১০। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—চপলা চিত্তচাপল্য (১৮৫৭)
১১। বিহারীলাল নন্দী—বিধবা-পরিণয়োৎসব (১৮৫৭)

উল্লিখিত নাটকসমূহের মধ্যে নন্দকুমার রায়ের অনূদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' বাঙালী নাট্য-রসিকগণের মনে কিরূপ উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার তিন বৎসর পূর্বেই বাংলা নাট্য-সাহিত্যে ভাববস্তু ও রচনারীতিগত নূতনত্ব সঞ্চারিত হইয়াছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) ও তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন (১৮৫২) একই বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দুইজন নাট্যকার অভিনয়ের উদ্দেশ্যে এই দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা মঞ্চস্থ হয় নাই বলিয়া পাঠক সমাজে তাহার বিশেষ কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে না। বরং ইহার তিন বৎসর পরে

রচিত নন্দকুমার রায়ের 'শকুন্তলা'র অভিনয় অধিকতর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র ও তারাচরণের নাটক দুইখানি অভিনীত হইলে বোধ করি বাঙালী দর্শক নন্দকুমারের পূর্বেই নূতন নাট্যরসের আস্বাদন লাভ করিতে পারিতেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র, তারাচরণ ও হরচন্দ্র ঘোষ ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন; ইংরাজী নাটকের প্রতি তাঁহাদের অধিকতর আকর্ষণ ছিল। কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র ও তারাচরণ বাংলা নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, এজন্য তাঁহাদের নাটক দুইখানি নানা দিক দিয়া বহুলাংশে মৌলিক হইলেও অভিনয়-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। হরচন্দ্র ঘোষ কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারের সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৮৩১ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'সমাচার দর্পণে' এই হিন্দু থিয়েটার গঠন-পরিকল্পনার যে বিবরণী বাহির হইয়াছিল, তাহাতে এই ব্যাপারের অন্যতম উদ্যোগী বলিয়া হরচন্দ্র ঘোষেরও নাম ছিল। কিন্তু এই তিনজন বাংলা নাট্য-সাহিত্যে নূতন বিষয়বস্তু, ভাবধারা, রচনারীতির অগ্রপথিক হইলেও তাঁহাদের নাটক অভিনীত হয় নাই—ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'কীর্তি-বিলাস' (১৮৫২) বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিয়োগান্ত নাটক; তিনি বাঙলাদেশের প্রথম নাট্য সমালোচক। এই নাটকের ভূমিকায় তিনি, কেন বাংলা ভাষায় বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিতেছেন, তাহার দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। এ্যারিস্টটল, সিনেকা ও শেক্সপীয়রের উল্লেখ করিয়া নাট্যকার ঐ ভূমিকায় বলিয়াছেন,

'ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময় তাঁহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাই। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তিমাত্র। জীবন ধারণ করিলেই ইষ্ট অনিষ্ট উভয়েরই ভোগী হইতে হইবে, ধার্মিক হইলেই যে আপদগ্রস্ত হইতে হইবে না, এমন নহে।

'অপিচ ধর্মশীল ব্যক্তি ক্লেশপ্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণে অধিক শোক হয়, সুতরাং যে করুণাভিনয়ে অধর্ম বিরুদ্ধে পুণ্যবান ব্যক্তির প্রাণত্যাগ, সে করুণাভিনয় দেখিলে অধিক তাপ জন্মে।'

এখানে যোগেন্দ্রচন্দ্র ট্র্যাজেডির বাহ্য লক্ষণ একপ্রকার ধরিতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষে কেন ট্র্যাজেডির উৎপত্তি হয় নাই, তাহার কারণ সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বিশেষ কৌতুকজনক। একটু উদাহরণ দেওয়া গেল—

'দেশবিদেশে মানুষগণের মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। শীতল দেশবাসিগণ স্বভাবতঃ প্রগাঢ় চিন্তায় মুগ্ধ হইতে অভিলাষ করে, কিন্তু উষ্ণদেশীয় লোকেরা হাস্যরসে প্রবৃত্ত। বঙ্গদেশ অতিশয় উষ্ণ সুতরাং বঙ্গদেশীয় লোকেরা হাস্তরসাভিনয় অবলোকন করিতে সর্বদাই অভিলাষী।'

নাট্যকার নানা দিক দিয়া বিয়োগান্ত নাটকের যৌক্তিকতা সমর্থন করিয়াছেন এবং ভৌগোলিক উষ্ণতাকেই ভারতীয় ট্র্যাজেডির অপ্রতুলতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সাহিত্য ও জীবনের গভীরতর সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁহার কোন প্রগাঢ় ধারণা ছিল না; যদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, ভারতের আলঙ্কারিকগণ যে বিয়োগান্ত রচনাব নিষেধ করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ—ভারতের জীবন-দর্শনের অনন্যসাধারণ মৌলিকতা। জীবনকে যদি কর্মবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায়, এবং বিশ্ব-বিধানের মূলে বিশ্বনিয়ন্তার যৌক্তিক কার্যপরম্পরা নির্দেশ করা যায়, তাহা হইলে বিয়োগান্ত শিল্পসৃষ্টি ভারতীয় মতে রসাভাসে পরিণত হইবে। "ধর্মশীল ব্যক্তি ক্লেশপ্রাপ্ত হইলে" কর্মবাদের অস্তিত্ব অসার্থক হইয়া পড়ে। জীবনের দোষগুণ, অপরাধ-অনপরাধ সবই যদি ব্যক্তির কৃতকর্মের ফল হয়, তাহা হইলে ধর্মশীল ব্যক্তির ক্লেশপ্রাপ্তি স্বতোবিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। সম্ভবতঃ ভারতীয় মনের এই বিচিত্র দার্শনিক প্রবণতার জন্য বিয়োগান্ত নাটক বচনা নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

বাঙলা দেশের বহু প্রচলিত রূপকথা 'শীতবসন্ত' ও 'বিজয়বসন্ত' নামক আখ্যানে বিমাতার অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। নাট্যকার যোগেন্দ্রচন্দ্রও সেই কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে শেক্সপীয়রেব হ্যামলেট নাটকের আখ্যানের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। নাটক হিসাবে ইহা অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নাই; লেখক য়ুরোপীয় রীতিতে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করিতে চাহিলেও আঙ্গিকের দিক দিয়া সংস্কৃত নাটকের নান্দী সূত্রধার প্রভৃতি রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। নাটকটি যে অভিনীত হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ, এই কাহিনীর মধ্যে চমৎকারিত্ব নাই, পূর্বাহ্লেই সকলে ঐ কাহিনীর আখ্যান ভাগ জানিত; দ্বিতীয়তঃ নাটকটির রচনারীতি ও ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে কিছুমাত্র চিত্তাকর্ষক বস্তু ছিল না। এই সকল কারণে যিনি সর্বপ্রথম য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডির অনুকরণে নাটক লিখিলেন, তাঁহার এই সাহিত্যকৃতি আদৌ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে

পারে নাই। তবে তিনি বাংলা নাটকের গতিপথে নূতন বেগ সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার্য।

এই নাটক প্রকাশের কয়েক মাস পরেই তারাচরণ শীকদার 'ভদ্রার্জুন' নাটক (১৮৫২) প্রকাশ করেন। নানা দিক দিয়া এই নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারাচরণ ইহাতে সংস্কৃত নাটকের রীতি পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজি নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে তিনি নূতন রীতি সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করিয়া বলিয়াছেন,

"এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাসংস্থানের নির্ণয বিষযে ইউরোপীয় নাটকের প্রায় হইয়াছে কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয নাই। সংস্কৃত নাটকসম্মত কয়েক জন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই ; যথা, প্রথমে নান্দী তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য এবং বিদূষক ইত্যাদি।"

শুধু রচনার আঙ্গিকেই নহে,—বিষয়বস্তু, চরিত্র ও সংলাপে যোগেন্দ্রচন্দ্র অপেক্ষা তারাচরণ অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ১৮২২ সালে ভবানীপুরের সখের যাত্রার দল পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে 'নলদময়ন্তী'র পালা অভিনয় করিয়াছিলেন ; তারপর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে মহাভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে তারাচরণ পৌরাণিক নাটকের সার্থক সূচনা করিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রচনা রীতিতে য়ুরোপীয় নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ করেন নাই। অপরদিকে তারাচরণ মহাভারতীয় মিলনান্ত ঘটনা গ্রহণ করিলেও রচনা রীতিতে ইংরাজী নাটকের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। অবশেষে নাটকের শেষে বলদেবের উক্তিতে ঠিক ট্র্যাজেডি না হইলেও বিষণ্ণ চিত্তের হতাশা ধ্বনিত হইয়াছে। সুভদ্রার্জুন পরিণয়ে বলদেবের ইচ্ছা লঙ্ঘিত হওয়াতে খণ্ডিত-মনোরথ কৃষ্ণাগ্রজ নাটকের সমাপ্তির মুখে সক্ষোভে বলিয়াছেন—

এমন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহবাসে
লোকালয়ে না রহিব আর।
ছাড়ি সবে মম আশ সুখে কর গৃহবাস
সব আশা ঘুচেছে আমার॥

এখানে নাট্যকারের অজ্ঞাতসারে বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

হরচন্দ্র ঘোষ শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে ১৮৫৩ সালে 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' রচনা করেন। নাটকটি প্রধানতঃ স্কুল-কলেজের

পাঠ্যপুস্তক রূপেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার রচনারীতি এত অপরিপক ও জটিল যে, স্কুল-কলেজের পাঠ্য হইতে পারে নাই। তিনি ইহার কিছুকাল পরে শেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' অবলম্বনে 'চারুমুখ চিত্তহরা' (১৮৬৪) প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার কোন নাটকই জনপ্রিয় হয় নাই, অভিনীতও হয় নাই—যদিও 'চারুমুখ চিত্তহরা'র মধ্যে চলিত ভাষার প্রয়োগে নাটকীয় ঘটনা বেগবান হইয়াছে।

'ভদ্রার্জুন' নাট্যবচনার যে আদর্শ স্থাপন কবে, তাহাতেই পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ কৌতূহল জাগ্রত হয়। অবশ্য পববর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাশ্রিত পৌরাণিক নাটকের প্রভাব বাঙালীর মনে দৃঢ়মূল হইয়াছিল। 'ভদ্রার্জুন'কে কোনক্রমেই ঐ জাতীয় নাটকের শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। হরচন্দ্র ঘোষ তাঁহার প্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাসে' ব্যর্থকাম হইয়াই বোধ হয় তারাচবণ শীকদারের প্রভাবে 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮) নাটক বচনা করেন। কিন্তু এই নাটকেও তিনি কোন নূতন কলা-কৌশল বা উচ্চতর বিষয়বস্তুর পরিচয় দিতে পাবেন নাই।

সংস্কৃত নাটকের অনুবাদগুলি কিন্তু 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' বা 'চারুমুখ চিত্তহরা' অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল। রামনাবায়ণের 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭) এবং নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' (১৮৫৫) জনচিত্তে নাট্যরস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল; তাহার প্রধান কারণ, ভারতীয় কাহিনীগুলির সহিত জনসাধারণের কিছু পরিচয় ছিল। তদুপরি রামনারায়ণ ও কালীপ্রসন্নের রচনাকৌশল হরচন্দ্রের অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ জ্যোতিন্দ্রনাথের পূর্বে রামনাবায়ণই সংস্কৃত নাটকের সার্থক অনুবাদ প্রকাশ করিয়া প্রাচীন নাটকের সহিত বাঙালীর পরিচয় করাইয়া দেন। তাঁহার 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' (১৮৬০) এবং 'মালতী মাধব' (১৮৬৭) ইত্যাদি নাটক একদা সাধারণ বাঙালীর নাট্যরুচিকে বিশেষভাবে পরিমার্জিত করিয়াছিল। রামনারায়ণ য়ুরোপীয় নাটক সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন; তথাপি তাঁহার স্বভাবজাত নাট্যপ্রতিভা তাঁহাকে নাট্যকার হিসাবে কিছু সাফল্য দান করিয়াছিল। 'নাটুকে রামনারায়ণ' সংস্কৃত নাটকগুলির অভিনয়যোগ্য রূপ দিতে গিয়া ভাষাকে যথাসাধ্য মৌলিক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কোন কোন

স্থলে চরিত্রগুলিকেও ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া বাঙালীর রুচি ও অভিজ্ঞতার অনুরূপ করিয়া লইয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন 'বিক্রমোর্বশী' নাটক (১৮৫৭) এবং 'মালতীমাধব' নাটক (১৮৫৯) অনুবাদ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের মধ্যে দুইটি সত্তা ছিল—একটি মহাভারতের অনুবাদক সত্তা, আর একটি 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় প্রকাশিত সত্তা। একদিকে তিনি গভীর, 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে'র প্রতিষ্ঠাতা, 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র সম্পাদক, আর একদিকে তিনি ব্যঙ্গবিদ্রূপের নক্শাকার। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদে তাঁহার ক্লাসিকপন্থী মনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮) নামক পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা সূচিত হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার অনুবাদ-নাটক এবং 'সাবিত্রী সত্যবানে'র ভাষায় মহাভারতের অনুবাদকের গুরুগম্ভীর রীতিই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে; ফলে প্রায় কোথাও নাট্যরস জমিতে পারে নাই। কিন্তু কয়েকখানি নাটক সু-অভিনীত হইয়াছিল। 'বিদ্যোৎ-সাহিনী রঙ্গমঞ্চে' তাঁহার অনূদিত 'বিক্রমোর্বশী' নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল (২৪এ নভেম্বর, ১৮৫৭)। 'সংবাদ প্রভাকর' তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুচরদিগকে এই ব্যাপারের জন্য অভিনন্দিত করিয়া লিখিয়াছিলেন, "এতদ্দেশীয় নাট্যক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের গোচরপথের অগোচর রহিয়াছে, তাহার পুনরুদ্দীপনে যাঁহারা যত্নশীল হইতেছেন, আমরা সাধুবাদসহযোগে অগণ্য ধন্যধ্বনি সম্বলিত তাঁহারদিগকে নমস্কার করিতেছি।" এই বৎসর, ইহার দেড়মাস পূর্বে (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭) আশুতোষ দেবের বাড়ীতে 'মহাশ্বেতা' নাটকের অভিনয়ও সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।[১৮] পৌরাণিক নাটক বাঙালীর চিত্তে যে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ মাইকেল মধুসূদন রামনারায়ণ অনূদিত 'রত্নাবলী' অভিনয় দর্শনে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া নিজেই পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্রতী হইলেন; তাঁহার প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা (১৮৫৮) পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনেই লিখিত।

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রই সর্বপ্রথম বাঙালীর স্বাদেশিক চিত্তকে একটা নবজাগ্রত কৌতূহলে ভরিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, অক্ষয়কুমার য়ুরোপীয়

জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শন, দেবেন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক চর্চা এবং রাজেন্দ্রলালের ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-ইতিহাস অনুশীলন নবশিক্ষিত বাঙালীর মানস-আকাশকে একটা বিপুল বিস্তার দান করিয়াছিল। নাটকেও সংস্কৃত অনুবাদ ও পৌরাণিক অনুসৃতি প্রাচীন সাহিত্য ও জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলে। এমন কি কালীপ্রসন্নের অনূদিত নাটক ও মৌলিক নাটকের নাটকীয়তা ও ভাষা নানা দিক দিয়া দুর্বল হইলেও শুধু উচ্চ আদর্শ সমন্বিত বিষয়বস্তুর জন্য সে যুগে অভিনীত হইয়া এই নাটকগুলি প্রচুর খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তখনও পৌরাণিক নাটকের বিশেষ কোন মান বা অদর্শ স্থিরীকৃত হয় নাই। যে-কোন একটি নীতিমার্গীয় বা আদর্শদ্যোতক করুণ, বীব বা আদিবসাত্মক কাহিনী দর্শকদের মনোরঞ্জন কবিত। পরবর্তী কালে মনোমোহন ও গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির ভক্তিভাব বাঙালীর পৌরাণিক বসাশ্রিত চিত্তে একটা স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই যুগে (১৮৫২-১৮৫৭) আর একপ্রকার নাটক বচিত হয় যাহা মূলতঃ সমাজ-সমস্যামূলক, কিন্তু ইব্‌সেনের সামাজিক নাটকের অনুরূপ নহে। ১৯শ শতাব্দীতে সমাজের বহু অনাচার ক্রমে ক্রমে উচ্চশিক্ষিত বাঙালীর প্রতিবাদ জাগ্রত করিয়া তোলে, এবং কতকটা সমাজ-কল্যাণের অনুরোধে প্রচারধর্মী, রঙ্গব্যঙ্গমূলক নক্‌শা জাতীয় নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। ইহাতে একটা লঘু সামাজিক জীবনের চিত্র থাকিলেও ইব্‌সেনের সে সামাজিক সুদৃঢ় প্রত্যয় ও জিজ্ঞাসা নাই। প্রধানতঃ কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহ এই তিনটি সামাজিক বিষয় অবলম্বনে অনেকগুলি নাটক রচিত হয়। ভবানীচরণের পুস্তিকা-গুলিও ঐ একই উদ্দেশ্যে রচিত। 'কলিরাজার যাত্রা', 'কামরূপ যাত্রা',[১৯] 'কৌতুক সর্বস্ব নাটক', 'রমণী নাটক', 'প্রেম নাটক' প্রভৃতিতেও সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গ অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে, কোন কোনটিতে আবার ব্যঙ্গ তীব্রতর করিবার জন্য রুচিকে সগর্বে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ 'রমণী নাটকে'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে বিবাহিতা রমণীর যে ভ্রষ্টাচার বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অন্তরালে হয়তো কোন সৎ সামাজিক অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু রচনাবস্তু অতিশয় ইতর রুচির ভোজ্যে পরিণত হইয়াছে।

প্রথমতঃ 'ইয়ং বেঙ্গলদের' কদাচারের প্রতি শানিত ব্যঙ্গোক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন কুসংস্কারের প্রতি আক্রমণ এবং নব ভাবাদর্শের প্রতি অনুকূল আন্দোলন

—এ যুগের সামাজিক নকশা বা প্রহসনগুলির প্রধান লক্ষণ। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটক' (১৮৫৩) সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই নাটকটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য সরবরাহের উপায় নাই, কারণ আমরা ইহার কোন কপি দেখি নাই। অবশ্য 'হুতোম পেঁচার নকশা'র লেখকের লেখনী হইতে কোন্ ধরণের প্রহসন বাহির হইতে পারে, তাহা অনুমেয়। ১৮৫৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' কালীপ্রসন্ন একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন—"পূর্বে প্রায় দুইবৎসর গত হইল আমি একবাব বাবুনাটক নামক গ্রন্থ রচিয়া প্রকাশ করি কিন্তু তাহা এক্ষণে এমত পুনরায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে, কত লোক চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায় মুদ্রিত করিবার অভিলাষি, যদ্যপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নামধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক, মূল্য ৷৷০, বিনা স্বাক্ষরকারী ৷৵০ আনা মাত্র।" এই বিজ্ঞাপন দৃষ্টে মনে হইতেছে যে, মুদ্রণের দুই বৎসবের মধ্যে এই নাটকের সমস্ত কপি নিঃশেষ হইয়াছিল, অথচ অভিনয় হইয়াছিল—এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। ১৮৫৩ সালে কালীপ্রসন্ন 'বিদ্যোৎসাহিনী' রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করেন।[২০] এই রঙ্গমঞ্চেও তাঁহার প্রথম নাটক অথবা প্রহসন অভিনীত হয় নাই, ইহা বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই। আমাদের অনুমান, পরবর্তী কালে ঐ 'বাবুনাটকে'র উপাদান হইতেই 'হুতোম পেঁচার নকশা'র (১৮৬২-৬৩) জন্ম লাভ ঘটে। এই প্রহসনে 'বাবু' অর্থাৎ "ঠনঠনের হটাৎ অবতারগণের" এমন নির্মম চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছিল যে, স্বয়ং নাট্যকারও হয়তো এই নাটক অভিনয় করাইতে সাহসী হন নাই। যে কারণে মধুসূদনের প্রহসন ('একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ') দীর্ঘকাল অভিনীত হয় নাই, এই নাটক অভিনীত না হওয়ার অন্তরালে ঐ একই কারণ বর্তমান থাকা সম্ভব। ১৮৫৫ সালে তিনি 'বাবু নাটক' পুনঃপ্রকাশের জন্য যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, তাহার পরেও ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। প্রকাশিত না হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ উহা মুদ্রিত হইলে সংবাদপত্রাদিতে তাহার উল্লেখ থাকিত। এই নাটকটি সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। এইটুকু শুধু অনুমান সাপেক্ষ যে, হয়তো কালীপ্রসন্ন ইয়ং বেঙ্গলদের অনভিপ্রেত আচারকেই এই নাটকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

সমসাময়িক সমাজের কদাচারের উপর কঠিন আঘাত করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন; তাঁহার 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) তাঁহাকে বাংলা নাট্যসাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সমকালীন অন্যান্য নাটক-নাটিকাকে প্রত্নপ্রেমিক ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস-রচনাকারগণ ধূলিস্তূপ হইতে মাত্র বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে উদ্ধার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু গত শতাব্দীর বিস্মরণীর সমুদ্র পার হইয়া এই নাটকখানি শুধু বক্তব্য বিষয়ের চমৎকারিত্বের জন্য অধুনাতন কালেও পৌঁছিয়াছে। এই যুগে অর্থাৎ ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের অব্যবহিত পরে বিদ্যাসাগরের সামাজিক আন্দোলনের প্রারম্ভেই বাঙালীর সমাজ-জীবনের যে প্রথাগুলি দীর্ঘকাল লালিত হইয়া কদাচারে পরিণত হইয়াছিল, বাঙালী সমাজ-সংস্কারকামী ব্যক্তিগণ সেই কুপ্রথাগুলিকে প্রহসনের দ্বারা নির্মমভাবে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। কৌলীন্য, বহুবিবাহ এবং বিধবাবিবাহের উপরেই কঠিনতম অস্ত্র বর্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রামনারায়ণ তাঁহার ব্যঙ্গ-প্রহসনের তূণ হইতে শানিত শায়ক বাহির করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় সামাজিক শত্রুকে (কৌলীন্য ও বহুবিবাহ) আঘাত করেন। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক (১৮৫৪) কৌলীন্য প্রথা এবং ১৮৬৬ সালে বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথাকে 'নবনাটকে' আক্রমণ করা হয়। তন্মধ্যে শেষোক্ত নাটকটির সম্বন্ধে এখানে আলোচনার অবকাশ নাই, কারণ আমরা ১৮০০ হইতে ১৮৫৭ সালের মধ্যে রচিত গ্রন্থাদি হইতেই বাঙালীর মানসজীবনের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছি।

রামনারায়ণ আদর্শ সতীর জীবনী 'পতিব্রতোপাখ্যান' লিখিয়া সর্বপ্রথমে বাঙলা দেশের সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। পরে রংপুর জেলার কুণ্ডী গ্রামের জমিদার কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সংবাদপত্রে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, "বল্লালসেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব কুলীনকুলসর্বস্ব নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তাঁহাকে ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।" ইতিপূর্বে ঐ ভূস্বামীর বিজ্ঞাপন অনুসারে রামনারায়ণ 'পতিব্রতোপাখ্যান' লিখিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়বারও তিনি এই পুরস্কার লাভ করিলেন এবং ১৮৫৪ সালে এই নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। ইহার প্রথম অভিনয় হয় নূতন-বাজারের রামজয় বসাকের বাড়ীতে (মার্চ, ১৮৫৭)। নাট্যাকারে প্রকাশিত হইবার পরও প্রায় তিনবৎসর

ইহার কোন প্রকার অভিনয়ের চেষ্টা করা হয় নাই। অভিনয়ের বিলম্বের কারণ, আমাদের অনুমান, কুলীনদিগের নিকট হইতে বাধা আসিতে পারে, এই আশঙ্কায় হয়তো কেহ এই নাটকাভিনয়ে অগ্রসর হয় নাই। বাস্তবিক কুলীন ব্রাহ্মণগণ এই নাটকের উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। ১৮৫৮ সালে এই নাটক চুঁচুড়ায় মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্থানীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণ ইহাতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল। সে সংবাদ হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল—

"The acting of the 'Kooloshurboshwo Natuck" at Chinsurah has, it appears, given great offence to the Koolins of the locality.. ...The acting took place in the house of a gentleman of the Banya caste and the Coolin Brahmins intend, it is said, to retaliate in kind." (The Hindu Patriot, July 15, 1858)[২১].

অবশ্য কুলীন ব্রাহ্মণগণের এই বিরোধিতা বেশীদূর গড়ায় নাই বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। ১৮৫৮ সালে গদাধর শেঠের বাড়ীতে 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র তৃতীয় অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে বিদ্যাসাগর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীমোহন মিত্র প্রভৃতি তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।[২২]

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক অভিনয়-সাফল্য অর্জন করিলে বাঙালীর সামাজিক কদাচারের উপর আক্রমণ করিয়া নানাবিধ নক্‌শা জাতীয় অথচ সাহিত্য-গৌরব-হীন অকিঞ্চিৎকর প্রহসন রচিত হয়। কিন্তু উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬) ব্যতীত ঐ শ্রেণীর আর কোন নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র নিকটেও যাইতে পারে নাই। অবশ্য রামনারায়ণ পুরাদস্তুর সংস্কৃতমতে এই প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, এমন কি কথোপকথনেও সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ ভদ্রজনের সাধুবাক্য, সাধারণের গ্রাম্য উক্তি এবং মহিলাদের কলিকাতা 'ককনী' ভাষা বজায় রাখিয়াছেন। সাধুভাষা অতিশয় আড়ষ্ট, কৃত্রিম ও প্রাণহীন। এক বিরহীর উক্তি উল্লেখ করা যাইতেছে—

"এই সূর্যমণ্ডল দেখিতে দেখিতে আরক্ত বর্ণ হইল, এই কমলিনী-নায়ক নিজ নায়িকা কমলিনীর প্রতি যে অনুরাগরাশি অপ্রকাশিত রূপে স্বকীয় মনোমন্দিরে রাখিয়াছিলেন, সম্প্রতি বিয়োগ হৃদয় বিলীন হইবাতে ঐ সঞ্চিত অনুরাগরাশি গলিত হইয়া প্রকাশ পাইল, তাহাতেই কি আদিত্য মণ্ডল আরক্ত বর্ণ হইতেছে?"

ইহার শূন্যগর্ভ আলঙ্কারিকতা সহজেই ধরা পড়িবে। কিন্তু এক রমণীর নিম্নলিখিত উক্তিটিতে পরিচিত জীবনের স্পর্শ পাওয়া যাইতেছে:

"নাতনি! আর বলিস্‌নে—বলিস্‌নে, বুক ফেটে যায়! (সজল নয়নে) হারে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি, কে তোকে কুলের ছিষ্টি কত্তো বলেছিল? কুল ত নয়, এ কুলের আঁটি—বড় কঠিন। যার কুল আছে, ·· ক দয়া নেই, ধর্ম নেই, কর্ম কেই? আহা! আহা! কি দুঃখু! কি দুঃখু! নাতনি! তুই আর কাঁদিসনে।............তবু কাঁদ্দে লাগলি? আহা ছেলে মানুষ! বোন! কি কর্বি তা বল? এই দেখ দেখি, আমরা কি কচ্চি! তোত্তো আছে, আমার যে নেই তা কি কর্বো!"

নাটকখানি প্রহসনের শ্রেণীভুক্ত হইলেও ইহার মধ্যে বহু স্থলে সহজ মানব জীবনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। নাট্যকার মুখোসের অন্তরালে মুখশ্রী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার এই নাটকখানির সাহিত্যিক মর্যাদা প্রশ্নাধীন, কিন্তু পরবর্তী কালে সমাজ-আন্দোলনে এই নাটকের আদর্শ বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছিল। ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইলে বাঙালী নাট্যকার সামাজিক নক্‌শা বা প্রহসনরচনার নূতন আহার্য পাইল। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' (১৮৫৬), উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্বাহ' (১৮৫৫), রাধামাধব মিত্রের 'বিধবা মনোরঞ্জন' (১৮৫৬), যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলা চিত্তচাপল্য' (১৮৫৭), বিহারীলাল নন্দীর 'বিধবা-পরিণয়োৎসব' (১৮৫৭) প্রভৃতি নক্‌শা জাতীয় রচনায় বিধবা-বিবাহ সমর্থিত হইয়াছিল। কিন্তু নাট্যকলা, রচনারীতি ও অভিনয়-সৌকর্যের দিক হইতে উমেশ মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা দেখাইবার জন্য উমেশচন্দ্র এবং অন্যান্য সমশ্রেণীর নাট্যকারগণ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উমেশ মিত্রই বালবিধবা সুলোচনার মৃত্যুতেই নাটক সমাপ্ত করিয়াছেন। নাটকটীতে সর্বপ্রথম সামাজিক সমস্যাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা হইয়াছে এবং লেখক সামাজিক দুর্নীতির সম্মুখে আসিয়া রুচির অনুরোধে মধ্য পথে ক্ষান্ত হন নাই, সমস্যার মূল পর্যন্ত অনুসন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন। বালবিধবা সুলোচনা অন্তঃসত্ত্বা হইয়া লোকলজ্জা এড়াইবার জন্য বিষপানে আত্মহত্যা করে, ইহাই নাটকটির মূল ঘটনা। ইহা প্রহসন শ্রেণীর নহে, নক্‌শাও নহে; সত্যকারের বিয়োগান্ত নাটক। ইতিপূর্বে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাসে' বিয়োগান্ত চিত্র আছে বটে, কিন্তু তাহা আদৌ জনপ্রিয় হয় নাই। 'কীর্তিবিলাস' রচনার চার বৎসর পরে উমেশ মিত্রের বিধবা বিবাহ নাটক প্রকাশিত হয়। নাট্যকার ইংরেজীতে লিখিত ভূমিকায় বলেন,

"This, the author believes, is the first attempt made to introduce the regular tragedy into Bengalle drama."

এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, উমেশ মিত্র 'কীর্তিবিলাসে'র নামও জানিতেন না। অথচ তিনি নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ ছিলেন, এই ভূমিকাতেই তাহার প্রমাণ আছে। তাঁহার উক্তি—

"A comedy can never well attempt to alter popular opinions tragedy in most cases can, and that for obvious reasons."

এই নাটক রচনার পশ্চাতে বিদ্যাসাগরের প্রভাব ছিল বলিয়া অনুমতি হইতেছে। কারণ উমেশচন্দ্র ১২৭২ বঙ্গাব্দে 'সীতার বনবাস' নাটকের ভূমিকায় বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত সীতার বনবাসই এই নাটকখানির আদর্শ বলিতে হইবেক। ইহার অনেক স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অবিকল ব্যবহার করিয়াছি, যেহেতু সীতার বনবাস যতদূর সুললিত অথচ পবিত্র গদ্যে লিখিত হইয়াছে, অল্প আয়াসে তাদৃশ রচনা হওয়া সুকঠিন··· ।"

১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে এপ্রিল মাসে উমেশচন্দ্রের 'বিধবা-বিবাহ' রামগোপাল মল্লিকের বাটিতে অভিনীত হইয়াছিল এবং তৎকালীন সংবাদপত্রে ইহার প্রচুর প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। ইহার প্রথম অভিনয়ে কেশবচন্দ্র সেন স্টেজ ম্যানেজারের কার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন।[২৩] বিদ্যাসাগর এই অভিনয় দেখিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেন।[২৪]

বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত অন্যান্য নাটকগুলি অধিকাংশ স্থলে নক্শা শ্রেণীর এবং উগ্র আদিরসগন্ধী। তাহা হইলেও ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, নানাবিধ সামাজিক আন্দোলন কিভাবে এই সমস্ত নাটক প্রহসনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। একদিকে ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, পৌরাণিক নাটক রচনার চেষ্টা, অন্যদিকে সমসাময়িক সমাজ-আন্দোলনের ধারা। ১৮৫২-৫৭ সাল, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর নাটক রচিত হইয়াছিল। বাঙালী সাহিত্যের মারফতে নবসমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছিল, ইহা একটা ঐতিহাসিক সত্য। এই নাটকগুলি নাটক হিসাবে যতই ব্যর্থ হউক না কেন, বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি বিচারে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইবে।

উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটকাভিনয়ের ঠিক পাঁচ মাস পরে বাংলা নাট্যসাহিত্যে ও বাংলা সাহিত্যে যুগান্তরেব সমুদ্র-ঝটিকা প্রবেশ করিল। ১৮৫৯ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। ১৯শ শতাব্দীব প্রথমার্ধ হইতেই বাংলা দেশ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যেব মধ্যে নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল ; বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের ফলে ১৯শ শতাব্দীব মধ্যভাগে নানা সামাজিক আন্দোলন বাঙালীর স্থাবর চিত্তে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিল; গৃহসুপ্ত বাঙালী নবজাগৃতিব রূঢ় আলোকসম্পাতে বিহ্বল হইয়া পড়িল ; ক্রমে সে বিহ্বলতা হ্রাস পাইয়া জীবনবোধ ও চেতনায় সৃষ্টিশীল প্রত্যয় ফিরিয়া আসিল। এই যুগেব নাটকের মধ্যে বাঙ্গালীব সেই উদ্বেগ ও উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।

পাদটীকা

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ ৪ পাদটীকা।

২। ঐ, পৃ ৪

৩। *Calcutta Gazette*, 17th March, 1796.—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

৪। ঐ, ঐ, পৃঃ ১৪-১৬

৫। H. N. Dasgupta—*The Indian Stage, Part 11*

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ—উল্লিখিত গ্রন্থ পৃ ৭-৮

৭। সমাচার দর্পণ, ১৮২২ ; ব্রজেন্দ্রনাথের ঐ গ্রন্থ, পৃ ৯

৮। অজিতকুমার ঘোষ—বাংলা নাটকের ইতিহাস, ২য় সং, পৃ ১১

৯। H N, Dasgupta—*The Indian Stage*, Vol. 1,

০। ব্রজেন্দ্রনাথের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ১১

১১। বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ, ১৭৮০ শক

১২। সমাচার দর্পণ, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩১

১৩। H. N. Dasgupta—*The Indian Stage*, Vol. 1,

১৪। ব্রজেন্দ্রনাথের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ১৩-১৫

১৫। ব্রজেন্দ্রনাথের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ২৮–৩০

১৬। ঐ, পৃ ৩২

১৭। ঐ, পৃ ৩৩

১৮। ঐ পৃ ৩৫

১৯। ঐ, পৃ ৯

২০। সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১নং পুস্তিকা

২১। ব্রজেন্দ্রনাথের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৪০

২২। ঐ. পৃ ৩৭-৩৮

২৩। ঐ, পৃ ৫০

২৪। Protap Chunder Majumdar—*Life and Teachings of Keshab Chundra Sen.*

উপসংহার

খ্রীঃ ১৮০০ হইতে ১৮৫৭ সাল—মোট সাতান্ন বৎসরের সাহিত্যের রূপ ও রীতি আলোচনা করিয়া আমরা বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির জীবনধারার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেটুকু সাহিত্য বিকশিত হইয়াছে, হয়তো তাহার অতি সামান্য অংশই সাহিত্যেব পংক্তিভোজে আহূত হইতে পারিবে। তথাপি বাঙালীর জীবনে নবযুগের তরঙ্গ-কল্লোল যে আঘাত হানিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা এই অধ শতাব্দীর সাহিত্যের পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে। যেদিন য়ুরোপীয় জীবনবাদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইংরাজী ভাষার দৌত্যে ঝড়ের বাহন হইয়া বাঙালীর অর্গল-রুদ্ধ মানস-দ্বারে আঘাত করিল, সেদিন বাঙালীর সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি-চৈতন্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার উগ্রসুরা তরুণ বাঙালীর শিরায় মৃতসঞ্জীবনী সুধা রূপে প্রবাহিত হইল। আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির ইহাই নবজীবনায়ন। ইংলণ্ডের দ্বৈপায়ন সংস্কৃতিকে নীলকণ্ঠের ন্যায় বাঙালী পান করিয়াছে, স্বীয় চিত্ত-ধাতুতে গ্রহণ করিয়াছে এবং সঙ্কুচিত জীবনধারাকে সম্প্রসারিত করিয়াছে। বাঙ্গালীর বহমান প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনবোধের সহিত নবাগত অপরিচিত ঐতিহ্যের প্রাথমিক সংঘর্ষের ফলে তাহার প্রতিক্রিয়া ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাহিত্যে কী ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাই অনুসন্ধান প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে সমসাময়িক সাহিত্য, সাময়িকপত্র ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচিত হইল। ১৮৫৭ সালের পর প্যারীচাঁদ, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে ১৯শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ নবযুগান্তরের সম্মুখীন হইল। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাহারই প্রস্তুতি চলিয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সাহিত্য নবপ্রতিভার অম্লান স্বাক্ষরাঙ্কিত হইয়া বাঙালীর জীবনকে বিচিত্র বিস্ময়রসে ভরিয়া তুলিয়াছিল—তাহা আর এক যুগের কাহিনী। তবে ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য যে প্রথমার্ধের সাহিত্যে সুপ্ত ছিল, এবং তাহাই পরার্ধে অনুকূল অবহাওয়ার প্রভাবে অযুত শাখা-বিস্তারী অক্ষয়বটের মহিমা লাভ করিয়াছে—উহা আলোচ্য পর্বের সাহিত্য বিচার করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে।

॥ সমাপ্ত ॥

পরিশিষ্ট

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী-মানস

॥ ১ ॥

প্রাচীন মিশরীয় পুরাণে আছে যে, ফিনিক্স পাখী জরাগ্রস্ত হলে নিজেই চিতা জ্বালিয়ে নিজেকে আহুতি দেয়, আর তার পরে সেই চিতাভস্ম থেকে নব কলেবর নিয়ে বেরিয়ে আসে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের চিতাভস্ম থেকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের জন্ম হলে সেই পুরাতন গল্পটাই সুপ্রমাণিত হ'ল। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য এমন একটা অনন্যরূপের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে যে মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালীর সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাধনার সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুস্তর ব্যবধান ঘটে গেছে। আমরা যে মন নিয়ে মধুসূদন পড়ি, আমাদের সেই মন কি মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রে তৃপ্তি পেতে পারে? পলাশীর আম্রকাননের তুচ্ছ ঘটনাটি বাঙলাদেশকে যে বিস্ময়কর তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে, বাঙলার ইতিহাসে সেইরকম ঘটনা খুব সুলভ নয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন দেবদেবীর লীলা প্রাধান্য লাভ করেছে, একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করে থাকেন। খ্রীস্টীয় দশম শতক থেকে ভারতচন্দ্রের তিরোধান পর্যন্ত প্রায় আটশ' বছর ধ'রে বাঙালী শুধু দেবদেবী বা অবতারকল্প মহামানবের লীলাকথা গান করেছে। বৌদ্ধ সহজিয়ামত, বৈষ্ণব আদর্শ, চৈতন্যজীবনকথা, লোকধর্মকেন্দ্রিক মঙ্গলকাব্য, শাক্তপদাবলী, বাউলগান, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ বা সারানুবাদ—এর পশ্চাদপটে রয়েছে দৈবচেতনার প্রত্যক্ষ প্রভাব। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনতত্ত্ব যেদিন বাঙলাদেশে আগন্তুকের মতো প্রবেশ করল, সেদিন থেকে বাঙালীর সমস্ত প্রাক্তন সংস্কারের পরিবর্তন আরম্ভ হল, তা সেদিন বোধহয় অনেকেরই দৃষ্টিগোচর হয়নি। মধ্যযুগীয় বাঙালীর সাহিত্য দেবতাপ্রধান, উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে বাঙালীর ভৌমজীবনের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা। তাই একে কেউ কেউ 'উনিশ শতকী রেনেশাঁস' বলতে চান। য়ুরোপে মধ্যযুগের অবসানে গ্রীক-রোমক শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের প্রভাবে এবং নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও নূতন দিকদিগন্ত আবিষ্কারের ফলে খ্রীস্টীয়

'দশ-অনুজ্ঞা'-বন্দী মানুষ বিশ্বমানবতার (*L'uomo Universale*) উদার প্রাঙ্গণে মুক্তি পেল। উনিশ শতকের বাঙলাদেশেও অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে ও কালে প্রায় অনুরূপ ব্যাপারই ঘটল। ইংরাজী ভাষার মারফতে পাশ্চাত্য জীবনবাদ, সাহিত্য, শিল্প ও নীতিশাস্ত্রের মানবমুখী ভাবাদর্শের ফলে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বাঙালীর মনে, সমাজজীবনে, রাষ্ট্রাদর্শে ও সাহিত্যে সেই মানবচৈতন্যের নিগূঢ় বাণী বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল—অবশ্য কলকাতা ও শহরতলী ছেড়ে গ্রামবাঙলার প্রাণের গভীরে সে জীবন-অভীপ্সা সঞ্চারিত হতে বিলম্ব হয়েছিল।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ইংরাজী সাহিত্যে নর্মান বিজয়ের চেয়েও গভীরতর। কারণ এ্যাংলো-স্যাকশন্ ও নর্মান সংস্কৃতির মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও তার মূল য়ুরোপীয় জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত। নানা কারণে এ্যাংলো-স্যাকশন চরিত্রে একটা দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা ঘনিয়ে এলেও নর্মান বিজয়ের পর তার আত্মসঙ্কোচন অনেকটা ঘুচে গেল। তা হলেও এই দুই জীবন-প্রত্যয় এমন কিছু বিসদৃশ ও বিজাতীয় নয়। কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পয়ার লাচাড়ী ছন্দে পাঁচালীর ধীর-মন্থর পদক্ষেপ, আর দেবদেবীদের 'চৌতিশা', নারীগণের পতিনিন্দা প্রভৃতি তুচ্ছ 'কাব্যকলাকুতূহল' কোন্ দিগন্তে ভেসে গেল—যখন প্রতীচ্য জীবনজলোচ্ছ্বাস বন্যাবেগে বাঙালীর স্থাবরত্বে প্রচণ্ডভাবে আহত হ'ল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য আর উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে মৌলিক প্রভেদ।

কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা চিন্তা করা দরকার। মধ্যযুগীয় দেবপ্রধান বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাস্তবধর্মী সমাজ-সচেতন ও মানবমুখী—এককথায় আধুনিক হ'ল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য যদি নিছক দেবকথায় পূর্ণ থাকত, তাহলে পাশ্চাত্য জীবনবাদী সাহিত্য ও সংস্কৃতি এ জাতির কাছে কখনও এত আগ্রহে গ্রাহ্য হ'ত না। ইংরেজের বাণিজ্যের কুঠি বাঙলার বাইরেও স্থাপিত হয়েছিল; কিন্তু ভারতের অন্য কোন প্রদেশে বাঙলাদেশের উনিশ শতকী রেনেশাঁসের মতো কোন নবজাগরণ ঠিক এই রকম সর্বব্যাপী, দার্শনিক ও আত্মিক সংস্কারে ছড়িয়ে পড়েনি কেন?

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দৈবপ্রাধান্য খুব প্রকটভাবে ধরা পড়েছিল। কিন্তু আরও একটু গভীরে অনুপ্রবেশ করলে দেখা

যাবে যে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দেবতার কথা নানা ছন্দে বিবৃত হলেও তার অন্তস্তলে মানবমুখিতার সুর প্রচ্ছন্নভাবে বয়ে যাচ্ছে ; চর্যাগীতিকা থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত প্রবাহিত বাংলা সাহিত্যে এই মানবমহিমা কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও-বা পরোক্ষে স্বীকৃত হয়েছে। পূর্বভারতে শাক্ততন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে বহুকাল থেকে। শাক্তের 'ভুক্তিমুক্তি' তত্ত্বই হোক, বা আদিম অস্ট্রিক সংস্কারই হোক, যে কোন কারণে বাঙলার সাহিত্য, সংস্কার, শীল, চর্যা, কৃত্য-ব্রত প্রভৃতিতে বাস্তব মানুষের প্রভাব পড়েছে। সাধনমার্গে যে বারবার 'কায়া-সাধনা'র কথা বলা হয়েছে, বাউল যে দেহমূলাধারে সহস্র দলের মর্মমধু পান করেছে, এর মূল তাৎপর্য হচ্ছে মানুষ। 'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এই সহজিয়া ছত্রটিতে অবশ্য নব্য মানবতন্ত্রের সাক্ষাৎ স্বীকৃতি নেই, বরং এতে গূঢ় রহস্যপূর্ণ 'আরোপসিদ্ধি'র কথাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দৈবচেতনার উল্টো পিঠে যে মানুষের কথা লেখা আছে, তা একটু অবধান করলেই বোঝা যাবে। সেইজন্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা মানুষের মতো ত্রুটি-বিচ্যুতি দুর্বলতা দিয়ে গড়া, বৈষ্ণব পদাবলীর 'উজ্জ্বল রস'-এর অন্তরালে তৃষাতপ্ত মানুষের কথাই প্রচ্ছন্নভাবে ধরা পড়েছে। এই মানবচেতনা—যা অষ্টাদশ শতাব্দীর আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লবের পথ ধরে এসেছে এবং এদেশে নূতন ভাবাদর্শ সৃষ্টি করেছে, তা পুরোপুরি পাশ্চাত্য দান হলেও বাঙালীর অন্তর্জীবন ও সাহিত্যে তার আভাস অনেক পূর্ব থেকেই ছিল ব'লে য়ুরোপীয় শিক্ষাসংস্কৃতি ক্ষণকালের জন্য সুরার মতো উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও—পরে তা-ই প্রাণসঞ্জীবনী সুধা হ'য়ে উঠল।

॥ ২ ॥

বাঙালী-মানস ও বাংলা সাহিত্যের পক্ষে উনবিংশ শতাব্দী শুধু একশ বছরের সমাহার নয়, বাঙালীর জীবন ও সাধনার যথার্থ পরিচয়—যা মিশ্র হয়েও মূল ঐক্য থেকে বিচ্যুত হয়নি, তার গঠন-প্রকৃতির ইতিহাস নানা বৈচিত্র্য-পূর্ণ ও বিশেষ কৌতূহলজনক। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কথাই ধরা যাক। এর প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে মুঘল রাজমহিমার দীপ নিভে গেলেও ইংরাজ আধিপত্য স্থাপিত ও কার্যকরী হতে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছিল ; তার ফলাফল ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা লাভবান হ'তে বাঙালীর আরও কিছু সময় লেগেছিল। ১৮১৪

সালের দিকে রামমোহন যখন কলকাতায় আবির্ভূত হলেন এবং ১৮৬১ সালে যখন মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হ'ল, তখনই বাঙালীর জীবন ও মননে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। রামমোহন নৈয়ায়িক পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। বেদ বেদান্ত-উপনিষদ-তন্ত্র, যাতেই তাঁর নিষ্ঠা থাক না কেন, মূলতঃ তিনি নব্যন্যায়ের শেষ প্রতিনিধি। তবে নব্যন্যায় একটি মানসিক ব্যায়াম মাত্র, আব রামমোহনের 'ন্যায়'—ন্যায়পরতার সঙ্গে যুক্ত, মানববোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যৌক্তিক পারম্পর্যের সারভূত, প্রত্যভিজ্ঞামূলক বিজ্ঞানবুদ্ধিব দ্বারা পদে পদে নিয়ন্ত্রিত। রামমোহন বাংলা গদ্যকে শান দিয়ে তীক্ষ্ণধার আয়ুধে প্রস্তুত করেছিলেন। তাতে বুদ্ধির জড়ত্বকে দ্বিখণ্ডিত করা যায়, কিন্তু বাগ্‌দেবীর চরণবন্দনায় তা' যথোপযুক্ত নয়। সে যাই হোক, রামমোহন নির্মোহ জ্ঞানবাদের সাহায্যে মানব-চৈতন্যের বস্তুস্বরূপকে বুঝে নিয়েছিলেন, প্রাচ্য অধিমানসকে পাশ্চাত্য অধিভূতের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। এ রকম ক্ষত্রিয়োচিত বীর্য এবং ব্রাহ্মণোচিত সাত্ত্বিকতা ইদানীং দুর্লভ।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়বে। রামমোহন যখন (১৮৩০) বিলাত যাত্রা করেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র দশ বৎসবেব বালক মাত্র; সংস্কৃত কলেজে তখন বছর-খানেক ধরে তিনি ব্যাকরণ পড়াশুনা করছিলেন। বিদ্যাসাগরকে আমরা দয়ার সাগর, বাংলা গদ্যের জনক, স্ত্রী শিক্ষার প্রচারক, বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, প্রভৃতি সদ্‌গুণে গুণবান ও বিপ্লবী মনোভাবের পুরোধা বলেই জানি। সূর্য গাছকে শ্যামসমারোহে ভরিয়া তোলে, জীবজগৎকে প্রাণমন্ত্র দান করে, ওষধিকে পরিপক্কতা দেয়—এ সবই সত্য। কিন্তু তারও চেয়ে বড় সত্য—সূর্য দিবা জ্যোতির্ময় বহ্নি-বলয়; অগ্নিজ্বালাই তাকে সৌরমণ্ডলের অধিপতি করেছে, তেজের প্রাণবীজ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই রকম বিদ্যাসাগর মানবপ্রেমী, 'হিউম্যানিস্ট'—যাই হোন না কেন, আসলে তিনি প্রেম ও মননের পারম্পরিক আকর্ষণে-বিকর্ষণে ব্যাকুল। পুরাতন জীবনাদর্শের মধ্যে লালিত হলেও তিনি সেই যুগে এমন সমস্ত অদ্ভুত কথা চিন্তা করলেন যে, তাঁর প্রভাব শুধু বাংলা গদ্যসাহিত্যে নয়, বাঙালীর নবজাগরণকে মানবমুখী করে তুলেছে। দেহ-দশাধীন মানুষের প্রতি তাঁর যে অন্তহীন স্নেহানিকা ছিল, তার প্রেরণা তিনি অন্তর থেকেই পেয়েছেন। প্রাণের দীপশিখাটিকে তিনি উনিশ শতকের বহ্নিকুণ্ড থেকেই জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সম্ভবতঃ পারমার্থিক সত্যে

সংশয়বাদী ছিলেন, তাঁর পক্ষে নিরীশ্বরবাদী হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। ব্যারন হল্‌বাখ্‌ *System de la nature* গ্রন্থে বলেছিলেন, "If we go back to the beginning, we shall always find that ignorance and fear have created gods." বিদ্যাসাগর স্বচ্ছন্দে একথা বলতে পারতেন।

অগুয়েস্ত কোঁতের মতো বিদ্যাসাগর মানুষকে নিয়েই চিন্তিত হয়েছিলেন, ব্যাকুল হয়েছিলেন। সেই মানব-ধর্ম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকট হ'য়ে পড়ল। মধুসূদন সেই নূতন মন্ত্র ঘোষণা করলেন। যাকে ফরাসী ভাষায় 'Eclaircissement' অর্থাৎ নবজাগরণের যুগ বলা হয়েছে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলাদেশে সেই প্রভাস্বর প্রজ্ঞার যুগ ('The Age of Illumination') সৃষ্টি করেছে। এই নবযুগপ্রেরণা শিক্ষিত বাঙালীর মন ও প্রাণের ধাতুধর্মকে বিচলিত করল, রাজসিক উল্লাসে ব্যাকুল ক'রে তুলল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে চলেছিল তার প্রস্তুতি। রামমোহন-বিদ্যাসাগর সেই মানবযজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ করেছিলেন, মধুসূদন তাতে অগ্নিসংস্কার করলেন।

যে মানবতন্ত্রবাদ মানুষের কবোষ্ণ হৃদপিণ্ডটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে, ক্ষয়-ক্ষতি, পাপতাপ সত্ত্বেও মানবযাত্রাকে মহৎ মূল্য দিয়ে অভিনন্দিত করে—মধুসূদন যেন তারই প্রভাবে সমস্ত শতাব্দীর ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও জীবনযৌবনের বাধাহীন মুক্তিকে ত্বরান্বিত করলেন। অথচ মধুসূদন ক'বছরই বা বাংলা সাহিত্যে বিচরণ করেছিলেন? ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৬, এই ক'বছরের মধ্যেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের সমাপ্তি হয়। মাইকেল শুধু পয়ারের বেড়ী ভাঙেননি, আমাদের দেশের দীর্ঘকালের সংস্কার ও মূল্যবোধকে বিচূর্ণ ক'রে এমন একটা ঝড়ের সঙ্কেত নিয়ে এলেন যে, পূর্বতন জীর্ণ সংস্কার কেঁপে উঠল। অবশ্য সে ঝড়ের সঙ্কেত একটা অদ্ভুত খাপছাড়া কিছু নয়, পাশ্চাত্য জাগ্রত জীবনের জয়োল্লাস আমাদের ভাঙা ভিতের ওপর বার বার যে আঘাত হানছিল, তারই সূক্ষ্ম চৈতন্যরূপী প্রকাশ ঘটল মধুসূদনের মহাকাব্যে। মধুসূদন শুধু কবিমাত্র নন, বা মিল্টনের মতো "Justify the ways of God to men" এই মতানুবর্তী হয়েও কাব্য রচনায় ব্রতী হন নি। তাঁর রচনায় সমস্ত সংস্কার নীতিদুর্নীতির প্রাচীর ডিঙিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মানবধর্মে একেবারে অনাবৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করল। মাইকেলের মহাকাব্যে ব্যাকরণ-অলঙ্কার-ঘটিত কিছু কিছু ত্রুটি আছে, দুচার স্থানে

সঙ্গতিবোধের অভাবও যে নেই, তা নয় ; কিন্তু তবু তারই মধ্য থেকে উনিশ শতকের বাঙালীর প্রাণবেদনা ফুটে উঠেছে।

॥ ৩ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ যেমন নানাবিধ সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে উচ্চকিত হ'য়ে উঠল, তেমনি তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যেও তার ঢেউ লাগল। একদিকে নীল-আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে কৃষক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহযোগিতা, অপরদিকে হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত এবং তারই সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের চেষ্টার ফলে বাঙালীর জড়চিত্তে এল প্রচণ্ড আঘাত। বস্তুতঃ রামমোহন, মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর—তিনজনের চরিত্র ও প্রতিভা সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরের হলেও বাঙালী-মানসের জড়ত্ব মুক্তির জন্য এঁদের ক্রিয়া-কর্ম যে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনজনেই প্রচলিত লোকসংস্কারের ওপর প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিলেন। রামমোহন-বিদ্যাসাগর সমাজের বহিরঙ্গে আঘাত দিয়েছিলেন, মধুসূদন তার অন্তর-চেতনায় বজ্রাঘাত করেছিলেন।

উনিশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশকে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা আন্দোলন চলছিল এবং এঁদের মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদল সংক্রান্ত বিরোধের বীজ জলসিঞ্চিত হচ্ছিল। রামমোহন পুরাণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শুধু পুরাণের বিরোধী ছিলেন না, সমস্ত উপনিষদকেও পুরোপুরি স্বীকৃতি দেন নি, এমন কি জ্ঞানবাদী অক্ষয়কুমারের প্রভাবে তিনি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকলেও অযৌক্তিক ও অন্যায় দেশাচারকে সর্বথা ঘৃণা করতেন। সুতরাং উনিশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশকে হিন্দু সমাজের লোকাচার ও পুরাণাশ্রয়ী মতের শোচনীয় অবস্থা ঘনিয়ে এল। অবশ্য মধুসূদনের শিষ্যস্থানীয় নবীনচন্দ্র তাঁর 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' এবং অন্যান্য কাব্যে আবার হিন্দুর পুরাণপ্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হলেন। কলকাতায় অবস্থানকালে কিছু দিন কেশবচন্দ্রের কলুটোলার বাড়ীতে যাতায়াত করলেও তিনি মূলতঃ ছিলেন পৌরাণিক ভক্তিবাদী। অবশ্য সে পুরাণকে তিনি আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার অনুকূলে ব্যাখ্যা করেন এবং প্রাচীন পুরাণ-কথাকে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার শুরু করেন। তাতে তিনি রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের কাছে কিছু নিন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু পুরাণকথাকে

আধুনিকীকরণের পশ্চাদপটে তদানীন্তন যুগমানসই জয়ী হয়েছে। 'রৈবতক' (১৮৮৭) যখন প্রকাশিত হ'ল তখন পৌরাণিক সংস্কারের পুনর্জাগরণ শুরু হয়ে গেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রথম যৌবনে ডিরোজিওব শিক্ষায় কিছু কালের জন্য হিউম-পন্থী হলেও পরে ভারতীয় পবাবিদ্যা এবং পাশ্চাত্য অপরাবিদ্যাকে আশ্চর্য উদারতার দ্বারা এক সমন্বয়ের সূত্রে গ্রহণ করলেন। সর্বোপরি তিনি সমাজ ও পাবিবারিক জীবনেব মধ্যে একটা সুস্থ যৌক্তিক ক্রম-বিকাশকে লক্ষ্য করেছেন। তিনিও মত ও পথের দিক থেকে বহুলাংশে পুবাণ-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। এই সময়ে নাটকে গিবিশচন্দ্রেব চেষ্টায় ভক্তিমূলক পৌরাণিক আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে বেশ প্রচার লাভ কবেছিল; অবশ্য গিবিশচন্দ্রেব নাটকগুলি সাহিত্যের দিক থেকে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি নয়।

যাঁরা পুরাণকথাকে অস্বীকার ক'বে বেদবেদান্তেব ওপর ধর্মমতের ভিত্তি করেছিলেন এবং উনিশ শতকেব ষষ্ঠ দশকের মধ্যেই হিন্দুর পৌবাণিক আদর্শ ও বহু দেববাদকে অযৌক্তিক প্রমাণ ক'বে ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদকে শরণ্য বলে গ্রহণ করলেন (কিন্তু মায়াবাদকে পরিত্যাগ করলেন), তাঁরা হলেন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র এবং পরে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নব্যব্রাহ্মদের অন্তর্বিরোধের ফলে যখন ব্রাহ্মমত ও আদর্শ ত্রিধা ভাগ হয়ে গেল, তখন বাংলা সাহিত্য ও সমাজে আবার পৌরাণিক মতেব নব অভ্যুদয় লক্ষ্য করা গেল। একেই হিন্দু-ধর্মেব পুনর্জাগরণ বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই নব আন্দোলনের নেতা, উপদেষ্টা ও মন্ত্রদ্রষ্টা। ইতিপূর্বে পুরাণকথাকে অলীক কথা ব'লে অনেকে পরিত্যাগ করেছিলেন; ব্রাহ্ম সমাজ ও ডিরোজিও-শিষ্যেরাই তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তু বাঙলাদেশে কোন দিনই পৌরাণিক সংস্কৃতি বিনাশ পায়নি। ব্রাহ্ম সমাজের প্রবল আধিপত্যের যুগেও কৃষ্ণকাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সমাজে পুরাণকথা বিশেষ জনপ্রিয়তালাভ করেছিল। নবীনচন্দ্র, শিশিরকুমার ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—এঁরা হিন্দুর পুরাণ ও কৃষ্ণতত্ত্বকে কোথাও সমাজদর্শন, কোথাও বা ভক্তিদর্শনের সাহায্যে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে সঞ্চারিত করেছিলেন। এমন কি কেশবচন্দ্রও কৃষ্ণের মহামানবত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বাঙলা তন্ত্রের দেশ বটে, কিন্তু কৃষ্ণকথা উনিশ শতকের বাঙালী-মনে যে কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা এখন আমাদের কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম

দশকের দিকে বাঙালীমনের এই দিকটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। ব্রাহ্ম-সমাজ তখন অন্তর্বিরোধের ফলে কিছু দুর্বল হয়ে পড়েছে। নব্য ব্রাহ্মেরা কেশবচন্দ্রের ভক্তির উচ্ছ্বাস, 'নরদেবপূজা' এবং অন্তঃপ্রেরণা থেকে প্রাপ্ত আপ্তবাক্যে আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। তখন তরুণ সম্প্রদায়ের মনে যুক্তি-বাদী সমাজসংস্কার এবং গ্যারিবল্ডি, মাৎজিনি, কাভুরের রাজনৈতিক আদর্শ ও উপায় প্রচ্ছন্ন বিক্ষোভকে ধূমায়িত করে তুলছে। সুরেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি নব্য ব্রাহ্মেরা ধর্মীয় মতভেদ ও কলহ থেকে সরে গিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে মুক্তির পথ খুঁজছেন—প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬)। আই. সি. এস. কর্ম থেকে সদ্য-বরখাস্ত সুরেন্দ্রনাথ তখন দেশের যুব-শক্তিকে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার ব্রত নিয়েছেন। য়ুরোপীয় nationalism-এর রক্তচক্ষু এঁদের চোখেও ঘোর সৃষ্টি করেছে। এতদিন ধরে ইংরাজ সরকার ও শাসনের বিরুদ্ধে যে মৃদু প্রতিবাদ জমে উঠছিল, সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তাই বজ্রাগ্নিতে ভেঙে পড়ল। এক দিকে যেমন রাজনীতির ঘটনাবর্ত দেশের যুবশক্তিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল, ঠিক তেমনি প্রায় এই সময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে এবং তাঁর শিষ্যদের সহযোগিতায় শিক্ষিত হিন্দু সমাজে একটা নবজীবনোল্লাসের প্রবল আলোড়ন এসে পড়ল।

বঙ্কিমচন্দ্র সর্বোপরি ঔপন্যাসিক; বাঙালীর জীবনের বৈচিত্র্যকে তিনি উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কখনও রোমান্সের জ্যোতির্ময় প্রান্তর থেকে, কখনও ধূসর ইতিহাসের বিবর্ণ অলিন্দ থেকে, কখনও বা দুঃখ-দুর্ভর দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর উপন্যাসের শিল্পবিচার বর্তমান প্রসঙ্গ বহির্ভূত; কিন্তু মহৎ জীবনের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে তিনি যে কয়েকটি মানব-মানবীর হাসি-কান্নার ছবি এঁকেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি হয়তো কিছু বিরূপ হবেন। সে যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র মানুষকে জোলা-মোপাসাঁর মতো কেবলমাত্র জীবধর্মী প্রাকৃত মানুষরূপে ভাবতে পারেন নি। যে নীতি জীবননীতি বা মানবনীতির পরিপন্থী নয়, তিনি সেই বিশেষ রকমের জীবন-নীতির পক্ষ নিয়েছিলেন বলে ইদানীং পাঠক ও সমালোচকগণ বঙ্কিম-চন্দ্রকে পুরোপুরি স্বীকৃতি জানাতে পারছেন না। কিন্তু গোটা মানবজীবনকে যে পরিমাণে এবং যতদূর সম্ভব নানাভাবের মুকুরে প্রতিফলিত করা সম্ভব, তা তিনি

করেছিলেন। শুধু উপন্যাসই তাঁর প্রতিভা পরিমাপের একমাত্র মাপ-কাঠি নয়। তৎকালীন হিন্দুসমাজের পুনর্জাগরণকে তিনি পুরাণকেন্দ্রিক শম্বূকবৃত্তি থেকে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, তাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাঙালীর চিন্তা, মনন ও কৌতূহলকে শুভ ও স্বাস্থ্যপ্রদ বিকাশের দিকে পরিচালনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বিচারবুদ্ধি, বিজ্ঞানবোধ ও যৌক্তিকতার সাহায্যে হিন্দুর পুরাণ-শাস্ত্র-সংহিতা পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬)-এর কথা মনে পড়বে। মনে পড়বে তাঁর মিল-বেস্থাম-কোঁতে অনুরক্তি এবং ১৮শ-১৯শ শতকী যুরোপীয় সাম্যবাদের প্রতি কৌতূহল। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকে মেজে নিয়ে যুরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা প্রাচীন কথাকে বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর যুরোপীয় জীবনতত্ত্বের সাক্ষাৎ উত্তর-পুরুষ। ব্রাহ্ম সমাজের মতো তিনি স্মৃতি-সংহিতাকে পুরোপুরি ত্যাগ করলেন না; বরং তাকে যুক্তির সাহায্যে বিচার এবং তার পরে গ্রহণে প্রস্তুত হলেন। সেই বিচার সুকঠোর যুক্তি-আশ্রয়ী। প্রয়োজন স্থলে তিনি প্রাচীন সংস্কারকে আধুনিক যুক্তি-বিজ্ঞানের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করতেও কুণ্ঠিত হলেন না। অবশ্য জীবনের উপান্তভূমিতে পৌঁছে তাঁর এই যুক্তিবাদ ও মানবতন্ত্রতা অধ্যাত্ম ও স্মার্ত সংস্কারের দ্বারা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হয়েছিল। তবে তিনি কোন দিনই পুরোপুরি স্মৃতি-সংহিতার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং প্রাচীন মোক্ষ শাস্ত্রকেও আধুনিক আন্বীক্ষিকী বিদ্যার শোধন যন্ত্রে পরিস্রাবণের চেষ্টা করেছিলেন—এই সত্য কথাটা সর্বাগ্রে স্বীকৃত হওয়া কর্তব্য। 'বঙ্গদর্শনগোষ্ঠীর' ওপর তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল বলেই চন্দ্রনাথ বসু, শশধর তর্কচূড়ামণি এবং কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বাঙালী হিন্দু সমাজকে পিছনে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা বহুলাংশে হতবল হ'য়ে পড়ে। আমাদের তো মনে হয় শিক্ষিত হিন্দু সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রগতিশীল মনের প্রভাব না পড়লে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়াতেও শশধর তর্কচূড়ামণির 'বৈজ্ঞানিক হিন্দু ধর্ম' বাঙালীর মনকে আবিষ্ট করে রাখত। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কিছুকাল তর্কচূড়ামণির 'শশশৃঙ্গবৎ' বৈজ্ঞানিক হিন্দু ধর্মের ভোজবাজিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু পরেই তিনি আত্মস্থ হন এবং লজিকে-ম্যাজিকে আসমান-জমিন ফারাক—তা সহজেই বুঝে নেন।

॥ ৪ ॥

ঊনিশ শতকের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হল কবিরূপে। তারও

চেয়ে বড় কথা, তদানীন্তন রাজনীতির আবেদন-নিবেদনের দাস্যলীলাকে বিদ্রূপ ক'রে তরুণ রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনের সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং যথার্থ দেশাত্মবোধ কি বস্তু, তা তিনি 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রে ব্যাখ্যা করলেন। এই সময়ে তিনি চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে দ্বৈরথে প্রবৃত্ত হলেন। চন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত হয়েও প্রাচীনকেই সনাতন ব'লে এমন কথা উচ্চারণ করলেন, যা যুগপৎ অনৈতিহাসিক ও কালানৌচিত্যদোষদুষ্ট। হিন্দুধর্ম, সাধনা ও আচার যে নিত্যধর্মের সঙ্গে যুগধর্মের আপোষ করে চলেছে, সময়ে সময়ে 'বৈতসীবৃত্তি' অবলম্বনেও বাধ্য হয়েছে—এ সব স্বকপোলকল্পিত কথা নয়; প্রাচীন স্মৃতি-সংহিতার মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। চন্দ্রনাথ কালানুক্রমিকতাকে অস্বীকার ক'রে ত্রিকালের ভেদরেখা মানতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। তাঁর বোধহয় ধারণা হয়েছিল, প্রাগৈতিহাসিককে ইতিহাসের কোঠায় টেনে নামালেই 'পরমা সিদ্ধি'। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত পুরাণ কথার জল্পনাকে আক্রমণ করেছিলেন। তখন তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে বৃত হয়েছেন (১২৯১ সন)। ফলে সেই দায়িত্ববোধের বশে তিনি হিন্দু সমাজের পশ্চাদ-গামিতাকে কিছু শানিত ভাষায় আঘাত দেবার চেষ্টা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কিছুকাল মনোমালিন্য চলেছিল, তার কারণও এই। সে যাই হোক, উনিশ শতকের নবজাগরণ যুবক রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর ধ্যানলীনতা থেকে টেনে এনেছিল এবং নিষ্ফল কলরবমুখর প্রাঙ্গণে তাঁকে মল্লের বেশে হাজির করেছিল। এর দ্বারা এ কথাটাই প্রমাণিত হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী-মানসে নবযুগচেতনা প্রবল বিক্ষোভের আকারে ভেঙে পড়ছিল। তাই উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য শুধু একটা সারস্বত নিদর্শনরূপেই গণনীয় নয়। তার মধ্য থেকে এক শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের ভাঙাগড়ার ইতিহাস, পুরাতন মূল্যমানের অবনয়ন এবং নূতন প্রত্যয়ের আবির্ভাব যে কোন চক্ষুষ্মান পাঠকেরই দৃষ্টিগোচর হবে। বস্তুতঃ বিশ শতকের বাঙালী-মানস ও ঐতিহ্য কার ওপর দাঁড়িয়ে আছে? ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমরা এদেশের মাটিতে যে আশ্চর্য মানুষগুলিকে দেখেছি, তাঁরাই তো একটা জাতির সমগ্র মানবচেতনাকে বিচিত্র প্রাণরসে ভরে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের অর্ধেকটাই তো ঊনবিংশ শতাব্দীর ফসল।

সম্প্রতি ঊনবিংশ শতাব্দীর তাৎপর্য নিয়ে বাদানুবাদ চলেছে। যে মনস্বী

লেখক বাঙালীকে 'আত্মবিস্মৃত জাতি' বলেছিলেন, তিনি বাঙালীমনের একটা অতিসাধারণ সত্যকেই নির্দেশ করেছিলেন। বোধহয় 'আত্মবিস্মৃত জাতি' না বলে 'অতীত-বিস্মৃত জাতি' বলাই অধিকতব সঙ্গত। তা নইলে উনিশ শতকের গৌরবময় কাহিনীকে ঊনার্থবাচক মন্তব্যের দ্বারা মুছে দেবাব এমন বিদূষক চেষ্টা তরুণ লেখকদেব ভূতাবিষ্ট কববে কেন? এঁরা বলেন, উনিশ শতককে বাঙালী জীবনের রেনেশাঁস বলা যায় না, য়ুবোপের রেনেশাঁস যেমন গোটা য়ুরোপকে মধ্যযুগীয় জড়তা থেকে বক্ষা করেছিল, বাঙালীব উনিশ শতকী বেনেশাঁস কি তাব সঙ্গে সমতুল্য? একে বড জোর *nascens* (nascenecy) বা *revivere* (revival) বলা যেতে পারে। কেন না বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা আর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি আবেগবাদীবা নূতন কোন সত্যকে উদঘাটিত করেননি, পুরাতন জরাজীর্ণতাব ওপর একটু যুগোপযোগী মোড়ক লাগিয়েছেন—এই মাত্র।

এখানে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাব অবকাশ নেই। উনিশ শতকের বাঙালীব যে সর্বাঙ্গীণ জাগরণের কথা বলা হয়, সাহিত্যে তাব যে তরঙ্গ আহৃত হয়েছে, তাকে কিছুতেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি বলা যায় না। য়ুরোপেব রেনেশাঁস যেমন হেলেনীয় সংস্কৃতি থেকে প্রচুর সহায়তা ও উপাদান নিলেও খ্রীস্টানী মধ্যযুগ থেকেও বহু উপকরণ সংগ্রহ কবেছে, তেমনি উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য মূল ভারতীয় সংস্কার এবং আগন্তুক পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে সমন্বিত করতে সমর্থ হয়েছে। য়ুবোপীয় রেনেশাঁসেব সঙ্গে বাঙলার উনিশ শতকের শিল্পাদর্শ, জীবন-চেতনা ও নীতিবোধেব সাদৃশ্য আছে বলেই একে সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে উনিশ শতকী রেনেশাঁস বলা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেব যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ করতে হলে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ঐতিহ্যগত পরিচয় গ্রহণ অবশ্যকর্তব্য।

—

নির্ঘণ্ট

(উদ্ধার-চিহ্নের দ্বারা গ্রন্থ বুঝাইতেছে।)

নির্ঘণ্ট
